বইঘর.কম
ভাষাচিত্র
bhashachitra
মানবজনম
বইঘর নিবেদন
সাদাত হোসাইন
বইঘর
বইঘর

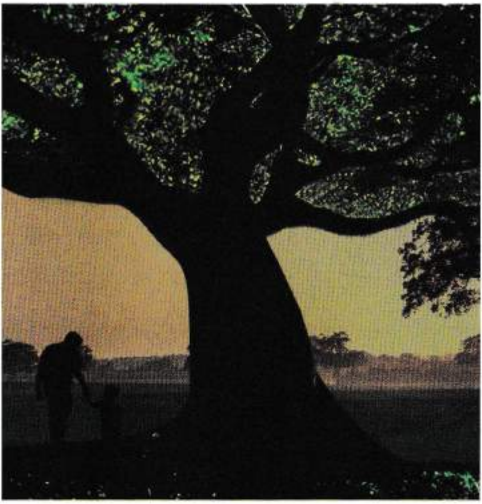

www.boighar.com

হেমার খুব বাসায় যেতে ইচ্ছে করে। তারপর তার সেই একলার বারান্দাটায় চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে। সজনে গাছগুলো কি পাতা ছেড়েছে? ঝুম বৃষ্টিতে সেই পাতাগুলো এখন নিশ্চয়ই গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে। হেমার বুকের ভেতরটা কেমন তড়পায়। এত ভেবেও নিজেকে কেন সে অনুভূতিহীন করতে পারে না? মানুষ এমন কেন? একটা পাতার জন্য, একটা ফুলের জন্য, এক ফোঁটা শিশিরের জন্য, একটা কল্পনার নদী, খানিক মেঘ, একটা পাহাড়, খানিক বৃষ্টি, খানিক স্মৃতি, খানিক স্পর্শ কিংবা ভুলে যাওয়া একটা গোটা মানুষের জন্যও কেন তার মন কেমন করে!

মানুষ হয়ে জন্মানোর এই এক কষ্ট! সকলই কেমন বুকের ভেতর ডুবে ডুবে লুকিয়ে থাকে। তারপর সুযোগ পেলেই ভেসে ভেসে ওঠে। তারপর বানের জলের মতন সকল কিছু ভাসিয়ে দেয়।

ISBN 978-984-92802-2-4

মানবজনম

www.boighar.com

মানবজনম

www.boighar.com

সাদাত হোসাইন

ভাষাচিত্র

..::MG::...
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
PRESENTS
EDIT
G ::...
..:: M
MG
SCAN
Visit Us at
...::boighar.com::...
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মানবজনম

সাদাত হোসাইন

www.boighar.com

প্রকাশক
খন্দকার মনিরুল ইসলাম
ভাষাচিত্র ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১১০০
মুঠোফোন : ০১৯৬৭ ৪০৪০৪০, ০১৬১১ ৩২৪৬৪৪
প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১৭
তৃতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১৭
চতুর্থ মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১৭
পঞ্চম মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১৭
স্বত্ব লেখক
প্রচ্ছদ খন্দকার সোহেল
মুদ্রণ টিমওয়ার্ক
মূল্য ৬৯৫ টাকা

MANABJANAM A Novel by Sadat Hossain
First Published : February 2017

Published by **BHASHACHITRA**
Mannan Market, 3rd Floor, 38/4 Banglabazar, Dhaka 1100
Cell : 01967 404040, 01611 324 644

E-mail : bhashachitra@gmail.com

PRICE : TK 695 US $ 50

ISBN : 978-984-92802-2-4

মানবজনম

সাদাত হোসাইন

SCAN & EDITED BY:

..::MG::..

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

IF YOU LIKE THIS BOOK
Please buy the original book
and help writer & publisher

একটা টু ব্যান্ডের রেডিও ছিল আমাদের। অজ-পারাগাঁয়ে আমার মা সেই রেডিওর এন্টেনা উঁচু করে ফ্রিকোয়েন্সি খুঁজতেন। তারপরও অদ্ভুত অদ্ভুত সব শব্দ হতো। সেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব শব্দের ভেতরও আম্মা উৎকর্ণ হয়ে রইতেন একটি অপার্থিব কণ্ঠের জন্য। সেই কণ্ঠের নাম কিংবদন্তি সংগীত শিল্পী **সৈয়দ আব্দুল হাদী**। www.boighar.com

আমি ভাবতাম এই মানুষটি বোধহয় বাস্তব জগতের কোনো মানুষ নন। তিনি বাস করেন এই রেডিওর ভেতর। তাঁকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। কেবল তাঁর ওই অপার্থিব কণ্ঠ রেডিওতে কান পেতে শোনা যায়। এই বিশ্বাস আমার এই সেদিন অবধি ছিল। কিন্তু সৈয়দ আব্দুল হাদীকে নিয়ে তার বায়োগ্রাফিক্যাল ভিডিও ডকুমেন্টারি বানাতে গিয়ে সেই বিশ্বাস ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি তিনি আমার সামনে বসে আছেন, জলজ্যান্ত রক্তমাংসের একজন মানুষ। আমার যেন বিশ্বাস হলো না। আমি তাকে ছুঁয়ে দেখলাম, তাকিয়ে দেখলাম, গল্প করলাম। তার সাথে ঘুরে বেড়ালাম কত কত জায়গায়। এই যাত্রায় আরও সঙ্গী ছিলেন সত্তর কিংবা আশি বছর বয়সী তাঁর বন্ধুরাও।

আমি ক্রমশ মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হতে থাকলাম, শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদীর চেয়েও মানুষ সৈয়দ আব্দুল হাদী-তে। আর তাঁর সাথের অসাধারণ সব বন্ধুদের উপস্থিতিতে কলরোল, উচ্ছ্বাসে, ব্যক্তিত্বে। মনে হলো, আমার সামনে অদ্ভুত কলকাকলিতে মুখর কিছু পাখি, উচ্ছ্বসিত কিছু শিশু কিংবা ঝলমলে কিছু তরুণ। যেন বার্ধক্যকে-বয়সকে-জরাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তুমুল উচ্ছ্বাসে তাঁরা শুষে নিচ্ছেন জীবন। জীবনের যৌবন। আমায় ভীষণভাবে চমকে দেয়া সেই সত্তরোর্ধ মানুষগুলো যেন নিমেষেই হয়ে উঠলেন আমার বন্ধু। সত্যি সত্যি বন্ধু।

সময়কে থমকে দেয়ার মতন অদ্ভুত সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেয়া চিরতরুণ সেই হৃদয়গুলোর জন্য ভালোবাসা, শ্রদ্ধা...

কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী **সৈয়দ আব্দুল হাদী** ও তাঁর বন্ধুদের–

মো. **হাবীবউল্লাহ**, সি.এম. **সফি সামি**, সি.এম. **তোফায়েল সামি**, **সাদিকুল ইসলাম ভূঁইয়া**, **খলিলুর রহমান**, **জিয়াউল হুদা** এবং

সেই অসাধারণ যাত্রার কারিগর **এনামুল হক**

ভূমিকা

আমি বিস্তৃত পরিসরে গল্প বলতে পছন্দ করি। এ কারণেই আমার উপন্যাসগুলোর দৈর্ঘ্যও বড় হয়। মজার বিষয়, এই উপন্যাস লেখার সময় প্রায়ই নানাজন বিভিন্নভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা আপনার এবারের উপন্যাসের ঘটনা কী? কী কাহিনি নিয়ে লিখছেন? বিষয়বস্তু কী?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি খানিকটা থমকে যাই। আসলেই তো, আমার উপন্যাসের কাহিনি কী? বিষয়বস্তু কী?

আমি প্রশ্নকর্তাকে বিনয়ের সাথে বলি, 'আমি এখনও জানি না, আমার উপন্যাসের কাহিনি কী?'

তিনি সরু চোখে আমার দিকে তাকান। তারপর বলেন, 'আপনি একটা উপন্যাস লিখছেন, আর আপনিই জানেন না উপন্যাসের কাহিনি কী? কেমন লেখক আপনি?'

তার এই কথায় আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাই। আসলেই তো! কেমন লেখক আমি? যে লেখক উপন্যাস শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত জানেন না, উপন্যাসের কাহিনি কী? ঘটনা কোনদিকে মোড় নিবে? কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি? এ কেমন লেখক?

এ এক রহস্যময় ব্যাপার। এই নিয়ে আমি অনেক ভেবেছিও। ভেবে ভেবে এই রহস্যের কূল-কিনারা করতে পেরেছি। আমার মনে হয়, আমি আসলে আগেভাগে, ভেবেচিন্তে, বড় কোনো প্লট মাথায় নিয়ে, উপন্যাসের শেষ হবে কীভাবে– তা সুনির্দিষ্টভাবে ভেবে, গভীর চিন্তাভাবনা করে, প্রস্তুতি নিয়ে লিখতে পারি না। আমি লিখি একদম হুটহাট। হয়তো হঠাৎ করেই একটা নাম চলে এলো আমার মাথায়, কিংবা কোনো একটা শব্দ গেঁথে গেল মনে, কিংবা কোনো একটা ছোট্ট পঙ্‌ক্তি। আমি সেই সামান্য শব্দ, নাম, বা ছোট্ট পঙ্‌ক্তি থেকেই শত শত পৃষ্ঠার উপন্যাস লিখে ফেলি। বিষয়টা অনেকটা সামান্য বীজ থেকে ডালপালা ছড়ানো বিশাল বৃক্ষের জন্মের মতো। ছোট্ট এক দানা থেকে যেমন মহীরুহ হয়, ঠিক তেমন। তবে পার্থক্য একটাই, শিমুল তুলোর বীজ থেকে যেমন শিমুল গাছ হয়, তাল গাছ হয় না, আমার

উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব খাটে না। আমার উপন্যাস যে শব্দ বা লাইনের ভাবনা থেকে শুরু হয়, সেই শব্দ, নাম বা লাইনকে অনুষঙ্গ করে সে না-ও বেড়ে উঠতে পারে। আদতে বেশিরভাগ সময়ই সে রকম করে বেড়ে ওঠে না। বরং সে বিস্তৃত হতে থাকে তার আপন গতিতে, আপন বাঁকে। তার সেই গতি, তার সেই বাঁক বোঝার সাধ্য আমার নিজেরই নেই।

এর কারণ কী? এর কারণ, লিখতে বসার পর একটা সময় গিয়ে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করি, সেই লেখা, ঘটনা কিংবা চরিত্রে আমার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং তারাই আমাকে তখন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। লিখতে লিখতে আমি আবিষ্কার করি, খানিক আগে ভেবে রাখা আমার গল্প পাল্টে যাচ্ছে, চরিত্ররা পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে আগে থেকে ভেবে রাখা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান চরিত্র। তার জায়গায় হয়তো প্রধান হয়ে উঠছে দীর্ঘ সময় অবহেলায় ফেলে রাখা অন্য কোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ চরিত্র।

লেখালেখির এই বিষয়টি আমি উপভোগ করি। লেখক হয়েও লেখার চরিত্রদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া।

মানবজনম তেমনই চরিত্র কর্তৃক লেখকের নিয়ন্ত্রিত হওয়া একটি উপন্যাস। উপন্যাস যদি জীবনাখ্যান হয়, *মানবজনম* তবে অনেক গল্পের, অনেক চরিত্রের, অনেক ঘটনার এক জীবনাখ্যান।

আমি বারবারই বলি, জীবন জুড়ে যেমন গল্প থাকে, গল্প জুড়েও তেমনি থাকে জীবন। *মানবজনম* সেইসব জীবনের গল্প। বা সেইসব গল্পের জীবন।

কিন্তু এই মানবজনম আসলে কি?

কে জানে, মানবজনম আসলে কি? হয়তো বিভ্রম আর অপেক্ষার নামই মানবজনম!

৫ জানুয়ারি ২০১৭ সাদাত হোসাইন

আষাঢ় মাসের রাত।

খানিক থেমে থেমে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি যতক্ষণ পড়ছে ততক্ষণ জোরেশোরেই পড়ছে। চারপাশ জুড়ে একটানা ঝমঝম শব্দ। কিন্তু থেমে গেলেই চারধার একদম চুপ। হঠাৎ করেই কেমন নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। তবে এখন হাওয়া বইছে। মৃদু শীতল হাওয়া। সেই হাওয়া সামান্য জোরালো হলেই গাছের পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ ঝরে পড়ছে। গাঁয়ের নাম হোসনাবাদ। হোসনাবাদে গভীর রাত। এই রাতে মানুষ ঘরে কাঁথা-মুড়ি দিয়ে ঘুমায়। টিনের চালে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি পড়ে। সেই শব্দে ঘুম হয় গভীর। এই গভীর ঘুমের রাতে গাঁয়ের বাড়িতে বাড়িতে চুরি হয়। চোর নিশ্চিন্তে সিঁধ কেটে চুরি করে। তাকে অতি সতর্কতার সাথে দুরু দুরু বুকে নিঃশব্দে চুরি করতে হয় না। সে চুরি করে আয়েশ করে। কারণ সে জানে, এই বর্ষণে গৃহস্থের ঘুম সহজে ভাঙে না।

আব্দুল ফকিরের অবশ্য সে সুযোগ নেই। তিনি কাঁধে ঝোলা নিয়ে হাঁটু সমান ল্যাদল্যাদে কাদার মধ্যে হাঁটছেন। এই কাদা-পানিতে হাঁটা তার জন্য ভয়াবহ যন্ত্রণার। তার বাঁ পায়ে বড় ধরনের সমস্যা। পায়ের সামনের দিকের পাঁচটা আঙুলই নেই। বীভৎসভাবে পাঁচ আঙুলই গোড়া থেকে কাটা। ফলে এই জল কাদায় হাঁটার সময় বাঁ পায়ে ভারসাম্য রাখা তার জন্য খুবই কঠিন। আব্দুল ফকিরের বাঁ পায়ের এই আঙুল কাটার কাহিনি সকলের কাছেই এক বিরাট রহস্য। যদিও আব্দুল ফকির সেভাবে স্পষ্ট করে কারো কাছেই এই আঙুল কাটার ঘটনা খোলাসা করেন না। তবে লোকমুখে এই নিয়ে নানা কথা প্রচলিত আছে। সেসব কথার বেশিরভাগই নানান অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও রহস্যে আবৃত।

আব্দুল ফকির দেখতে জীর্ণ শীর্ণ, অতি সাদাসিধে মানুষ। থুতনির নিচে সামান্য দাড়ি রয়েছে। গাল ভাঙা। তিনি পেশাদার ওঝা। সাপের বিষ নামান। সাথে জ্বিন-পরীর আছরও ছাড়ান। নানান অসুখ-বিসুখে লতাপাতার ওষুধ,

www.boighar.com

পানিপড়া দেন। দশগ্রামের লোক তাকে চেনে। আব্দুল ফকিরের সাথে হারিকেন হাতে হাঁটছে জুলফিকার। জুলফিকার খানিক পাগল কিসিমের মানুষ। সে কথায় কথায় হাসে। আবার কখনো কখনো থাকে ভয়ানক গম্ভীর। সময়ভেদে তার মধ্যে বিপরীতধর্মী আচরণ দেখা যায়। তবে এই মুহূর্তে সে আছে হাসিঠাট্টার মেজাজে। খানিক আগে চতুর্থবারের মতো আছাড় খেয়ে পড়েছে সে। অবশ্য নিজে পড়লেও কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে হাতের হারিকেনটা প্রতিবারই অক্ষত রাখতে পেরেছে জুলফিকার। কাদাপানিতে গড়াগড়ি খেয়ে উঠতে উঠতে সে হাসিমুখে বলেছে, 'ও কাকু, এই বাইস্যাকালে (বর্ষাকালে) দেহি হগলই ভাইস্যা যাইব গো কাকু।'

আব্দুল ফকির কথা বলেননি। এই মাঝরাতে তাকে আরামের ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে, এই নিয়ে তিনি প্রচণ্ড বিরক্ত। ফতেহপুরের চেয়ারম্যান খবির খাঁ তাকে জরুরি তলব করেছেন। খাঁ-বাড়ির ডাক এড়ানো সহজ কথা নয়। অবশ্য খবির খাঁর জরুরি তলব করার সঙ্গত কারণও রয়েছে। খবির খাঁর একমাত্র ভাগ্নে এসেছে শহর থেকে। ভাগ্নের নাম নয়ন। নয়ন সদ্য এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার। এখন তার আরো উচ্চতর শিক্ষার সময়। সামনে অবিরাম ব্যস্ততা। ডাক্তার জীবনের সেই অবিরাম ব্যস্ততায় ডুবে যাবার আগে সম্ভবত খানিক অবসর কাটাতেই সে গ্রামে এসেছে।

অতীতের নানান ঘটনায় বহুকাল নানাবাড়ির সাথে যোগাযোগ নেই তাদের। সম্পর্কটাও যেন কেমন ধূসর আর বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত সেই সম্পর্কহীনতায় খানিক সম্পর্কের ঢেউ তুলতেই সে এসেছিল নানাবাড়ি। এসেছিল বৃদ্ধ নানা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সঙ্গে দেখা করতেও। কিন্তু এসেই সে পড়েছে বিপদে। রাতে বিছানায় শুতে যাওয়ার আগে সাপের ছোবল খেয়েছে নয়ন। কুণ্ডুলি পাকানো সাপ ছিল মশারির ওপরে। মশারি তুলতে গিয়ে সে সাপটাকে যতক্ষণে দেখেছে, ততক্ষণে সাপ তার ডানহাতের আঙুলে ছোবল মেরেছে। নয়ন তীব্র আতঙ্কে পাগলের মতো চিৎকার করেছে। তার শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। খাঁ-বাড়ি ভর্তি নানান লোকজন। মুহূর্তেই তারা চারপাশ থেকে ছুটে এসেছে। নয়নের মামা ফতেহপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খবির খাঁ। তিনি দু'হাতে নয়নের কাঁধ চেপে ধরে বললেন, 'কী হইছেরে নয়ন? কী হইছে?'

নয়ন অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেনি। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার সামনেই ঘরের বেড়ার চৌকাঠের নিচের ফাঁকা অংশে। তার দৃষ্টি জুড়ে তীব্র ভয়। সে সেই তীব্র ভয় জড়ানো গলায় ফ্যাসফ্যাস করে বলল, 'সাপ, সাপ। আমাকে সাপে কেটেছে। সাপ...'।

চারদিকে বর্ষার থৈ থৈ পানি। এই পানিতে গৃহস্থের বসতবাড়িতে সাপ-খোপ থাকা বিচিত্র কিছু নয়। বরং এই সময়ে এটিই নিয়মিত ঘটনা। গৃহস্থের

উঠোনে, ঘরে, খাটের তলায় এমনকি কখনো কখনো বিছানায়ও কুণ্ডুলি পাকানো সাপ দেখা যায়। সাপে কাঁটা মানুষের সংখ্যাও এই সময়ে বেড়ে যায়।

খবির খাঁ লোকজন দিয়ে সাপের খোঁজে সারা ঘরে তল্লাশি চালালেন। তল্লাশি চালানো হলো বাইরে উঠানেও। কিন্তু সাপ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সাপটিকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। অবশ্য গ্রাম-গঞ্জের টিনের ঘরের বেড়ার চৌকাঠের নিচে অনেকটা ফাঁকা জায়গা থাকে। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে সাপ-খোপ ঢোকা অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। বরং অতি স্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক ঘটনা বের হয়ে যাওয়াও। খবির খাঁ ধরে নিয়েছেন, সাপ সম্ভবত সেই পথেই বেরিয়ে গেছে।

টানা বর্ষায় বাড়ির চারধারের ঘাস, লতাগুল্ম তরতর করে বেড়ে উঠেছে। সবুজ ঘন জঙ্গলে ছেয়ে গেছে চারপাশ। তার ওপর বাড়ির উঁচু ভিটে ছুঁইছুঁই হয়ে উঠে এসেছে বিলের পানি। এই মেঘলা রাতে সাপটা যদি টুপ করে ওই পানিতে নেমে যায় কিংবা ঘন আগাছা বা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে, তবে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। খবির খাঁ অবশ্য সেই আশা ছেড়েও দিয়েছেন। তিনি সাপ খোঁজা বাদ দিয়ে শক্ত করে নয়নের হাতের কব্জি বেঁধে দিলেন, যাতে সাপে কাঁটা বিষাক্ত রক্ত নয়নের হাত থেকে শরীরের বাকি অংশের রক্তের সাথে মিশে যেতে না পারে।

নয়নকে সাপে কেটেছে রাত দশটার দিকে। আব্দুল ফকিরের কাছে খবর এসেছে রাত একটায়। ফতেহপুর থেকে নৌকায় হোসনাবাদ ঘণ্টাতিনেকের পথ। তার মানে এখন আবার ফতেহপুর পৌঁছাতে পৌঁছাতে সকাল হয়ে যাবে। তিনি খানিক চিন্তিত। এই ভরা বর্ষায় বসতভিটায় যে সাপ থাকে, সেই সাপ হয় অতি বিষধর সাপ। খবির খাঁর ভাগ্নেকে কী সাপ কেটেছে কে জানে! দ্রুত পৌঁছাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু এই বর্ষায় নৌকা ছাড়া হোসনাবাদ থেকে ফতেহপুর যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। খানিক হেঁটে গিয়ে নৌকায় উঠতে হবে আব্দুল ফকিরকে। তাকে খবর দিয়ে আবার নৌকার ফিরে গেছে মাঝি সোহরাব। আব্দুল ফকির কাঁচা ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়েছেন। জিনিসপত্রের যোগাড়-যন্তর করে রওনা হয়েছেন।

আব্দুল ফকির নৌকায় উঠলেন আরো কিছুক্ষণ বাদে। ভালো নৌকা পাঠিয়েছে খবির খাঁ। ছইঅলা বড় নৌকা। নৌকার ভেতর পরিপাটি করে বিছানা পাতা। ছইয়ের একপাশে মাটির চুলা রয়েছে। সেই চুলায় রান্না-বান্নাও করা যায়। নৌকায় দুইজন মাঝি। খাঁ-বাড়ির বাঁধা মাঝি সোহরাব আর মাজেদ। তারা দুই ভাই। মাজেদ বড়, সোহরাব ছোট। সোহরাবের নাম নিয়ে অবশ্য খানিক জটিলতা আছে। তার নাম সোহরাব হলেও গাঁয়ের লোকজন তাকে

www.boighar.com

ডাকে ছোরাব। এই নিয়ে সোহরাবের আক্ষেপের অন্ত নেই। আব্দুল ফকিরকে দেখে সে বলল, 'ফইর সাব, নাও কি ছাড়ব?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'আল্লাহ-রসুলের নাম নিয়া নাও ছাড়ো। পথে কোথাও থামবা না। বাকি রাইত একটানা নাও বাইবা। দেখছ কী শো শো শব্দে বাতাস বইতাছে! আইজ ঝড়-তুফান অইবো। সেই ঝড় তুফানেও নাও তীরে ভিড়াইবা না। কোনোদিক না চাইয়া একটানা নাও বাইবা। কথা পরিষ্কার?'

মাঝি-ভাইদের মধ্যে সোহরাবের বয়স কম। সে গায়ে-গতরে শক্তিশালী। কিন্তু আব্দুল ফকিরের কথা শুনে সে খানিক ভড়কে গেল। ভীত গলায় বলল, 'কিছু ইশারা পাইছেননি ফইর সাব?'

আব্দুল ফকির সোহরাবের কথার জবাব দিলেন না। তিনি নাওয়ের গলুইয়ের কাছে গিয়ে পানিতে পা ডুবিয়ে যত্ন করে পা ধুলেন। পা ধোওয়া শেষে গম্ভীর মুখে নৌকার ছইয়ের ভেতর পাতা বিছানায় গিয়ে বসলেন। তারপর কাপড়ের পুঁটলি থেকে খানিক ধূপ আর নারকেলের ছোবড়া বের করে জ্বালালেন। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে নৌকার চারপাশে ফুঁ দিয়ে বললেন, 'কই মিয়ারা, নাও এহনো ছাড়ো নাই? নাও ছাড়ো, নাও ছাড়ো।'

সোহরাব লগিতে ধাক্কা দিয়ে নৌকা ছাড়ল। হাওয়ার দমক বাড়ছে। কেমন একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে নৌকার সামনে বিশেষ পদ্ধতিতে হারিকেন বাঁধা হয়েছে। তবে দেখে মনে হচ্ছে না সেই পদ্ধতি কোনো কাজে আসবে। হারিকেন নিভে যেতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে।

হারিকেনের আলোয় আব্দুল ফকিরকে কেমন অদ্ভুত লাগছে। তিনি বসে আছেন ছইয়ের ভেতর বেড়ায় হেলান দিয়ে। তার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে সোহরাবের শরীর অবধি। প্রবল হাওয়ায় হারিকেনের চিমনির ভেতরের আলো দপদপ করে কাঁপছে। সাথে কাঁপছে আব্দুল ফকিরের দীর্ঘ ছায়াও। দেখে মনে হচ্ছে আব্দুল ফকিরের ওই লম্বা ভয়ালদর্শন ছায়াখানা যেন কোনো ছায়া নয়, জীবন্ত অশরীরি কোনো অস্তিত্ব! সেই ছায়ার ভেতর বসে সোহরাবের গা কেমন ছমছম করতে থাকল। তার হঠাৎ মনে হলো, এই মুহূর্তে হারিকেনের আলোটা যদি নিভে যেত, যদি সব অন্ধকার হয়ে যেত, তাহলে বেশ হতো! এমন গা ছমছমে ভয়াল আলো-আঁধারির চেয়ে অন্ধকার ঢের ভালো। এইপথে সে অন্ধকারেও নাও বেয়ে যেতে পারবে।

সোহরাবের ভাবনা শেষ হলো না, প্রবল হাওয়া বইতে শুরু করল। ঝড়ের মতো বিক্ষুব্ধ হাওয়া। সেই হাওয়ায় নাওয়ের গলুইয়ে বাঁধা হারিকেন হঠাৎ ছিটকে পড়ল বিলের পানিতে। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল নৌকা। সোহরাব কোনো কথা বলল না। মাজেদও না। সকল কিছুই কেমন যেন স্থির হয়ে রইল। সেই স্তব্ধ স্থিরতায়ও সোহরাব আর মাজেদ ঘোরের ভেতর নৌকা বেয়ে চলল।

নৌকা ফতেহপুর চেয়ারম্যান খবির খাঁর বাড়ির ঘাটে পৌঁছাল ফজরের আজানের সময়। তখন সামান্য আলো ফুটেছে। সেই আলোয় আব্দুল ফকির খাঁ-বাড়ির ঘাটে নামলেন। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন এলাকার গণ্যমান্য লোকজন। তাদের মধ্যে রয়েছেন খবির খাঁ স্বয়ং। বোঝা যাচ্ছে, ভাগ্নের চিন্তায় সারারাত ঘুমাননি তিনি। সকলেই আব্দুল ফকিরের অপেক্ষায় ছিল। আব্দুল ফকির লাঠিতে ভর দিয়ে নৌকা থেকে পা নামিয়েছেন তীরে। কিন্তু সোহরাব যেন তখনও রাতের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে ঘোরগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে আছে আব্দুল ফকিরের দিকে। যেন জগৎ সংসারে আব্দুল ফকিরকে দেখা ছাড়া সোহরাবের আর কিছু করার নেই। আর কোনো কিছুর প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। সে ঘাড় ঘুরিয়ে নৌকা থেকে আব্দুল ফকিরের নেমে যাওয়া দেখছে। আব্দুল ফকির তার পেছনের পা নামিয়ে শানবাঁধানো ঘাটে রাখলেন। খবির খাঁ দু'পা এগিয়ে এসে আব্দুল ফকিরকে কিছু বলতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আব্দুল ফকির বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'খবরদার! নড়িস না, ছোরাব। নড়িস না। যুইত মতো বইস্যা থাক!'

সোহরাব আব্দুল ফকিরের কথার কিছুই বুঝল না। সে হতভম্বের মতো আব্দুল ফকিরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার বুকের ভেতর ধকধক করে কাঁপছে। সেই কাঁপুনি থামছে না। বরং রুদ্ধশ্বাস এক তীব্র আতঙ্ক নিয়ে সে বসে আছে। আব্দুল ফকির সামান্য সামনে এগিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসে থাকা সোহরাবের পায়ের নিচে, নাওয়ের গলুইয়ের ভেতরের অংশে বিদ্যুৎবেগে হাত চালালেন। তার হাতের গতি অবিশ্বাস্য! উপস্থিত সকলে মুহূর্তেই হতভম্ব হয়ে গেলেন! সোহরাব যেখানে বসে আছে, ঠিক সেখানেই, নৌকার কাঠের গলুইয়ের নিচ থেকে আব্দুল ফকির তার হাত বের করলেন। তার সেই হাতের মুঠোয় ভয়ালদর্শন এক সাপ! এক গোখরা সাপ!

বিস্ময়ে, আতঙ্কে উপস্থিত সকলেই যেন পাথরের মূর্তির মতো জমে গেলেন।

আব্দুল ফকির কারো দিকে তাকালেন না। তিনি হাতের মুঠোয় চেপে ধরা গোখরার মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'কীরে কালনাগিন, নাওয়ে চইড়া অত দূর পথ যাওন লাগল? আমি নিজেই তো আইতে আছিলাম!'

উপস্থিত সব কয় জোড়া চোখ প্রবল আতঙ্কে যেন চোখের কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে! আব্দুল ফকির জনতার দিকে তাকিয়ে সাপের গলা আরো শক্ত করে চেপে ধরে অদ্ভুত গলায় বললেন, 'খা রে খা, বক্ষিলারে খা'।

ফতেহপুরের চেয়ারম্যান খবির খাঁর বাবা তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অশীতিপর বৃদ্ধ। তার ছোট ভাই আইয়ুব উদ্দিন খাঁ দীর্ঘ রোগ-শোকে ভুগে বছর পনেরো আগেই মারা গেছেন। কিন্তু অবাক ব্যাপার, এই বয়সেও তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ মানুষ। শুধু যে শারীরিকভাবে শক্ত সমর্থ তা-ই নয়, মানসিকভাবেও যথেষ্ট দৃঢ় তিনি। কঠিন নিয়ম-কানুন মেনে চলা মানুষ তিনি। রোজ রাতে ঠিক ন'টায় ঘুমাতে যান, ওঠেন ফজরের খানিক আগে। কিন্তু আজ তার ঘুম ভেঙেছে আরো আগে। সম্ভবত বাইরের নানান শব্দ শুনেই তিনি আজ আগে-ভাগে জেগে উঠেছেন। উঠেই নাতি নয়নের খবর শুনেছেন। খবর শুনে দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। নিজেকে সামলে নিতে এই সময়টুকু তার দরকার ছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে দীর্ঘ উঠান পাড়ি দিয়ে নয়নের ঘরে গিয়েছিলেন তিনি। উঠানের পশ্চিম দিকের ঘরে শুয়েছিল সে। মরার মতো পড়ে রয়েছে ছেলেটা। তবে মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সাহসী মানুষ। কিন্তু নয়নকে দেখে বুকের ভেতর কেমন চিনচিনে তীব্র একধরনের ব্যথা অনুভব করলেন। শরীর জুড়ে অবশ এক অনুভূতি। নয়নের ডান হাতের আঙুলে ছোবল মেরেছে সাপ। সেই হাত দড়ি টানা দিয়ে ঘরের উঁচু আড়ার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। হাতের কব্জি ও বাহুতেও শক্ত করে বাঁধ দেয়া হয়েছে। এতে বিষাক্ত রক্ত শরীরের বাকি অংশে প্রবেশ করতে পারবে না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নাতির সামনে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। এবার যেন আগেরবারের চেয়েও দীর্ঘতর উঠান পাড়ি দিয়ে তিনি তার ঘরে ফিরলেন।

তারপর থেকে নিজের ঘরেই বসে আছেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। জড়মূর্তির মতো চুপচাপ বসে আছেন তিনি। তার মাথা জুড়ে অসংখ্য এলোমেলো ভাবনা। সেই ভাবনাগুলো একের পর এক আসছে, আবার সম্পূর্ণ না হয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্য একটি অসম্পূর্ণ ভাবনা এসে আগের ভাবনাটিকে গ্রাস করে

নিচ্ছে। কেমন একটা ঘোরের মতো অনুভূতি। বসে থাকতে থাকতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর খানিক তন্দ্রামতো লেগে এলো। সেই তন্দ্রা কতক্ষণের তা তিনি জানেন না। তবে সেই তন্দ্রার ভেতর তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখেছেন। ঠিক স্বপ্নও না, আসলে অতীতের নানান ঘটনা তার চোখের সামনে একের পর এক ভেসে উঠেছে। সেইসব ঘটনায় তিনি অবাক হয়েছেন। খানিক বেদনার্তও। তার চোখের সামনে তার একমাত্র কন্যার একমাত্র সন্তান সাপের দংশনে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে, অথচ তিনি কিনা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন!

কী ভয়ঙ্কর কথা!

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিজেই নিজের কাছে ভীষণ লজ্জিত এবং বিব্রত হলেন। তিনি রাশভারি মানুষ। কারো সাথে খুব একটা কথাবার্তা বলেন না। দীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবন তিনি কাটিয়েছেন। প্রথম যৌবনে অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিলেন। অল্প বয়সের সেই স্ত্রী পরপর দুই পুত্রসন্তান জন্ম দিয়ে গত হয়েছেন। দুই সন্তানের বড়জন ফতেহপুরের চেয়ারম্যান খবির খাঁ, আর ছোটজন বেশিরভাগ সময়েই ঘর-সংসার ত্যাগ করে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ানো দবির খাঁ।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন আর বিয়ে-শাদি করেননি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। পুত্রদের কথা বিবেচনা করেই তিনি আর বিয়ে করতে চাননি। নতুন মা ঘরে এলে ছোট ছোট সন্তানদের কতটা ভালোবাসবে, সে বিষয় নিয়ে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এ কারণেই তিনি আর বিয়ে-শাদি করেননি। বছরের পর বছর কেটেছে। পুত্ররাও বড় হয়েছে। বড় পুত্র খবির খাঁর বয়স যখন কুড়ি, তখন হঠাৎ দ্বিতীয় বিয়ে করলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম আমোদি বেগম। আমোদি বেগম দেখতে অনিন্দ্য সুন্দরী। তবে বংশ মর্যাদায় তিনি ছোট এবং অতি দরিদ্র ঘরের মেয়ে। তার বয়স তৈয়ব উদ্দিন খাঁর প্রথম পুত্র খবির খাঁর চেয়ে বছর দুয়েক বেশি।

দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হলো। সেই কন্যা সন্তানকে দেখে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ রীতিমত চমকে গেলেন। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং। লম্বা বাঁশির মতো নাক। বড় বড় চোখ। অনিন্দ্য রূপবতী এক কন্যা সন্তানের পিতা হয়েছেন তিনি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সেই কন্যার নাম রেখেছেন কোহিনূর। জগৎবিখ্যাত হীরার নামে নাম। কোহিনূর শব্দের অর্থ আলোর পর্বত। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কোহিনূর হীরার কথা জানলেও কোহিনূর শব্দের অর্থ তিনি জানেন না। তবে নূর শব্দের অর্থ জানেন। নূর শব্দের অর্থ আলো। আর এ সকল কারণেই কিনা কে জানে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার অপূর্ব রূপবতী কন্যার নাম রাখলেন কোহিনূর।

মানুষ হুট করে তীব্র কোনো কিছু নিতে পারে না। সেটি ভালো হোক কিংবা মন্দ। বরং অতি মন্দ মেনে নেয়ার চেয়ে অতি ভালো মেনে নিতে মানুষের

সমস্যা হয় বেশি। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। মানুষ তীব্র সৌন্দর্য নিতে পারে না। সে তীব্র অসুন্দর যতটা ভয় পায়, তীব্র সৌন্দর্যকে ভয় পায় তার চেয়েও বেশি। তার ভেতর একধরনের চাপা আতঙ্ক কাজ করে। তার সন্দেহ হতে থাকে, এই নিখুঁত সৌন্দর্যের আড়ালে ভয়াবহ কোনো অনাবিষ্কৃত কদর্যতা লুকিয়ে নেই তো! হয়তো এজন্যই তীব্র সৌন্দর্যকে মানুষ 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' বলে অভিহিত করে। তীব্র সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা 'ভয়ঙ্কর'কে সে অস্বীকার করতে পারে না। কোহিনূরের সৌন্দর্য সেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের মতো। যা দেখে চারপাশের মানুষের ভেতর অস্বস্তি হতে থাকে। বুকের ভেতর কেমন একধরনের শিরশির কাঁপন তৈরি হতে থাকে। কোহিনূরকে দেখেও তার আশেপাশের মানুষের তেমন হয়। তারাও তাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না। তবে এতে তারও ভূমিকাও রয়েছে। সেই ভূমিকা কেবল তার রূপেরই নয়, ভূমিকা আছে তার আচরণেরও।

কোহিনূরের আচার-আচরণও অদ্ভুতরকম! সে বাবা ছাড়া আর কারো কাছে যায় না। কারো সাথে মেশে না, কথা বলে না। সারাক্ষণ একা একা থাকে। বাড়ির উঠোনে, আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে-মধ্যে কথা বললেও তা বেশিরভাগ সময়ই কেবল নিজের সঙ্গে। শান্ত-শিষ্ট, ধীর-স্থির স্বাভাবিক এক শিশু। কিন্তু তার সেই স্বাভাবিকত্বেই কোথায় যেন খুব সামান্য অথচ তীক্ষ্ণ এক অস্বাভাবিকত্ব!

এই অস্বাভাবিকত্ব বহুদিন বাদে হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়। তারপর আবার মিলিয়ে যায়। মুহূর্তেই আবার সবকিছু হয়ে যায় আগের মতো চুপচাপ, শান্ত, স্বাভাবিক। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিজে এমন এক ঘটনার সাক্ষী।

তখন বছর তিনেক বয়স কোহিনূরের। সে বসেছিল উঠানের পাশে কাঁঠাল গাছের ছায়ায়। তার সামনে খেঁজুর পাতায় বানানো অনেকগুলো চরকি। চরকিগুলো বানিয়ে দিয়েছে খাঁ-বাড়ির অতি পুরাতন কাজের মানুষ মমিনের মা।

কোহিনূর চরকিগুলোকে খেঁজুর কাঁটার মাথায় আলতো করে বিঁধিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রতিবারই কাঁটার তীক্ষ্ণ মাথা চরকির ঠিক কেন্দ্রস্থল ফুটো করে পুরোপুরি ঢুকে যাচ্ছে। ফলে চরকি আটকে থাকছে সেই কাঁটায়।

মমিনের মা প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। বার দু'য়েক সে কোহিনূরকে সাহায্য করতে এগিয়েও এলো। কিন্তু প্রতিবারই গম্ভীর মুখে তাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে কোহিনূর। তারপর আবারো মনোযোগী হয়েছে চরকিতে। কিন্তু তাতেও ফলাফলের কোনো হেরফের হলো না। বরং তার সুন্দর মুখটি ক্রমশই মলিন হয়েছে। চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়েছে। তবে চোখের সেই কঠিন দৃষ্টিতেও ছলছল করে উছলে উঠেছে পানি।

মমিনের মা আরো একবার এগিয়ে এলো। কোহিনূর আগের দুইবারের মতো এবারও সরে গেল। কিন্তু মমিনের মা এবার যেন নাছোড়বান্দা। সে কোহিনূরের সামনে গিয়ে তার মুখোমুখি বসল। তারপর খানিক ঝুঁকে কোহিনূরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আদুরে কণ্ঠে বলল, 'আমার কাছে দেও গো মা। দ্যাহো, আমি কী সোন্দর কইরা গাঁইথা দেই। দেও, দেও।'

কোহিনূর মমিনের মায়ের দিকে তাকাল না। সে এবার পিছু সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মমিনের মা এবার আর ছাড়ল না। সে এক হাতে কোহিনূরকে জাপটে ধরে আরেক হাতে তার হাত থেকে চরকি আর কাঁটাখানা নেয়ার চেষ্টা করল। একবার, দুইবার, তিনবার। প্রতিবারই কোহিনূর তার হাত সরিয়ে নিল। কিন্তু চতুর্থবার ঘটল ভয়াবহ ঘটনা! মমিনের মা হাত বাড়াতেই কোহিনূরের হাতটি হঠাৎ সাপের মতো ছোবল মারল মমিনের মার চোখে। তীব্র চিৎকারে মমিনের মা তার ডান চোখটি বাঁ হাতে চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তার চেপে ধরা হাতের ফাঁক গলে দরদর করে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বসে ছিলেন ঘরের দাওয়ায়। তিনি ঘটনার কিছুই বুঝতে পারলেন না। খানিক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দৌড়ে ছুটে এলেন
www.boighar.com
মমিনের মায়ের কাছে। মমিনের মা তখন জবাই করা মুরগির মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। তার কান-ফাটানো চিৎকারে চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে এলো।

রক্তে মাখামাখি উঠান থেকে ধরাধরি করে মমিনের মাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঘরে। ভাগ্য ভালো কোহিনূরের কাঁটার আঘাত তার চোখে লাগেনি। লেগেছে চোখের সামান্য নিচে। প্রায় অর্ধেকটা বিদ্ধ হয়েছিল কাঁটাটি। ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু সেই ভয়াবহ ব্যাপারে আতঙ্কিত হননি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন অন্য কারণে। কোহিনূর যেমন বসেছিল, ঘটনার পরও সে তেমনই বসে রয়েছে। এই যে এত কিছু হয়ে গেল, তবুও একবারের জন্যও সে ফিরেও তাকায়নি। নিজের জায়গা থেকে একচুল নড়েনি। একমনে বসে খেজুর কাঁটায় গেঁথে হাতের চরকি ঘোরানোর চেষ্টা করছে সে। সেই কাঁটায় লেগে রয়েছে রক্ত! রক্ত মেখে যাচ্ছে চরকিতেও। কিন্তু তাতে যেন কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই কোহিনূরের।

এই ঘটনার পর থেকে চারপাশের লোকজন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। সকলেই কেমন আড়চোখে তাকাতে লাগল কোহিনূরের দিকে। খুব প্রয়োজন না হলে কেউ তার কাছে আসে না। অবশ্য কোহিনূর যেন এতে বরং খুশিই হলো। সে থাকে তার মতো। একা একা। বয়স যত বাড়ছে, ততই সে আরো অন্তর্মুখী হয়ে উঠছে। সাথে সাথে হয়ে উঠছে আরো রূপবতী! যেন চোখ ঝলসে যাওয়া

www.boighar.com

রূপ তার। এ নিয়েই চারপাশে নানা ফিসফিসানি। নানা ঘটনায় অঘটনে সেইসব ফিসফিসানি ক্রমাগত ডালপালা ছড়ায়।

এরমধ্যে ঘটল আরেক কাণ্ড! মাঝরাতে খাঁ-বাড়ির সকলেই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ঠিক তখন একা একা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কোহিনূর। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর শোবার ঘরে সারারাত অল্প আলোতে হারিকেন জ্বলে। সেই আলোয় ঘরের কোণে রাখা জলচৌকি টেনে তার ওপরে দাঁড়িয়ে দরজার খিল খুলল সে। তারপর গুটিগুটি পায়ে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে। গভীর ঘুমে অচেতন খাঁ-বাড়ির কেউ কিছু টের পেল না। ঘটনা জানাজানি হলো ফজরের আজানের পরপর। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ রীতিমতো উন্মাদ হয়ে গেলেন। দিশেহারার মতো লোক পাঠালেন বাড়ির চারপাশে। পুকুরে জাল ফেলা হলো। খোঁজ লেগে গেল গ্রামের চারদিকেও। কোহিনূরকে অবশ্য পাওয়া গেল আরো খানিকটা বেলা বাড়ার পর। খাঁ-বাড়ির জামে মসজিদের সামনে স্তূপ করে রাখা শুকনো খড়ের গাদার ভেতর ঢুকে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছিল সে।

এই ঘটনার পর থেকে কোহিনূরকে নিয়ে ফিসফিসানি আরো বাড়তে লাগল। লোকজন আড়ালে-আবডালে তাকে নিয়ে নানান কথা বলাবলি করতে লাগল। সেই বলাবলির বেশিরভাগ জুড়েই থাকে কোহিনূরের আগুনে রূপ আর উদ্ভট আচার-আচরণের গল্প। সেইসব গল্পে হাজার বছর ধরে চলে আসা গ্রামীণ নানা সংস্কারে রূপবতী মেয়েদের দুর্ভাগ্যের কথা যেমন টেনে আনা হয়, টেনে আনা হয় নানান অতিপ্রাকৃত অশুভ শক্তির কথাও। থাকে বদ জ্বীনের আছর, খারাপ পুরুষের নজরের কথাও। চাঁদের গায়ে যেমন সামান্য দাগ পড়লেই সেটি কলঙ্ক হয়ে যায়, তেমনি রূপবতী মেয়েদেরও সামান্যতেই কলঙ্কের অভাব হয় না।

সুন্দরী মেয়েদের পদে পদে ওঁৎ পেতে থাকে নানান বিপদ। সেই বিপদে জীবন কাটে প্রবল দুঃখ কষ্টে– এইসব ফিসফিসানি অবশ্য তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কান অবধি পৌঁছানোর কথা নয়। তার সামনে এ সকল কথা উচ্চারণ করার সাহস কারো নেই। কিন্তু সেবার এই কথা তার কান অবধি পৌঁছাল। পৌঁছালেন তার স্ত্রী আমোদি বেগম। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ধারণা, আমোদি বেগমের বুদ্ধিশুদ্ধি যথেষ্ট কম। সে সারাক্ষণ হাসে। সম্ভবত নামের সাথে মিল রেখেই কথায় কথায় আমোদ-ফুর্তি, হাসিঠাট্টা তার স্বভাব।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ জানালার কাছে বসে গভীর মনোযোগে বাড়ির পুরনো দলিলপত্র ঘাঁটছিলেন। এইসময়ে আমোদি বেগম এসে বললেন, 'ঘটনা শুনছেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ঘটনা শুনতে চাইলেন না। আমোদি বেগমের বেশিরভাগ কথাই তিনি শুনতে চান না। কোনো আগ্রহ বা অর্থ খুঁজে পান না। আমোদি

বেগম নিজ থেকেই বললেন, 'আপনার মাইয়ারে নাকি বজলু ব্যাপারীর বাড়ির আমড়া গাছে দেখা গেছে!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ঝট করে মুখ তুলে তাকালেন। আমোদি বেগম দাঁত বের করে হাসছেন। হাসতে হাসতেই তিনি বললেন, 'মিছা কথা বললাম। মিছা কথায়, ইছা বল, সাথে সাথে দিছে ফল।'

আমোদি বেগম হাসছেন। হাসির দমকে তার শরীর কাঁপছে। তিনি কোনোমতে হাসি থামিয়ে বললেন, 'আপনে তো আর আমার কথা শোনার জন্য মুখ তুইলা তাকাইবেন না। এইজন্য মাইয়ার নামে মিছা কথা বললাম। দেখলেন, মিছা কথায় সাথে সাথে ফল দিছে। আপনে মুখ তুইলা তাকাইছেন।'

আমোদি বেগম আবারও হাসছেন। হাসিতে তার শরীর ভেঙে পড়ছে। কিন্তু সেই হাসি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ লক্ষ করলেন না। তার মুখ গম্ভীর, থমথমে। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'যা বলতে আসছ বলো। বইলা বিদায় হও।'

আমোদি বেগম বললেন, 'বজলু ব্যাপারীর ছোট পোলা ফজু আসছিল। এইটুক পোলা। বছর পাঁচ বয়স। কী পাকনা পাকনা কথাই না জানে গো আল্লাহ! সেই পোলা বলে, তার বাপে নাকি গত রাইতে তাদের আমড়া গাছের ডালে আমাগো কোহিনূররে বসা দেখছে। সে চিৎকার করতেই তার বউ পোলা মাইয়াও ছুইটা গেছে। তারাও দেখছে। তারপর ভয়ের চোটে সে কী অবস্থা! তার বাড়ি ঘর জুইড়া লঙ্কাকাণ্ড ঘইটা গেছে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমোদি বেগমের দিকে তাকিয়ে স্থির গলায় বললেন, 'কি বললা?'

আমোদি বেগম বললেন, 'আপনের মাইয়া নাকি রাইত-বিরাইতে মাইনষের বাড়ির জংলা ভিটায়, গাছের ডালে ঘুইরা বেড়ায়।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কোনো কথা বললেন না। একদৃষ্টিতে আমোদি বেগমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ সময়। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সেই শীতল, নিষ্কম্প দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমোদি বেগম হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এই মানুষটাকে তিনি ভয় পান। বাঘের মতো ভয়। কিন্তু প্রায়ই সেই ভয়ের কথা যেন ভুলে গিয়ে হয়ে ওঠেন আদি ও অকৃত্রিম আমোদি বেগম। তবে তার পরিণতি যে খুব একটা সুখকর হয় না, তা আমোদি বেগমের চেয়ে ভালো আর কে জানে!

পরদিন ভোরে বজলু ব্যাপারীর বাড়ির পেছনের জঙ্গল কাটা শুরু হলো। শুরু হলো আশেপাশের সকল গাছপালা কাটাও। বজলু ব্যাপারীর বাড়ির ভিটায় যে বিশাল আমড়া গাছ ছিল, সেই আমড়া গাছও কাটা হলো। আমড়া গাছের সাথে বসতভিটার আম-জাম-কাঁঠাল-নারকেলসহ আর সকল বৃক্ষও কেটে ফেলা হলো। দুইদিনের মাথায় বজলু ব্যাপারীর বাড়িটি দেখে মনে হলো সদ্য কামানো

www.boighar.com

চকচকে একখানা ন্যাড়া মাথা। যেই মাথার মাঝখানে একগোছা চুলের মতো কেবল বিসদৃশ একখানা ঘর।

বজলু ব্যাপারী অবশ্য গাছ কাটার আগেই খবর পেয়ে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কাছে ছুটে এসেছিল। কিন্তু তাতে কাজ কিছু হয়নি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নির্বিকার মুখে বলেছিলেন, 'তোর তো উপকারই করলামরে বজু। আমার মাইয়া রাইত-বিরাইতে তোর বাড়ির গাছের ডালে পাও ঝুলাইয়া বইসা থাকে। সেই জিনিস দেইখা তোর বউ-পোলা-মাইয়া ডরায়। এইটা কোনো কথা! আমি থাকতে এই গ্রামে আমার মাইয়ার জন্য এমন সাংঘাতিক অসুবিধা কারো হইতে পারে না। তাই সিদ্ধান্ত নিছি, তোর বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনো গাছপালা থাকব না। গাছপালা না থাকলে গাছপালার ডালও থাকব না। আর ডাল না থাকলে আমার মাইয়াও রাইত বিরাইত গিয়া সেই ডালে পাও ঝুলাইয়া বইসা থাকতে পারব না। ঝামেলা এড়ানো সহজ। সহজ বিষয় কঠিন করার লোক আমি না।'

বজলু ব্যাপারী কান্নাকাটি করল, হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল, কিন্তু তাতে লাভ কিছু হলো না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এক কথার মানুষ। যা ভাবেন, তাই করেন। তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়ায়– এমন লোক এ অঞ্চলে নেই।

বজলু ব্যাপারীর বাড়ির আমড়া গাছের ডালের ঘটনা যে পুরোপুরি মিথ্যে, তা কিন্তু নয়। বজলু ব্যাপারীর ঘরের উপরের বিশাল আমড়া গাছের ডাল কাটতে গিয়ে দেখা গেল সেই ডালে আজদাহা এক ঘুড়ি আটকে আছে। ঘুড়ির রং কটকটা হলুদ। আবছা অন্ধকারে সেই ঘুড়ি দেখেই হয়তো কেউ একজন ভয় পেয়ে চিৎকার করেছিল। তার দেখাদেখি চিৎকার করেছিল অন্যরাও। ভয় সংক্রামক ব্যাধির মতো, যা একজনের কাছ থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অন্যদের ভেতর।

বজলু ব্যাপারীর বসতবাড়ির গাছপালা কেটে ফেলার ঘটনার পর থেকে কোহিনূরকে নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলাবলি বন্ধ হয়ে গেল। ভালো হোক, মন্দ হোক, কোহিনূরের বিষয়ে কেউ আর কোনো কথা বলে না। এই গাঁয়ে কোহিনূর যেন নিষিদ্ধ এক নাম। কিন্তু এতে সমস্যা বরং আরো বাড়ল। কোহিনূরকে নিয়ে সকলের ভেতরই অপ্রকাশ্য এক চাপা আতঙ্ক কাজ করা শুরু করল। সেই আতঙ্ক যেন দিনদিন বাড়তেই থাকল। তার কাছে সহজে কেউ ভেড়ে না। অন্য বাচ্চা-কাচ্চারাও না। কোহিনূরও যেন এই-ই চাইছিল। সকলের কাছ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একাকী এক মানুষ হয়ে গেল সে। মাঝে-মধ্যে নানান অদ্ভুত আচার আচরণ সে করে। কিংবা এমনও হতে পারে সেই আচরণগুলো কোহিনূর করে বলেই সেগুলো হয়তো তখন অন্যদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। সে ছাড়া অন্য কেউ করলে হয়তো তা অদ্ভুত মনে হতো না। মনে হতো স্বাভাবিক ছেলেমানুষি।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে হলো যেন গভীর কোনো স্বপ্ন থেকে তিনি এইমাত্র জেগে উঠলেন। চোখের সামনে ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে একের পর এক ভেসে বেড়াল বহু বহু বছর আগের সেই ঘটনাগুলো। কত বছর আগের? ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, নাকি আরো বেশি? কী জানি! তৈয়ব উদ্দীন খাঁ সময়টা মনে করতে পারছেন না। তার কাছে হঠাৎ সকলকিছু কেমন এলোমেলো লাগতে লাগল। এলোমেলো, আবছা, অস্পষ্ট! অথচ খানিক আগেই কল্পনায় বা স্বপ্নে সেইসব দিন, সেইসব স্মৃতি, কী অদ্ভুত ঔজ্বল্যে, কী অদ্ভুত সজীবতায়ই না ধরা দিয়ে গেল!

পূবাকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। খানিকবাদেই ফজরের আজান হবে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নামাজে যাওয়ার জন্য তৈরি হবেন। কিন্তু শরীরটা যেন আজ সায় দিচ্ছে না। রোজ তিনি ঘুম থেকে ওঠেন ঠিক ফজরের আজানের আগে। তারপর ওজু করে মসজিদে যান। নামাজ শেষে খানিক হাঁটাহাঁটি করেন। হাঁটাহাঁটির সময় তার সাথে থাকে এস্কান্দার। এস্কান্দার ছোটবেলা থেকে এ বাড়িতেই মানুষ। বিশাল দেহের বলশালী লোক সে। তার বাবা হায়দার আলী ছিলেন খাঁ-বাড়ির বান্ধা লাঠিয়াল। সে কালে চর দখলের ভয়াবহ লড়াই হতো। সেই লড়াইয়ে খাঁ-বাড়ির আসল শক্তি ছিল হায়দার আলী। একাই একশ মানুষের সামনে পর্বত হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারত সে। এস্কান্দারও বিশাল শরীরের মানুষ। দশ গ্রামের লোক তাকে ভয় পায়। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ প্রায়ই বলেন, 'বাপের স্বাস্থ্য শরীলের কিছুই পাইলি না এস্কান্দার। কী পাহাড়ের মতো শরীল আছিল মানুষটার। আফসোস, অল্পবয়সে ঘাট-বমিতে মারা গেল। বাপ বাইচ্যা থাকলে বুঝতি, কী বাপ আছিল তোর! কিন্তু তুই তো তোর বাপের কিছুই পাইলি নারে ছ্যামড়া। বাপের মতো অমন বলশালীও হইলি না। না হইলি শরীলে, না হইলি সাহসে।'

তবে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য জানেন, এস্কান্দার এক কথায় তার জন্য জীবন দিয়ে দিতে পারে। বাপ হায়দার আলীর মৃত্যুর পর তিনিই এস্কান্দারকে পেলে-পুষে মানুষ করেছেন। ফলে তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে সে পিতাজ্ঞান করে। সারাক্ষণ ছায়ার মতো আগলে রাখে বৃদ্ধ মানুষটাকে। ভোরের আলোর আভাস দেখা দিতেই এস্কান্দার এসে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর দরজার পাশে দাঁড়াল। খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, শেষে বার দুই মৃদু কাশির শব্দে সে তার উপস্থিতি জানান দিলো। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এস্কান্দারের দিকে ফিরেও তাকালেন না। এস্কান্দার রোজ ভোরে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে মসজিদে যায়, নামাজ পড়ে। আজও সেইজন্যই সে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আজ আর মসজিদে গেলেন না। তিনি ওযু করে জায়নামাজ হাতে গেলেন নয়নের ঘরে। হারিকেনের মৃদু আলোয় তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার সামনে মৃতের মতো পড়ে থাকা নয়নের

www.boighar.com

দিকে তাকালেন। নয়নের মাথাভর্তি বড় বড় কোঁকড়ানো চুল। ধবধবা ফর্সা গায়ের রং। ছিপছিপে লম্বা শরীর। এ যেন অবিকল কোহিনূরের প্রতিরূপ!

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দীর্ঘ সময় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। স্থির, অবিচল, অপলক। তার হঠাৎ কেমন অবাক লাগতে লাগল। মনে হতে লাগল, তার সামনে শুয়ে থাকা এই রাজপুত্রের মতো ছেলেটিই কি তার সেই গম্ভীর, ছোট্ট ফুটফুটে কন্যা কোহিনূরের সন্তান! কী অদ্ভুত! সেই গম্ভীর মুখে একা একা ঘুরে বেড়ানো ছোট্ট পরীর মতো এইটুকু এক মেয়ে কোহিনূর! তার সন্তান এই ছেলেটি, ভাবতেই কেমন অবাক লাগে! কোহিনূরকে কতবছর দেখেন না তিনি? তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মনে মনে হিসেব করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

বয়স মানুষের সামনে নানান সীমারেখা টেনে দেয়, তার মধ্যে প্রবলতম হলো বিস্মৃতি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে সেই বিস্মৃতি এখনো পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি। তবে আজকাল মাঝে-মধ্যেই বিস্মৃতি তার প্রবল উপস্থিতি জানান দিয়ে যায়।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ উঠে জানালার কাছে গেলেন। পূবাকাশে স্পষ্ট আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। ফজরের আজান হচ্ছে। নয়নের পাশে বসেই নামাজ সেরে নিলেন তিনি। নামাজ শেষে নয়নের জন্য আল্লাহর কাছে দীর্ঘ মোনাজাত করলেন।

আব্দুল ফকির ঘরে ঢুকলেন তার আরও খানিক পর। তার সাথে ঢুকলেন খবির খাঁ। আব্দুল ফকিরকে দেখে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মাথা উঁচু করে তাকালেন। তার সাথে সামান্য সময়ের জন্য চোখাচোখি হলো আব্দুল ফকিরের। তবে দুজনের কেউ কোনো কথা বললেন না। আব্দুল ফকিরের পিছু পিছু ঘরে ঢুকল আরো অনেকেই। বড় খোলা ঘর। ঘরের মাঝখানে পুরনো আমলের উঁচু খাট। খাটের পেছনের দিকের রেলিং ঘেঁষে খাঁ-বাড়ির বউ-ঝিয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা চুপচাপ। তবে সকলেই ভয়মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইল আব্দুল ফকিরের দিকে।

আব্দুল ফকির ঘরে ঢুকতেই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ খুব ধীর পায়ে নড়লেন। তারপর শান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। খবির খাঁ ছুটে এসে বাবার পেছন থেকে চেয়ারখানা সরিয়ে নিলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কোনো কথা বললেন না। তিনি ধীরে সময় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আব্দুল ফকির নয়নকে দেখলেন। নয়নের ডান হাতের আঙুলে সাপে কাঁটার চিহ্ন। আবছা আলোয় নয়নের হাতের সাপে কাঁটার দাগ স্পষ্ট না হলেও সাপের দাঁতের আঁচড়গুলো দেখলেন আব্দুল ফকির। তাকে মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত দেখালেও সাথে সাথেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলেন তিনি। খানিক থম মেরে বসে থেকে আচমকা চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তারপর মৃগী রোগীর মতো তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি

বিড়বিড় করে এক নাগাড়ে কী সব মন্ত্র পড়তে লাগলেন। জুলফিকার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে দুই হাতে আব্দুল ফকিরের মাথা চেপে ধরে আছে। আব্দুল ফকির হঠাৎ তীব্র চিৎকারে বললেন, 'কালনাগিনী দংশন করেছে গো। কালনাগিনী দংশন করেছে। এই বিষ কালনাগিনীর বিষ। রুগী ঘর থেইকা বাইর কইরা উঠানো নামাও। ক্যালা গাছ পোঁতো উঠানের মধ্যিখানে। অক্ষুণি, অক্ষুণি।'

খাঁ-বাড়ির উঠানে হুলস্থুল লেগে গেল। আশেপাশের গ্রাম থেকে আব্দুল ফকিরের আরো দুই তিনজন সাগরেদও চলে এসেছে। তারা নানান জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে সাথে করে। উঠানের মাঝখানে ছোট্ট পুকুর কাটা হলো। কোথা থেকে তিনটি কলাগাছ সমূলে উপড়ে এনে সেই পুকুরের চারপাশে পুঁতে দেয়া হলো। বড় বড় ঢোল-বাদ্যের ব্যবস্থা হলো। এ সকলই আব্দুল ফকিরের বিষ নামানোর বন্দোবস্ত। তিনি এমন কায়দা-কসরত করেই বিষ নামান। বিষ নামানোর সময় বিকট শব্দে ঢোল বাজিয়ে চিৎকার করে মন্ত্র পড়েন। মন্ত্র পড়ার সময় উচ্চ শব্দে বাদ্য বাজানোর সঙ্গত কারণ রয়েছে। আব্দুল ফকিরের মতে, মন্ত্রের কথা সকলে শুনতে পেলে সেই মন্ত্রের আর কার্যকারিতা থাকে না। এইজন্য ঢোল-বাদ্যে বিকট শব্দের ব্যবস্থা। শব্দে ঢাকা পড়ে যায় মন্ত্রের কথা।

সকল আয়োজন শেষ। এবার বিষ নামানোর পালা। ঢোলের তালে তালে মন্ত্র পড়বেন আব্দুল ফকির আর জুলফিকার। সেই মন্ত্রের জোরে রোগীর শরীর থেকে বিষ নেমে যাবে। শরীর থেকে নেমে যাওয়া বিষ শুষে নেবে কলাগাছ। আর বিষের প্রভাবে ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়বে লকলকে লাউয়ের ডগার মতো সজীব সতেজ কলাপাতা। তারপর একসময় মরে যাবে। এ যেন জীবনের বিনিময়ে জীবন।

বৃক্ষজনমের বিনিময়ে মানবজনম।

আব্দুল ফকির আয়েশ করে তীব্র আঘাতে ঢোলের ওপর প্রথম শব্দটা করলেন। সেই শব্দ তরঙ্গে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে-বাতাসে। চারপাশে মানুষ জমে বিশাল ভিড় হয়েছে। তাদের মধ্যে নানান উৎকণ্ঠা, ছেলেটা কি বাঁচবে? এই যে মরার মতো পড়ে থাকা ছেলেটা? খাঁ-বাড়ির নাতি নয়ন? সে কি এখনও বেঁচে আছে, নাকি মৃত? মৃত হলে কি তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন আব্দুল ফকির? অবশ্য আব্দুল ফকিরকে নিয়ে এমন নানান গুঞ্জন নানান সময়ে ভেসে বেরিয়েছে। তিনি নাকি সাপে কাঁটা মৃত রোগীকেও জ্যান্ত করে তুলেছেন। উপস্থিত জনতার কেউ অবশ্য তা সরাসরি দেখেনি। এই

www.boighar.com

নিয়ে তাদের কারো কারো আক্ষেপও রয়েছে। আজ কি তবে তাদের সেই আক্ষেপ ঘুঁচবে! এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারবেন আব্দুল ফকির!

রুদ্ধশ্বাস শত শত চোখের সামনে আব্দুল ফকির ঢোলের ওপরে তার দ্বিতীয় আঘাতটি করলেন। তারপর খানিক অপেক্ষায় রইলেন বাদ্যের শব্দটি বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার। বাতাসে ভেসে ভেসে শব্দটি মিলিয়ে গেল দূরে। আব্দুল ফকির এবার তৃতীয় আঘাতটি করবেন। আঘাত করার সাথে সাথে উচ্চস্বরে মন্ত্র জপতে শুরু করবেন। সাথে শুরু হবে দ্রুতলয়ে ঢোলের শব্দ। প্রথম তিনবার ঢোলে বাড়ি দিতে হয় ধীরে, বিরতি নিয়ে। তারপর মন্ত্র পড়া শুরু করামাত্র বাদ্য বাজাতে হয় দ্রুতলয়ে। আব্দুল ফকির তৃতীয় আঘাতের জন্য হাত উচেে তুলেছেন। আর মুহূর্ত খানেকের মধ্যে হাতখানা তীব্রগতিতে নেমে আসবে ঢোলের উপর। মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে। কিন্তু আব্দুল ফকিরের হাতটি আর নামল না। স্থির হয়ে ভেসে রইল শূন্যে, বাতাসে। যেন প্রস্তরের এক স্তব্ধ মূর্তি। তার চোখে আটকে রয়েছে উঠানের মাঝখানের খাটিয়ায়। চোখ আটকে গেছে উপস্থিত আর সকলেরও। নয়ন কি মুহূর্তের জন্য নড়ে উঠেছে! মৃতের মতো অচেতন পড়ে থাকা মানুষটা কি আব্দুল ফকিরের এই দু'টিমাত্র ঢাকের শব্দেই মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে!

সকলে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল উঠানে। নয়ন যে শুধু নড়ে উঠল তা-ই নয়, কিছুক্ষণের মধ্যে সে পুরোপুরি জেগে উঠল। তারপর কুঞ্চিত কপালে আধখোলা চোখে চারপাশে তাকাতে লাগল। তার চোখ, মুখ জুড়ে রাজ্যের বিরক্তি, হতভম্ব ভাব। যেন কোনো গভীর কিন্তু অপরিপূর্ণ এক নিদ্রা থেকে সে জেগে উঠেছে। আব্দুল ফকিরের এই ঢোলের তীব্র শব্দ যেন তার সেই গভীর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

এই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হবার কথা আব্দুল ফকিরের। আজকাল আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আসার পর থেকে গাঁও-গ্রামের ফকির, কবিরাজ, ওঝাদের উপর থেকে মানুষজনের বিশ্বাস উঠে গেছে। আগে যে আদর-সম্মান তারা পেতেন, আজকাল তার সিঁকিভাগও তাদের জোটে না। বরং কিছু হলেই পাশ করা ডাক্তার খোঁজে মানুষ।

অবশ্য ফতেহপুর-হোসনাবাদের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় এখনো ফকির, কবিরাজ, ওঝাই ভরসা। এই অঞ্চলের আশেপাশে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পাশ করা ডাক্তার পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভরা বর্ষায় সেটি আরো অসম্ভব। আজকের ঘটনা আব্দুল ফকিরের জন্য বিরাট সাফল্যের। শত শত লোক স্বচক্ষে ঘটনা দেখেছে, মৃতপ্রায় একজন সাপে কাঁটা রোগীকে তিনি মন্ত্র পড়ে ঢোলে বাড়ি দেওয়ামাত্র সুস্থ করে তুলেছেন। এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা!

আব্দুল ফকিরের নানা কীর্তিকলাপের কথা লোকমুখে বছরের পর বছর ধরে ছড়িয়েছে। মানুষ তাকে ভয় করে, সমীহও করে। তবে আগের সেই রমরমা ভাবটা যেন কোথায় একটু একটু করে কমছে। লোকজন যেন আজকাল আর তেমন একটা ডাকে না তাকে। কিন্তু এই ঘটনা নিঃসন্দেহে আবার তার প্রসার বাড়াবে। নিজ চোখে দেখা এই ঘটনা লোকজন রঙচঙ মাখিয়ে দশদিকে ছড়িয়ে দিবে। ফকির ওঝাদের এই ঘোরতর দুঃসময়ে আব্দুল ফকিরের জন্য এর চেয়ে ভালো ঘটনা আর কিছু হতে পারে না!

কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে আব্দুল ফকিরের চোখে-মুখে কোথাও সেই উচ্ছ্বাস বা প্রাপ্তির ছটা নেই। যা আছে তা হলো রাজ্যের দ্বিধা, বিস্ময়। তিনি দ্বিধামিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন নয়নের দিকে। যেন তার এই দীর্ঘ জীবনে এর চেয়ে খারাপ ঘটনা আর ঘটেনি!

নয়নের ফতেহপুর থাকার কথা ছিল সাকুল্যে তিন দিন। কিন্তু সে থেকে গেল দীর্ঘ সময়। এই সময়ে সে নানান আদিখ্যেতা করে বেড়ালো। গাঁয়ের বাচ্চাকাচ্চাদের সাথে কাদাজলে হুটোপুটি খাওয়া, কলাগাছের ভেলা বানিয়ে বিলের পানিতে হইচই করা– সময়গুলো আনন্দের সাথেই কাটাচ্ছিলি। এরমধ্যে একদিন দূরের গঞ্জে গিয়ে সে মোবাইল ফোনে তার মার সাথে কথাও বলল। মাকে সে জানাল, তার আসতে আরো কিছুদিন দেরি হবে। ফতেহপুরে এখনও মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক সুবিধাজনক নয়। ফলে নয়নের সাথে থাকা মোবাইল ফোনটিও এখানে একরকমের মৃত। তাছাড়া ফতেহপুরে এখনও ইলেক্ট্রিসিটিও আসেনি। ইলেক্ট্রিকের পিলার অবশ্য বসেছে বছরখানেক আগেই। কিন্তু কী এক জটিলতায় তাতে আর তার বসেনি।

রাতদুপুরে রঘু বয়াতিকে এনে খাঁ-বাড়ির উঠানে গানের জলসা বসাল নয়ন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর অবশ্য গান-বাজনা ভীষণ অপছন্দ। কেবল গান-বাজনাই নয়, তিনি গল্প-উপন্যাস-কবিতা কোনো কিছুই পছন্দ করেন না। তার কন্যা কোহিনূর ছেলেবেলা থেকেই মুখচোরা গম্ভীর স্বভাবের হলেও লেখালেখির প্রতি তার কিছু আগ্রহ ছিল। এই ঘটনা আবিষ্কার হয়েছিল কোহিনূরের বয়স যখন বারো বা তেরো তখন।

মেয়েকে নিয়ে সব সময়ই একটা চাপা আতঙ্কে থাকতেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। মেয়ের অস্বাভাবিক গম্ভীর আচরণ কাটানোর জন্যই কিনা কে জানে, খাঁ-বাড়ির ইতিহাসে প্রথম মেয়ে হিসেবে কোহিনূরকে তিনি স্কুলে পাঠালেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হয়তো ভেবেছিলেন, স্কুলে আর সকল ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশে কোহিনূরের গাম্ভীর্য এবং আচরণের অস্বাভাবিকত্ব হয়তো কিছু কমবে। কিন্তু কমল না, বরং বাড়ল। সে স্কুলে কারো সাথে মেশে না, কথা বলে না। একা একা বই-খাতা নিয়ে বসে থাকে। আর নিজের মনে আঁকিবুকি করে।

কোহিনূরকে অবশ্য স্কুলে ভর্তি করাতে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল আমোদি বেগমের বাপের দেশে। ফতেহপুরে তখনও স্কুল-মাদ্রাসা কিছু নেই। যা-ও আছে সে বেশ দূরে। তার চেয়ে বরং নানাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করুক। তাছাড়া নানান কারণে ফতেহপুরে কোহিনূরকে তখন রাখতেও চাননি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। চারপাশে মানুষের ভেতর কোহিনূরকে নিয়ে চাপা তীব্র এক আতঙ্ক। প্রবল অস্বস্তি। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করেই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কোহিনূরকে পাঠিয়ে দিলেন আমোদি বেগমের বাপের দেশে। সেখানে ক্লাস এইট অবধি পড়ালেন মেয়েকে। কিন্তু সেই পড়ালেখা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন ছোট্ট এক কারণে। মেয়ে তার স্কুলে ছড়া-কবিতা লিখে বেড়াত। সেই সকল ছড়া-কবিতা পড়ে আশেপাশের লোকজন মুগ্ধ হয়। বিশেষ করে স্কুলের হেড মাস্টার অমল বাবু ভীষণ খুশি হলেন। তিনি তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে দীর্ঘ পত্র লিখলেন। পত্রের প্রথমাংশে তিনি লিখলেন,

'শ্রদ্ধাভাজনেষু,
আপনার কন্যা কোহিনূর বানু কেবল রূপেই নয়, গুণেও সমান গুণান্বিতা। তাহার হস্তাক্ষর মুক্তোর ন্যায় জ্বলজ্বলে। তাহার ছন্দ ও মাত্রা জ্ঞান প্রকৃতি প্রদত্ত। ছড়া ও কবিতায় তাহার পারঙ্গমতাও বিস্ময়কর। এর মধ্যেই সে এক আচানক কাণ্ড ঘটাইয়াছে। আমি নিজ উদ্যোগে তাহার একখানা কবিতা ফরিদপুর জেলার এক স্বনামধন্য সংবাদপত্রে পাঠাইয়াছিলাম। সেই কবিতা তাহার ছবিসমেত পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। আমি নিজ খরচে কুড়িখানা পত্রিকা খরিদ করিয়াছি। ফরিদপুর শহরে নানা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়, নানান আলোচনা সভা হয়। আমার পরিকল্পনা রহিয়াছে আমি তাহাকে উপর্যুক্ত সাহিত্য সভাগুলোতেও লইয়া যাইব...'।

এরপর সেই পত্রে আরো দীর্ঘ বিবরণ ছিল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সময় নিয়ে সেই পত্র পাঠ করলেন। পত্রের শেষে এসে তিনি বেশ বড়সড় ধাক্কা খেলেন। সেখানে অমল বাবু ফুটনোট দিয়ে লিখেছেন,

'পুনশ্চ ঃ ভাবিয়াছিলাম আপনার নিকট প্রকাশ করিব না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেমন খচখচ করিতেছিল। তাই না বলিয়া পারিতেছি না। আমি ইতোমধ্যে দুইবার কোহিনূরকে লইয়া ফরিদপুর গিয়াছিলাম। তাহাকে সাহিত্য সভায় অনেকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়ছিলাম। যদিও সে কাহারো সহিত কোনোরূপ বাক্যালাপ করে নাই। অদ্ভুত ব্যাপার হইল সে স্কুলেও কাহারো সহিত কোনোরূপ কথাবার্তা বলে না। শিক্ষকদের সহিতও না। তবে সে আমাকে খুবই পছন্দ করে। আমিও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করি। কন্যারূপ স্নেহ। আপনি জানিয়া ব্যথিত হইবেন যে তাহার বয়সী আমার একমাত্র কন্যা জলে

www.boighar.com

www.boighar.com

ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই আমার সেই মৃত কন্যার কথা মনে পড়িয়া যায়। মনে হয়, সে-ই আমার সেই হারানো কন্যা। কোহিনূর আমাকে লইয়া একখানা কবিতাও লিখিয়াছে। সেই কবিতায় সে আমাকে পিতা বলে সম্বোধন করিয়াছে। লেখাটি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমার চোখ জলে সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। কী আচানক কাণ্ড দেখুন তো! এই যে এখন সেই কবিতার কথা আপনাকে লিখিতে গিয়াও আমার চক্ষু আবারো জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে'!

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কেন যেন অমলবাবুর এই ঘটনা নিতে পারলেন না। তার ভেতরে প্রবল রাগ আর অস্বস্তি তৈরি হলো। এই রাগ আর অস্বস্তির কারণ হতে পারে দুটো। এক. কোহিনূরকে তার অনুমতি ছাড়াই দুই-দুইবার ফরিদপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর দুই. অমলবাবুর প্রতি কোহিনূরের এই যে প্রবল আসক্তি, সেই আসক্তি।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার রাগের কারণটি স্পষ্ট ধরতে পারলেন না। তবে সেই দিনই তিনি লোক পাঠিয়ে কোহিনূরকে ফতেহপুর নিয়ে আসলেন এবং তার লেখাপড়া বন্ধ করে দিলেন। কোহিনূর অবশ্য সেভাবে কোনো প্রতিবাদ করেনি। সে তার মতো আবার একা একা তার জগতে ঢুকে গেল। তবে দিন যত যেতে লাগল, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ততই আবিষ্কার করতে লাগলেন যে এই কোহিনূর কোথায় যেন আর আগের সেই কোহিনূর নেই। জগতে যে একজন মাত্র মানুষের সাথে কোহিনূরের সখ্য ছিল, সেই মানুষটি ছিলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। কিন্তু এই নতুন কোহিনূরের কাছে তৈয়ব উদ্দিন খাঁও হয়ে রইলেন আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই দূরের মানুষ।

কন্যাতেষ্টায় ব্যাকুল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর পিতৃহৃদয় ভেতরে ভেতরে এই দূরত্ব মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু এই ব্যাকুলতার কথা, এই অসহায়ত্বের কথাও তিনি কারো কাছেই প্রকাশ করতে পারছিলেন না। তিনি জানেন না, এই কথা তিনি কার কাছে বলবেন? কীভাবে বলবেন? তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মতো রাশভারি প্রবল ব্যক্তিত্ববান মানুষটা তাই ক্রমশই যেন ভেতরে ভেতরে দংশিত হচ্ছিলেন, ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন, সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিলেন। আর সেই সঙ্কুচিত মানুষটিই নানান সময়ে নানানরকম অসংলগ্ন আচরণ করতে লাগলেন।

খাঁ-বাড়িতে একসময় ফসল ওঠার মৌসুমে বয়াতি ডেকে রাতভর গান-বাজনার আয়োজন করা হতো। জমি থেকে তোলা নতুন ধান স্তূপ করে রাখা হতো বাড়ির বিশাল উঠান জুড়ে। হারিকেনের আলোয় রাতভর সেই ধান মাড়াই করত কামলারা। মহিলারা সার বেঁধে প্রকাণ্ড কুলায় সেই ধান ঝাড়তো। আর বয়াতিরা দল বেঁধে একের পর এক গান গাইত। চারদিকে উৎসব উৎসব ভাব। কাজও চলছে সমানতালে। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ একদিন হঠাৎ সেই গানের

দলকে বারণ করে দিলেন। সকলে হতভম্ব চোখে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তারা ভেবেছিল এটি দুয়েকদিনের ব্যাপার। হয়তো কোনো কারণে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মন-মেজাজ ভালো নেই। ভালো হলেই আবার সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কিন্তু হলো না। খাঁ-বাড়ির বহু বছরের পুরনো একটি প্রথা তিনি সেইদিনই চিরতরে বন্ধ করে দিলেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এতদিন ধরে মনে হচ্ছিল খাঁ-বাড়িতে গান-বাজনা চিরতরেই বন্ধ। আর কখনো এই বাড়িতে গান-বাজনা হবে না। কিন্তু নয়ন যেন সেই নিষিদ্ধ প্রথা আবার চালু করল। সে রঘু বয়াতিকে নিয়ে এলো। রাতভর গানের আয়োজন করল। বড় মামা খবির খাঁর স্ত্রী নাজমা বেগম। সে বিকেল বেলা নাজমা বেগমের কাছে গিয়ে বলল, 'মামী, আজ ভরা পূর্ণিমা। বহুদিন পরে বৃষ্টিবাদলাও নেই। আজ রাতভর গান হবে। রঘু বয়াতিকে খবর দিয়েছি। বয়াতিদের দলে লোক মোট আটজন। দশ-বারোজনের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে, পারবেন না?'

নাজমা বেগম কোনো কথা বললেন না। তিনি কাঁচুমাচু মুখে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলেন। নাজমা বেগমের ছোট ছেলে মনির তখন গাঙপাড় থেকে মাছ ধরে ফিরেছে। বছর বাইশ-তেইশ বয়স মনিরের। তার কাঁধে ঝাঁকি জাল। সে উঠানে ঢুকতেই নাজমা বেগম বললেন, 'অ মনির। তোর বাপ কই গেছে দ্যাখ তো? এ কী যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে ফেলছে দেখ দেখি তো! এই বাড়িতে বুড়োর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। আর এ এসেছে রঘু বয়াতিরে নিয়ে। অ মনির, আমি এসবের কিছু জানি নারে। তুই তোর বাপরে খবর দে। সে এসে যা একটা ব্যবস্থা করুক।'

খবির খাঁ খবর শুনলেন আরো কিছু পর। খবর দিয়েছে মনির। খবির খাঁর দুই পুত্র। বড় পুত্র কুয়েত থাকে। সে আসে না বহু বছর। ছোট ছেলে মনির খানিক সহজ-সরল প্রকৃতির নির্বিবাদী মানুষ। সে বলল, 'আব্বা, দাদাজান শুনলে তো পিঠের ছাল তুলে ফেলাবেন।'

খবির খাঁ কোনো জবাব দিলেন না। তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। খাঁ-বাড়ির ঘটনা তো নিজ ঘরের ব্যাপার, গোটা ফতেহপুরেই এখনো তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না। আর সেখানে কিনা প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে নিষিদ্ধ থাকা গান-বাজনার আসর আবার শুরু হবে খাঁ-বাড়িতে! এ অসম্ভব! লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাবে। কিন্তু কী করবেন তিনি? খবির খাঁ দীর্ঘ সময় বসে থেকেও কোনো সমাধান পেলেন না। তিনি গাঁয়ের চেয়ারম্যান সে কথা যেমন সত্য, আবার এ কথাও সত্য, তিনি তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সন্তান। এই ষাট ছুঁইছুঁই বয়সেও তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সামনে দাঁড়াতে গেলে তার হাঁটু কাঁপে। কথা বলতে গেলে

www.boighar.com

মুখ শুকিয়ে যায়। খবির খাঁ বুঝতে পারছেন না তিনি কী করবেন! তবে যে করেই হোক নয়নকে থামাতে হবে। পথ এই একটিই। তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে কিছু বলার সাহস তার নেই। কারোরই নেই।

আছরের নামাজের পরপর তিনি হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। বাড়ির দহলিজ ঘরের সামনে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বসা। তার পাশে বসে আছে এস্কান্দার। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কবুতরদের খানা খাওয়াচ্ছেন। খবির খাঁ বাবার পাশ ঘেঁষে সন্তর্পণে মৃদু পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন। দহলিজ ঘরের ডান পাশ দিয়ে ভেতর বাড়ির দিকে যাওয়া প্রবেশের পথে আর দুই কদম বাড়ালেই ঘরের আড়ালে চলে যেতে পারবেন তিনি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিবিষ্ট মনে কবুতরদের খাবার দিচ্ছেন। মুহূর্তের জন্যও তিনি খবির খাঁর দিকে তাকাননি। হয়তো খেয়ালই করেননি। তারপরও খবির খাঁ যতদ্রুত সম্ভব তৈয়ব উদ্দিন খাঁর দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে যেতে চাইছেন। প্রায় চলেও গিয়েছিলেন, কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ খুব স্বাভাবিক কিন্তু রাশভারি গলায় খবির খাঁকে ডাকলেন। বললেন, 'গান-বাজনা হউক। এত অস্থির হওনের কিছু নাই।'

খবির খাঁ মৃদু গলায় বললেন, 'জ্বে আব্বা'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আর কোনো কথা বললেন না। বাকিটা সময় খবির খাঁ তৈয়ব উদ্দিন খাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মাগরিবের আযান অবধি কবুতরকে খাওয়ালেন। এই পুরোটা সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন তার বড় পুত্র, প্রায় ষাট বছর বয়স ছুঁইছুঁই খবির খাঁ। মুহূর্তের জন্যও তিনি তার বাবা তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে জিজ্ঞেস করার সাহস করে উঠতে পারলেন না, তিনি কি দাঁড়িয়ে থাকবেন, নাকি চলে যাবেন!

দহলিজ ঘরের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে তখন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখছে এক তরুণী। তরুণীকে দেখে মনে হচ্ছে না সে এই গাঁয়ের কেউ।

রাতভর গানের আসর হলো। আসরে আলো ছড়াল ঢাকা থেকে আসা অপরিচিত এক তরুণী। তরুণীর নাম হেমা। ঠিক হেমাও নয়, তার নাম হিমাদ্রি। কিন্তু বাবা আহমেদ আসলাম চেয়েছিলেন মেয়ের নাম হবে হেমা। যৌবনে অভিনেত্রী হেমা মালিনীর প্রতি দারুণ অনুরক্ত ছিলেন বলেই কিনা, এই নামের প্রতি তার ভীষণ দুর্বলতা ছিল। কিন্তু স্ত্রী রেণু বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক, তিনি তার কন্যার নাম রাখলেন হিমাদ্রি। কোনো এক অদ্ভুত কারণে স্ত্রীর সাথে আসলাম সাহেবের সম্পর্কটা অসম্ভব রকমের শীতল। এই সুদীর্ঘ বৈবাহিক জীবনে রেণু পারতপক্ষে অপ্রয়োজনে স্বামীর সাথে কথাবার্তা বলেননি। ঘটনাটি খুবই অস্বাভাবিক। কিন্তু এই অস্বাভাবিক ঘটনাটিই বছরের পর বছর ধরে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আসলাম সাহেব ঝলমলে আনন্দের অধিকারী এক মানুষ। কিন্তু তার এই এক জীবনে সম্ভবত এটিই তার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা যে, তিনি তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কটা কখনোই স্বাভাবিক করতে পারেননি। চেষ্টা যে করেননি, তা নয়। বরং সাধ্যের সবটুকু দিয়েই তিনি চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই চেষ্টা কখনোই সফলতার মুখ দেখেনি। হেমার কাছেও তার বাবা-মায়ের এই সম্পর্ক এক রহস্য হয়েই রয়ে গেছে। যদিও এ নিয়ে সে কখনোই তেমন আগ্রহ দেখায়নি। তাছাড়া আর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন বসবাস তাদের। ফলে এর পেছনে অতীতের কোনো গল্প থাকলেও, সেটি তার কখনোই জানা হয়ে ওঠেনি।

আসলাম সাহেব স্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে কখনোই কিছু করেন না। হিমাদ্রি নামটি তার পছন্দ নয়। বহু পুরুষকেই এই নামটি তিনি ব্যবহার করতে দেখেছেন। ফলে নামটি তার অপছন্দ হলেও তিনি স্ত্রীকে সরাসরি কিছু বললেন না। তবে আসল খেলাটা তিনি খেললেন হিমাদ্রির জন্মের পর। যেখানেই যান, যার সাথেই মেয়ের পরিচয় করিয়ে দেন, তিনি আনন্দ ঝলমলে গলায় বলেন,

www.boighar.com

'মেয়ের ভালো নাম হিমাদ্রি। এই নাম রেখেছে তার মা। কিন্তু ডাক নাম হেমা। হেমা হলো হিমাদ্রির সংক্ষেপ।'

হিমাদ্রির সংক্ষেপ হেমা নয়, হওয়ার কথা হিমা। কিন্তু এই যুক্তি কেউ আর তুলল না। বরং হিমাদ্রির মতো কঠিন উচ্চারণের একটি খটমট নামের পরিবর্তে অতি সহজ দুই অক্ষরের হেমা বলতে পেরেই যেন সকলে খুশি। এই সহজতার কারণেই হিমাদ্রি হয়ে রইল কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক নাম। আর আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত-অর্ধপরিচিত সকলের কাছেই হিমাদ্রি হয়ে গেল হেমা।

হেমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। একটা ফিল্ড ওয়ার্কের অংশ হিসেবে সে কাজ করছে গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান নিয়ে। বিষয়টি জটিল এবং নিরস হবার কথা। কিন্তু নিরস এবং জটিল বিষয়কেও প্রাণবন্ত করে তোলার এক অসম্ভব ক্ষমতা এই তরুণীর রয়েছে। তরুণীকে এই বাড়ির কেউ চেনে না। কিন্তু তাতে যেন তরুণীর কিছু আসে যায় না। সে সন্ধ্যায় সরাসরি দহলিজ ঘরের সামনে এসে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। তারপর স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, 'নয়নের কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। গল্প শুনে শুনে অবস্থা এমন হয়েছে যে আপনাকে প্রথম দেখায়ই চিনে ফেলেছি। মনে হচ্ছিল আপনাকে আমি অনেক বছর ধরে চিনি। আপনি ফতেহপুরের বিখ্যাত তৈয়ব উদ্দিন খাঁ, তাই না?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবাক হলেন না। তবে সরু চোখে তরুণীর দিকে তাকালেন। তরুণী আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তাকে সে সুযোগ দিলেন না। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'অনেকদূর পথ জার্নি কইরা আসছ, ভেতরে যাও'।

অপরিচিত তরুণীর এমন কিম্ভুত আচরণ দেখে বিস্মিত এস্কান্দার খানিক সামনে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথা শুনে সে আবার ফিরে গেল। খবির খাঁও ভীষণ অবাক হলেন। ঘটনার কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না। এই তরুণীকে তিনি চেনেন না, দেখেনওনি কখনো। ভাব দেখে মনে হচ্ছে না যে তৈয়ব উদ্দিন খাঁও চেনেন। তবে তরুণী যেহেতু এসেই নয়নের প্রসঙ্গ তুলেছে, সেহেতু এটি সহজেই অনুমেয়, তরুণী নয়নের পূর্ব পরিচিতা। কিন্তু এই সময়ে সে এখানে কী করে এলো! খবির খাঁ নানান কিছু ভাবছেন, হিসেব মেলানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তার হিসেব মিলছে না। তবে হিসেব যা-ই হোক, তার বাবা তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যেহেতু তরুণীকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতে বলেছেন, সেহেতু এখানে আর কথা চলে না। তিনি কথা বললেনও না। মাগরিবের আজান হচ্ছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ উঠে দাঁড়ালেন। হাতের অবশিষ্ট

খাবারের পাত্রখানা এস্কান্দারের হাতে তুলে দিয়ে খবির খাঁকে বললেন, 'এরে ভেতর বাড়িতে নিয়া যা। নয়ন কই? নয়নরে খবর দে!'

নয়নকে খবর দেয়া হলো। হেমা উঠানের বাঁ পাশে লিচু গাছ তলায় চেয়ারে বসেছিল। নয়নকে দেখে সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসল। যেন বিকেল বেলা তারা একসাথে পার্কে ঘুরতে বেরিয়েছিল। আশেপাশে কোনো চা ওয়ালাকে না দেখে নয়ন গিয়েছিল চা ওয়ালাকে খুঁজতে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ঘুরেও সে চা ওয়ালাকে খুঁজে না পেয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে ফিরে আসছে। তার সেই বিব্রত ভঙ্গি দেখে হেমা যেমন করে হাসত, সে এখনও তেমন করেই হাসল। তার চোখভর্তি দুষ্টুমি। সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'এই ক'দিনেই তো দেখি কালাবাবা হয়ে গেছ। তবে কালাবাবা হলেও সমস্যা নেই। তোমাকে ম্যানলি লাগছে!'

নয়ন সাথে সাথে জবাব দিলো না। সে চুপচাপ স্থির দাঁড়িয়ে রইল। গত চার বছর ধরে সে হেমাকে চেনে। হেমার এমন বহু পাগলামির সাথে তার পরিচয় রয়েছে। হেমার ফিল্ড ওয়ার্কের কাজ পড়েছে ফরিদপুরে। ফরিদপুর থেকে মাদারীপুর খুব দূরের পথ নয়। তবে মাদারীপুর জেলা শহর থেকেও ফতেহপুর গ্রামটি বেশ দূরের পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন ভালো কিছু নয় বলে দূরত্ব আরো বেশিই মনে হয়। ভরা বর্ষার মৌসুমে সেই পথ হয় আরো দুর্গম। হেমা এই এতখানি দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কী করে এলো, তা এক বিস্ময়!

চার বছর আগে পরিচয়ের পর থেকে তাদের বন্ধুত্ব। তারপর প্রেম! তবে সেই প্রেম অদ্ভুত। সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে হুটহাট দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বোঝা যায় না। কেবল কখনো যদি মৃদু হাওয়া বয়, তবেই টের পাওয়া যায়। না হলে নিস্তরঙ্গ জলের মতো তাদের এই যুগল জীবন। সেখানে কতটা দূরত্ব বাড়ল কি কমল, সেই ভাবনা কারো মনে আসে না।

নয়ন বলল, 'চমকে দিয়েছ আমাকে'।

হেমা বলল, 'আমার তো ধারণা ছিল তুমি সহজে চমকাও না। বরং সব সময় অন্যদের চমকে দাও।'

নয়ন বলল, 'সহজে তো চমকাইনি। কঠিনে চমকেছি'।

হেমা হাসল। বলল, 'কী কঠিন?'

নয়ন বলল, 'এই এতটা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তুমি এখানে! তোমাকে হয়তো এ বাড়ির কথা, গাঁয়ের কথা কখনো কখনো বলেছি। কিন্তু তারপরও এভাবে আসাটা কঠিন। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।'

www.boighar.com

হেমা তরল গলায় বলল, 'এই জন্যই তো রবীন্দ্রনাথ কবিশ্রেষ্ঠ। তিনি সেই কবে বলে গেছেন, সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম। আমিও কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।'

এবার নয়ন হাসল। বলল, 'নানাজানের সাথে দেখা হয়েছে?'

হেমা বলল, 'হ্যাঁ, হয়েছে'।

নয়ন খানিকটা চিন্তিত। সে এখনো জানে না এ বাড়ির আর সকলে বিষয়টিকে কীভাবে নেবে! সে এতকাল পরে ফতেহপুর এসেছে। আর আসার পর থেকেই একের পর এক ঘটনা। তার মা কোহিনূর এ বাড়িতে আসেন না কত কত বছর! তাদের সাথে খাঁ-বাড়ির সম্পর্কও এক প্রকার আড়ালই হয়ে গিয়েছিল। সেই আড়াল হওয়া সম্পর্ক আবার খানিক জোড়া লেগে গেল তার কারণে। কিন্তু হেমা এমন দুম করে এখানে চলে আসবে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি নয়ন। বিষয়টি কারোরই সহজভাবে নেয়ার কথা নয়। কিন্তু নানা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে হেমার দেখা হয়েছে জেনে নয়ন বেশ কৌতূহলী হলো। সে বলল, 'নানাজান কিছু বলেছেন?'

হেমা বলল, 'হু, বলেছেন'।

নয়ন বলল, 'কী বলেছেন?'

দহলিজ ঘরের সামনে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে তার দেখা হবার ঘটনা হেমা খুলে বলল। নয়ন খানিক অবাক হলেও কিছু বলল না।

রাতে রঘু বয়াতির গানের আসর বসেছে। বহুকাল পর খাঁ-বাড়িতে গানের আসর। সেই আসর সকলের জন্য উন্মুক্ত। খাঁ-বাড়ির উঠান বিশাল মাঠের মতো। এই বিরাট উঠান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। তবে দর্শকরা খানিক গুটিয়ে আছে। প্রতিটি গানের শেষে রঘু বয়াতির দলকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে অভিনন্দিত করতে সাহস পাচ্ছে না তারা। উঠানের পূবপাশেই তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ঘর। অতিরিক্ত কোলাহলে না আবার তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন! যদিও তৈয়ব উদ্দিন খাঁর আজকের ভূমিকায় সকলেই যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত! তবে সেই আনন্দের আবডালে অজানা চাপা কী এক আশঙ্কাও রয়েছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য আসেননি। খবির খাঁ শেষ মুহূর্তে একবার তার ঘরেও গিয়েছিলেন। এটা-সেটা নানান কথা শেষে ইনিয়ে-বিনিয়ে গানের প্রসঙ্গও তিনি তুলেছিলেন। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আগের মতোই গম্ভীর গলায় বলেছেন, 'একবার তো বললাম, গান হোক। এই ছোট্ট বিষয় নিয়া এত কথা বলনের তো কিছু দেখি নাই।'

সেই থেকে গানের আসর চলছে। বহুকাল পর খাঁ-বাড়িতে গান করতে পেরে রঘু বয়াতি ভারি খুশি। সে বিরামহীন গান করে চলেছে। যেন নিজেই ভুলে গিয়েছে, তার সেই আগের বয়স আর নেই। একনাগাড়ে সাত-আটটি গান

গাইতেই রঘু বয়াতি খানিক দমে গেল। গান শুরু করল তার দোহার আমজাদ মিয়া। কিন্তু আমজাদ মিয়ার গানে শ্রোতারা তেমন খুশি নয়। আসর কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। শ্রোতরা যেন ক্রমশই ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে হেমা উঠে দাঁড়াল। অনেকগুলো হারিকেনের জ্বলজ্বলে আলোর মাঝখানে তাকে দেখে মনে হচ্ছে অপূর্ব রূপবতী এক কিশোরী। সে তার গাঢ় হলুদ ওড়না কোমড়ে গুঁজে দিতে দিতে আমজাদ মিয়াকে বলল, 'আমি লোকগান খুব বেশি শুনিনি, তবে আমার খুব প্রিয় একটি গান আছে, আনন্দ আইল গো বালির বিনন্দিত মন, বালির ঘরে উদয় অইছে পূর্ণিমায়া চাঁন। আপনি এই গানটিতে বাজাতে পারবেন?'

আমজাদ মিয়া একইসাথে আড়ষ্ট এবং বিস্মিত গলায় বলল, 'পারব না ক্যান? পারব'।

আমজাদ মিয়া বাজনা শুরু করল। সেই বাজনার তালে তালে সুর তুলল হেমা। নয়ন অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। হেমার গানের গলা ভালো, তা সে জানে। কিন্তু এই অচেনা-অজানা অজপাড়া গাঁয়ে হেমার মতো আপাদমস্তক শহুরে এক তরুণী অপ্রচলিত এক লোকগানের সুরে নিজেকে এমন পুরোপুরি মিশিয়ে দিবে– এ যেন অন্য কিছু! সে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। আজকের এই হেমা যেন অন্য কেউ। অনাবিষ্কৃত কোনো এক নতুন মানুষ।

হেমার গান শেষ হলো। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। হেমাও না। রঘু বয়াতি কেবল পাশ থেকে উঠে এসে কাঁপা গলায় বলল, 'মা জননীরে তো চিনলাম না। কী নাম? কী গো মা জননী?'

হেমা মৃদু হাসল। বলল, 'হেমা'।

রঘু বয়াতি বলল, 'আগে তো আপনেরে কোনোদিন দেখি নাই? খাঁ-বাড়ির কুটুম নাকি গো মা?'

হেমা মাথা নাড়ালো। রঘু বয়াতি বলল, 'আরেকখান গান ধরবেননি মা?'

হেমা সলজ্জ গলায় বলল, 'আমি তো এই গান আর পারি না। একবার ট্রেন স্টেশনে এক ভবঘুরে বাউল দলের কাছে গানটা শুনেছিলাম। কথা আর সুরটা এমন অদ্ভুত ছিল যে মাথায় গেঁথে গেল। তারপর বহু খুঁজে বের করলাম। আর তো জানি না!'

রঘু বয়াতি বলল, 'আপনি অন্য যেই গান পারেন, তা-ই গান। আপনের গানের গলা ভালো।'

হেমা খানিক কী ভাবল। তারপর বলল, 'রবীন্দ্র সংগীত গাই? কিন্তু...'

হেমা কথা শেষ করতে পারল না। রঘু বয়াতি বলল, 'গান মা, আপনের যেইটা ভালো লাগে সেইটাই গান।'

www.boighar.com

হেমা চুপ করে কী ভাবল! তারপর চোখ বন্ধ করে বসে রইল। আকাশের চাঁদ আর চারপাশের হারিকেনের নরম আলোয় তার ফর্সা মুখটি কী যে অপরূপ এক মায়াময় বিভায় ছেয়ে রইল!

হেমা খুব ধীরে, দু'হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুকের কাছে জড় করে গাইল, 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে...'।

এই গ্রামের শতশত মানুষ, তারা গান-বাজনা বলতে যা বোঝে, তা হলো রঘু বয়াতির গ্রামীণ লোকগান। সেই গানের কিছু কিছু রঘু বয়াতির নিজের লেখা। আর কিছু কিছু মানুষের মুখে মুখে বছরের পর বছর ধরে প্রচলিত গান। সেই সকল গানের প্রকৃত স্রষ্টার নাম পরিচয় বিস্মৃত হয়ে সকলের গান হয়ে উঠেছে। তাতে তাদের রোজকার দুঃখ-বেদনা, প্রেম-বিচ্ছেদ, ভালোবাসার কথা থাকে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের এমন অচেনা কথা আর সুরের গান তাদের কাছে স্বাভাবিক হিসেবেই দূরের কোনো দুর্বোধ্য সংগীত। তার ওপর এই গানের সাথে রঘু বয়াতির দলের ঢোলবাদ্যও বাজল না। দোহারেরা সকলে হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছে। যেন এই গানের তাল লয়টা তারা ঠিক ধরতে পারছে না। কিন্তু হেমার গলায় কিছু একটা ছিল। চাঁদের আবছা আলোয় তার খালি গলায় গাওয়া গান বিষণ্ন সুর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের বুকের ভেতর যেন কোনো এক অচিনপুরের গভীর বিষাদ ছড়িয়ে দিলো।

গান শেষ হতেই হেমা উঠে এলো। রঘু বয়াতি আবার গান ধরল। হেমা কিছু সময় এসে তার আগের জায়গায় চুপচাপ বসে রইল। তারপর সকলের অগোচরে বেরিয়ে এলো গানের আসর ছেড়ে। বাইরে কী অপার্থিব মায়াময় জোছনা! গাছের পাতার ফাঁকে সেই জোছনা গলে গলে পড়ছে। মাটিতে এঁকে দিচ্ছে নানান রকম নকশা। সে সেই জোছনার নকশার ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে ঢুকে গেল বাড়ির দক্ষিণ দিকের বাগানের ভেতর। গত ক'দিনে বৃষ্টি না হওয়ায় মাটির স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা ভাবটা এখন আর নেই। বরং অনেকটাই খটখটে শুকনো হয়ে এসেছে চারপাশ। সে যেখানে এসে দাঁড়াল, সেখানে দীর্ঘাকায় এক চাম্বুল গাছ। চাম্বুল গাছখানা সটান দাঁড়িয়ে আছে খাঁ-বাড়ির বিশাল সীমানার শেষ প্রান্তে। তারপরেই দিগন্ত প্রসারিত ফসলের মাঠ। কিন্তু সেই বিস্তৃত ফসলের মাঠ জুড়ে ভরা বর্ষার থইথই জল। ফুরফুরে হাওয়ার মৃদু কম্পনে সেই জল তিরতির করে কাঁপছে। ছোটছোট ঢেউগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন কারো কল্পনার তুলিতে আঁকা অবাক নকশা!

হেমা সেই জলের ঢেউয়ের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। বিস্তৃত জলরাশির সেই অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঢেউয়ের মাথায় চিকচিক করে জ্বলছে জোছনা। সেই জল আর জোছনায় ডুবে গিয়ে হেমা চাম্বুল গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই রইল। স্থির, অবিচল। কতক্ষণ সে এমন দাঁড়িয়ে রইল তা সে জানে

www.boighar.com

না। তবে দীর্ঘ সময় বাদে হঠাৎ আবিষ্কার করল তার গাল বেয়ে নেমে আসছে উষ্ণ জলের ধারা। সে কাঁদছে!

কেন কাঁদছে সে?

কী এমন গোপন গভীরতম দুঃখ তার? যে দুঃখের কথা সে কাউকে বলতে পারছে না? কাউকে না! একা এই অচেনা-অজানা এক গাঁয়ের বিস্তৃত জলরাশির সামনে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত অপার্থিব জল আর জোছনার কাছে এসে তাকে কেন এমন করে কাঁদতে হচ্ছে! কী এমন দুঃখ সে পুষে রেখেছে বুকের গহীন ভেতর?

অপার্থিব কোনো দুঃখ?

মানুষের দুঃখগুলো কী অদ্ভুত! সে তার পুরোটা জীবন জুড়েও জানে না, কার কাছে সে তার দুঃখের কথা বলবে! কার কাছে সঁপে দিবে তার বুকের গভীরে সযত্নে লুকিয়ে রাখা একান্ত অনন্ত দুঃখগাঁথা!

নয়ন এসে দাঁড়িয়েছে অনেকক্ষণ। হেমা টের পায়নি। অবশ্য নয়ন তাকে ডাকেওনি। তবে কাছেই কোথাও ডানা ঝাপটে উড়ে গেল নাম না জানা নিশাচর কোনো পাখি। পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দে হেমা ঘুরে তাকাল। তারপর নয়নকে দেখে কেমন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তাকাল। তবে মুহূর্তেই স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে। মৃদু হেসে বলল, 'তুমি এখানে? গান শেষ?'

নয়ন জবাব দিলো না। সে হেমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। হেমা খানিকটা সামনে এসে নয়নের মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর বলল, 'চলো ভেতরে যাই। সবাই কী ভাববে!'

নয়ন সাথে সাথে জবাব দিলো না। খানিক সময় নিয়ে কী ভাবল। তারপর বলল, 'নানাজান আমার মাকে অসম্ভব পছন্দ করেন। পৃথিবীতে আর কোনো বাবা তার মেয়েকে এত ভালোবাসেন কিনা আমার জানা নেই। তবে নানাজান হলেন জগতের সেই সকল অসহায় মানুষদের একজন, যারা অহরহ তাদের রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ প্রকাশ করেন। কিন্তু কখনোই তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারেন না। এই সকল মানুষের বাইরের দিকটা হয় শুকনো, খটখটে কঠিন। সবাই কেবল তাই তাদের সেই খটখটে কঠিন রূপটাই দেখে। বুকের ভেতরে লুকিয়ে থাকা গভীর ভালোবাসাটা আর কেউ দেখে না।'

হেমা কোনো কথা বলল না। নয়নই আবার বলল, 'মা তো বহু বছর আসে না। নানাজানের সাথে দেখাও নেই কত বছর। এতকাল পর তাই আমায় পেয়ে নানাজান কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না! না হলে এই এতকাল পরে এ বাড়িতে গান-বাজনা হলো, তুমি এলে, অচেনা-অজানা এক তরুণী মেয়ে, অন্য সময় বা অন্য কেউ হলে কী হতো জানি না। কিন্তু এ সকল আমার কারণে হচ্ছে বলেই হয়তো নানাজান কিছু বলেননি। বরং সকল কিছুতেই মৌন সম্মতি দিয়েছেন।'

নয়ন সামান্য হাসল, তারপর বলল, 'সুতরাং এখানে রাত পার করে দিলেও কেউ কিছু বলবে না।'

হেমা বলল, 'বলার কথা তো বলিনি। বলেছি ভাবার কথা। বলা না হয় আটকানো যায়, কিন্তু ভাবনা? ভাবনা আটকানোর কি কোনো উপায় আছে?'

নয়ন হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

হেমা বলল, 'কেন? কী হবে?'

নয়ন বলল, 'সেটাই তো জানতে চাইছি।'

হেমা বলল, 'এই যে এমন হুট করে গ্রামে চলে এলাম, তাই?'

নয়ন বলল, 'ঠিক তা নয়। এমন করে আসাটা তোমার জন্য অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু কোথাও যেন কিছু একটা গড়মিল...'

হেমা হাসল, 'গড়মিল? তুমি গড়মিল টের পাও?'

নয়ন বলল, 'হুঁ, পাই। না পেলে গানের আসর ছেড়ে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে আসব কেন?'

হেমা বলল, 'এটা তো খুব স্বাভাবিক, সহজ। আমাকে ওখানে হঠাৎ না দেখতে পেয়ে তুমি তো খুঁজবেই। এই সহজ গড়মিল খুব সহজেই সকলে টের পায়। কেবল জটিল আর অদৃশ্য গড়মিলগুলো সকলে টের পায় না।'

নয়ন বলল, 'তুমি পাও?'

হেমা সাথে সাথেই এই প্রশ্নের কোনো উত্তর করল না। সে দীর্ঘ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিঃশব্দ সময়। হঠাৎ কাছে কোথাও গাছের পাতায় সরসর শব্দ তুলে নেমে গেল কোনো পাখি বা প্রাণী। জলের ভেতর টুপ করে শব্দ তুলল কোনো মাছ। সেই শব্দের উৎস হতে অজস্র ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে আবার ক্রমশই মিলিয়ে গেল জলে। হেমা সেই মিলিয়ে যাওয়া ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে খুব নরম কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, 'পাই'।

নয়ন বলল 'কী পাও?'

হেমা বলল, 'জটিল অদৃশ্য গড়মিল'।

নয়ন বলল, 'সেই জটিল অদৃশ্য গড়মিলটা কী?'

হেমা আবারো চুপ করে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি কী আর আপাতত ঢাকায় ফিরে যাবে না?'

নয়ন খানিক চমকে উঠল! সে বলল, 'কেন? ঢাকায় ফিরে যাব না কেন?'

হেমা বলল, 'জানি না। তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে তুমি দীর্ঘ সময় এখানে থেকে যাবে।'

নয়ন বলল, 'এমন কেন মনে হচ্ছে?'

হেমা বলল, 'অনেক বিষয় আছে, যেগুলো মনে হবার পেছনের কারণটা মানুষ ধরতে পারে না। কিন্তু মনে হয়। আবার সেই মনে হওয়াটা সত্যিও হয়ে যায়। যায় না? এটা ধরো তেমন কারণ ধরতে না পারা কোনো মনে হওয়া।'

নয়ন বলল, 'তুমি আজকাল কেমন দার্শনিকদের মতো কথা বলো।'

হেমা হাসল। বলল, 'আমি আগে এমন ছিলাম না, তাই না?'

নয়ন বলল, 'এখনও বুঝতে পারছি না। তবে কোথাও একটা বদল তো হয়েছেই।'

হেমা বলল, 'মানুষ তো বদলায়ই। ওই যে মনে নেই, মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে অকারণে বদলায়।'

নয়ন বলল, 'কারণে বদলায়, কিন্তু অকারণেও কি বদলায়?'

হেমা আবারও হাসল। বলল, 'তুমি কেন বদলেছ? কারণে, না অকারণে?'

নয়ন এবার আর জবাব দিলো না। চুপ করে রইল। হেমাই আবার বলল, 'আমরা কখনোই তো তেমন গলাগলি করে জড়িয়ে থাকা কেউ ছিলাম না। এবং এই নিয়ে তোমার আমার কারোই কোনো অভিযোগও ছিল না। আমরা জানতাম, আমরা আছি। আর সেই থাকাটা কোনোভাবেই অপ্রয়োজনীয় বা হালকা কিছু নয়। এই বোঝাবুঝিটা সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব জরুরি। কিন্তু কী হয় জানো, দীর্ঘ সময় যখন কেউ কারো সাথে থাকে, মেশে, তখন পরস্পরের নানান কিছু তাদের চেনা-জানা হয়ে যায়। ফলে সামান্য বদলও হুট করে ধরা পড়ে যায়।'

হেমা খানিক থামল। তারপর আবার বলল, 'আমি তোমাকে বলিনি, ভেবেছি, হয়তো আমারই বুঝতে ভুল। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে টের পাচ্ছিলাম, ভেতরে ভেতরে কিছু একটা চলছিল তোমার। আমি ভাবতাম, তুমি আমাকে বলবে। বারকয়েক জানতেও চেয়েছি, কিন্তু যখন বুঝতে পেরেছি, তুমি বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে চাও না, তখন আর ঘাটাতে চাইনি।'

ফুরফুরে হাওয়ায় কাঁধের ওপরের চুলগুলো এসে বারবার মুখ ঢেকে দিচ্ছিল হেমার। সে খানিক থেমে আলগোছে মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরালো। তারপর আবার বলল, 'প্রতিটি মানুষের নিজের খুব একার আলাদা একটা জগৎ থাকে। সেই জগতে সে ছাড়া আর কারোই কোনো প্রবেশাধিকার থাকে না। কারোরই না। আমি তাই তোমার সেই জগতে অনধিকার প্রবেশ করতে চাইনি। কিন্তু তোমার সেই পরীক্ষার আগ থেকেই তুমি ক্রমশই কেমন অস্থির হয়ে যাচ্ছিলে। তোমাকে আমি আগে কখনো রাগতে দেখিনি। কিন্তু সেই তুমি হঠাৎ করেই কেমন হয়ে যেতে থাকলে। হুটহাট যার-তার সাথে যখন-তখন অকারণে রেগে যেতে থাকলে। সব সময় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে। ফোনে কথা বলার সময়ও কেবল একা আমিই বলে যেতাম। প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না

www.boighar.com

যে, তুমি আমার কথা শুনছ না। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আসলে কেবল ফোন কানে চেপে ধরে বসে থাকো। আমার কথা শুনছ না। তুমি আসলে ভাবতে অন্য কিছু এবং সেই অন্যকিছু ভাবনায় তুমি গভীরভাবে ডুবে আছ। দিনের পর দিন। যখন থেকে বুঝতে পারছিলাম, তারপর থেকে তোমার জন্য খুব অস্থির লাগত আমার। কিন্তু দিনে দিনে আমরা আমাদের সম্পর্কটাই যেন কেমন করে ফেলেছিলাম! সেখানে জায়গাগুলো সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল।'

হেমার কাঁধের উপর দিয়ে নয়ন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পেছনের বিস্তৃত জলরাশিতে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে এই পৃথিবীর কোথাও আছে! বরং মনে হচ্ছে সে যেন ডুবে রয়েছে অন্যকোনো জগতে।

হেমা বলল, 'আসলে কী জানো, আমরা শুধু আমাদের পাশাপাশি ছিলাম, কিন্তু কাছাকাছি কখনোই ছিলাম না। ওই কাছাকাছি থাকাটাই আসল। কিন্তু পাশাপাশি থাকা আমাদের ভেতর ভেতর এক বিশাল দূরত্ব তৈরি হয়ে ছিল। এই দূরত্বটা সম্পর্কের জন্য খুব ভয়ঙ্কর। আমার খুব জানতে ইচ্ছে হতো, কী হয়েছে তোমার, কী হচ্ছে? কিন্তু আমরা আমাদের মাঝখানে একটা শক্তিশালী অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করে ফেলেছিলাম। সেই দেয়াল টপকানোর সাধ্য আমার একার ছিল না। আমি ভাবছিলাম ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে ঘটেছে উল্টোটা। সবকিছু বরং রোজ রোজ আরো বেঠিক হয়েছে। আমাদের যোগাযোগটাও ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছিল। কিন্তু সেসব খেয়াল করার মতো অবস্থাও তোমার ছিল না। আমি ঠিক জানি না কী, তবে তোমার বুকের ভেতর, তোমার ভাবনার ভেতর কোনো এক ঘুণপোকা তোমাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল, সে আমি টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু কী করব বলো! কিছুই করার সুযোগ আমার ছিল না। হয়তো এখনও নেই।'

হেমা নয়নের কাঁধ ছুঁয়ে বলল, 'তুমি আমাকে শুনছ নয়ন?'

নয়ন ধীরে মাথা নাড়াল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'শুনছি'।

হেমা বলল, 'আমি তোমায় বিরক্ত করছি না তো?'

নয়ন আবারো মাথা নাড়ল, 'না'।

হেমা এক পা এগিয়ে এসে নয়নের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'জগতের প্রতিটি মানুষই তার বুকের ভেতর একান্ত নিজস্ব কিছু কষ্ট বয়ে বেড়ায়। ভয়াবহ কষ্ট। সেই কষ্ট সে আর কারো কাছে বলতে পারে না। প্রকাশ করতে পারে না। কারো কাছেই না। কারণ সে জানে তার এই কষ্ট বুঝবার ক্ষমতা এই জগতে সে নিজে ছাড়া আর কারোরই নেই। কারোরই না। কেবল সে একা, কেবল সে নিজে একা ছাড়া আর কেউই সেই কষ্ট ছুঁতে পারবে না। স্পর্শ করতে পারবে না।'

হেমা সামান্য থামল। তারপর আবার বলল, 'এই জন্যই বুঝি সবাই বলে, দিন শেষে আমরা সকলেই আসলে একা। ভীষণরকম একা, তাই না?'

নয়নের হঠাৎ কী হলো! সে হেমাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হেমা মুহূর্তকাল স্থবির দাঁড়িয়ে রইল। তাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদা এই মানুষটাকে সে আগে কখনো দেখেনি। এই দীর্ঘ ছয় বছরেও না। সে দু'হাতে শক্ত করে নয়নকে তার বুকের সাথে জাপ্টে ধরে রাখল।

হেমা নিজেও কি কাঁদছে? কে জানে!

হেমা কাঁদলেও তার সেই কান্না শব্দহীন। হেমা আর নয়ন, দুটো মানুষ, তারা পরস্পরের চেনা কিংবা অচেনা, তারা পরস্পরকে জানে কিংবা জানে না, কিন্তু সেই মানুষ দু'টো এক গভীর নিস্তব্ধতায় দীর্ঘ সময় ধরে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অব্যক্ত কত কিছুই না বলে গেল! কত কিছুই না শুনে গেল! সে সকল হয়তো ভাষায় বলা যায় না। জগৎ তো এমনই, এখানে গভীরতম অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, প্রকাশ করতে হয় স্পর্শে, অনুভূতিতে। নয়ন আর হেমা, পরস্পরকে সেই গভীরতম অনুভূতির কথা বলে যেতে লাগল শব্দহীন এক গভীরতম নৈঃশব্দ্যে।

www.boighar.com

হেমা চলে গেল পরদিন ভোরেই। তারপরের কয়েকটা দিন কেটে গেল নিস্তরঙ্গ। সেই নিস্তরঙ্গ সময় কেটে গিয়ে আবার খানিক তরঙ্গায়িত হলো নয়নের সময়। তার সাথে আব্দুল ফকিরের দেখা হলো এক মঙ্গলবার। মঙ্গলবার বিলকুড়ানির হাট। বিলকুড়ানি ফতেহপুর থেকে যন্ত্রচালিত নৌকায় ঘন্টাদুয়েকের পথ। এই এলাকার নাম বিলকুড়ানি হওয়া নিয়ে নানান গল্প রয়েছে। তবে সবচেয়ে প্রচলিত গল্প যেটি রয়েছে, সেটি হলো এই অঞ্চল জলাবদ্ধতার অঞ্চল, ফলে বর্ষা মৌসুমের ফসল ছাড়া আর কোনো মৌসুমের ফসল এখানে হয় না। এই এলাকার খেটে খাওয়া মানুষজন তাই অন্যান্য মৌসুমে আশেপাশের এলাকায় কাজ-কর্মের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে হেমন্তে যে ধান ওঠে সেই ধান কাটতে তারা দলবল বেঁধে নেমে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে। ধান কেটে তারা গৃহস্থের কাছ থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে ধানের একটা ভাগ তো পায়ই। তার ওপর আরো খানিক অধিক আয়ের জন্য ফসল তুলে ফেলা শূন্য মাঠে, মাঠের আইল বা ইঁদুরের গর্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা উচ্ছিষ্ট ধান সংগ্রহে তারা দিনের পর দিন কাজ করে। এই ধান সংগ্রহকে বলে ধান কুড়ানো। তারা যেহেতু প্রতি মৌসুমেই শুকনো ফসলের মাঠ-বিলে দলবল বেঁধে এমন ধান কুড়ায়, সে কারণেই দিনে দিনে তাদের গাঁয়ের নাম হয়ে যায় বিলকুড়ানির গাঁও। তবে আজকাল আর সেই বিলকুড়ানির গাঁওয়ের আগের সেই অবস্থা নেই। বরং আর সকল এলাকা থেকে এই এলাকা এখন ঢের এগিয়ে গেছে। এখানে সকলের আগে ইলেক্ট্রিসিটি চলে এসেছে। বাজারের দোকানপাট বেড়েছে। ইলেক্ট্রিসিটি আসার কারণে জমির দাম বেড়েছে। ব্যবসাপাতিও বেড়েছে মানুষের। হরেক রকমের লোকজন আসায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরনেও বৈচিত্র্য এসেছে। দোকানে দোকানে ছোট্ট সাদা কালো, কালেভদ্রে দুয়েকখানা রঙিন টেলিভিশনও দেখা যাচ্ছে। নয়ন এসেছে তার বড় মামা খবির খাঁর ছেলে মনিরের সাথে। আসার পুরো পথে মনির তাকে বিলকুড়ানির নানান গল্প বলেছে। নয়ন সেসব মন দিয়ে শুনেছেও।

www.boighar.com

মনিরের সকল গল্প এসে ঠেকে মাছে। কোন বছর কোন বিলে কত বড় মাছ ধরা পড়েছিল, এই হলো তার গল্পের নির্যাস। আর গল্প শেষ হবে দীর্ঘশ্বাসে, 'বুঝলেন ম্যাভাই (মিয়া ভাই), সেই আগিলা (আগের) দিন আর নাই। মাছ নাই পানিতে। থাকব ক্যামনে? পানিই তো নাই। আগে নাকি বাইস্যাকালে চাইরদিকে থাকত খালি পানি আর পানি। মাইনষের ঘর যাইতো ডুইব্যা, সবারই বাড়ির চালে গিয়া ঘর বানান লাগত। আর এখন? দেখছেন, এই যে বাইস্যাকালটা আইল, আছে? কোনোদিক কোনো পানি দেহেন? এই কোমড় পর্যন্ত পানি না হইলে কি আর বাইস্যাকাল হয় কন? তার উপরে পানিতে এহন নানান বিষ। মাইনষে ক্ষেত-খামারে সার দেয়, কিটনাশক দেয়, এইগুলান তো সব বিষ। এই বিষ যায় কই? যায় পানিতে। মাছ কেমনে থাকব কন?'

নয়নের শুনতে যে খারাপ লাগে তা না। তবে তার ভাবনা জুড়ে অন্য কিছু। সে প্রায়ই সেই অন্যকিছুতে আনমনা হয়ে থাকে। মনিরের বেশিরভাগ কথাই তাই তার শোনা হয় না।

নয়নের অবশ্য বিলকুড়ানির হাঁটে আসার মূল উদ্দেশ্য তার মোবাইল ফোনে চার্জের ব্যবস্থা করা। সে শুনেছে এখান থেকে ফোনের নেটওয়ার্কও অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। তা চার্জ হলোও। মায়ের সাথে ঢাকায় কথাও হলো। তার মা কোহিনূর বানু ফোন ধরেই বললেন, 'তুই কবে আসবি?'

নয়ন উদাস গলায় জবাব দিলো, 'জানি না মা'।

এইটুকু মাত্র কথা, তারপর কোহিনূর বানু চুপ করে রইলেন। তিনি পারতপক্ষে কারো সাথে খুব একটা কথাবার্তা বলেন না। তবে ব্যাতিক্রম বলতে কেবল এই নয়ন। তার এই একজীবনে তিনি যত কথা বলেছেন, সম্ভবত তার বেশিরভাগই নয়নের সাথে। তিনি খানিক চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'তুই আমাকে বল তো, তুই কী চাইছিস?'

নয়ন বলল, 'আমি তো কিছু চাইছি না মা।'

কোহিনূর বানু বললেন, 'না চাইলে তুই আমাকে না বলেই ফতেহপুর গেলি। আর গিয়ে জানালি দুয়েক দিনের মধ্যে ফিরে আসবি কিন্তু তারপর থেকে তোর সাথে আমার আর কোনো যোগাযোগ নেই। কয়েকদিন পরপর এখান সেখান থেকে ফোন দিয়েই আবার উধাও!'

নয়ন বলল, 'ফতেহপুরে ইলেক্ট্রিসিটি নেই। ফোনের নেটওয়ার্কও নেই, তা তো তুমি জানোই। কী করে কথা বলব!'

কোহিনূর বানু বললেন, 'তুই আসছিস না কেন? কবে আসবি?'

নয়ন বলল, 'গ্রাম আমার খুব ভালো লেগে গেছে মা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি খারাপ না লাগা অবধি আমি এই গ্রামেই থেকে যাব।'

www.boighar.com

কোহিনূর বানু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে নয়নের চোখ আটকে গেল বাজারের সাথেই স্কুলের মাঠে। সেখানে খানিক আগেও ছোটখাট এক জটলা ছিল। সেই জটলা এইটুকু সময়ে যথেষ্ট বড় হয়েছে। মানুষের ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। তবে মাঠ খানিক নিচু হওয়ায় ভিড়ের মানুষের মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, জটলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন আব্দুল ফকির। আব্দুল ফকিরের হাতে ফণা তোলা এক গোখরা সাপ। জটলার কারণে এতদূর থেকে আব্দুল ফকিরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। খানিক পরপর মানুষ এসে দাঁড়াচ্ছে দৃষ্টিপথে। নয়ন তড়িঘড়ি করে মাকে বলল, 'মা, রাখি। পরে কথা বলব'।

কোহিনূর বানু আর কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। নয়ন ফোন কেটে দিয়ে দ্রুত পায়ে জটলার কাছে গেল। আব্দুল ফকির এখন জটলার মাঝখানে বসে আছেন। গোখরা সাপটা এখনো তার গলায় ঝুলছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগের মতো সে আর ফণা তুলে ফোঁসফোঁস শব্দ করছে না। বরং অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে দড়ির মতো গলা পেঁচিয়ে ঝুলে আছে। আব্দুল ফকিরের সামনে অনেকগুলো কাঁচের বয়াম। বয়ামগুলোভর্তি নানান রকমের ভেষজ ওষুধ। ওষুধের পাশে কয়েকটি কাঠের বাক্স। বাক্সগুলোতে সম্ভবত আরো কয়েকটি সাপ রয়েছে। কিন্তু আব্দুল ফকির সেই সাপগুলো বের করছেন না। তার সাথে রয়েছে জুলফিকার।

জুলফিকার সুর করে কথা বলছে, 'মুসলমান ভাইদের আমার সালাম, হিন্দু ভাইদের আমার নমস্কার। আপনেগো সামনে আইজ যিনি উপস্থিত হইয়েছেন, তারে আপনেরা সকলে এক নামে চেনেন। তিনি হইলেন কালনাগিনীর জম, নাগ নাগিনীর ভ্রম, স্বীয় পায়ে সর্প অর্পণ, সাত'শ সর্প মন্ত্রে কর্তন, নাগিনীর চোখ তাহার দর্পণ, তিনি মানব বীর, বলেন, কে তিনি? বলেন, বলেন, বলেন... তিনি...?'

উপস্থিত জনতা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'তিনি আব্দুল ফইর, তিনি আব্দুল ফইর'।

জনতা আব্দুল ফকিরের নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে জুলফিকার হাততালি দিলো। নয়ন এতক্ষণ খেয়াল করেনি, আব্দুল ফকিরের পাশেই তের চৌদ্দ বছরের শীর্ণকায় এক কিশোর জড়সড় হয়ে বসে আছে। জনতা আব্দুল ফকিরের নাম বলার সাথে সাথেই সেই কিশোর লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার পায়ে নর্তকীদের মতো ঘুঙুর। সে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়তেই জুলফিকার আবারো হাততালি দিলো। জুলফিকারের দেখাদেখি হাততালি দিলো উপস্থিত জনতাও। কিশোর ছেলেটি মুহূর্তেই তার কোমড় থেকে একটি বাঁশি বের করল।

এই বাঁশিকে বলে বীণ। বীণ বাজাতে শুরু করলেই সাপ বীণের তালে তালে নাচতে শুরু করে।

আব্দুল ফকির হাতের ইশারা করতেই কিশোরটি বীণ বাজাতে শুরু করল। বীণ বাজাতে গিয়ে তার গলার সরু শিরাগুলো বীভৎস রকম টানটান হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে। দম রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। তবে দেখে মনে হচ্ছে যে কোনো সময় দম বন্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে ছেলেটি। কিন্তু ছেলেটি পড়ল না। বিস্ময়কর রকম দম তার। আব্দুল ফকির নিস্তেজ গোখরা সাপটিকে তার গলা থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখলেন। তারপর তার বাম হাতটি মুঠি করে সাপটার মুখের কাছে নিয়ে গেলেন। আব্দুল ফকিরের দুই হাতের দশ আঙুল জুড়েই নানান রকমের বড় বড় আংটি। তিনি সেই আংটি দিয়ে বার দুয়েক মুহূর্তের জন্য সাপটার মুখে মৃদু আঘাত করলেন। সেই আঘাতেই সাপটা যেন আবার ফুঁসে উঠল। বাঁশি বাজাতে থাকা কিশোর ছেলেটি এবার অর্ধনমিত হয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে সাপটার সামনে শরীর বাঁকিয়ে নাচতে লাগল। নৃত্যের সাথে সাথে তার মুখের বাঁশি ধরা হাতেও সে চমৎকার ভঙ্গিতে নানাভাবে দোলাতে থাকল। তার এই বাঁশির সুর এবং বাঁশিসহ দেহ দোলানোয় এক অদ্ভুত সুন্দর ছন্দ রয়েছে। উপস্থিত জনতা যেন সেই সুর আর ছন্দে বুঁদ হয়ে আছে। সাথে বুঁদ হয়ে আছে সাপটির অসাধারণ নৃত্যেও।

উপস্থিত জনতার সাথে নয়ন আর মনির অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, নিস্তেজ সাপটি এবার ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। শুধু যে দাঁড়িয়েছে, তা-ই নয়, সে যেন বাঁশির সুরে সুরে ক্রমশই আরো উঁচুতে উঠছে। কিশোর ছেলেটির বাঁশির সুর আর ছন্দের সাথে সাথে সেও সারা শরীর বাঁকিয়ে মোহনীয় ভঙ্গিতে নাচছে।

নয়নের কানের কাছে মুখ এনে মনির ফিসফিস করে বলল, 'দেখছেন ম্যাভাই, এই হইল আব্দুল ফইর! সাপখোপ তারে আজরাইলের মতো ভয় পায়। সে যা কয়, তা-ই শোনে। সে যদি আন্ধার রাইতেও রাস্তা দিয়া হাঁইটা যায়, আশেপাশে কোনোখানে সাপখোপ থাকলে যে যেদিকে পারে পলাই যায়। দেখছেন, কেমনে মাজা দুলাইয়া নাচতে আছে। কী আচানক কাণ্ড, দেখছেন ম্যাভাই'!

নয়ন কোনো কথা বলল না। মনিরই আবার বলল, 'দেখলেন না, আপনেরে কেমনে বাঁচাই তুলল! আপনে মরা মানুষটা, কেমনে ঢোলে দুইটা বাড়ি দিয়া আপনেরে জ্যাতা (জীবন্ত) বানাই দিলো। কী আচানক কাণ্ড!'

নয়ন এবারো কোনো কথা বলল না। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আব্দুল ফকিরের দিকে। আব্দুল ফকির উঠে দাঁড়ালেন আরো খানিক পর। তিনি উঠেই গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনেরা এইখানে আসছেন সাপের খেলা দেখতে। ভালো কথা। এই যে বাক্সগুলান দেখতেছেন, এইগুলানের সবকয়টা ভর্তি সাপ।

www.boighar.com

নানান জাতের, নানা রঙের বিষধর সব সাপ। আইজ সবই আপনাগো দেখাব। কিন্তু তার আগে একখান কথা। এই যে বাইস্যাকাল, সকলের বাড়ি ঘরে পানি উঠতেছে। খাল বিল, নদী নালা, মাঠ, ঘাট সবই যে ডুইবা গেছে, এতে যে মহা বিপদ আইতেছে ঘরে ঘরে, সেই খেয়াল আছে?'

আব্দুল ফকিরের কথা বলার ভঙ্গিতে বিশেষ কিছু একটা রয়েছে। শরীর জুড়ে কেমন শিরশিরে অস্বস্তিকর এক অনুভূতি হয়। কিন্তু সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি সত্ত্বেও তার সামনে থেকে চলে যাওয়া যায় না। কথা শেষ না হওয়া অবধি সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। নয়ন আর মনিরও দাঁড়িয়ে রইল।

আব্দুল ফকির বললেন, 'ঘরে ঘরে এহন সাপের বাসা। সাপ এহন যাইব কই? এই পানিতে যাইব? এই পানিতে থাকব? না। সাপের এহন যাওনের জায়গা একটাই। সেই জায়গা হইল গৃহস্তবাড়ির ঘর। গৃহস্তবাড়ির লোকজনের ঘুমানোর চৌকির তলা। ধান-চাউলের গোলা। ওইদিন হুনলাম কেরামতগঞ্জের ইনুচ মুন্সির পোলারে সাপে কামড়াইছে। সে ঘুমাই আছিল বিছানায়, আচুক্কা (আচমকা) দেখে পিঠের নিচে ঠান্ডা ঠান্ডা কী যেন লাগে। হাত দিয়া ধরতে গেছে, সাথে সাথে কামড়। আমারে খবর দিছে দুপার বেলা। যাইতে যাইতে সন্ধ্যা। বাঁচান বড় মুশকিল আছিল। তয় শ্বাস যতক্ষণ থাকে, আল্লাহ-রসুলের দোয়ায় আব্দুল ফইর ততক্ষণ পর্যন্ত সাপে কাঁটা রুগীরে জমের হাতে ছাড়ে না।'

আব্দুল ফকির দম নেয়ার জন্য খানিক থামলেন। পাশ থেকে জুলফিকার বলল, 'খালি দম থাকলেই বাঁচাইতে পারেন কাকু? দম না থাকলে বাঁচাইতে পারেন না?'

জুলফিকার প্রশ্ন ছুড়ে দিলেও কেউ কোনো জবাব দিলো না। উপস্থিত জনতা কোনো কথা বলছে না। এই এতবড় জটলা, এত এত মানুষ, কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না। ভয়ে বা উত্তেজনায় তারা সকলেই নিশ্চুপ হয়ে আছে। আব্দুল ফকিরের সম্পর্কে নানান কথা তারা নানান সময়ে শুনেছে। সে সকল কথা শুনতে কেমন অবিশ্বাস্য লাগে, ভয় লাগে, কিন্তু আবার ভালোও লাগে। কেমন এক ধরনের রোমাঞ্চ হয়। মনে হয় এ বাস্তবে ঘটা কোনো ঘটনা নয়। অথচ ঘটনাগুলো বাস্তব, আর সেই অবাস্তবকে বাস্তব করে তোলা মানুষটা তাদের সামনেই! সকলেই পরের ঘটনা শোনার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

জুলফিকার বলল, 'শোনেন মেয়ারা। আব্দুল কাকু তার নিজের ঘটনা নিজে বলতে চান না। শরমিন্দা হন। তয় আমার মুখে শোনেন। আপনেরা তো সকলে ফতেহপুরের খাঁ-বাড়ি চেনেন। সেই বাড়ির তৈয়ব উদ্দিন খাঁরে চেনে না এমন মানুষ এই দ্যাশে নাই। সেই দিন গভীর রাইতে খবর আইল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর নাতি সাপের কামড়ে মারা গ্যাছে। নাতি বিরাট ডাক্তার। থাকে ঢাকার শহর।

গ্রামে আইছে বুড়া নানারে দ্যাখতে। আইসা সাপের কামড় খাইছে। খাইছে দিনের বেলা। কী করব, কী করব, কোন ডাক্তারের কাছে নিব, এইসব ভাবতে ভাবতেই হইছে রাইত। ততক্ষণে রুগী তো শ্যাষ। শ্বাস-নিঃশ্বাসও বন্ধ। মরা লাশ আর কি! সবাই কান্নাকাটি করতেছে। সেই সময় তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার বড় পোলা খবির খাঁরে ডাইকা বলল, ডাক্তার-ফাক্তার বাদ। আমার নাতিরে যদি কেউ বাঁচাইতে পারে, তয় পারব একমাত্র আব্দুল ফইর, যা এক্ষুণি তারে আনতে লোক পাঠা, এক্ষুণি। লোক আসলো ভোর রাইতে। আমরা গেলাম পরদিন বেয়ান বেলা। সাপে কাঁটা রোগী এতক্ষণ বাঁচে? আপনেরাই কন, বাঁচে?'

তুমুল উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাস তাকিয়ে থাকা মানুষগুলো এবার জবাব দিলো। তারা সমস্বরে বলল, 'না, বাঁচনের কথা না'।

জুলফিকার ম্লান গলায় বলল, 'বাঁচেও নাই। আহারে লাল টুকটুক্কা গায়ের রঙ পোলাটার। সাপের বিষে নীল হইয়া গেছে। মরা মানুষটা পইড়া আছে বিছানায়। সবাই চিক্কুর দিয়া কানতেছে। কেউ কেউ কোরআন শরিফ পড়তেছে, দোয়া-দরুদ পড়তেছে। কিন্তু উপরে আল্লাহ, আর নিচে ইল্লাহ আব্দুল ফইর। আব্দুল ফইর গিয়া রুগীরে একপলক দেখলেন। দেইখা বললেন, রুগীরে উঠানে নামাও। উঠানের মাঝখানে ক্যালাগাছ পোঁত। ক্যালাগাছের শরীলে যাবে রুগীর শরীলের বিষ, সেই বিষে ক্যালাগাছ মরব, রুগী মরব না। এই রুগীরে আমি ছাড়ব না, যতবড় সাপের বিষ হউক, এই রুগীরে আমি ছাড়ব না।'

জুলফিকার একটু থামল। তারপর গলা পরিস্কার করে গম্ভীর স্বরে বলল, 'আব্দুল ফইর সেই রুগীরেও জমের হাতে ছাড়েন নাই। ঢোলে দুইটা বাড়ি দিয়া মন্তর পড়ছেন, সাথে সাথে রুগী লাফ দিয়া উইঠ্যা খাড়াইছে! কী মিয়ারা, সেইদিনের ঘটনা দেখছেন এমুন কেউ নাই এইহানে? কথা কন না কেন মিয়ারা? নাই কেউ এইহানে?'

ভীড়ের মধ্যে হইচই পড়ে গেল। সেইদিন খাঁ-বাড়িতে ছিল, নিজের চোখে সেই দিনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এমন দুজন লোকও বেরিয়ে এলো ভিড় থেকে। তারা নিজের চোখে কী দেখেছে তাও বর্ণনা করল। উপস্থিত শ্রোতারা বিস্ময়াভিভূত চোখে আব্দুল ফকিরের দিকে তাকিয়ে আছে! তাদের চোখে একই সাথে শ্রদ্ধা, ভয় এবং বিস্ময়!

হইচই খানিক কমলে আব্দুল ফকির মৃদু কাশির শব্দ করলেন, তারপর বললেন, 'যাই হউক। এইসব কথা এত বলনের কিছু নাই। আসল কথায় আসি। আমার বয়স হইয়া গেছে, আগের মতো এহন আর যহন তহন হাঁটা চলা, দৌড়ঝাঁপ করতে পারি না। যেইহানে সেইহানে সাপের বিষ নামাইতেও যাইতে পারি না। আপনেরা শোনছেন কিনা জানি না, এইবার এহন পর্যন্ত এই অঞ্চলে ঊনপঞ্চাশ জনরে সাপে কাটছে। সবখানে তো আমি যাইতে পারি নাই,

তাই মারাই গেছে বেশিরভাগ। এহন আল্লায় আমারে একটা ক্ষমতা দিছে, মানুষের উপকার করার, জান বাঁচানোতে সাহাইয্য করার ক্ষমতা। এহন সেই দায়িত্ব যদি আমি ঠিকঠাক পালন করতে না পারি, তাইলে আমি হইমু পাপী। মহাপাপী। এই পাপের ভাগিদার আমি হইতে চাই না। আল্লাহর নামে আপনেগো কিছু সাহাইয্য করতে চাই।'

আব্দুল ফকির থামলেন। থেমে দু'কদম বাঁ পাশে সরে গেলেন। তারপর মাটি থেকে একখানা কাঁচের বয়াম হাতে নিয়ে চোখের কাছে ধরলেন। সেই কাঁচের বয়াম দীর্ঘ সময় ধরে দেখে বয়ামখানা হাতের তালুতে নিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, 'এই বয়াম আপনেগো জইন্য। এই বয়ামের ভিতর যে গাছগাছরার ছালবাকল দেখতেছেন, এই ছালবাকল সাধারণ কোনো ছালবাকল না। এইগুলান সাপের জম। তার ওপর আমার মন্ত্র পড়া। বাড়ির চাইরপাশে এই ছালবাকল ছিটাইয়া দিবেন। বিছানার নিচে, চৌকির নিচে, ধানের গোলার ভিতর, টিনের চালে এই ছালবাকল যত্ন কইরা রাইখা দিবেন। এক টুকরা ছাল যেইহানে থাকব, সেইহানে সাপ তো দূরের কথা, সাপের গন্ধও আইব না।'

আব্দুল ফকির বয়ামখানা মাটিতে রাখলেন। দর্শকদের মধ্যে আবার শোরগোল শুরু হয়েছে। আব্দুল ফকির শান্ত গলায় বললেন, 'তাড়াহুড়ার কিছু নাই। আপনেরা সবাই-ই পাইবেন। আপনেদের জইন্য ওই বস্তা ভইরা ছাল বাকল আনা হইছে। জুলফিকার আর রতন, দুইজন মিল্যা আপনেগো সবাইরেই দিব। আপনেরা যে যা পারেন কিছু হাদিয়া দিয়া যাবেন।'

আব্দুল ফকির জটলা থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও আবার থামলেন। তারপর বললেন, 'আরেকখান কথা। অনেক সময়ই কোনো ফইরের ফিহিরে কাজ না হইলে, সেই ফইরের দোষ হয়। সবাই বলে ফইরসাবে কোনো কামের না। কিন্তু কেউ হিসাব কইরা দেহে না, ফইরে যা কইছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হইছিল না কিনা? শোনেন মেয়ারা, এই ছালবাকলা ছিটাইবেন ফজরের নামাজে খাড়ানের আগে। ওযু কইরা পাক পবিত্র হইয়া, খালি প্যাডে, এক গ্লাস পানিও খাওন যাইব না। একদম খালি প্যাডে। পাক পবিত্র থাকনটা খুব জরুরি। মনে রাইখেন।'

আব্দুল ফকির কথা শেষ করে ধীর পায়ে জটলা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপরের কয়েক মিনিটে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। তারা আব্দুল ফকিরের সেই আশ্চর্য ক্ষমতাধর বৃক্ষের ছালবাকল সংগ্রহের জন্য উঠে-পড়ে লাগল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, সারি সারি সাজিয়ে রাখা কাঁচের বয়ামগুলো খালি হয়ে গেল। খালি হয়ে গেল বস্তাও। তবে সেই বৃক্ষের বাকল বিক্রির হাদিয়ায় ক্রমশই পূর্ণ হয়ে উঠল জুলফিকারের হাতের টাকার থলেটি।

নয়ন আর মনির গুটিগুটি পায়ে জটলা ছেড়ে আড়াআড়ি মাঠ পেরিয়ে স্কুলের কাছাকাছি চলে এলো। এখান থেকে সামান্য বায়ে হেঁটে গেলেই বড় খাল। এইসময়ে খালের দুই পাড়ে নানান রকমের সারি সারি নৌকা বাঁধা থাকে। নৌকাগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে পণ্য নিয়ে আসে সওদা করতে। এই থইথই বর্ষায় খাল অবশ্য আর খাল নেই, দিগন্ত বিস্তৃত বিলের জলের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

www.boighar.com

খালপারের উঁচু মাটির ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে মনির বলল, 'ম্যাভাই, দেখলেন কারবার খান? একদম জাদুর লাহান কাণ্ড-কারখানা! আপনের ঘটনার কথাই চিন্তা কইরা দেহেন, মরা মানুষটারে ফইর সাবে জ্যাতা বানাই দিলো। কী আচানক কাণ্ড!'

নয়ন তাকিয়ে আছে বিস্তৃত জলের ওপরে ভেসে থাকা ধানডগার দিকে। মৃদু ঢেউয়ে ধানের ডগাগুলো তিরতির করে কাঁপছে। দেখে মনে হচ্ছে তাদের এই কম্পনেরও বুঝি কোনো নির্দিষ্ট ছন্দ রয়েছে। তারা একসাথে তাদের ডগা নুইয়ে প্রায় জল ছুঁইছুঁই হয়ে আবার মুহূর্তেই সাই করে দল বেঁধে উঠে যাচ্ছে। কী যে অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য! নয়ন সেদিক তাকিয়ে আনমনা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। পাখির পালকের মতো ছুঁয়ে যাওয়া মোলায়েম হাওয়ায় তার মনটা কেমন উদাস হয়ে উঠল।

মনিরের অবশ্য সে বালাই নেই। সে নয়নের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যে পানি দেখছেন ম্যাভাই, এই পানিতে কিন্তু মাছ নাই। পানির রঙ দেখলেই বলন যায়, সেই পানিতে মাছ আছে, না নাই। আপনে তো দাদাজানের সাথে কথাই বলেন না। দাদাজান আপনেরে যেই পছন্দ করেন, তার অর্ধেকও যদি আমারে করত, তাইলে দেখতেন, মাছ ধরনের কায়দা-কানুন সব আমি শিখ্যা ফালাইতাম। দাদাজান যে বয়সকালে কত মাছ ধরছে! শুনছি দাও বটি দিয়া কোপাইয়া আইড় বোয়াল ধরত! কিন্তু তারে তো আমি বাঘের লাহান ভয় পাই। ম্যাভাই, এইবার কিন্তু দাদাজানের কাছেরতন মাছ ধরনের কিছু কায়দা-কানুন জাইনা আমারে শিখাইবেন।'

নয়ন কথা বলল না। সে খালপাড়ের উঁচু ঢিবি ধরে হাঁটা ধরল। দু'চারটি নৌকা পার হয়ে যেতেই সে দেখল একটি ছইওয়ালা নৌকার গলুইয়ে ধ্যানের ভঙ্গিতে বসে রয়েছেন আব্দুল ফকির। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত সমর্থ দুই যুবক। নয়ন মুহূর্তের জন্য যেন থমকে দাঁড়াল। তারপর পা বাড়িয়ে আবার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে চাইল। কিন্তু পেছন থেকে তার বাহু চেপে ধরল মনির। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'ফইর সাব ভারে বইছে'।

নয়ন বলল, 'ভারে বসা মানে কী?'

www.boighar.com

মনির দ্বিরুক্তি করল, 'ধ্যান ধ্যান। ফইর সাব ধ্যানে বইছে। ধ্যানে বসলে উনার সাথে জ্বিন-পরীদের কন্টাক হয়। আগাম অনেক খবর জানতে পারেন।'

নয়ন আব্দুল ফকিরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তিনি মুদ্রিত চোখে স্থির বসে আছেন। তার গলায় এখনও ঝুলে আছে সেই গোখরা সাপ। ধীরে ধীরে তার নৌকার সামনে মানুষ জমছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবক দু'জন নৌকা থেকে নেমে এসে দুই পাশে হাত প্রসারিত করে খানিকটা জায়গা নিয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে স্কুল মাঠের জটলায় ওষুধ বিক্রি করে জুলফিকার আর তার সাথের সেই বীণ বাজানো কিশোর ছেলেটিও চলে এসেছে। তাদের সাথে দুজন মাল বহনকারী মুটে। মুটে দুজনের মাথায় বাদবাকি সাপের বাক্স আর নানা জিনিসপত্র। তারা সে সকল নৌকায় তুলে দিয়ে ফিরে গেল।

ততক্ষণে অবশ্য আব্দুল ফকিরের নাও ঘিরে ভিড় বেড়েছে। সন্ধ্যা নামতে খুব একটা বাকি নেই। পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্যের লাল টুকটুকে আভায় রঙিন হয়ে ওঠা মেঘ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে নয়ন বলল, 'উনি এখন কী করবেন রে মনির?'

মনির বলল, 'উনি এখন কিছুই করব না। তয় লোকজন উনার কাছে এখন নানান অসুখ-বিসুখের দাওয়াই চাইব। ভবিষ্যতের বিপদ আপদ জানতে চাইব। কারো মাইয়ার বিয়া হয় না, কারো পোলা ঘুমের মইধ্যে বিছানায় মোতে, কারো ছেলে সন্তান হয় না, এইসব দাওয়াই চাইব।'

নয়ন ঘাড় ঘুরিয়ে ধ্যানমগ্ন আব্দুল ফকিরের দিকে তাকাল। তারপাশে দাঁড়িয়ে আছে জুলফিকার। জুলফিকার আব্দুল ফকিরকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আব্দুল ফকির চোখ মেলে তাকালেন। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই এত এত মানুষের মধ্যেও আব্দুল ফকির চোখ মেলে সোজা তাকালেন অনেকটাই দূরে খালপাড়ের উঁচু ঢিবির উপরে দাঁড়ানো নয়নের দিকে। তারপর চমৎকার ভঙ্গিতে হেসে হাত ইশারায় নয়নকে ডাকলেন। নয়ন কিছু সময়ের জন্য বুঝতে পারল না, তিনি কি আসলেই তাকে ডাকছেন কিনা, নাকি সে ভুল বুঝছে! কিন্তু সে লক্ষ করে দেখল উপস্থিত সকলেই তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। নয়ন অবশ্য তারপরও দাঁড়িয়ে রইল। সে আসলে খানিক বিভ্রান্তি বোধ করছে। কিন্তু মনির চাপা উচ্ছ্বাস আর কিছুটা ভয়মিশ্রিত গলায় বলল, 'ম্যাভাই, ফইরসাবে আপনেরে ডাকে'।

নয়ন মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমাকে কেন ডাকবে?'

মনির বলল, 'চলেন গিয়া শুনি। সেই দিন তো আর আপনের সাথে ফইর সাবের কথাবার্তা হইল না। এত বড় একটা উপকার করল আপনের। আপনের জান বাঁচাইল, তার সাথে আপনে একটা কথাও বললেন না।'

নয়ন বিড়বিড় করে বলল, 'তা অবশ্য ঠিক'।

মনির নয়নের হাত ধরে বার দুই টানল। কিন্তু নয়ন কী ভেবে তখন অনড় দাঁড়িয়ে রইল। মনির বলল, 'ম্যাভাই লন, লন। গিয়া দেখি ফইরসাবে কী কয়? আরেকখান কথা ম্যাভাই, ফইরসাবেও কিন্তু জানে, কোন বিলে মাছ বেশি, গাঙেও কোন কোন জায়গায় মাছ থাকে বেশি, এইটা ফইর সাব পানির মধ্যে চাইলেই এক্কেবারে পষ্ট দেখতে পায়। আপনে কিন্তু এই সুযোগে একটু জিগাইবেন ম্যাভাই।'

নয়ন কোনো কথা বলল না। সে তাকিয়ে আছে উঁচু ঢিবি থেকে নিচে খালের দিকে নেমে যাওয়া ঢালের দিকে। জুলফিকার ঢাল ধরে উঠে আসছে। সে তাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। তারপর গলার স্বর যতটা সম্ভব নরম করে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম। আপনে ফতেহপুরের খাঁয়গো বাড়ির তৈয়ব উদ্দিন খাঁর নাতি না?'

নয়ন মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ'।

জুলফিকার এবার বিগলিত গলায় বলল, 'কী ভাগ্য দেখেন, আপনের সাথে আপনের নানাজানের বাড়িত বইসা কথা বলনের সুযোগ হইল না, আর এই এত দূরের পথে আইসা কথা বলনের সুযোগ হইল। এরেই কয়, ভাগ্যে থাকলে জুইট্যা যায়, না থাকলে খুইট্যা খায়।'

নয়ন কোনো জবাব দিলো না। জুলফিকারই বলল, 'ফইর সাব আপনের সাথে একটু আলাপ করতে চান। তার বাও পায়ে সমস্যা, পাও কাটা পড়ছিল। এইজন্য ঢাল বাইয়া উঠতে পারে না। না হইলে সে নিজে নিজেই হাইট্যা আসত আপনের কাছে।'

নয়ন যেন এবার কিছুটা বিব্রত হলো। সে বলল, 'না না, ঠিক আছে। আমিই আসছি।'

মনিরের হাত ধরে সতর্কভঙ্গিতে ঢাল বেয়ে নিচে নামল নয়ন। মানুষের শোরগোল, ভিড় আরো বেড়েছে। সকলেই আব্দুল ফকিরের সাথে কথা বলতে চায়। কিন্তু আব্দুল ফকির ততক্ষণে নৌকার ছইয়ের ভেতরে ঢুকে গেছেন। নয়ন আর মুনিরকে নিয়ে নৌকায় উঠল জুলফিকার। বড় নৌকা। নৌকার ভেতর সাপের বিষ নামানোর, খেলা দেখানোর, সাপ রাখার নানান জিনিসপত্র। নয়নকে নৌকার ভেতর নিয়ে গিয়ে আব্দুল ফকিরের কাছে বসিয়ে দিলো জুলফিকার। আব্দুল ফকির নয়নকে দেখে পরিস্কার গলায় সালাম দিয়ে বললেন, 'আপনে এখন কেমন আছেন বাজান?'

নয়ন মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'জ্বি ভালো'।

আব্দুল ফকির বললেন, 'আপনের কথা বহু শুনছি। আপনে খাঁ-বাড়ির নাতি। বিরাট ডাক্তার। এই অঞ্চলে এখন দূর-দূরান্ত থেইকা অনেক ডাক্তারই আসে। কিন্তু আমাগো নিজেগো কোনো ডাক্তার নাই। আপনের কথা শুইনা

www.boighar.com

পরানডা জুড়াই গেছিল বাজান। আপনেরে দেখনের বহু শখ আছিল। সেই শখও মিটল। কিন্তু তহন তো আপনে আর আপনে আছিলেন না। জমে মানুষে টানাটানি। আপনের সাথে কথাবার্তা তো আর হইল না। আল্লাহর কি কুদরত, আইজ, এইহানে আপনের সাথে কথা বলনের সুযোগ আল্লাহতালা কইরা দিলেন।'

আব্দুল ফকির হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার হাতের মুঠোয় নয়নের হাত চেপে ধরলেন। আব্দুল ফকিরের শক্ত খসখসে হাতের স্পর্শে নয়নের সারা শরীর কেমন শিরশির করে উঠল! শরীর জুড়ে অচেনা, অদ্ভুত এক অব্যাখ্যেয় অনুভূতি! সে আলতো করে হাত ছাড়িয়ে নিল। আব্দুল ফকির বললেন, 'তা বাজান, আপনেরা কি এইখানে ফতেহপুর থেইক্যা নিজেগো নাও লইয়া আইছেন? না খ্যাপের নাওয়ে আইছেন?'

ছইয়ের বাইরে নাওয়ের গলুইয়ের পাটাতনে দাঁড়ালো মনির জবাব দিলো, 'না ফইর সাব। আমরা বাড়িতে কাউরে বইলা আসি নাই। হাটবার তো ফতেহপুরতন অনেক মানুষ মিল্যা ট্রলার ভাড়া কইর‍্যা আসে। আমরা সেই ভাড়ার ট্রলারেই আসছি।'

মনিরের কথা শুনে আব্দুল ফকির যেন স্বস্তি পেলেন। তিনি নয়নের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'তাইলে আর কি! আমাগো নাওখানও তো হোসনাবাদ যাইব। ফতেহপুরের উপর দিয়াই হোসনাবাদ যাইতে হয়। আমাগো নাওয়েই চলেন, আপনাগো ফতেহপুর নামাই দিয়া যাব।'

নয়ন কিছু বলার আগেই মনির উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'খুবই ভালো হয় ফইর সাব। খুবই ভালো হয়।'

জুলফিকার মাথা নিচু করে ছইয়ের ভেতর উঁকি দিয়ে বলল, 'নাও তো ছাইড়্যাই দিছি কাকু, লোকজনের যে ভিড় বাড়ছিল, সামলানোই দায় হইয়া গেছিল '।

আব্দুল ফকির মৃদু হাসলেন। তারপর নয়নকে বললেন, 'বাজান, নাও তো ছাইড়াই দিছে, আপনের অসুবিধা নাই তো?'

নয়ন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার একধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছিল। কিন্তু সে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'না, অসুবিধার কী আছে!'

নাও বিলকুড়ানির হাট ছাড়িয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। ফুরফুরে হাওয়ায় বড় পাল তুলে দেওয়া হয়েছে। তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকা। নৌকার দুইপাশে ধবধবে সাদা কবুতরের মতো শাপলা ফুল ফুটে আছে। নয়নের পাশেই ছইয়ের গায়ে খোপ কেটে একখানা ছোট জানালাও বসানো হয়েছে। সেই জানালায় তাকিয়ে নয়ন বলল, 'আমি কি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারি?'

আব্দুল ফকির আবারো বিগলিত গলায় বললেন, 'জ্বে বাজান, জ্বে। মনে করেন এইটা আপনের নিজের নাও। আপনের যা মন চায় করতে পারেন।'

নয়ন আর কিছু বলল না। সে উঠে নৌকার গলুইয়ে এসে দাঁড়াল। ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে, তবে এখনো তেমন গাঢ় হয়ে ওঠেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে যাবে রাতের আকাশ। আজ কি অমাবশ্যা? নয়ন এইসব চাঁদ-তারার হিসেব জানে না। কিন্তু তার কেন যেন মনে হলো আজ অমাবশ্যা। নৌকার ছাদে সেই দুইজন যুবক আর জুলফিকারের সাথে বসে রয়েছে মনির। তাদের মধ্যে কোনো এক বিষয়ে আড্ডা জমে উঠেছে। নয়ন কান পেতে খানিক শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পারল না। তবে অস্পষ্টভাবে হলেও যে দুয়েকটি কথা কানে ভেসে এসেছে, তা শুনেই নয়ন বুঝতে পারল মনির এখানেও তার মাছ-সংক্রান্ত কোনো গল্প নিয়ে দারুণ উত্তেজিত।

কতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল নয়ন জানে না। এই এতক্ষণ ধরে কী ভেবেছে, তাও জানে না। তবে তার ভাবনাগুলো আজকাল যেন হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো হয়ে যাচ্ছে, দেখতে শুনতে বেশ বড়সড় রঙিন, কিন্তু ধরতে গেলেই কেমন মিইয়ে যায়। নয়ন খানিকটা ঝুঁকে বাঁ পাশে তাকাল, কিন্তু বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন আর। এরমধ্যেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চারপাশ। সে মাথা নিচু করে গলুইয়ের ভেতর ঢুকতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে সে ধাক্কা খেল কিছু একটার সাথে। তার শরীরের ধাক্কায় অন্ধকারে কিছু একটা সশব্দে ছিটকে পড়ল নৌকার মেঝেতে।

নয়ন প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে মোবাইল ফোন বের করে আলো জ্বালল সে। তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল আব্দুল ফকির। ফলে নয়ন আচমকা ঘুরতেই তার শরীরের ধাক্কায় পেছনে দাঁড়ানো আব্দুল ফকির তাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়েছেন নৌকার পাটাতনে। নয়ন তটস্থ ভঙ্গিতে আব্দুল ফকিরকে গিয়ে ধরল। আব্দুল ফকির অবশ্য তেমন অস্থির হলেন না। তিনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে বসলেন। তারপর বললেন, 'বাম পাওখানে তেমন বল পাই না। হাত-পায়ে'র বল থাকে হাত-পায়ে'র আঙুলে। হাত-পায়ে যদি আঙুল না থাকে, তাইলে বলও থাকে না। তার ওপর বয়সও হইছে। সারাজীবন দৌড়-ঝাপ কইরা বুড়া বয়সে আইসা শরীর হইছে পলকা কাঠির লাহান। হালকা হাওয়া বইলেও লড়েচড়ে।'

নয়ন বলল, 'আপনার পায়ে আঙুল নেই?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'ডাইন পায়ে আছে, বাম পায়ে নাই'।

নয়ন কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আব্দুল ফকির মাথার ওপরে মৃদু আলোতে জ্বলতে থাকা হারিকেনটির আলো আরো খানিক বাড়ালেন। তারপর

www.boighar.com

হারিকেনের লালচে আলোয় তার বাম পায়ের নাগড়া মতো জুতোখানা খুলে ফেললেন। নয়ন এতক্ষণ খেয়াল করেনি, আব্দুল ফকিরের বাঁ পায়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশই নেই। পায়ের সামনের দিকটা বীভৎসরকম আকার নিয়ে যেন ওঁৎ পেতে আছে। সে ডাক্তার, কিন্তু তারপরও আব্দুল ফকিরের পায়ের এই বহু আগের পুরনো শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতখানা দেখেও তার কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। সেই অস্বস্তির ভেতর কি কিছুটা ভয়ও রয়েছে? নয়ন মুহূর্তের জন্য ভাবল।

হতে পারে এই বিশেষ মুহূর্তের এমন গা ছমছমে পরিবেশ এর জন্য দায়ী। এখানে ইলেক্ট্রিসিটি নেই, জনমানবহীন এক বিলের জলে অমাবশ্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে হারিকেনের আলোয় সে নৌকায় বসে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর সাপুড়ের সাথে। যার নৌকা ভর্তি জ্যান্ত সব সাপ। এমন পরিস্থিতিতে ভয় পাওয়াটা দোষের কিছু নয়।

নয়ন যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বলল, 'কী হয়েছিল আপনার পায়ে? দেখে মনে হচ্ছে কেটে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি। তবে মারাত্মক জখম অবস্থায় পায়ে পচন ধরেছিল। শেষে চিকিৎসায় ভালো হলেও এই বীভৎস অবস্থা আর এড়ানো যায়নি!'

আব্দুল ফকির জবাব দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ শব্দ করে হাসলেন। নয়ন এই প্রথম আবিষ্কার করল, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ সহজ এই মানুষটির ভেতরে যেন পুরোপুরি ধরতে না পারা ভয়ঙ্কর কিছু একটা লুকিয়ে রয়েছে! সেই পুরোপুরি ধরতে না পারা ভয়ঙ্কর কিছু একটা তার আশেপাশের মানুষদের ভেতর ক্ষণে ক্ষণে প্রবল অস্বস্তি তৈরি করে। তৈরি করে আতঙ্কও। হয়তো সে কারণেই আব্দুল ফকিরের এই খুব সহজ সাধারণ নিরীহ দর্শন হাসিতেও নয়নের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে আব্দুল ফকিরের হাস্যময় চিমসানো মুখ আর জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। তার বুকের ভেতরটা কেমন হিম হয়ে এলো।

আব্দুল ফকির আপাতদৃষ্টিতে দেখতে ভীতিকর কেউ নন। খুবই সাদাসিধে চেহারার গ্রামীণ মানুষ। মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। থুতনিতে সামান্য দাড়ি। পান খাওয়া মুখে লালচে কালো ক্ষয়িষ্ণু দাঁত। শরীরটিও তেমন হৃষ্টপুষ্ট নয়। অতি সাধারণ চেহারার স্বাভাবিক এক মানুষ। কিন্তু এই অতি সাধারণ চেহারার আড়ালেই কোথায় যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা রয়েছে। সেই অস্বাভাবিক কিছু একটা অন্যদের কাছে তাকে আলাদা করে তোলে।

আব্দুল ফকির তখনও হাসছিলেন। নয়ন একদৃষ্টিতে আব্দুল ফকিরের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল, আব্দুল ফকিরের হাসির সাথে সাথেই বা শেষ হতে না হতেই বুঝি ভয়ঙ্কর কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটবে। গা ছমছমে এক

অনুভূতি নিয়ে আব্দুল ফকিরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। আব্দুল ফকির হঠাৎ নয়নের কাছে সরে এসে বসলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক ধরছেন বাজান, একদম ঠিক। এই পাওখান একজন কোপ দিয়া কাইট্টা ফালাইছিল। সে চাইছিল রাইতের আন্ধারে আব্দুল ফইরের কল্লাখান কাইট্টা ফেলতে। একবার পারে নাই। আবার চেষ্টা করছে। আবারও পারে নাই। নাকি পারছিলও? লোকে অবশ্য বলে যে পারছিল। আব্দুল ফইরের কল্লা কাইট্যাও ফালাইছিল। কিন্তু রাইতের আন্ধারে যে আব্দুল ফইরের কল্লা সে কাটছে, দিনের বেলায় লোকজন দেখল সেই আব্দুল ফইরের শইলের ওপর কল্লাও আছে, কল্লার ওপরে মাথাও আছে। কল্লা মাথা লইয়া আব্দুল ফইর ঠিকঠিক ঘুইর‍্যা বেরাইতেছে।'

আব্দুল ফকির আবারও ফ্যাঁসফেঁসে গলায় সেই লোমহর্ষক শব্দ তুলে হাসলেন। নয়নের প্রবল অস্বস্তি হচ্ছে। তার শরীর ক্রমশই আরো হিম হয়ে আসছে। অদ্ভুত অবর্ণনীয় এক অনুভূতি তাকে ক্রমাগত আরো প্রবলভাবে গ্রাস করে ফেলছে। তার মনে হচ্ছে, এই অন্ধকারে তার চারপাশের অচেনা-অজানা অসংখ্য ভয়ঙ্কর প্রাণী ওঁৎ পেতে আছে। মুহূর্তের মধ্যে তারা দল বেঁধে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সে নড়তে পারবে না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে তার শরীর ভার হয়ে আসছে। নিজের শরীরটাকে মনে হচ্ছে কোনো বিশাল পর্বতের নিথর শরীর। এই শরীর নিয়ে সামান্য নড়াচড়ার ক্ষমতাও তার নেই। আব্দুল ফকির নয়নের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলেন। তার মুখের বোটকা গন্ধে নয়নের পেট গুলিয়ে উঠল। সে ঝট করে বাঁ দিকে তার মুখ সরিয়ে নিল।

আব্দুল ফকির আবারো ফ্যাঁসফ্যাঁস করে হাসলেন। তারপর গায়ে কাঁটা দেয়া হিম কণ্ঠে বললেন, 'রাইতে ঘুমের ঘোরে আব্দুল ফইরের কল্লা রাম দাওয়ের এক কোপে আলাদা কইরা ফালানো হইল। শুধু যে আলাদা কইরাই ফালানো হইছিল, তা-ই না। সেই কল্লা রাইতের আন্ধারে লইয়াও যাওয়া হইছিল। কিন্তু বেয়ান বেলা সকলে দেখল আব্দুল ফইর শইলের উপর কল্লা আর মাথা লইয়া ঘুরতাছে। হা হা হা। হা হা হা। কী বাজান, ঘটনা শুইনা কি বুঝতাছেন? ঘটনায় কোনো প্যাঁচগোছ আছে? আছে কোনো প্যাঁচগোছ?'

নয়ন পিছলে তার শরীর খানিকটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে গেল। একদম নৌকার ছইয়ের বেড়ার সাথে ঠেকিয়ে নিলো তার পিঠ। আব্দুল ফকির যেন আগুনের গোলার মতো ধকধকে চোখ মেলে তাকালেন। তারপর বললেন, 'ভয় পাইলেননি বাজান? ভয় পাইলেন? কী ভাবতেছেন, আমার কল্লার ওপরে এই মাথাটা আসল কিনা? কল্লায় রাম দাওয়ের দাগ আছে কিনা? নাকি ভাবতেছেন সকলই চৌক্ষের ভুল। ভুল দেখতেছেন? নেন নেন, হাত দিয়া দেখেন, এই কল্লা আর এই মাথা আসল। একদম আসল।'

আব্দুল ফকির আবার থামলেন। তারপর বললেন, 'ভয়ের কিছু নাই বাজান। আসল ঘটনা অন্য। এই ঘটনা সকলেই জানে, কিন্তু তারপরও বিশ্বাস করতে চায় না। তারা ভাবে এই ঘটনায় আব্দুল ফইরের কোনো জাদু টোনা আছে। হে হে হে। আব্দুল ফইর তো নিজের জাদু টোনার ক্ষমতার কথা নিজে বলে না, বলে মাইনষে। মাইনষেই ছড়ায় বেশি। মাইনষের মুখে জয়, মাইনষের মুখেই ক্ষয়।'

আব্দুল ফকির কথার ফাঁকে ফাঁকে থামছেন। থেমে গভীর চোখে তাকিয়ে থাকছেন নয়নের দিকে। সম্ভবত বোঝার চেষ্টা করছেন তার কথা নয়নের ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করছে। নয়ন একধরনের তীব্র আতঙ্ক বোধ করছে। কিন্তু সেই আতঙ্কের ভেতর থেকেও তার মনে হচ্ছে সে আব্দুল ফকিরের বাকি গল্পগুলোও শুনুক। কথাগুলো শুনুক।

আব্দুল ফকির কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। তারপর বললেন, 'সেইদিন ঘটনা কী হইছিল আপনারে বলি শোনেন। সেইদিন আসলে ঘটনাচক্রে মাঝরাইতে আমার বাড়িতে গিয়া হাজির হইছিল আপনেগো ফতেহপুরেরই বজলু ব্যাপারী। গরমকাল। আমি আবার গরম সইতে পারি না। ঘরের সামনেই একখান ছোট দোচালা ঘর আছিল। চাইরদিকে খোলা। হুড়মুড় কইরা বাতাস আইতো। সেই ঘরেই আমি ঘুমাইতাম। সেই দিন বজলু ব্যাপারী আইল অনেক রাইতে। তার সাথেই ঘুমাইলাম। কিন্তু শেষ রাইতে আইল বিষ্টি। বিষ্টির ছাটে ভিজ্যা যাওনের দশা। আমার আবার ঠান্ডার ধাঁত। বজলু ব্যাপারীরে কয়েকবার ডাকলাম। সে শুনল না। ঠান্ডা আর বিষ্টি পাইয়া আরামের ঘুম। তাই বিষ্টিতে যেন না ভেজে, তাই পাটির এক পাশ উঠাইয়া তার গায়ে দিয়া আমি ঘরে চইলা গেলাম।'

আব্দুল ফকির একজন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা বলছেন। মানুষটিকে কীভাবে খুন করা হয়েছিল সেই ঘটনা বলছেন। যেই খুনটি তিনি নিজেও হতে পারতেন। অথচ সেই বীভৎস খুনের ঘটনা বলতে গিয়ে তার চোখে মুখে চাপা আনন্দ! তিনি সামান্য থেমে চাপা গলায় বললেন, 'খুনি শেষরাইতের আন্ধারে আর তাড়াহুড়ায়, আমারে ভাইবা তারে জাইত্যা ধইরা খুন করছে। তার কল্লা কাইট্যা লইয়া গেছে। খুনি তো আর জানে নাই, ওই বিছনায় আমি নাই, আছে বজলু ব্যাপারী। হে হে হে। সবাই ভাবল আব্দুল ফইরের কেরামতি! আপনের কী মনে হয় বাজান, ঘটনায় আব্দুল ফইরের কেরামতি কি কিছু আছিল, না আছিল না?'

www.boighar.com

নয়ন ভয় পাচ্ছে। প্রবল ভয়। সে যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ। আব্দুল ফকিরের এইসব ঘটনায় তার ভয় পাওয়ার কথা না। বরং এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার কথা। কিন্তু সে কিছুই পারছে না। তার সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আব্দুল ফকির বলল, 'কি ডাক্তার বাজান, পাইলেননি

কিছু খুঁইজা? সেই রাইতে বজলু ব্যাপারীই কেন আমার বাড়িত যাইব? সে তো আগে আর কোনোদিন আমার বাড়িত যায় নাই। তাইলে ওইদিনই কেন গেল? বুঝলেন কিছু বাজান? কিছু বুঝলেন?'

নয়ন ধাতস্ত হবার চেষ্টা করছে। সে একটা বিষয় আবিষ্কার করেছে, সেটি হচ্ছে আব্দুল ফকিরের কথা বলার ধরনটিই আসলে ভীতিকর। তিনি যেই ঘটনা বলছেন, তা অন্য কেউ বললে হয়তো এমন ভীতিকর মনে হতো না। একই কথা নানানভাবে বলা যায়। মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয়ার এক সহজাত ক্ষমতা আব্দুল ফকিরের রয়েছে। সেই ক্ষমতার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে তার কথা, তার কণ্ঠ, তার হাসি আর তার কথা বলার ধরন। তার চেয়েও বড় কথা সেই কথা বলার জন্য তিনি সব সময় উপযুক্ত পরিবেশ খোঁজেন। উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে তিনি তার এই ভয়ের খেলা খেলেন না। নয়ন এখন নিশ্চিত, তাকে বাজারের সেই জটলার ভেতরই আব্দুল ফকির দেখেছিলেন, এবং তিনি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন যে সন্ধ্যার আগেই নয়নকে বাড়ির ফেরার জন্য নৌকার ঘাটে যেতে হবে। আর সে কারণেই আব্দুল ফকির আগেভাগেই সেখানে চলে গিয়েছিলেন। এবং তার পরিকল্পনামাফিকই তিনি নয়নকে নৌকায় তুলেছেন। কিন্তু কেন? আব্দুল ফকিরের উদ্দেশ্য কী?

নয়ন হঠাৎ বলল, 'আপনি মানুষকে ভয় দেখাতে খুব পছন্দ করেন, না?'

আব্দুল ফকির হা হা হা করে হাসলেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, 'ভয়? মানুষরে কি চাইলেই ভয় দেখান যায়? আপনে পারবেন? পারবেন মানুষরে ইচ্ছা মতো ভয় দেখাইতে? আর আমি মানুষরে ভয় দেখামু কেন বাজান? ভয় দেখাইয়া আমার লাভ কী?'

নয়ন বলল, 'ভয় দেখানোর অনেক লাভ আছে। মানুষ যা কিছু ভয় পায়, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘাটায় না। মানুষ যেই বিষয়কে ভয় পায়, সে সেই বিষয়কে সহজে মেনে নেয় বা এড়িয়ে চলে। আপনিও চান, মানুষ আপনাকে খুব সহজে মেনে নিক। আর যারা না মানবে তারা আপনাকে না ঘাঁটাক। আপনার কাজকর্মে বাঁধা না দিক। আবার সবাই আপনাকে সম্মান করুক, সমীহ করুক। আপনার প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতা তৈরি হোক। মানুষের ওপর আপনার খুব প্রভাব থাকুক। এতে আপনার অনেক লাভ। আপনি এতে অনেক বেশি ক্ষমতাবান হয়ে উঠবেন।'

নয়ন থামল। সে আবিষ্কার করল, তার ভয় কাটছে। সে সময় নিয়ে বলল, 'এই জগতে মানুষ এই যে এত অর্থের পেছনে ছুটছে, যুদ্ধ করছে, আবিষ্কার করছে, এই যে এত কিছু করছে, এর পেছনে কারণ কি জানেন?'

আব্দুল ফকির জবাব দিলেন না। তবে নয়নের হঠাৎ বদলে যাওয়া আচরণে তিনি খানিক বিস্মিত হয়েছেন। নয়ন বলল, 'এই সবকিছুর পেছনে কারণ

www.boighar.com

একটাই, আর সেটি হলো, ক্ষমতা, প্রভাব, কর্তৃত্ব। পৃথিবীতে সবাই ক্ষমতা চায়। কারণ মানুষ জানে ক্ষমতা পেলে সে আর সব কিছুই পাবে। পৃথিবীতে ক্ষমতার চেয়ে অধিক আনন্দের কিছু নাই।'

আব্দুল ফকির হাসলেন। মৃদু হাসি। তারপর বললেন, 'আপনে বলতেছেন সেই দিন সেই রাইতে বজলু ব্যাপারী এমনে এমনেই আমার বাড়িতে গেছিল? আমার কোনো ক্ষমতা সেইখানে আছিল না?'

নয়ন মৃদু গলায় বলল, 'হয়তো ছিল। কিন্তু সেটা জাদু টোনা বা ভূত-প্রেতের কিছু না। হয়তো কোনো কারণে আপনি তাকে খবর দিয়ে বা অন্য কোনো কারণে তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার ক্ষমতা বলতে ওইটুকুই। এমনও হতে পারে, সে নিজেই কোনো কারণে গিয়েছিল।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'দুনিয়াতে আল্লাহতালা দুই ধরনের মানুষ তৈয়ার করছেন। এক ধরনের মানুষ দেখে চামড়ার চোউক্ষে। আরেক ধরনের মানুষ চামড়ার চক্ষু ছাড়াও আরেক চৌক্ষে দেখে। সেই চৌক্ষের নাম গায়েবী চৌখ। অন্তরচক্ষু। এই চৌক্ষু সকলের থাকে না। অল্প কয়েকজনের থাকে। এইজইন্য বেশিরভাগ মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু এই চৌখটাই আসল বাজান। ওইটাই আসল। দুম কইরা অবিশ্বাস কইরা বইসেন না। অবিশ্বাসে বিপদ ঘটে। মহাবিপদ।'

আব্দুল ফকির শেষের শব্দ ক'টি বলার সময় ঠিক সাপের মতো হিসহিস করে শব্দ করলেন। সেই শব্দে যে কারো রক্ত জল হয়ে যেতে বাধ্য। নয়নেরও হলো। সে আবারো গুটিয়ে গেল। আব্দুল ফকির বললেন, 'শুনছি, ডাক্তাররা নাকি বিশ্বাস করে না যে, গাঁও-গ্রামের ওঝারা সাপের বিষ নামাইতে পারে? আপনে তো ডাক্তার বাজান, আপনের কী মনে হয়, পারে?'

নয়ন জবাব দিলো না। যেমন বসে ছিল তেমনই বসে রইল চুপ করে। আব্দুল ফকিরই আবার বললেন, 'হাজার হাজার বচ্ছর ধইর্যা এই দ্যাশে সাপের বিষ নামায় ওঝারা। সাপ বশ করে, এই যে আমার বাক্সের মইধ্যে এত্তগুলান সাপ, এইগুলান বশ না করলে এইভাবে রাখন সম্ভব? ধরা সম্ভব? সম্ভব না। তার উপর এই যে বীণের সুরে সুরে সাপ নাচে, এই বীণও কি যেই সেই বীণ? সব বীণেই কি সাপ নাচে? নাচে না। দুইপাতা ডাক্তারি পইড়্যাই আইজকাল সবাই বিদ্বান হইয়া যায়, সব জাইন্যা ফালায়। দুইন্যাতে মানুষ এক চিমটি নুনের থেইকাও কম জানে। আর না জানার পরিমাণ আসমানের তারার পরিমাণের চাইতেও বেশি। তারপরও মানুষ দুইপাতা বই পইড়াই হাজার হাজার বচ্ছরের নিয়ম-কানুনরে বলে ভুয়া, বুজরুকি! কী বেক্কেলই না এই মানুষ, কন তো বাজান?'

নয়ন এবারও কোনো কথা বলল না। সে আব্দুল ফকিরকে বোঝার চেষ্টা করছে। আব্দুল ফকির আবার বললেন, 'কী বাজান, কথা বলেন না কেন? এই যে বাপদাদা চৌদ্দগুষ্টি ধইরা এই সাপ ধইর‍্যা খাই, সবই কি তাইলে হারাম? মাইনষের চৌক্ষে ধুলা দিয়া খাই? মাইনষের জীবন বেইচ্যা খাই?'

নয়ন এবার কথা বলল। সে বলল, 'না না, তা কেন? কিছু না কিছু তো আছেই'।

আব্দুল ফকির এবার যেন দপ করে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'কিছু না কিছু মানে কী? কিছু না কিছু মানে কী?'

নয়ন বলল, 'আসলে মন্ত্রটন্ত্রের বিষয়টা কিছুই না। কিছু যা আছে, তা হলো ট্রিকস, কৌশল।'

আব্দুল ফকির হিসহিসে গলায় বললেন, 'টিরিকস? কৌশল? এখন এই বাক্সের মধ্যেরতন দুইটা গোক্ষুর সাপ ছাইড়া দেই? ছাইড়া দিয়া তখন দেখতে চাই, কী টিরিকসে আপনে সামলান!'

নয়নের ভয় পাবার কথা ছিল, কিন্তু সে কেন যেন এবার আর ভয় পেল না। বরং বলল, 'আসলেই ট্রিক্স। এই যে আপনি বললেন সাপ বাঁশির শব্দের তালে তালে নাচে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, সাপ তো কানেই শোনে না। সে বাঁশির শব্দের তালে তালে নাচবে কী করে?'

আব্দুল ফকির খপ করে নয়নের হাত ধরলেন। তার শক্ত মুঠোর মধ্যে নয়নের ডান হাতের কব্জি। নয়ন বারকয়েক সেই হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তার হঠাৎ মনে হলো, এই পলকা বৃদ্ধ শরীরের আড়ালেও আসলে অন্য একটা মানুষ রয়েছে। অন্য একটা আব্দুল ফকির। সেই মানুষটা শক্ত, কঠিন, শক্তিশালী। কিন্তু মানুষ সেই মানুষটাকে দেখতে পায় না, তারা দেখে দুর্বল, বৃদ্ধ, ন্যুব্জ এক আব্দুল ফকিরকে।

আব্দুল ফকির বললেন, 'তাইলে স্কুলের মাঠে গোক্ষুর সাপখান এমনে এমনেই নাচল? এমনে এমনেই?'

নয়ন নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। তারপরও সে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'নাহ্, এমনি এমনিই নাচে নাই। এইটা সাপুড়েদের খুব পুরনো ট্রিকস। সাপ কানে শোনে না। সে বাঁশির শব্দ শুনবে কী করে? আসলে যেটি হয়, সেটি হচ্ছে সাপুড়েরা বাঁশি বাজানোর আগে সাপের মুখে নানানভাবে আঘাত করে। মাটিতে আঘাত করে। এতে সাপের শরীরে এবং মাটিতে যে কাঁপুনি তৈরি হয়, সাপ তাতে সতর্ক হয়ে যায়, সাপের অনুভূতি তাতে সজাগ হয়ে যায়। তখন যিনি বীণ বাজান, তিনি সাপের চোখের কাছে বীণ নিয়ে গিয়ে নানাভাবে দুলে দুলে বীণ নাড়াতে থাকেন। এই বীণ নাড়ানোর কারণে সাপও নড়তে থাকে। সে বীণ নাড়ানোর তালে তালে নিজের মাথা

নাড়াতে থাকে। চোখের সামনে দুলুনি দেখেই সাপ মূলত তখন নিজের মাথা দোলায়। সাপুড়েরা এটাকেই বীণ শুনে সাপ নাচছে বলে প্রচার করে। আর বিষয়টি গল্প, উপন্যাস, সিনেমার জন্য খুবই আকর্ষণীয়। এই কারণেই এইসবেও বিষয়টা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে আর দিনে দিনে মানুষের বিশ্বাসকে আরো পাকাপোক্ত করে তোলে।'

আব্দুল ফকির হাসলেন, তারপর খুব সতর্ক চোখে নয়নের দিকে তাকালেন। তাকিয়েই থাকলেন। তারপর বললেন, 'একখান কথা শোনেন বাজান, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস না করলে এই জগতের সকলই মিছা, আর বিশ্বাস করলে সকলই হাছা। এই যে আপনেরে সাপে কাটল। আপনে তো আর টের পান নাই। টের পাইছে খাঁ-বাড়ির লোকজন। তারা জানে আপনের অবস্থা কী হইছিল। আপনে তো একপ্রকার মারাই গেছিলেন। কিন্তু মাত্র দুইখান ঢোলের বাড়িতে আব্দুল ফইর আপনেরে সুস্থ কইরা তুলছে। শত শত মানুষে দেখছে, সেইটারে আপনে কী বলবেন? আপনেরে সেই মৃত্যু থেইক্যা যেই মানুষটা বাঁচাই তুলল, তারে আপনে অবিশ্বাস করেন? তার ক্ষমতারে আপনে অবিশ্বাস করেন? বলেন টিরিকস?'

নয়ন এবার খুব দৃঢ় কিন্তু ঠান্ডা গলায় জবাব দিলো, 'ফকিরসাব, আপনার কী মনে হয়, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন?'

নয়নের এই ছোট্ট প্রশ্ন এবং প্রশ্ন করার ধরনে আব্দুল ফকির যেন মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন। সেদিন খাঁ-বাড়ির উঠানে নয়ন যখন ঢোলের বাড়ি শুনে জেগে উঠেছিল, সেইদিন সেই মুহূর্তে নয়নকে দেখে আব্দুল ফকিরের চোখে যে বিভ্রান্তি, দ্বিধা এবং বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, আজ এই মুহূর্তেও সেই একই বিভ্রান্তি আর দ্বিধা ফুটে উঠল। তবে সেটি তিনি তার গলায় উঠে আসতে দিলেন না। তিনি স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'আমি বাঁচানোর কেউ না বাজান। জান বাঁচানোর মালিক আল্লাহ। আমি আব্দুল ফইর উছিলা মাত্র।'

www.boighar.com

নয়ন এবার হাসল। বলল, 'আমার সেইদিন কী হয়েছিল ফকির সাব? আপনি আমাকে কী থেকে বাঁচিয়েছিলেন?'

আব্দুল ফকির এবার যেন পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আপনে কি সুস্থ বাজান? নাকি অসুস্থ? আপনেরে যে কালনাগিনে কাটছিল, আপনের নানাজান যে সেই রাইতে আমারে আনতে পাঠাইছিল। আমি আসলাম বেয়ানবেলা। আপনে কিছুই জানেন না বাজান? নাকি সব ভুইলা গেছেন?'

নয়ন এবার স্থির দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি সবই জানি ফকির সাব। আমার ধারণা আপনিও সবই জানেন। কিন্তু না জানার ভান ধরে বসে আছেন। আপনি শুনতে চাচ্ছেন আমার মুখ থেকে। তাই না?'

আব্দুল ফকিরের চোখে-মুখে মুহূর্তের জন্য যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, তিনি বললেন, 'বলেন বাজান, আপনে কী জানেন, বলেন।'

নয়ন এবার মৃদু হাসল। সে ধীরে ধীরে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। সে খানকিটা সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, 'আমাকে তো সেদিন সাপে কাটে নাই ফকিরসাব। আপনি এতদিন ধরে সাপের বিষ নামান, সাপে কাঁটা রোগী নিয়ে কাজ করেন, এই ঘটনা তো আপনার না বোঝার কথা না!'

আব্দুল ফকির সাথে সাথে জবাব দিলেন না। এ যেন মুখোমুখি যুদ্ধরত সাপ আর বেজী। মুহূর্তের অসতর্কতার মরণকামড় বসে যেতে পারে যে কারো শরীরে। আব্দুল ফকির খানিক সময় নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'তাইলে, আপনের কী হইছিল সেইদিন বাজান?'

নয়ন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে জুলফিকার হারিকেন নিয়ে ছইয়ের মুখে উঁকি দিলো। তারপর উঁচু গলায় বলল, 'ও কাকু, নাও তো ফতেহপুর ঘাটে চইল্যা আসছে। তারে তো নামাই দিতে হইব।'

আব্দুল ফকির জুলফিকারের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'নাও ভিড়া। নাও ভিড়াইয়া সাবধানে নামাই দে। আন্ধারে রাস্তাঘাটে আইজকাল সাপখোপের অভাব নাই। খুব সাবধান।'

জুলফিকার আবার চলে গেল নৌকার গলুইয়ে। সে নামার জন্য সুবিধাজনক জায়গা দেখে নৌকা ভিড়ানোর ব্যবস্থা করছে। আব্দুল ফকির নয়নের চোখে চোখ রেখে বলল, 'বলেন বাজান, সেইদিন আপনের কী হইছিল?'

নয়ন বলল, 'কেন? আপনি বোঝেননি?'

আব্দুল ফকির এবার খানিক রুষ্ট হলেন। তিনি শক্ত গলায় বললেন, 'আমি যেইটা বুঝছি, সেইটা তো আর আপনের কাছে জানতে চাইতেছি না। আপনের কথা আপনে বলেন বাজান।'

নয়ন হাসল। তারপর বলল, 'আপনি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন ফকিরসাব। উত্তেজনা ব্যাপারটা আপনার সাথে মানায় না। আপনার মতো মানুষেরা সাধারণত উত্তেজিত হন না। কিন্তু যখন হন, তখন বুঝতে হবে, তারা হেরে যাচ্ছেন। আপনি হেরে যেতে পছন্দ করেন না, তাই না ফকিরসাব?'

আব্দুল ফকির এবার আর জবাব দিলেন না। হারিকেনের তেল সম্ভবত শেষ হয়ে এসেছে বা জ্বলতে থাকা সলতে পুড়ে প্রায় নিঃশেষ হওয়ার পথে। যে-কোনো কারণেই হোক, হারিকেনের আলো নিভে এসেছে। নৌকার ভেতরে ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার। হয়তো স্পষ্ট আলো থাকলে নয়ন দেখতে পেত, আব্দুল ফকিরের কপালের শিরাগুলো দপদপ করে কাঁপছে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে আসছে।

www.boighar.com

নয়ন সেসব দেখল না, কিন্তু তারপরও সে স্পষ্ট গলায় বলল, 'আপনার সাথে দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল আমার ফকির সাব। আপনাকে নিয়ে যে কত কিংবদন্তী গল্প আমি শুনেছি। আমার খুব জানার ইচ্ছা ছিল, সেইসব গল্পের কতটুকু সত্য, আর কতটুকু মিথ্যা। আপনি কতটুকু আসল, আর কতটুকু ভান? আপনার সাথে হয়তো খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা হতে পারত, কিন্তু তাহলে তো আর আসল আব্দুল ফকিরকে আমি দেখতে পারতাম না। পারতাম বলেন?'

আব্দুল ফকির এবারও কোনো কথা বললেন না। তবে তিনি সেই সাপের মতো ঠান্ডা চোখ মেলে নয়নের দিকে তাকিয়েই রইলেন। নয়নই আবার কথা বলল, 'আপনি তো জানেন, আমি ডাক্তার। সেদিন রাতে ঘুমানোর আগে আমি সাড়ে সাত মিলিগ্রামের তিনখানা মিডাজোলাম ট্যাবলেট খেয়েছিলাম। এগুলো উচ্চমাত্রার সিডাটিভ, মানে ঘুমের ওষুধ। এগুলো খেলে মানুষ টানা আট থেকে দশ ঘণ্টা মরার মতো ঘুমায়। আমিও ঘুমিয়েছিলাম। তার আগে খুব সাবধানে ব্লেড দিয়ে আমার হাতের আঙুলে সাপে কাঁটা আঘাতের মতো কতগুলো সরু আঁচড় কেটেছিলাম। তারপর চিৎকার করে সবাইকে বলেছিলাম আমাকে সাপে কেটেছে! সবাই ছুটেও এলো। তারা সারা বাড়িতে তন্নতন্ন করে সাপ খুঁজে বেড়ালো। আর ততক্ষণে আমি ওষুধের প্রভাবে ঘুমিয়েও পড়েছি। গভীর ঘুমে অচেতন, যেন মৃত মানুষ। কিন্তু মৃদু শ্বাস বইছে। হাতে সাপে কাঁটার আঘাত। ওইসব মুহূর্তে অন্য কিছু আর কী-ই বা ভাবতে পারে মানুষ বলুন? তাছাড়া আপনি তো জানেনই, এইসময়ে এ অঞ্চলে সাপের কি উপদ্রব!'

নয়ন মুহূর্তের জন্য থামল। তার গলা শুকিয়ে এসেছিল। সে খানিক ঢোক গিলে আবার বলল, 'বিষয়টা খুব ছেলেমানুষি আমি জানি ফকির সাব। কিন্তু ছেলেমানুষি কে না করে? আপনি করেন না? আপনিও করেন। আমরা সকলেই করি। আমার হাতের আঁচড়ের চিহ্ন দেখে তো আপনার না বোঝার কথা না যে, ওগুলো সাপে কাঁটার দাগ নয়।'

নৌকা খানিকটা দুলে উঠেছে। সম্ভবত ঘাটে ভিড়েছে। নয়ন বলল, 'ধরে নিলাম সেই আবছা অন্ধকারে আপনি কেবল দাগ দেখেই ভেবে নিয়েছিলেন আমাকে সাপে কেটেছে। কিন্তু আপনি তো খুব ভালো করেই জানেন, বিষাক্ত সাপের দুটো দাঁতে বিষ থাকে। সে কাউকে আঘাত করলে তার সেই বিষদাঁত দুটো দিয়েই আঘাত করে। ফলে রোগীর শরীরে কেবল তার সেই বিষদাঁত দুটোর ছোবলের চিহ্নই থাকে। আর যেসব সাপ বিষাক্ত না, তারা কাউকে কাটলে, তারা রোগীর শরীরে একসারি দাঁত বসায়। পাশাপাশি এক সারি দাঁত। যারা সাপ সম্পর্কে সামান্য কিছুও জানেন, তারাও তাই এই সাপে কাঁটা দাগ দেখলেই বুঝতে পারেন, কোনটি বিষাক্ত সাপের ছোবল, আর কোনটি নির্বিষ সাপের ছোবল। আবছা অন্ধকারে না হয় আমার হাতের আঘাতের চিহ্ন দেখে

আপনি ধরেই নিয়েছিলেন যে আমাকে সাপেই কামড়েছে। কিন্তু আমার আঙুলে একসারি আঁচড়ের চিহ্ন ছিল। সেই চিহ্ন দেখে আপনার তো সহজেই বুঝে ফেলার কথা, সাপটা বিষাক্ত ছিল না।'

নয়ন থামল। থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আব্দুল ফকিরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তাহলে? তাহলে তারপরও আমাকে বিষধর নাগিন কেটেছে বলে হৈচৈ শুরু করে দিলেন কেন? বিষ নামানোর অতসব আয়োজন কেন করলেন?'

নয়ন ভেবেছিল তার কথা শুনে আব্দুল ফকির ক্ষেপে যাবেন, বা নিদেনপক্ষে অপ্রতিভ হবেন, কিন্তু আব্দুল ফকিরের চেহারায় তেমন কিছুই দেখা গেল না। তিনি বরং খুব সহজ-স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'বাজান, আপনে বুদ্ধিমান মানুষ, লেখাপড়া জানা বড় ডাক্তার। আপনের বুদ্ধির সাথে কি আমাগো গাঁও-গ্রামের মানুষের বুদ্ধি কুলায়? কুলায় না। তয় একখান কথা, আপনেরে যে সাপে কাটে নাই, এই জিনিস আব্দুল ফইরের না বোঝনের কথা না। কিন্তু তাইলে ঘটনা কী?'

নয়ন আব্দুল ফকিরের চোখে চোখ রেখে বলল, 'কী ঘটনা ফকির সাহেব?'

আব্দুল ফকির গলা খাকাড়ি দিয়ে জমে থাকা শ্লেষ্মা পরিষ্কার করলেন। তারপর বললেন, 'সেই রাইতে আপনেরে কীভাবে সাপে কাটছে সেই ঘটনা পুরাটাই তো আমি নিজ কানে আপনের মামা খবির খাঁর মুখেই শুনছি। তাইলে? তাইলে আপনেরে যদি সাপে নাই কাটে, আপনে তাইলে অমন সাপ সাপ বইলা চিক্কুর দিয়া ফিট হইয়া গেলেন কেন? রহস্য কী? আর ওই ঝড় বৃষ্টির রাইতে অতদূর থেইকা ওইরকম জরুরি খবর দিয়া আমারে আনানোর কারণটাই বা কী? এই রহস্যটা আমার খুব জাননের দরকার আছিল বাজান।'

আব্দুল ফকির থামলেন। নয়ন কোনো কথা বলল না। সে প্রবল মনোযোগে আব্দুল ফকিরের কথা শুনছে। এ যেন কোনো রহস্যময় গল্পের শেষ পৃষ্ঠা। এক মুহূর্তের জন্যও মনোযোগ হারানো যাবে না। সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে আব্দুল ফকিরের চোখে। আব্দুল ফকির খানিক দম নিয়ে বললেন, 'আমি জানতাম, আপনের আর যাই হউক, সাপে আপনেরে কাটে নাই। কিন্তু আব্দুল ফইর তো এই অঞ্চলে একটা নাম। সে সাপে কাঁটা রুগীরে এমনি এমনি ছাইড়া দিয়া আসব, তাও আবার ফতেহপুরের খাঁয়গো বাড়ির রুগী, এইটা কোনো কথা! এইটা কোনো কথা না। আর আপনের আসল ঘটনা কী? সেইটা না দেইখাই চইলা আসনের মানুষ আব্দুল ফইর না! এই দুই কারণেই আপনেরে উঠানে নামাইছিলাম। আমার ঘটনা বোঝা খুব জরুরি আছিল। আর লোকজনের সাপের বিষ নামানির বন্দোবস্ত দেখনের দরকার আছিল।'

আব্দুল ফকির কেমন চাপা শব্দে হাসলেন। তারপর বললেন, 'নাও ঘাটে আইছে, আপনের নামনের সময় হইছে, আপনে নামেন বাজান। তয় তার আগে

একখান কথা, আপনে সেইদিন যহন ঢোলের বারিতে জাইগা উঠলেন, সেইদিন সেই কাণ্ড দেইখা আমি নিজেও থম খাইয়া গেছিলাম। কিন্তু একটা রহস্য এহনও পরিষ্কার না। আপনে এত কিছু করলেন শুধু আমার সাথে দেখা করনের লাইগা? শুধু আমি কতটুক আসল, কতটুক নকল, এইটা বোঝনের লাইগা? এই কথা আমারে বিশ্বাস করতে বলেন?'

নয়ন এবার চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ। জুলফিকার ঘাটে নাও ভিড়িয়েছে। সে বারকয়েক নয়নকে ডেকেও গিয়েছে। মনিরকে সাথে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে নৌকার গলুইয়ের পাটাতনে। আব্দুল ফকির বললেন, 'বলেন বাজান, আসল ঘটনা বলেন।'

নয়ন এবার তার মুখখানা আব্দুল ফকিরের মুখের কাছে নিয়ে আসল। তারপর খুব অনুচ্চ কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'আপনি আসমাকে চেনেন, আসমা?'

আব্দুল ফকির কিঞ্চিৎ কপাল কুঁচকে নয়নের দিকে তাকালেন। তারপর সামান্য দ্বিধামিশ্রিত গলায় বললেন, 'আসমা? কোন আসমা বাজান?'

নয়ন বলল, 'আসমাকে সাপে কেটেছিল। আপনি গিয়েছিলেন তার বিষ নামাতে।'

আব্দুল ফকির এবার যেন খানিক উদাস হয়ে গেলেন। তিনি মাথা তুলে আবছা অন্ধকারে নাওয়ের ছইয়ের দিকে তাকালেন। তারপর উদাস গলায় বললেন, 'কত মানুষের লগেই তো দেখা সাক্ষাৎ হয় বাজান, কত রুগীর বাড়িতেই তো যাই। কত মানুষের বিষ নামাই, সবই কি মনে থাকে?'

নয়ন বলল, 'আসমার কথা আপনার মনে থাকার কথা।

আব্দুল ফকির বললেন, 'বয়স তো আর কম হয় নাই। বয়স বাড়লে মানুষের ইয়াদ শক্তি কইম্যা যায়। আপনে ডাক্তার মানুষ, আপনের ভালো জাননের কথা।'

নয়ন আব্দুল ফকিরের কথার জবাব দিলো না। সে মৃদু হাসল। কিন্তু তার সেই হাসিতে আব্দুল ফকির কী যেন খুঁজলেন। তিনি বললেন, 'ঘটনা খুইলা বলেন বাজান।'

নয়ন বলল, 'ঘটনা খুলে বলার তো তেমন কিছু নেই ফকির সাহেব। আপনি সবই জানেন। ঘটনার সবই আপনার মনে আছে। আপনি কিছুই ভোলেননি। আসমাকেও না।'

নয়ন থামল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আব্দুল ফকিরের দিকে কিন্তু আব্দুল ফকির কোনো কথা বললেন না। নয়নই আবার বলল, 'আসমা থাকত শহরে। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। ঢাকায় সে মানুষের বাসায় কাজ করত। কিন্তু সেই মেয়েটা শহর থেকে ফিরল লাশ হয়ে। আপনার ভুলে যাওয়ার কোনো

কারণ নেই। আসমার জানাজার নামাজ পড়তেও আপনি গিয়েছিলেন ফকির সাব।'

আব্দুল ফকির এবার যেন খানিক সতর্ক হলেন। তবে তার ভাবভঙ্গি সহজ স্বাভাবিকই। তিনি খানিক নরম গলায় বললেন, 'ওহ্, গহর মাঝির মাইয়া আসমা? আহারে সোনার বরণ মাইয়াডা। অভাবের সংসার বইলা বাপ মায়ে সেয়ানা মাইয়াডারে ঢাকার শহর কামে দিছিল। মাইয়া ফির‍্যা আসলো লাশ হইয়া।'

নয়নের চোখ যেন এবার ধক করে জ্বলে উঠল। সে বলল, 'এই তো আপনার ইয়াদ আসছে ফকির সাব। একদম ইয়াদ আসছে।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'কিন্তু বাজান, আসমার সাথে এইসবের সম্পর্ক কী?'

নয়ন সাথে সাথেই জবাব দিলো না। খানিক থেমে কী যেন ভাবল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, 'সম্পর্ক আছে ফকির সাব'।

আব্দুল ফকির বললেন, 'কী সম্পর্ক?' www.boighar.com

নয়ন ঠান্ডা, স্থির, স্পষ্ট গলায় বলল, 'খুন আর খুনির সম্পর্ক'।

নয়ন বাক্যটা শেষ করে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল আব্দুল ফকিরের চোখে। সে ভেবেছিল তার এই কথা শুনে আব্দুল ফকির মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে যাবেন। ভয় পাবেন। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটল না। আব্দুল ফকির বরং নয়নকে বিস্মিত করে দিয়ে খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নয়নের আরো খানিকটা কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর চিন্তিত গলায় বললেন, 'আপনি কি অসুস্থ বাজান? সেইরাতের সেই ঘুমের ঔষুধের নেশা কি এখনও কাটে নাই? আপনাগো এই ঔষুধের গুনতো দেখি মাশাল্লাহ ভালোই।'

নয়ন আব্দুল ফকিরের আচরণে যথেষ্টই অবাক হলো। কিন্তু সে তার ভাবে তা প্রকাশ করল না। বরং সামান্য হাসল। সেই সামান্য হাসিটুকু ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে রেখেই সে বলল, 'আপনি কি জানেন, আপনি ভয়াবহ বিকৃত মানসিকতার একজন মানুষ? এই অজপাড়াগাঁয়ে আপনার মতো এমন ভয়াবহ বিকৃত মানসিকতার একজন মানুষ থাকতে পারে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কখনো না। বরং আমি কাউকে বললে, তারা আপনার মতই আমাকে পাগল বলবে। অসুস্থ বলবে। কিন্তু আপনার এই সহজ সাধারণ চেহারা আর সাদাসিধে পোশাকের আড়ালে যে এমন এক ভয়ানক অসুস্থ একজন মানুষ রয়েছে, এটি কেউ জানে না, এটি কেউ বিশ্বাসও করবে না, তাই না ফকির সাব?'

www.boighar.com

আব্দুল ফকির সাথে সাথে কথা বললেন না। তিনিও হাসিহাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন নয়নের দিকে। নয়ন কিছু বলতে যাবে, কিন্তু তার আগেই

www.boighar.com

আব্দুল ফকির ধীরে সুস্থে তার বাঁ হাতখানা তুলে নয়নকে থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'কদম গাছ চেনেন? কদম গাছের পাতা?'

নয়ন এতক্ষণ নানাভাবে চেষ্টা করছিল আব্দুল ফকিরের সামনে নিজেকে উন্মোচিত না করতে। নিজের ভেতরে কী চলছে সেটি আব্দুল ফকিরকে ধরতে না দিতে। কিন্তু এবার যেন আর পারল না। আব্দুল ফকিরের হঠাৎ এমন উদ্ভট প্রশ্নে নয়ন বিস্মিত হলো! তার নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগতে লাগল। সে স্থির বসে রইল। কোনো জবাব দিলো না। আব্দুল ফকির অবশ্য নয়নের জবাবের অপেক্ষাও করলেন না। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'গ্রাম-গঞ্জে একটা গাছ আছে। গাছের পুস্তকি নাম আমি জানি না। আমরা গাঁও-গ্রামের মানুষেরা বলি লোট পিপিল গাছ। কিছুটা কদম গাছের পাতার মতো দেখতে। সাইজে আরেকটু ছোট আর রঙটাও ঘন কালচে সবুজ। সেই পাতা পানিতে ভিজাই রাখলে পানি হইয়া যায় আঠার মতো ঘন। খাইতে কোনো টেস্ট নাই। তয় কাজে পাক্কা। খাঁটি সরতিক। দিনে দুই বেলা সেই পাতা পানিতে ভিজাইয়া রাইখা সেই পানি খাইবেন। মাথায় বায়ু চড়লে, উদবাগ হইলে, ঘুম না হইলে, পেশাবের ঝামেলা হইলে, আবোল-তাবোল চিন্তা মাথায় আইলে এই পাতা পানিতে ভিজাইয়া রেগুলার খাইবেন। খুব কাজে লাগব। দেখবেন এইসব বায়ু চড়ার লক্ষণ দূর হইব। আবোল-তাবোল কথা বার্তাও।'

আব্দুল ফকির থামলেন। কিন্তু নয়ন কোনো কথা বলল না। সে পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেছে। আব্দুল ফকির নির্বিকার ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন তার সামনে সাত-আট বাছরের নাবালক শিশু নয়ন বসে আছে। শিশু নয়নের নানান শিশুসুলভ কর্মকাণ্ড দেখে তার অভিভাবক সামান্য চিন্তিত। আব্দুল ফকির নয়নের সেই চিন্তিত অভিভাবক।

নয়নের হঠাৎ কী হলো! সে চট করে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আচমকা তার মাথা ঠুকে গেল নাওয়ের ছইয়ের সাথে। নয়ন অবশ্য আঘাতটাকে পাত্তা দিলো না। সে ঘুরে আব্দুল ফকিরের দিকে তাকিয়ে হড়বড় করে বলল, 'আপনার সম্পর্কে একদম কিছু না জেনে শুনে আমি গ্রামে আসিনি ফকির সাহেব। আর শুধু আমি একা না, আপনার অনেক ঘটনা আরো অনেকেই জানেন, কিন্তু কেউ কেউ লজ্জায়, কেউ কেউ ভয়ে আপনাকে কিছু বলে না। আমার নানাজানও আপনাকে চেনেন। হাড়ে হাড়ে চেনেন। কিন্তু আবার ভয়ও করেন।'

আব্দুল ফকির এবার শব্দ করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'আপনার নানাজান তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমারে ভয় পান? আপনের মাথাডা আসলেই গেছে বাজান। এই তল্লাটের সকল মানুষ এখনও তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ভয়ে কাঁপে। আর

আপনে বলতেছেন, সে আমারে ভয় পায়। আপনে তো এহনও নিজের নানাজানরেই চেনলেন না। আব্দুল ফকিররে কী চেনবেন বাজান?'

আব্দুল ফকিরও নাওয়ের ছইয়ের বেড়ায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এই নাওয়ের যথেষ্ট উঁচু হলেও পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। দাঁড়াতে হয় কুঁজো হয়ে। আব্দুল ফকিরের তুলনায় নয়নের উচ্চতা বেশি হওয়ায় সে দাঁড়িয়ে আছে কুঁজো হয়েই। আব্দুল ফকির নয়নের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন, তারপর নিজের পায়ের দিকে চোখ রেখে বললেন 'আপনে জানেন, আমার পায়ের এই অবস্থা কে করছে? কে আমারে খুন করতে গিয়া বজলু ব্যাপারীরে খুন করছে? জানেন?'

নয়ন বলল, 'জানি'।

আব্দুল ফকির যেন কিছুটা চমকিত হলেন। তিনি বললেন, 'কী জানেন?'

নয়ন বলল, 'আপনাকে সেই রাতে খুন করতে গিয়েছিলেন আমার নানাজান। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। কিন্তু তার ভুলে খুন হয়ে গেলেন আরেকজন, বজলু ব্যাপারী। বহু বছর আগের ঘটনা। এইসব গাঁও-গ্রামে তখন আইন-কানুনের বালাই নাই। চর দখলের কারণে মানুষ খুন নিত্যদিনের ঘটনা। নানাজানের বয়সও তখন কম। শরীরে শক্তি আছে, দাপট আছে। তার কথাই তখন আইন। ফতেহপুরে তখন পুলিশ, আইন, আদালত সবই তিনি। এইজন্যই তিনি গিয়েছিলেন আপনাকে আপনার অপকর্মের শাস্তি দিতে। আপনার ভাগ্য ভালো যে আপনি অন্য গ্রামের মানুষ। না হলে দিনের আলোতেই আপনাকে তিনি প্রকাশ্যে খুন করতেন।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'এই তো। আপনে তো সবই জানেন। তাইলে যে আবার বললেন, আপনার নানাজানে আমারে ভয় পায়?'

নয়ন বলল, 'এইখানেই তো আপনার আসল খেলা। নানাজানের মতো মানুষও আপনাকে ভয় পান। স্বীকার না করলেও পান। নানাজান একবার আপনাকে খুন করতে গিয়ে ভুল করে ফেললেন। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্য করতেই আবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেবারও ব্যর্থ হলেন, তখন থেকেই তিনি মনে মনে আপনাকে ভয় পেতে শুরু করেন। কিন্তু সেই দ্বিতীয়বারের চেষ্টার আঘাতের চিহ্নই আপনি আপনার বাম পায়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য এই বারবারের ব্যর্থতা থেকে নানাজান নিজেও মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে আপনার অতিপ্রাকৃত কোনো ক্ষমতা রয়েছে। তিনি আপনাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন, কিন্তু ভয়ও করেন। তার ভেতরে ভেতরে এই ভাবনাও ধীরে ধীরে গেড়ে বসেছে যে আপনার সত্যি সত্যি অন্য কোনো ক্ষমতা রয়েছে। হয়তো এই জন্যই আমাকে সাপে কাঁটার কথা শুনে তিনি আপনাকেই নিয়ে আসার জন্য বলেছিলেন। কারণ তিনি যে-কোনো মূল্যে আমাকে বাঁচাতে

চেয়েছিলেন। আর, ঘটনা যা-ই হোক, যেভাবেই হোক, আমাকে সুস্থ করে দিয়ে তার সেই বিশ্বাস আপনি আরো পাকাপোক্তই করেছেন।'

আব্দুল ফকির এবারও কোনো কথা বললেন না। বসে রইলেন স্থির। নয়ন হেঁটে ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ঘাটে নেমে হারিকেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জুলফিকার আর মনির। নয়নকে দেখে মনির চকচকে চোখে তাকাল। তারপর দাঁত বের করে হেসে বলল, 'ম্যাভাই, ফইরসাবের কাছেরতন মাছের বিষয়টা পরিষ্কার কইরা শোনছেন তো?'

নয়ন মনিরের কথার জবাব দিলো না। সেই তাকিয়ে আছে মনিরের পেছনে। জুলফিকারের হাতের হারিকেনে সামান্য জায়গা আলোকিত হয়ে আছে। বাদবাকি সকল জায়গা ঢেকে আছে গাঢ় অন্ধকারে। নয়নের হঠাৎ মনে হতে থাকল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এই মানবজনম, এই সকল কিছুরই আসলে ওই হারিকেনের আলোর মতো খুব সামান্যটুকুই আমরা কেবল জানি, দেখতে পাই। খুব সামান্যটুকুই। আর বাদবাকি বিশাল অংশটুকু ঢেকে থাকে এই অন্ধকারের মতো ঘুটঘুটে গাঢ় অন্ধকারে, রহস্যে। সেই অন্ধকার, রহস্যের কিছুই আমরা দেখতে পাই না। কখনো কখনো হয়তো সেই গাঢ় অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রহস্যের বাকি অংশটুকু না দেখাই ভালো।

পারুল বসে আছে পুকুর ঘাটে। তার মন খারাপ। মন খারাপের অবশ্য যথার্থ কারণও রয়েছে। সে তার বাবাকে বলেছিল বিল কুড়ানির হাট থেকে ফেয়ারনেস ক্রিম আনতে। তার বাবা ক্রিম এনেছেনও। কিন্তু পারুল যা আশঙ্কা করেছিল ঘটনা তাই ঘটেছে। তার বাবা এনেছেন নকল ক্রিম। আসল আর নকল ক্রিমের প্যাকেট, ক্রিমের নাম, নামের বানান আর নকশাও প্রায় এক। একটা দুটো অক্ষর শুধু এদিক-সেদিক। তারা বাবা অতশত বোঝেন না। বোঝেন না বলেই পারুল একটা কাগজে স্পষ্ট করে লিখেও দিয়েছিল। কিন্তু সেই কাগজ তার বাবা হারিয়ে ফেলেছেন।

পারুল আব্দুল ফকিরের একমাত্র সন্তান। আব্দুল ফকির বাড়ি ফিরেছেন ভোরের আলো ফোঁটারও অনেক পর। এখন পড়ন্ত বিকেল। কিন্তু সেই সকাল থেকে এখন অবধিও পারুলের মন খারাপ। একটু-আধটু মন খারাপ না। ভয়াবহ রকমের মন খারাপ। মন খারাপের অবশ্য আরো অনেক কারণ রয়েছে। পারুল খেয়াল করে দেখেছে, মন খারাপের কোনো একটা ঘটনা ঘটলে তখন আগের ভুলে যাওয়া মন খারাপরে ঘটনাগুলোও একের পর এক মনে পড়তে থাকে। এই যেমন এখন পুকুর ঘাটে বসে পারুলের অতীতের অনেক মন খারাপের ঘটনা মনে পড়তে শুরু করেছে। সেইসব ঘটনা মনে করে তার গাল বেয়ে পানি পড়তে শুরু করেছে। সে সেই পানি মুছছে না। পানি টপটপ করে ঝরে পড়ছে পুকুরের পানিতে। পারুল সেই পানির দিকে তাকিয়ে নিমগ্ন মনে কাঁদছে। অবশ্য পারুল যে শুধু কাঁদছেই, তাও না। বরং এই ফাঁকে সে পুকুরের শান্ত পানিতে তার নিজের চেহারাটাও ভালো করে দেখে নিচ্ছে। পারুলের এই এক অভ্যাস। সুযোগ পেলেই নিজের চেহারাটা দেখতে তার ভারি ভালো লাগে। কিন্তু পুকুরের পানিতে নিজের চেহারা দেখতে দেখতে পারুল খানিক চিন্তিত হয়ে উঠল। তার হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, সে কি আগের চেয়ে খানিক শুকিয়েছে, নাকি মোটা হয়েছে? তার নাকখানা কি আরো খানিকটা লম্বা হয়েছে?

www.boighar.com

গায়ের রঙ? পারুলের কেন যেন মনে হলো, তার গায়ের রঙটা এ ক'দিনে বেশ ময়লা হয়ে গেছে। কেমন তামাটে হয়ে উঠেছে মুখখানা।

এ ভারি দুশ্চিন্তার কথা। এই অবধি এসে পারুলের দুঃখবোধ আবার গাঢ় হয়ে উঠল। তার হঠাৎ মনে হতে লাগল, এই বছরটা তার জন্য আসলেই অপয়া বছর। না হলে এই বছরেই সবকিছু তার এত খারাপ যাচ্ছে কেন?

তা এই বছরটা পারুলের আসলেই খুব খারাপ যাচ্ছে। এ বছরই সে এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছে। অথচ তার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী লতা পাশ করে গেছে। লতা পাশ করেছে বলে অবশ্য তার খুব একটা আক্ষেপ নেই। তার আক্ষেপ অন্য জায়গায়, লতা পাশ করতে না করতেই লতার প্রেম হয়ে গেছে। ছেলের নাম আশিক। আশিক শহরে থাকে। লতা থাকে তার মামার বাড়ি রায়গঞ্জে। সেখানে কলেজ আছে। সে সেই কলেজে ভর্তি হয়েছে। রায়গঞ্জ বড় নদী বন্দর। সেখানে ইলেক্ট্রিসিটি আছে। মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক আছে। এতে অবশ্য লতার সুবিধা হয়েছে। তার একটা মোবাইল ফোনও আছে। সে এসএসসি পাশ করার কারণে তার মামা তাকে মোবাইল ফোন কিনে দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, লতার প্রেম হয়েছে সেই ফোনে।

পারুলের দুঃখটা এখানেই। লতার প্রেম হয়ে গেল, অথচ কিনা তার প্রেম হলো না। এই দুঃখেই সারাটাক্ষণ তার মন ভার হয়ে থাকে। সে রূপবতী মেয়ে। তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল। গ্রামের মেয়েদের তুলনায় সে লম্বাও বেশ। তার চোখ দুটি খুব বড় না হলেও কোষা নাওয়ের মতো অত সরুও নয়। অবশ্য নাক তার বাঁশির মতো লম্বা নয় বলে তার কিছু আক্ষেপও আছে। সেই আক্ষেপ মেটাতেই সে নিয়ম করে রোজ দু'বেলা তার নাকটি আঙুলে চেপে ধরে টানে। এই টানাটানিতে তার নাক কতটা বড় হয়েছে তা অবশ্য খুব একটা স্পষ্ট নয়, তবে নাকটি যে দিনকে দিন ভারি উঁচু হয়েছে, তা তার হাবভাবে বেশ বোঝা যায়। সে বেশ নাক উঁচু স্বভাবের হয়ে উঠেছে। এর কারণ পথে-ঘাটের ছেলে-ছোকড়ারা তাকে দেখলেই ছোকছোক করে, পেছন থেকে শিস কাটে, চিঠিপত্রও দেয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে লতার শহুরে ছেলের সাথে প্রেম হয়ে যাওয়ার পর থেকেই গাঁয়ের আর কোনো ছেলেকেই পারুলের ভালো লাগে না। সে সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। আশেপাশে ছোকছোক করা ছেলেদের দেখলেই তার গা জ্বলে। অথচ আগে একটা সুন্দর ছেলে দেখলেই কেমন একটা প্রেম প্রেম ভাব চলে আসত তার। আজকাল আর ভালো লাগে না। পারুলের দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। তার একখানা পুরোদস্তুর শহুরে প্রেমিকই চাই।

কিন্তু এই গণ্ডগ্রামে সে শহুরে ছেলে পাবে কই! এই নিয়ে তার বেজায় দুঃখ। সে আসলেই দুর্ভাগা। না হলে লতার চেয়ে সে কম কিসে? বরং লতার চেয়ে তার গায়ের রঙ ফর্সা। লম্বায়ও সে লতার চেয়ে ঢের বেশি। সবচেয়ে বড়

ব্যাপার লতার শরীরে মাংস বলতে কিছু নাই, টিনটিনে হাড্ডিসার মেয়ে। মেয়ে মানুষের শরীরে মাংস না থাকলে সে আবার কিসের মেয়ে মানুষ! মেয়ে মানুষ হাড্ডিসার হলে পুরুষ মানুষের কাছে তার আর কদর কীসের! অথচ সেই হাড্ডিসার লতার প্রেম-ভালোবাসা হয়ে গেল শহুরে ছেলের সাথে। আর সে কিনা পড়ে রয়েছে এই গেয়ো ভূতদের মাঝে!

পারুলের বুকের ভেতরটা আবারও হুঁ হুঁ করে উঠল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ আর সে ভাত খাবে না। অবশ্য ভাত না খাওয়ার কারণ যে শুধু ক্রিমের জন্য রাগ, তা-ই নয়। সে লতার কাছে শুনেছে, আজকালকার শহুরে ছেলেরা নাকি থলথলে স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের পছন্দ করে না, তারা পছন্দ করে হালকা পাতলা শরীরের মেয়েদের। প্রথম প্রথম অবশ্য লতার কথা বিশ্বাস হয়নি পারুলের। সারাজীবন সে গাঁয়ের মা-চাচীদের কাছে শুনে এসেছে, পুরুষ মর্দ মানেই মেয়ে মানুষের মাংস থলথল শরীর পছন্দ। শুধু যে শুনেছে, তাই-ই নয়। আশেপাশে সে দেখেছেও। অথচ সেই দিনের সেই লতা কিনা তাকে কী সব জন্তর-মন্তর শেখাচ্ছে! লতা তার নিজের হাড্ডিসার শরীরের দুঃখেই আবার পারুলকে এইসব কূটমন্ত্র শেখাচ্ছে না তো? নানান ফুসমন্তর দিয়ে তাকে হাড্ডিসার করে তার ক্ষতি করতে চাইছে না তো! এই ভাবনাও পারুলের মনে এসেছে। তবে তার সেই ভাবনা বদলেছে লতার মোবাইল ফোনের কারণে। আজকাল লতা মাসে মাসে যে দুয়েকবার রায়গঞ্জ থেকে হোসনাবাদে আসে, তখন পারুল লতার মোবাইল ফোনে নানান ভিডিও দেখেছে। বেশিরভাগই হিন্দি সিনেমার গানের ভিডিও। সেইসব গানের নায়িকাগুলো দেখতে যে কী সুন্দর! ছিপছিপে শরীরের লম্বা লম্বা মেয়েগুলোকে দেখে লতার সেই প্রথম নিজের শরীরটা নিয়ে আক্ষেপ হতে শুরু করল, ইশ! সেও যদি আর খানিকটা পাতলা হতে পারত!

কিন্তু পাতলা সে কী করে হবে! তার বেশি খেয়ে অভ্যাস। খেতে সে ভারি পছন্দ করে। সারাক্ষণ তার মুখে এটা-সেটা লেগেই থাকে। এত খেলে কি আর শুকানো যায়? আজকাল তাই সে নিজেকে বোঝাতেই না খাওয়ার নানান উপলক্ষ খুঁজতে থাকে, অজুহাত তৈরি করতে থাকে। আজ সারাদিন না খাওয়ার ভাবনাও তাই তার তেমনই এক অজুহাত।

পারুল তার পা দু'টি ছড়িয়ে রেখেছে পুকুরের জলে। স্বচ্ছ জলে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট পুঁটি, চাপিলা মাছ। মাছগুলোর ভয়-ডর বলতে কিচ্ছু নেই। তারা প্রায়ই পারুলের পা ঠুকরে দিচ্ছে। পারুল মৃদু পা নাড়াতেই অবশ্য চকিত চম্পট। পুকুরের পশ্চিম দিকের ঢিবিতে এক সারি গাছ। সেই গাছের ফাঁক দিয়ে তেড়ছাভাবে বিকেলের সোনারঙা রোদ এসে পড়েছে পারুলের গায়ে। সেই আলোয় পারুল হঠাৎ খেয়াল করল, এতক্ষণ ধরে জলের ভেতর ডুবে থাকা তার

www.boighar.com

পা-জোড়া কেমন ফর্সা হয়ে উঠেছে। ধবধবে ফর্সা। যদিও খানিকটা ফ্যাকাশে লাগছে। কিন্তু ওই অতিরিক্ত ফর্সা রঙটুকুর কারণেই পারুলের হঠাৎ মন ভালো হয়ে গেল। অদ্ভুতরকমের ভালো। তার আচমকা মনে হতে লাগল, আচ্ছা, সে যদি আরো খানিকক্ষণ জলের ভেতর তার নিজের পুরো শরীর ডুবিয়ে রাখে, তাহলে কী হবে?

পারুল এক পা দু'পা করে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে জলের ভেতর নামল। গত ক'দিন ধরে আচমকা বৃষ্টি না হওয়ায় গরমও খানিক চড়েছে। আষাঢ় মাসের ভরভরন্ত পুকুর। সেই পুকুরে গলা অবধি গা ডুবিয়ে পারুলের ভারি আরাম বোধ হলো। সে চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ সময় জলের মধ্যে ভেসে রইল। পারুল চোখ খুলল তার বাবা আব্দুল ফকিরের গলা শুনে। সে চোখ মেলে দেখল চারপাশে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এসেছে। আব্দুল ফকির মসজিদ থেকে মাগরিবের নামাজ পড়ে ফিরেছেন। তার মাথায় টুপি, হাতে জায়নামাজ। আব্দুল ফকির আবারও কন্যাকে ডাকলেন, 'মারে, এই সইন্ধ্যাবেলা সময় ভালো না। এইসময় সেয়ানা মাইয়াগো ঘরের বাইর হইতে হয় না। চুল খোলা রাখতে হয়নারে মা।'

পারুল বাবার কথার উত্তর দিলো না। সে আবার চট করে চোখ বন্ধ করে যেমন ছিল তেমন করেই ভেসে রইল। তার মুখভর্তি পানি। আব্দুল ফকির মোলায়েম গলায় বললেন, 'মারে, তুমি এইরকম কইরো না। ভালো-মন্দ কিছু একটা হইয়া গেলে তখন কানলেও লাভ হইব না রে মা।'

পারুল কলকল করে মুখের পানি ছাড়ল। তারপর চোখ বন্ধ রেখেই বলল, 'কী ভালো-মন্দ হইব আব্বা?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তোমার মায়রে দেখো না মা? তোমার মায়ও আছিল এই এক তোমার মতো। কোনো কথা শুনত না আমার। হাবড়ে-জাবড়ে যখন তখন ঘুইরা বেড়াইতো। সেই থেইকা এই অবস্থা! কত রকমের খারাপ জিনিস যে মানুষের চোউক্ষের অগোচরে আছেরে মা। মানুষ তো আর সব তার চামড়ার চৌক্ষে দেখে না।'

পারুল বলল, 'আপনে তো দেহেন আব্বা। তা আপনে বলেন তো, এহন এইখানে কতগুলা খারাপ জ্বিন আছে? আমার চেহারা ছবি তো মাশাল্লাহ ভালো। তার উপর ভরা সন্ধ্যায় আমি চুল খুইলা পুষ্কুনিতে ভাসতেছি। আমার চাইরপাশে তো জ্বীনেগো মেলা বইসা যাওনের কথা আব্বা।'

আব্দুল ফকির গলা খাকাড়ি দিয়ে বললেন, 'এইভাবে কথা বলবা না মা। তোমারে উঠতে বলছি, তুমি ওঠো।'

পারুল বলল, 'আপনের এত ডর ক্যান আব্বা? এরা তো আপনের কথায় উঠে বসে। আপনে বইলা দিলেই তো হয়, ওরে বদজ্বীনের দল, আমার কন্যার

দিকে চক্ষু তুইল্যা তাকাইবি না। তাইলে কিন্তু ফুঁ দিয়া চক্ষু উপড়াই ফেলব। আপনের না কত ক্ষমতা!'

আব্দুল ফকির আর কিছু বললেন না। বলার অবশ্য মানেও হয় না। তিনি জানেন, তার এই কন্যা কারো কথা শোনার মানুষ না। সে নিজে যা ভালো মনে করে, তাই করবে। তারপরও তিনি ফিরে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বললেন, 'ঠান্ডা লাগাইয়া জ্বর বাঁধাইওনা মা। তোমার মায় ঘরে অসুস্থ। তুমিও অসুস্থ হইলে তার দেখাশোনা করব কে!'

পারুল তখনই পানি থেকে উঠল না। সে উঠল এশার আজানের পর। আব্দুল ফকির অবশ্য মেয়েকে একা রেখে চলে যান নাই। তিনি বাড়ির ভেতর থেকে একখানা কেরোসিনের কুপি ধরিয়ে এনে এশার আজান অবধি পুকুর পারে বসে রইলেন। এই পুরোটা সময় তিনি মেয়েকে নানান কথাবার্তা, উপদেশ বাণী শোনালেন। যদিও পারুল তার কিছু শুনল কিনা, বোঝা গেল না। এশার আজানের পর পর কথা বলল পারুল। সে বলল, 'আব্বা, কুপি নিভান'।

আব্দুল ফকির বললেন, 'এই আন্ধারে কুপি নেভাবো কেন মা?'

পারুল বলল, 'আমি এখন উঠব'।

আব্দুল ফকির বললেন, 'মারে, তুমি উঠলে কুপি নিভানো লাগব কেন? আন্ধারে তুমি কীভাবে উঠবা? তাছাড়া এই সময়ে চাইরপাশে কত সাপ খোপ থাকে।'

পারুল বলল, 'আব্বা, মাইয়া মানুষ ভেজা কাপড়ে উঠলে সেইখানে কোনো পুরুষ মানুষের থাকন উচিত না। নিজের বাপ-ভাই হইলেও না। আপনে কুপিটা নিভাই দিলে আমি উঠতে পারি।'

লজ্জায় আব্দুল ফকিরের মনে হলো তিনি মাটির নিচে ঢুকে যান। এই মেয়ে এমন সব বিচার-বিবেচনাহীন কথাবার্তা যে বলে! তিনি ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু বাতি নিভিয়েই তার হঠাৎ মনে হলো, এই অন্ধকারে মেয়েটা একা একা উঠবে কী করে! পুকুর ঘাট থেকে বাড়ির পথ সামান্য দূরত্ব হলেও এই অন্ধকারে এইটুকু পথও অনেক। তিনি তো বাতিটা জ্বালিয়ে রেখে নিজেই চলে যেতে পারতেন। আব্দুল ফকির অন্ধকারের ভেতর থেকেই বললেন, 'মারে, তুমি এই আন্ধারে উইঠো না। আমি বাড়ি থেইকা তাবারনরে বাতি লইয়া পাঠাইতেছি। তুমি ডর পাইও না মা।'

আব্দুল ফকিরের চিন্তা নামাজের। এশার আজান হয়েছে অনেকক্ষণ। মসজিদে নামাজ শুরু হয়ে যাবে। তিনি নামাজের সময় মসজিদে না থাকলে বিষয়টা মানুষের চোখে লাগবে। কিন্তু মেয়েকে এভাবে রেখে তিনি নামাজে যেতে পারছেন না। আব্দুল ফকির তাবারনের ঘরে ঢুকলেন। তাবারন এই বাড়িতে কাজ-কর্ম করে। বয়স তিরিশের ঘরে। বিয়েও হয়েছিল দুইবার। কিন্তু

www.boighar.com

ছেলেপুলে হয় না বলে বাজা মেয়ের অপবাদ নিয়ে দু'বারই স্বামী-সংসার ছাড়তে হয়েছে তাকে। গত দু'দিন ধরে তাবারনের জ্বর। এইজন্যই তাবারনকে না পাঠিয়ে আব্দুল ফকির নিজেই গিয়ে বসেছিলেন মেয়ের কাছে। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আব্দুল ফকির তাবারনকে বাতি নিয়ে পারুলের কাছে পাঠালেন। পারুল ঘরে ঢুকতে আব্দুল ফকির হন্তদন্ত হয়ে মসজিদের দিকে ছুটলেন।

www.boighar.com

পারুল অবশ্য রাতে না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারল না। তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সে আয়োজন করে ভাত খেতে বসল। কিন্তু ভাত খেতে বসে সে আবিষ্কার করল তার শরীর খারাপ লাগছে। অবশ্য তারপরও সে তার সেই শরীর খারাপ নিয়েই ভাজা মরিচ মাখিয়ে গপগপ করে দুই প্লেট ভাত খেয়ে ফেলল। পারুলের জ্বর আসল গভীর রাতে। জ্বর মানে সাধারণ জ্বর না। একদম উথাল-পাথাল জ্বর। পারুল রাতে ঘুমায় একা। ছোটবেলা থেকেই তার একা ঘুমিয়ে অভ্যাস। কারো সাথে বিছানা ভাগাভাগি করতে সে পারে না। তার মার সাথেও না। অবশ্য জন্মের কয়েক বছর পর থেকেই সে দেখে এসেছে তার মা নুরুন্নাহার অসুস্থ। বেশিরভাগ সময়ই নুরুন্নাহারের ঘর থাকে বন্ধ। নুরুন্নাহার সেই বন্ধ ঘরের দরজায় শব্দ করতে করতে সারাদিন ইনিয়ে-বিনিয়ে সুরে সুরে নানান কথাবার্তা বলেন। তার সেই কথাবার্তার অবশ্য আগামাথা কিছু নেই। তাছাড়া নুরুন্নাহার বেশিরভাগ সময়ই কাউকে চিনতে পারেন না। এমনকি পারুলকেও না। তবে বহু বহু দিন পর মাঝে-মধ্যে তিনি একদম সুস্থ হয়ে ওঠেন। ভালো মানুষের মতো আচরণ করেন। সেদিন তিনি পারুলকে কাছে টেনে নিয়ে পারুলের মাথার চুল আঁচড়ে দেন, চুলে তেল দিয়ে দেন। পারুলের বিয়ে-শাদি নিয়ে নানান কথাবার্তা বলেন। কিন্তু তা ওই বড়জোড় এক-আধ দিন।

মাকে নিয়ে অবশ্য পারুলের আলাদা কোনো অনুভূতি নেই। বরং নুরুন্নাহার তার সুস্থতার সময়টুকুতে পারুলকে যে আদর যত্নটুকু করেন, পারুলের কাছে তাও ভীষণ বিরক্তিকর মনে হয়। এইজন্য সে পারতপক্ষে মায়ের আশেপাশে ভেড়ে না। কিন্তু আজ এই গভীর রাতে পারুলের কী যে হলো! তার হঠাৎ মনে হলো, এই জ্বর শরীর নিয়ে সে যদি এখন তার মায়ের গা ঘেঁষে বসে থাকতে পারত, তাহলে বোধহয় খানিক ভালো লাগত! পারুল বিছানা থেকে উঠল। জ্বরে তার সারা শরীর কাঁপছে। কিন্তু সে সেই কম্পমান শরীর নিয়েই বাতি জ্বালাল। তারপর ঘরের টিনের দেয়াল ধরে ধরে মায়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। নুরুন্নাহারের ঘরের দরজায় বিশাল তালা ঝুলছে। এই তালার চাবি পারুলের কাছে নেই। কার কাছে আছে তাও পারুল জানে না। সে বুঝতেও পারছে না সে এখন কী করবে? টিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। তার শরীর কাঁপছে। জ্বরের তোড় বাড়ছে। পারুল

নিজের ঘরের দিকে ফিরে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। নুরুন্নাহারের ঘরের ভেতর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মৃদু শব্দ। সে অতি কষ্টে পা ফেলে ঘরের বন্ধ দরজায় কান পেতে দাঁড়াল। ভেতর থেকে গুনগুন কান্নার মৃদু শব্দ। কিন্তু সেই কান্না জুড়েও নুরুন্নাহার যেন কিছু বলছে। পারুল অবশ্য সেই কান্নার গুনগুনানি থেকে নুরুন্নাহারের বলা কথাগুলোকে আলাদা করতে পারল না। সে কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘ সময়। চারপাশে হারিকেনের আবছা আলো। সেই আলোয় তেরছাভাবে পারুলের বিদঘুটে ছায়া পড়েছে উত্তর দিকের দেয়ালে। ছায়াটা থেকে থেকে কাঁপছে। অদ্ভুত এক দৃশ্য। সেই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে তাকিয়েই পারুলের হঠাৎ মনে হলো সে তার মায়ের কান্নার শব্দ থেকে কিছু একটা যেন আলাদা করতে পারছে। কী সেই কিছু একটা?

পারুল আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। চুপচাপ। নিঃসাড়। সে তার মায়ের সেই গুনগুন কান্নার শব্দ থেকে যা আলাদা করতে পারল, তার নাম একাকিত্ব। পারুল এই অচেনা সময়ের অবাক মুহূর্তে যেন আবিষ্কৃত করে ফেলল তার কাছে এতদিন অনাবিষ্কৃত হয়ে থাকা এক অতি সাধারণ সত্য। তার মা, ওই দরজার ওপাশের অন্ধকারে একা একলা একটা মানুষ, আর সবার মতোই দেখতে, শুনতে। কিন্তু সেই মানুষটা জগতের আর সকল মানুষের কাছ থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। এমন করেই রোজ মাঝরাতে তিনি হয়তো কাঁদেন, কিন্তু এই জগতে তার সেই কান্না শোনার কেউ নেই। তার সেই কান্না হয়তো কেউ কোনোদিন শোনেওনি। তার নিজের গর্ভে ধরা সন্তানও না। অথচ সেই সন্তান তার হাত ছোঁয়া দূরত্বে ফড়িঙের মতো ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়, পাখির মতো ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়ায়। অথচ তার মায়ের কান্না শোনার মতো সামান্যতম ফুরসৎও তার নেই। এই জগতে তার মতো দুর্ভাগা মা আর কে আছে!

পারুল হঠাৎ সেই দরজার পাশে মেঝেতে বসে পড়ল। তার আজ কেন যেন কান্না পাচ্ছে। খুব কান্না পাচ্ছে। হাউমাউ করা কান্না। কিন্তু সে কাঁদতে পারল না। আচ্ছা, পারুল কি কখনোই কেঁদেছে?

পারুলের হঠাৎ মনে হলো, এই তো কিছুক্ষণ আগে, আজ সন্ধ্যায়ই সে গাল ভাসিয়ে কেঁদেছে। রঙ ফর্সাকারী ক্রিমের জন্য কেঁদেছে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার কেন যেন মনে হলো, সত্যিকার অর্থেই কান্না বলতে যা বোঝায়, তা আসলে ওই কান্না নয়। আসল কান্না মানে অন্য কিছু। অন্যরকম কিছু। সেই অন্যরকম কান্না কি সে কখনো কেঁদেছে? পারুল মনে করতে পারল না, সে তার এই জীবনে কখনো অমন কান্না কেঁদেছে কিনা! সে ঝলমলে হাসিখুশি আনন্দময় এক তরুণী। জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব কারণে তার প্রবল মন খারাপ হয়। সেই মন খারাপ নিয়ে সে কাঁদেও। কিন্তু তার সেই মন খারাপ ভাব বেশিক্ষণ থাকে না। সেই কান্নাও না। সে মুহূর্তকাল পরেই মেতে ওঠে অন্য কিছু নিয়ে।

www.boighar.com

কিন্তু আজ পারুলের খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে। অন্যরকম কান্না। পারুল অনেকটা সময় নিয়ে সেই অন্যরকম কান্নার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কে জানে সে কেন পারল না? হয়তো এই এতদিনেও পারুল কখনো জানত না, জগতের সকল কান্না, কান্না নয়। কিংবা জগতের সকল কান্না এক নয়। কিছু কিছু কান্না থাকে আর সকল কান্নার চেয়ে গভীর, আর সকল কান্নার চেয়ে তীব্র। পারুল এই এতটা কাল সেই কান্নার কথা জানত না বলেই হয়তো সেই কান্নারা প্রবল অভিমানে তার কাছ থেকে লুকিয়ে ছিল দূরে। সযতনে আগলে রেখেছে তাদের বিশুদ্ধতম অশ্রু!

ফজু ব্যাপারী দাঁড়িয়ে আছে খাল পাড়।

রেইনট্রি গাছের ডাল ভেঙে সে পড়েছে পানিতে। আষাঢ় মাস। একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে রেইনট্রির পাতায় পানি জমে জমে পাতা ভার হয়ে গেছে। সেই পাতার ওজনে রেইনট্রির ডাল নুয়ে পড়েছে। ফজু ব্যাপারীর স্ত্রী সালেহা ভেবেছিল পাতার এই ওজনে ডাল আপনাআপনি ভেঙে পড়বে। কিন্তু তার ধারণা সত্যি হলো না। দুইদিন কেটে গেলেও ডাল ভেঙে পড়ল না। বরং ডালের অগ্রভাগ নিচু হতে হতে প্রায় মাটি ছুঁয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে ঝুঁকে রইল। সেই ডাল কাটতেই গাছে উঠেছিল ফজু ব্যাপারী। আর আচানক কাণ্ডটি ঘটল তখনই। সে গাছে উঠতেই ডাল ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। সাথে পড়ল সেও। তাল সামলাতে না পেরে গাছের তলায় খালের পানিতে ছপ করে পড়ল ফজু। সমস্যা হচ্ছে পড়ে তার বাঁ হাত মচকে গেছে। পানিতে পড়লে হাত মচকে যাবার কথা নয়। কিন্তু তার গিয়েছে। হাতখানা মচকালো কী করে? খাল পাড় দাঁড়িয়ে ফজু ব্যাপারী এই কথাই ভাবছিল।

হাত মচকানোর রহস্য উদঘাটিত হলো আরো দু'দিন পর। বৃষ্টি থেমে গেছে। শুধু থেমেই যায়নি, দুদিনের মধ্যেই আকাশ ঝলমল করে রোদও উঠেছে। একটানা বৃষ্টিতে পানি যতটা বেড়েছিল এই দু'দিনে তার সামান্য খানিকটা আবার নেমেও গেছে। ফজু ব্যাপারী মচকানো হাত নিয়েই আজ ভোরবেলা খাল পাড় এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই তার চক্ষু হঠাৎ আটকে গেল সে সেইদিন গাছ থেকে যেখানে পড়েছিল ঠিক সেইখানে। টানা বৃষ্টিতে খালের পাড় ধ্বসে গেছে। সেই ধ্বসে যাওয়া অংশ এতদিন পানিতে ডুবেছিল। দুদিনের টানা রোদে জায়গাটা আজ আবার সামান্য জেগে উঠেছে। সেই জেগে ওঠা জায়গায় কালচে রূপালি রঙের কিছু একটা ঝিলিক মারছে! ফজু কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ভোঁ-দৌড়ে নেমে এলো ঢাল বেয়ে। একখানা কলসি! কলসির তিনভাগের দুইভাগ বের হয়ে আছে। বাকি একভাগ

www.boighar.com

এখনো মাটির ভেতর। সেই কলসি দেখে ফজু নড়তে ভুলে গেল। তার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, এই কলসিখানাই কি সেই কলসি? যেই কলসির কথা সে জনমভর শুনে এসেছে!

এদিক-সেদিক তাকিয়ে হঠাৎ টুপ করে খালের পানিতে নেমে গেল ফজু ব্যাপারী। খানিক সাঁতার কেটে সে পৌঁছে গেল কলসিটার কাছে। কলসির বেশিরভাগ অংশই মাটির ভেতর থেকে বের হয়ে আছে। পুরু চামড়ার বন্ধনি দিয়ে শক্ত করে কলসির মুখ বাঁধা। কত আগের কলসি কে জানে! চামড়ার বন্ধনিটুকু এখানে সেখানে ক্ষয়ে গেছে, রঙ চটে গেছে। ফজু ডান হাতে কলসির মুখটা চেপে ধরে আলতো করে বার দুয়েক টানল। কিন্তু কলসি নড়ল না। ফজুর ধারণা ছিল, হালকা টানতেই কলসিখানা মাটির ভেতর থেকে বের হয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা ঘটল্যো উল্টো। অনেক চেষ্টা করেও সে কলসিটা মাটির ভেতর থেকে টেনে বের করতে পারল না। ফজুর সমস্যা হচ্ছে তার বাঁ হাত। গাছ থেকে সেদিন পড়ে বাঁ হাত মচকে যাওয়ায় ফজুকে এখন কাজ করতে হচ্ছে এক হাতে। কিন্তু একহাতে সে মোটেই সুবিধা করতে পারছে না।

ফজুর প্রবল দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সে কি গিয়ে বাড়ি থেকে কোদাল বা শাবল জাতীয় কিছু নিয়ে আসবে? নাকি তার স্ত্রী সালেহাকে ডাকবে! অবশ্য এতদূর থেকে ডাকলেও সালেহা শুনতে পাবে না। তার চেয়ে ভালো সে যদি বাড়ি গিয়ে শাবল বা কোদাল কিছু নিয়ে আসে। কিন্তু তাতেও ফজুর মন সায় দিচ্ছে না। তার কেবল মনে হচ্ছে, এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল! যদিও আশেপাশে কেউ নেই। তারপরও বিপদের তো হাত-পা নেই। দেখা গেল খালের উল্টো পাশের ওই ঘন নলখাগড়ার ঝোঁপ থেকে কেউ বের হয়ে এলো। কোনো গাছের উঁচু ডাল থেকেও কেউ ঠারে-ঠুরে চোখ রেখে থাকতে পারে। এইসব ভেবে ফজুর ভারি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সাথে প্রবল অস্বস্তিও। যদিও এই ভোর বেলা কারোরই আশেপাশে থাকার কথা না। কিন্তু ফজু সেসব ভেবেও কোনোভাবেই নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছে না। তার বুকের ভেতরটা কেমন আনচান করছে।

কলসিটাকে যতটা সম্ভব পিঠ দিয়ে ঢেকে রেখে দীর্ঘ সময় কোমড় অবধি পানিতে ভেসে রইল ফজু। এই পুরোটা সময় সে তীক্ষ্ণ চোখে বোঝার চেষ্টা করেছে আশেপাশে কেউ রয়েছে কিনা! কিন্তু চারধার নিশ্চুপ। কোথাও একটা পাতার পরার শব্দ অবধিও নেই। ফজু তারপরও আরো কিছু সময় ঘাপটি মেরে বসে থেকে তারপর উঠল। চোখের পলকে দম বন্ধ করে সে দৌড়ে বাড়ি পৌঁছাল। সমস্যা হচ্ছে বাড়িতে গিয়ে সে শাবল বা কোদাল কোনোটাই খুঁজে পেল না। গোয়াল ঘরে রোজ সকালে গরুর গোবর ফেলার একটা ভাঙা কোদাল থাকে, সেই কোদালও কোথাও খুঁজে পেল না ফজু। চিৎকার করে সে তার বউ সালেহাকে ডাকল। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সালেহাও বাড়ির কোথাও নেই। না

রান্নাঘরে, না ঘরের পেছনের উঠানে। কোথাও না। ফজুর কেমন শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। বুকের ভেতর ঢোলের বাড়ির মতো ধমধম শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ রান্নাঘরের পাটখড়ির বেড়ার সাথে ঝোলানো কাস্তেখানা চোখে পড়ল তার। সেই কাস্তেখানা তুলে নিয়েই ফজু আবার একদৌড়ে খালপাড় ফিরে এলো। কিন্তু খালপাড় এসেই তার মনে হলো, এক্ষুণি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে! বুকের ভেতর থেকে কলিজাটা এখনই ছিটকে বেরিয়ে আসবে!

একখানা ডিঙি নাও আসছে উত্তর দিক থেকে। সেই ডিঙি নাওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে লগিতে নাও ঠেলছে ফতেহপুরের চেয়ারম্যান খবির খাঁর ছেলে মনির। এত দূর থেকে দেখেও মনিরকে চিনতে ভুল হলো না ফজুর। কিন্তু নাওয়ে আরো কেউ একজন আছে। সে নাওয়ের পাটাতনে ঝুঁকে বসে রয়েছে বলে তাকে স্পষ্ট চিনতে পারল না ফজু ব্যাপারী।

ফজু ব্যাপারী হন্তদন্ত হয়ে ঢাল বেয়ে নেমে এলো খালের পানিতে। সে চকিতে তাকিয়ে দেখল, নাহ্, কলসিখানা এখনও ঠিকঠাক আগের জায়গাতেই আছে। কিন্তু তার ভয় মনিরকে নিয়ে। মনির নাও বেয়ে এই দিকেই আসছে। সে যদি কলসিখানা দেখে ফেলে তা হলে আর নিস্তার নেই। অর্ধেক পানিতে ডুবেও ফজু ব্যাপারীর কপালের দুই পাশ বেয়ে দরদর করে ঘাম নামতে লাগল। কী করবে সে এখন?

মনির নাও বেয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে। তার লগির আঘাতে পানিতে তরঙ্গ তৈরি হয়েছে। সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে খালের দু'পাশে সারি সারি লম্বা ঘাসের ঝোঁপের ভেতর। লম্বা ঘাসগুলো ঢেউয়ের তালে তালে কেঁপে উঠছে। সেই কেঁপে কেঁপে ওঠা ঘাসগুলো দেখেই ফজু ব্যাপারীর মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে কলসিটা থেকে হাতখানেক দূরের জলা থেকে ঘ্যাচঘ্যাচ করে কয়েক মুঠো ঘাস কেটে ফেলল। তার মচকে যাওয়া বাঁ হাতখানাতে প্রচণ্ড ব্যথা। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই ব্যথা পাত্তা দিতে চায় না সে। আরো কয়েক মুঠো ঘাস কেটে ঘাসগুলো সে ছড়িয়ে দিলো কলসির ওপরে। পুরোপুরি না হলেও কলসিখানা অনেকটাই ঢেকে রাখা গেছে। এবার মন দিয়ে আরো ঘাস কাটতে শুরু করল ফজু ব্যাপারী।

মনির পৌঁছাল তার প্রায় সাথে সাথেই। সে ফজু ব্যাপারীকে দেখে হাঁক ছেড়ে বলল, 'কী ফজলু কাকা? এই বেয়ান বেলা খালের মধ্যে ঘাস কাটেন কোন দুঃখে?'

ফজু ব্যাপারী বলল, 'গরু দুইটারে যে চরাইতে কোনখানে নিব, সেই উপায় কি আর আছেরে মনির? ঘাসের জমি তো সব ডুইব্যাই সারা।'

মনির বলল, 'তয় কাকা, পানির ঘাস তো গরুতে খাইতে চায় না। গরু খায় শুকনা মাঠের ঘাস।'

www.boighar.com

ফজু ব্যাপারী শীতে ঠোঁট ফাটা মানুষের মতো হেসে বলল, 'মোটে চুলায় রান্ধন জোটে না, আবার পান্তা না গরম? আরে ব্যাডা, গরু মরতে আছে না খাইয়া। এখন ভিজা আর শুকনা ঘাস কি রে? যা দিব তাই খাইব।'

মনির বলল, 'তয় খেয়াল কইরা কাকা। এই কাঁচা ঘাস খাইয়া না আবার গরুর পেট নাইমা যায়!'

ফজু ব্যাপারী বলল, 'তোর খালি অলক্ষইন্যা কথারে মনির। তা এইখানে এই বেয়ান বেলা কী কামে আইছস?'

মনির বলল, 'আপনের বাড়ির পাশের এইখানে খালে এইবার বাইল্যা মাছ পড়ছে ভালো। ইচা মাছেরও দেখি খুব ঝনঝনানি। এইজন্য এইহানে দুইখান বড় চাঁই পাতছিলাম কাইল রাইতে। এহন আইছি উঠাইতে। দেখি ইছা, বাইল্যা কিছু ধরা পড়ল কিনা!'

ফজু ব্যাপারীর বুকখানি আবার ধক করে উঠল, আজ না দম বন্ধ হয়েই সে মারা যায়! মনির নাওখানা থামাল ফজু ব্যাপারীর ঠিক উল্টোদিকে নলখাগড়ার ঝোঁপের ভেতর। লম্বা বাঁশের লগিখানা খালের তলদেশের নরম কাদামাটিতে পুঁতে তার সাথে বেঁধে দিলো ডিঙি নাওখানা। ফজু ব্যাপারী এতক্ষণ চিনতে না পারলেও এবার চিনতে পারল, নাওয়ের মাঝখানে যে বসে রয়েছে, সে নয়ন। খাঁ-বাড়ির নাতি। এই ছোট ডিঙি নাওয়ে বসে থেকে তার অভ্যাস নেই বলেই সে নাওয়ের মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে বসে রয়েছে।

ফজু ব্যাপারী নয়নকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কী ভাইগ্না, আছেন কেমন? আপনের শরীল এহন ভালো?'

নয়ন মাথা ঝাকালো, 'জ্বী ভালো।'

ফজু ব্যাপারী বলল, 'আপনের মায় কেমন আছে? বহু দিন তারে দেহি না। সে আর আমি কিন্তু এক বয়সী। বুঝছেন ভাইগ্না? কিন্তু আমরা থাকি গাঁও-গ্রামে। খাটাখাটনিতে আমাগো শরীল যায় বুড়া হইয়া। বোঝলেন? এইজন্য আমাগো দেখতে বয়স লাগে বেশি।'

নয়ন বলল, 'না না। আপনাকে দেখে তেমন বয়স মনে হয় না।'

ফজু ব্যাপারী নয়নের কথা শুনে ফ্যা ফ্যা করে হাসল। তারপর বলল, 'মাছ ধরা দেখতে আইছেন?'

নয়ন বলল, 'হ্যাঁ'।

ফজু ব্যাপারী বলল, 'দেহেন দেহেন। শহরে থাইক্যা তো গ্রামের এইসকল জিনিস দেখন যায় না। মন ভইরা দেহেন।'

নয়ন জবাব দিলো না। তবে মৃদু হাসল। সে তাকিয়ে আছে মনিরের দিকে। মনির গামছা পরে পানিতে নেমে গেল। ফজু ব্যাপারী আবারো বলল,

'তা ভাইগ্না, আপনে আইছেন তো মেলা দিন। শুনছি আপনে ঢাকায় বড় ডাক্তার, তা এতদিন যে থাকতেছেন, কোনো অসুবিধা হইব না?'

নয়ন হাসল। বলল, 'ভাবছি এইখানেই ডাক্তারি শুরু করে দিব'।

ফজু ব্যাপারীও হাসল। বলল, 'শোনেন ভাইগ্না। গ্রামের মানুষ যহন শহরে যায়, তহন চাইরপাশের যা দেহে, তাই-ই তাদের কাছে মনে হয় কী সুন্দর! কী সুন্দর! মনে হয় সারাটা জীবন এই শহরেই কাটাই দিব। আবার শহরের মানুষ যহন গ্রামে আসে, তারাও ভাবে সারাটা জীবন গ্রামে কাটাই দিব। কী সুন্দর গ্রাম! সবকিছুই তাদের ভালো লাগে। কিন্তু ওই শুরুরে শুরুরে আষ্ট দিন। বোঝলেন বাজান, আষ্ট দিন। তারপর যে যার জায়গায় যাওনের লইগ্যা মাছের মতো তড়পায়।'

নয়ন এবারও হাসল। ফজু ব্যাপারীকে তার পছন্দ হয়েছে। লোকটার কথা বলার ধরন ভালো। শুনতে ভালো লাগে। সে বলল, 'আপনি কথা ঠিক বলেছেন। আমারও ঢাকায় যাওয়ার জন্য অস্থির লাগছে।'

মনির গামছা পরে পানিতে নেমেছে। দুই হাতে ঢেউ তুলে পানিতে ভেসে যাওয়া কচুরিপানা সরাল। তারপর ঝুপ শব্দে ডুব দিলো। নয়নকে অবাক করে দিয়ে মনির দীর্ঘ সময় ডুবে থাকল পানিতে। সে যখন উঠল তখন তার হাতে বিশাল আকারের একখানা বাঁশের চাঁই। চাঁইভর্তি খলবল করছে বেলে আর চিংড়ি মাছ। মাছ ধরার এ এক অদ্ভুত গ্রাম্য যন্ত্র। এই যন্ত্রে মাছ খুব সহজেই ঢুকতে পারে কিন্তু একবার ঢুকে গেলে আর বের হতে পারে না। নয়ন অবশ্য জানে না, এই যন্ত্রেরর নাম চাঁই হয়েছে কেন!

মনির দাঁত বের করে হাসল, 'দেখলেন ম্যাভাই, পুরা খালের কোনো জায়গায় মাছের গন্ধ পর্যন্ত নাই, আর এইহানে এক্কেবারে মাছের খনি।'

নয়নও মৃদু হাসল। সে বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু এত মাছ কে খাবেরে মনির?'

মনির এই প্রশ্নের জবাব দিলো না। চাঁইয়ের ভেতর কলকল করতে থাকা মাছের দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার জগতে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর নেই। সে চাঁই নিয়ে নাওয়ের কাছে আসলো। তারপর চাঁইয়ের মুখ খুলে মাছগুলো ঢেলে দিলো নাওয়ের খোলে। ছটছট শব্দে মাছগুলো লাফিয়ে পড়ছে নাওয়ের দুইপাশের পাটাতনের মাঝখানের সামান্য জলভর্তি খোলের ভেতর। www.boighar.com ফজু ব্যাপারী সেই দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর মাছের ভাগ্যখান খুব ভালোরে মনির। এই যে এইহানে আমার ঘরের লগের জায়গায় এত মাছ, কিন্তু দ্যাখ, আমি কিচ্ছু জানি না।'

মনির হাসল। বলল, 'যার যা জাননের দরকার সে সেইটাই জানব কাকা। কিন্তু তুমি বেয়ান বেলা কলসি লইয়া ঘাস কাটতে আইছ কেন?'

www.boighar.com

ফজু ব্যাপারীর বুকটা মুহূর্তে ধক করে উঠল। কেউ যেন ধারালো নখের তীক্ষ্ণ থাবায় খপ করে তার কলিজা ধরে টান দিলো। সে সাথে সাথে জবাব দিতে পারল না। মনির বলল, 'চাচীজান কি আইজকাল আপনেরে দিয়া পানিও নেওয়ায় নাকি কাকা?'

ফজু ব্যাপারী ঠিক বুঝতে পারছে না আজ সকাল থেকে তার সাথে কি ঘটছে। মনির কি কলসির বিষয়ে কিছু বুঝতে পেরেছে? নাকি না বুঝেই বলেছে? সে আঁড় চোখে কলসিটা খানিক দেখে নিল। দুই দফা ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়ার পরও কলসির অবয়ব সামান্য বোঝা যাচ্ছে। কিছু ঘাস পিতলের ওপর থেকে পিছলে সরে গেছে। সেই ফাঁকে কালচে রূপালি কলসির পেটের দিকের কিছুটা চোখে পড়ছে। ফজু ব্যাপারী দ্বিধান্বিত হলেও গলায় খানিকটা জোর ঢেলে বলল, 'তোর চাচীর বাতের ব্যথাডা আইজকাল বাড়ছে। কাজ-কাম করতে পারে না। গরুর ঘর থেইকা শুরু কইরা রান্ধনের পানি পর্যন্ত সব আমারই করা লাগে।'

মনির তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, 'এই কাজ আপনে এমনে এমনেই করেন ফজু কাকা। আপনের বউ ডরানি নাম কি আর এমনে এমনে হইছে?'

ফজু ব্যাপারী বলল, 'বিয়া-শাদি তো করস নাই। বিয়া-শাদি কর। সুন্দরবনের বাঘও বিলাইর মতো ম্যাও ম্যাও শুরু করে।'

মনির মাছ ঢালা শেষ করে চাঁইখানা হাতে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল। ডুব দেওয়ার আগে সে ফজু ব্যাপারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তৈয়ব উদ্দিন খাঁর নাতী আমরা ফজু কাকা। ভুইলা গেলে চলব কেমনে? খাঁ-বাড়ির পোলা।'

মনির কথা শেষ করে কেমন রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল। তারপর আবার বলল, 'তৈয়ব উদ্দিন খাঁ লোক হিসাবে কেমন এইটা আর কেউ না জানলেও আপনের তো জাননের কথা কাকা। 'আপনে তো বজলু ব্যাপারীরই পোলা। আপনে ভুইলা গেলে হইব? মনে রাখতে হইব না? আমাগো শরীলে তার রক্ত।'

ফজু ব্যাপারী কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই মনির আবারো ঝুপ শব্দে ডুবে গেল পানির তলায়। নয়ন এতক্ষণ কথা বলেনি। সে নাওয়ের খোলের ভেতর বৃষ্টির ফোঁটার মতো ফুটতে থাকা মাছের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু মনিরের কথাখানি খট করে তার কানে বিঁধে গেল, 'আপনে তো বজলু ব্যাপারীরই পোলা।'

এই ফজু ব্যাপারীই তাহলে বজলু ব্যাপারীর ছেলে। যাকে ভুল করে আব্দুল ফকির ভেবে খুন করেছিল তার নানা তৈয়ব উদ্দিন খাঁ! বাকিটা সময় নয়ন আর কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারল না। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফজু ব্যাপারীর দিকে। ফজু ব্যাপারী তখন একমনে ঘাস কেটে যাচ্ছে। সে ঘাস কেটে স্তূপ করে রাখছে তার পাশেই। নয়নের খুব ইচ্ছে করছিল ফজু ব্যাপারীর

সাথে কথা বলতে। কিন্তু কী ভেবে সে আর কথা বলল না। কথা বলল না ফজু ব্যাপারীও। যেন মনিরের শেষ কথাগুলো তাকে মুহূর্তের মধ্যে জগতের আর সকল ভাবনা থেকে স্তব্ধ করেছে। মনির অবশ্য এসব কিছু খেয়াল করল না। সে মাথা মুছতে মুছতে নাওয়ে উঠল। লগিখানা টেনে তুলে নাও ছাড়ল।

ফজু ব্যাপারী বাড়ি ফিরল তারও খানিক পর। সালেহা তখনও ঘরে ফেরেনি। সে ঘরে ফিরে কলসিখানা চৌকির তলায় অবহেলা ভরে রেখে দিলো। এতক্ষণ যে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে সে কলসিখানার জন্য উন্মুখ হয়েছিল, সেই উত্তেজনা যেন অনেকটাই মিইয়ে গেছে। সে এই অবেলায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। তার পা-ভর্তি কাদা। শরীর পানিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। কিন্তু সেসবের কিছুই তার মাথায় নেই। তার চোখে তখন ভাসছে আজ থেকে প্রায় বছর পঁচিশেক আগের এক তুমুল বর্ষার থৈ থৈ দিন। সেই থৈ থৈ বর্ষায় তার বাবা বজলু ব্যাপারীর দেহবিহীন মাথাখানা পড়ে ছিল নদীর ধারে বটতলায় একখানা হোগলা পাতার মাদুরের ওপর। সেই মাথা ঘিরে মাছি ভন ভন করছে। বোকাসোকা কিসিমের কিশোর ফজু গভীর আগ্রহ নিয়ে বাবার কাটা মাথার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা বড় মাছি টুপ করে বাবার মুখের ভেতর ঢুকে গেল। ফজু প্রবল দুশ্চিন্তা নিয়ে তাকিয়ে আছে সেই মুখের দিকে, মাছিটা বের হতে পারবে তো! নাকি মাছিসহ তার বাবার মাথা কবর দিয়ে দেয়া হবে?

তার বাবার শরীর রয়ে গেছে হোসনাবাদে আব্দুল ফকিরের বাড়িতে। সেই মুণ্ডুবিহীন শরীর আনতে দলবল নিয়ে হোসনাবাদ গেছে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ডান হাত হায়দার আলী। থানা-পুলিশ জানাজানি হওয়ার আগেই এই মাথা কবর দিতে হবে। কিন্তু কবর দেয়ার আগে মাথার সাথে শরীর দরকার। তারা গেছে সেই শরীর আনতে। পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরের তার বাবার এমন নৃশংস মৃত্যু না বোঝার কথা নয়। তার চিৎকার করে কাঁদার কথা। একটি মানুষের শরীরবিহীন মাথা দেখে আতঙ্কে মূর্ছা যাওয়ার কথা। কিন্তু সে তার কিছুই করল না। সেই দিন ফজুর কিছু একটা হয়েছিল। সে সেই সারাটা দিন নদীর ধারে বসে রইল। একফোঁটা কাঁদল না অবধি। কিন্তু সেখান থেকে কেউ তাকে এক মুহূর্তের জন্য সরাতেও পারল না।

একের পর এক চোখের সামনে এইসব ভেসে উঠছিল ফজু ব্যাপারীর। তার মধ্যেই খানিক তন্দ্রামতো লেগে এসেছিল। কিন্তু সালেহার ডাকাডাকিতে তন্দ্রা ভাঙল তার। অবেলায় কাদাপানি মেখে বিছানায় শুয়ে থাকার কারণে সালেহা তার স্বরে একচোট গালমন্দও করল। কিন্তু ফজুর টকটকে লাল চোখ দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। আরো ভয় পেলো ফজু যখন হড়বড় করে বমি করে ফেলল। রাত নামতে না নামতেই ফজুর শরীর কাঁপিয়ে জ্বর নামল। সেই জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করল সে। আতঙ্কিত সালেহা স্বামীর মাথায় পানি

www.boighar.com

ঢালতে গিয়ে আবিষ্কার করল চৌকির তলায় একখানা কলস। সেই কলসিখানার মুখ বাঁধা। সালেহার মাথায় তখন কোনো চিন্তাই কাজ করছিল না। সে সেই কলসি টেনে নিতে গিয়ে দেখল কলসিখানা অসম্ভব ভারী। কলসির মুখ যখন সে খুলল, তখন তার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল একখানা সোনার হার। সে হারখানা বের করল। এই জীবনে এমন একখানা সোনার হার পরার সৌভাগ্য তার কস্মিনকালেও হয়নি। সে কলসিখানা মেঝেতে উপুড় করে ধরল। ভেতর থেকে ঝনঝন করে বের হতে থাকল একের পর এক গহনা। মাঝরাতের সেই গভীর নৈঃশব্দ্যে, অসুস্থ স্বামীকে পাশে নিয়ে সালেহা ঘোরগ্রস্তের মতো বসে রইল। তার সামনে স্তূপ হয়ে পড়ে রয়েছে এক কলসি সোনার গহনা!

পারুলের জ্বর সেরেছে সাত দিন বাদে। এই সাতদিনে তার চোখ বসে গেছে। গাল ভেঙে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মন খারাপ ভাব খুব বেশিক্ষণ থাকেনি। বরং কিছুক্ষণ বাদেই তার মন ভালো হতে শুরু করেছে। চোখের নিচে কালি পড়ে গেলেও নিজেকে তার সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল তার চোখ মুখ জুড়ে একটা মায়া মায়া ভাব চলে এসেছে। যেন চোখভর্তি করে সে কাজল পরেছে। এ ক'দিনে সে খানিক শুকিয়েছেও। এই শুকিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। এমন কয়েকবার জ্বর হলে বিষয়টা তো মন্দ হয় না! শরীর দুর্বল হলেও পারুলের নিজেকে কেমন পাখির পালকের মতো ফুরফুরে লাগতে লাগল। সে দুপুরের আগে আগে সময় নিয়ে গোসল করল। এই সময়টা জ্বরজারির সময়। চারধারে সকলেরই জ্বর ঠান্ডা লেগেই আছে। ক'দিন আগেই তাবারন ভয়াবহ জ্বর থেকে উঠেছে। সে এসে পারুলকে বার দুই ডেকেও গিয়েছিল, কিন্তু পারুল তখনই পুকুর থেকে উঠল না। সে উঠল আরো কিছু সময় পর। তারপর যত্ন করে মাথা মুছল। চুল আঁচড়ালো। কপালে টিপ দিলো। পাটভাঙা কমলা রঙের একখানা শাড়ি পরল। তারপর আয়নার সামনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল এবং নিজেকে দেখে তার মন ভালো হয়ে গেল। সে গুনগুন করে গানও গাইল কিছুক্ষণ। যদিও দুপুরে খেতে গিয়ে সবকিছুই ভারি বিস্বাদ লাগল পারুলের। কিছুই খেতে পারল না সে। তার কেবল মনে হচ্ছিল দু'খানা ঝাঁঝালো মরিচ আর কাঁচা আমের খানিক টক ডাল হলে সে পেটপুরে ভাত খেতে পারত। মুখটা কেমন টক-ঝাল তেষ্টায় মুখিয়ে আছে। কিন্তু এই অসময়ে কাঁচা আম সে কই পাবে? অবশ্য চালতা হলেও মন্দ হতো না। ডালের ভেতর নুন-মরিচে সেদ্ধ হওয়া দু'ফালি চালতা পাতে পেলে হয়তো আশ মিটিয়ে ভাত খাওয়া যেত।

পুকুর ধারের বাগানে একখানা চালতা গাছ রয়েছে। যদিও সেটাতে অনেকদিন আর চালতা ধরে না। কালেভদ্রে যাও দুয়েকখানা দেখা যায়, তাও

www.boighar.com

পোকামাকড়ে ভর্তি। পারুল তারপরও ঘর থেকে বেরুল। বাইরে মেঘ-রোদের খেলা। ফুরফুর করে মৃদু হাওয়াও বইছে। পারুল ধীর পায়ে হেঁটে পুকুর পারে চলে এলো। উত্তর দিকের ঢিবির উপর সামান্য কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কদম গাছ। গাছভর্তি শুভ্র-হলুদ কদম ফুল। সেই কদম ফুল দেখে পারুল মুগ্ধ হয়ে গেল। বিষয়টা এমন না যে সে আজই প্রথম কদম ফুল দেখছে, কিন্তু আজ কোনো কারণে সবকিছুতেই সে মুগ্ধ হচ্ছে। এমন হয়, প্রকৃতি কখনো কখনো মানুষকে প্রবল মুগ্ধতাভাবে আচ্ছন্ন করে। সে যা দেখে, তাই তাকে মুগ্ধতায় ডুবিয়ে রাখে। আবার কখনো কখনো তাকে করে তোলে জগৎ সংসারের প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত। সে যা দেখে, তাই তাকে করে ফেলে চূড়ান্ত বিরক্ত। পারুলের আজ মুগ্ধ হবার সময়। সে যা দেখছে তাতেই সে মুগ্ধ হচ্ছে।

টানা বর্ষায় পুকুরের ঢিবি ছুঁইছুঁই হয়ে উঠে এসেছে বিলের পানি। সেখানে কচি ধানের সবুজ ডগা ফুরফুরে হাওয়ায় কাঁপছে। একটা মাছরাঙা ঝপ করে পানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে ফুড়ুৎ উড়ে গেল। তার ঠোঁট ডোবানো জলে ঢেউয়ের ছোট্ট বৃত্ত তৈরি হয়েছে। বৃত্তটা ক্রমশই ছাড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। কাছেই কোথাও বউ কথা কও ডাকছে। একটা কাঠঠোকরাও ঠুক ঠুক শব্দে কাঠ ঠুকছে। বাঁশের পাতায় শিস কেটে যাচ্ছে হাওয়া। কী শান্ত, স্নিগ্ধ সময়! পারুল ক্রমশই অবাক মুগ্ধতায় ডুবে যাচ্ছিল।

পারুলের মুগ্ধতায় ছেদ টানল জুলফিকার। পারুল টেরও পায়নি সে কখন তার পিছে এসে দাঁড়িয়েছে। জুলফিকার বার দুই গলা খাকড়ি দিয়ে পারুলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'তুমি এইহানে পারুল? আর তোমারে আমি সারা বাড়ি খুঁইজা পেরেশান!'

পারুল ঝট করে মুখ তুলে তাকাল। এই মানুষটাকে দেখলেই রাগে তার গা ঝিমঝিম করে। তার মনে হচ্ছিল সে জুলফিকারকে কড়া গলায় কিছু বলে। কিন্তু সে কিছুই বলল না। এই চমৎকার সময় আর অনুভূতিটা তার নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না।

জুলফিকার বলল, 'তুমি নাকি ভাত খাও নাই? কাকুজান বড় পেরেশানিতে আছেন। তিনি আমারে বলছেন তোমার খোঁজ-খবর নিতে। এতদিনের জ্বর, এহন প্যাট ভইরা ভাত না খাইলে কি চলব? শরীলের কী অবস্থা দেখছ?'

পারুল কঠিন গলায় বলল, 'বুঝি নাই?'

জুলফিকার বলল, 'কী সোন্দর শরীল স্বাস্থ্য আছিল তোমার। এই কয়দিনের জ্বরে পাটকাঠির লাহান হইয়া গেছো। ব্লাউজ পরছ, সেই ব্লাউজ হইছে ঢিলা। মনে হইতেছে তোমার মাপের না, অন্য কারো ব্লাউজ পরছ। এইজন্য ব্লাউজ হইছে ঢলঢলা।'

পারুলের হঠাৎ কী হলো! সে চট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর দুই কদম আগে বেড়ে বলল, 'আপনে আমার ব্লাউজের মাপ নিতে আইছেন? কোন সাইজের ব্লাউজ আমি পরি, এইটা জানন খুব দরকার আপনের? কী, ব্লাউজ খুলব? ব্লাউজ খুইলা আপনেরে আমি ব্লাউজের মাপ দিব?'

জুলফিকার পারুলের উত্তর শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। সে পারুলকে পছন্দ করে। বেশ ভালোই পছন্দ করে। কিন্তু এই মেয়েকে সে কখনোই বুঝে উঠতে পারে না। সে কখন কোন মেজাজে থাকে সেটা বোঝা বড় মুশকিল। তার এই আগুন তো, এই পানি অবস্থা! সে মিনমিন করে বলল, 'ছি ছি, তুমি এইটা কী বললা পারুল! এই কথা মাইনষে শুনলে কী বলব?'

পারুল বলল, 'আহারে আমার লজ্জাবতী লতা। শরমে একেবারে চোখমুখ টকটকা লাল হইয়া গেছে, না? মাইনষেরে খুব ডর? আব্বারে বলব? আমি গোসলে আইলে যে আপনে নানান ছুতায় পুস্কুনির ঘাটে আসেন? কে জানে, কোনো গাছের, ঝোঁপঝাড়ের ফাঁকফোকড়ে লুকাইয়া থাকেন কিনা? বলব আব্বারে?'

জুলফিকারের মাথা কাজ করছে না। সে এমন কী করেছে, কী বলেছে যে পারুল এমন ক্ষেপে গেল? জুলফিকারের চুলের গোড়া বেয়ে দরদর করে ঘাম নামছে। এই এক অদ্ভুত ব্যাপার! জগতের আর সকলের কাছে সে শক্ত সমর্থ বুদ্ধিমান মানুষ। ভরা মজলিশেও সে নানান কথাবার্তা ফটফট করে বলে ফেলতে পারে। কিন্তু এই একরত্তি মেয়ের কাছে আসলেই তার জিভ জড়িয়ে যায়, গলা শুকিয়ে যায়, কথা এলোমেলো হয়ে যায়।

পারুল বলল, 'চলেন আব্বার কাছে যাই। আব্বার কাছে গিয়া বলি আপনে আমার ব্লাউজের মাপ চাইছেন।'

জুলফিকার ঝপ করে পারুলের পায়ের কাছে বসে পড়ল। তারপর দু'হাতে পারুলের পা জড়িয়ে ধরে করুণ গলায় বলল, 'আমি দোষ মনে কিছু বলি নাই পারুল। তারপরও আমার ভুল হইয়া গেছে, আমারে তুমি মাফ কইরা দাও।'

পারুল নির্বিকার গলায় বলল, 'আপনে জোয়ান পুরুষ পোলা। সেয়ানা মাইয়ার ব্লাউজের মাপ খোঁজবেন, এইটাই তো স্বভাবিক ঘটনা। এতে দোষের কি আছে? চলেন আব্বার কাছে যাই।'

জুলফিকার এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কাকুজান আমারে আস্তা রাখব না পারুল। আমারে সে জ্যাতা মাটিতে পুইত্যা ফালাইব।'

পারুল বলল, 'ভালোই তো। তারপর আপনের শেকড় বাকড় গজাইব। আমার আব্বা বিশাল পীর ফকির মানুষ। দেখা গেল তার কেরামতিতে আপনার গাছে ফল পাকড় ধরতে থাকল।'

www.boighar.com

জুলফিকার অসহায় চোখে পারুলের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। পারুলের মুখ অবশ্য ভাবলেশহীন। সে জুলফিকারকে বলল, 'চলেন। আব্বার কাছে যাই। গিয়া দেখি আপনেরে কেমনে সে জ্যাতা পুইত্যা ফালায়। জ্যাতা পুইত্যা ফেলানোর ঘটনা অনেক শুনছি। কিন্তু চোখে দেখি নাই। আইজ নিজ চোখে আরাম কইরা দেখব। খবরদার, আপনে কিন্তু তহন আবার এমনে মাইয়া মাইনষের মতো কইরা কান্দা কাটি করবেন না।'

আব্দুল ফকির বসে আছেন উঠানে। তার হাত-পায়ে তেল মালিশ করছে রতন। রতন সেদিনের সেই সাপের বীণ বাজানো কিশোর। সে তেল মালিশ করতে করতে আব্দুল ফকিরকে বলল, 'দাদাজান, আমারে আসল মন্তর শিখাইবেন না? আমার গোক্ষুর সাপ ধরনের বড় শখ।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তাড়াহুড়া করন যাইব না রে রতন। এইগুলান হইল সাধনার ব্যাপার। সাধনার বিষয়ে তাড়াহুড়া করলে সাধনা হয় না।'

রতন কথা বলল না। সে একমনে আব্দুল ফকিরের পায়ে তেল মালিশ করছে। তেল মালিশ শেষ হলেই আব্দুল ফকির গোসলে যাবেন। সাধারণত এত বেলা করে তিনি গোসল করেন না। তিনি গোসল করেন রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠেই। কিন্তু বহুবছর বাদে আজ তিনি ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারেননি। চারধারে বর্ষার পানি উঠে গেছে। এই পানির কারণেই সকলের জ্বর, ঠান্ডা, সর্দি লাগছে। গোসলের আগে তাই সারা শরীর জুড়ে খানিক সরিষা তেলের মালিশ খুব উপকারি। ঠান্ডাটা জেঁকে ধরতে পারে না।

আব্দুল ফকির পারুলকে দেখে বললেন, 'মারে তাব্যরন বলল, দুপুরেও নাকি ভাত খাও নাই? নিজের মুখের দিকে চাইয়া দেখছ? কী সোনার বরন মুখখান কী হইছে?'

পারুল হাসল। বলল, 'আব্বা, জ্বর হইছে। জ্বর তো আর এমনে এমনে যাইব না। যাওনের আগে তার ক্ষমতা একটু আধটু না দেখাইয়া গেলে কেমনে হইব?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'কথা সত্য। তয় মা, এই জন্যই তো একটু খানা-খাদ্য খাইতে হইব। শরীলের যত্ন করতে হইব।'

পারুল বলল, 'যার মা নাই, তার আবার যত্ন-আত্তি কী আব্বা?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তোমার মা নাই কে বলল?'

পারুল আবারো হাসল। তারপর বলল, 'আপনের কি ধারণা, আমার মা আছে?'

আব্দুল ফকির বুঝতে পারছেন, পারুলের মনে কিছু একটা চলছে। কিন্তু কী চলছে তা তিনি ধরতে পারছেন না। তবে পারুল যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে

এসেছে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তিনি বললেন, 'তোমার মা আল্লাহর রহমতে সুস্থ হইয়া যাইব। তার আগে তোমারও তো সুস্থ থাকতে হইব মা। তুমি সুস্থ না থাকলে তোমার মা'র যত্ন করব কে?'

পারুল এই বিষয়ে কোনো কথা বলল না। সে খানিক সরে গিয়ে জুলফিকারের পাশে দাঁড়াল। জুলফিকার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেও কিছুই বুঝতে পারছে না। পারুল হঠাৎ বলল, 'আপনের সাথে আমার একখান কথা আছে আব্বা। জরুরি কথা।'

আব্দুল ফকির মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠলেন। এই মেয়েকে নিয়েই তার যাবতীয় উৎকণ্ঠা। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পারুলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'বলো মা'।

পারুল বলল, 'কথাখান জুলফিকার ভাইয়ের বিষয়ে। আমি অনেকদিন থেইকাই ভাবছি কথাখান আপনেরে বলন দরকার। কিন্তু আপনে আবার কিনা কি মনে করেন, এই জন্য আর বলা হয় নাই। কিন্তু আজকে আর না বইলা পারতেছি না।'

জুলফিকারের হৃদস্পন্দন যেন মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল। ঘটনা শোনার পর আব্দুল ফকির কী প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, সেই কথা চিন্তা করে তার হাত-পাও অবশ হয়ে আসছে। সে শেষ চেষ্টা হিসেবে গলায় সামান্য জোর ঢেলে কিছু বলার চেষ্টা করল, 'পারুল... আমার কথাখান শোন... আমি...'

পারুল অবশ্য জুলফিকারকে কথা শেষ করতে দিলো না। সে আচমকা গলা চড়িয়ে বলল, 'আপনে চুপ থাকেন। যা বলার আমারে বলতে দেন'।

দমকা হাওয়ায় নিভে যাওয়া বাতির মতো দপ করে নিভে গেল জুলফিকার। আব্দুল ফকির অবশ্য কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি বিস্মিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন পারুলের দিকে। পারুল ধীর স্থির গলায় বলল, 'জুলফিকার ভাইর বিয়ার বয়স হইছে অনেক আগেই। তারে একখান বিয়া দেওন জরুরি আব্বা।'

পারুলের কাছ থেকে এই ধরনের কথা আব্দুল ফকির আশা করেননি। ফলে তিনি খানিক বিভ্রান্ত বোধ করছেন। যদিও তিনি তা তার মুখভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন না। কেবল মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'কেন? হঠাৎ এই কথা কেন?'

জুলফিকারের মাথা কান ঝা ঝা করছে। সে এখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে এর পরের কথাটি কী হবে! আব্দুল ফকিরের প্রশ্নের জবাবে পারুল এখন তাকে কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি তার নিজের মতো করে বানিয়ে বলবে। কিন্তু তারপর? তারপর কী হবে? জুলফিকারের চিন্তাশক্তি কাজ করছে না। সে উদ্ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এখন আর তাকে এর থেকে রক্ষা করার কেউ নেই।

www.boighar.com

পারুল বলল, 'আব্বা, আপনের ঘরে সেয়ানা মাইয়া। এই বয়সে সব বাপ মা-ই তার মাইয়ার বিয়ার জন্য ছেলে দেখে। আমার তো মা থাইকাও নাই। এখন এই দায়িত্ব তো আপনের। আমারেও তো আপনের বিয়া দিতে হইব। হইব না? আবার জুলফিকার ভাইরও বিয়ার বয়স অনেক আগেই হইয়া গেছে। তো এহন তো দুইজনেরই বিয়া দেওন দরকার। দরকার না?'

আব্দুল ফকির রীতিমতো ধাক্কা খেলেন। পারুল কি জুলফিকারকে বিয়ে করার কথা বলছে? জুলফিকারের ঘোর এখনও কাটছে না। পারুল এইসব কী বলছে! সে কি সত্যিসত্যি তাকে বিয়ে করবে? জুলফিকারের মনে হচ্ছে সে স্বপ্ন দেখছে। এই ঘটনা সত্য না। খানিক বাদেই এই স্বপ্ন তার ভেঙে যাবে। সে দেখবে সে তার ছোট্ট ঘরের ময়লা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। পারুলকে সে অসম্ভব ভালোবাসে। কিন্তু সচেতনভাবে এই কথা সে নিজেকেও কখনো বলার সাহস পায়নি। আর পারুলের আচার-আচরণেও কখনো সে এই বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পায়নি। পারুলের চেয়ে বয়সে সে ঢের বড়। তাছাড়া এই বাড়িতে সে অনেকটাই আশ্রিতের মতো। সেই ছোটবেলা থেকেই সে আব্দুল ফকিরের ফুটফরমায়েশ খাটে। আব্দুল ফকিরই তার ভালোমন্দ দেখেন। কিন্তু পারুলের সাথে বিয়ে? এটা অসম্ভব। কিন্তু পারুল এটি কী বলল? জুলফিকার তার নিজের অনুভূতি ধরতে পারছে না। ভালো-মন্দ কিছুই না। তার নিজেকে পুরোপুরি অসাড় মনে হচ্ছে।

আব্দুল ফকির চাপা গলায় বললেন, 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না মা।'

পারুল বলল, 'আমার আর জুলফিকার ভাইর বিয়ার ব্যবস্থা করেন আব্বা।'

আব্দুল ফকির এবার যেন খানিক ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি সচরাচর পারুলকে নাম ধরে ডাকেন না। কিন্তু এইবার ডাকলেন। তিনি শক্ত গলায় বললেন, 'পারুল!'

পারুল অবশ্য তার বাবার কথা গ্রাহ্য করল না। সে আবারও নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'আমাদের দুইজনের বিয়ার ব্যবস্থা করেন। আমার জন্য ছেলে দেখেন। জুলফিকার ভাইর জন্যও মাইয়া দেখেন। আমি মাইয়া মানুষ। মাইয়া মানুষ বিয়ার পর শ্বশুর বাড়ি চইলা যায়, এইটাই নিয়ম। আমিও চইলা যাব। তখন আপনে থাকবেন একলা। আর আমার মায়ও অসুস্থ। তখন তাবারন খালায় একলা সব সামলাইতে পারব না। এইজন্য একটা ভালো মাইয়া দেইখ্যা জুলফিকার ভাইরেও একখান বিয়া করাই দেন। তার বউ থাকব এই বাড়িতে। সে আর তার বউ এই দুইজনে মিল্যা ঘর সংসার সব সামলাইয়া রাখব।'

পারুল কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না। আব্দুল ফকিরের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এই মেয়েকে নিয়ে তিনি আর পারেন না। একে বোঝার সাধ্য তার

নেই। এই অতি সামান্য এক কথা বলতে গিয়ে কী ভয়াবহ পরিস্থিতিই না সে তৈরি করল! রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল সে আব্দুল ফকিরকে। তার মনের ওপর দিয়ে একটা বড়সড় ঝড়ই যেন বয়ে গেল।

জুলফিকারের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন। তার নিজেকে এখন মনে হচ্ছে ঘুমের ঘোরে বোবায় ধরা এক মানুষ। খানিক আগ থেকে একের পর এক যা ঘটছে, তার সবকিছুই সে দেখছে, শুনছে, অনুভব করছে, কিন্তু কোনো কিছুর ওপরই তার বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। সে যেন এক খেলনা। পারুল তাকে নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলছে। এই অনুভূতিটা বড় অসহায়ত্বের।

পারুল অবশ্য কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এলো। তারপর আব্দুল ফকিরের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমার জন্য গাঁও-গ্রামের ছেলে দেখবেন না আব্বা। ছেলে দেখবেন টাউনের। আমার টাউনের ছেলে বিয়া করনের খুব শখ। টাউনের ছেলে বিয়া কইরা আমি টাউনে গিয়া থাকব। এই পঁচা কাদা পানির গাঁও-গ্রাম আমার ভালো লাগে না।' www.boighar.com

আব্দুল ফকির কোনো কথা বললেন না। তিনি শূন্য চোখে পারুলের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পারুল অবশ্য কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না। আব্দুল ফকির বসে রইলেন যেমন ছিলেন তেমনই। তার সামনে পাথরের ভাস্কর্যের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হতভম্ব, বিধ্বস্ত জুলফিকার।

সেই দিন পারুল আর ঘর থেকে বেরুল না। ঘর অন্ধকার করে বসে রইল। বিকেলের দিকে আব্দুল ফকির কোথা থেকে ব্যাগভর্তি করে আমড়া নিয়ে আসলেন। সাথে ঝাল-মরিচের নুন। বাড়ির পেছনের বাগান থেকে দুখানা বড় জাম্বুরাও পারলেন। তাবারনকে বললেন সেসব কেটে পারুলকে দিতে। কিন্তু প্লেটভর্তি আমড়া নিয়ে পারুলের ঘরে গিয়ে তাবারন দেখল পারুল ঘুমিয়ে আছে। সে বারকয়েক ডাকল। কিন্তু পারুল উঠল না। এশার নামাজ শেষ করে আব্দুল ফকির ঘরে ফিরলেন। তিনি পারুলকে রাতের খাবার খেতে ডাকলেন। কিন্তু পারুলের তাতেও নড়চড় নেই। পারুল সে রাতে আর জাগলই না। সে ঘুম থেকে উঠল পরদিন ভোরে। তার পেটে তখন রাজ্যের ক্ষিদে। ঝাঁঝালো পেঁয়াজ আর শুকনো ঝাল মরিচ ডলে প্লেটভর্তি পান্তা ভাত খেয়ে ফেলল সে। ঝালে তার জিভ মুখ পুড়ে যাচ্ছিল। চোখে পানি চলে এসেছে। তারপরও পারুলের মনে হচ্ছিল বহুকাল পরে সে তৃপ্তি করে কিছু খেয়েছে। শরীরে যেন শক্তি পাচ্ছে। খানিকটা রোদ চরতে সে নুরুন্নাহারের ঘরের সামনে গেল। ঘরের দরজায় তালা নেই। তবে দরজার পাল্লা বাইরে থেকে বন্ধ। সে দরজায় কান পেতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আলতো হাতে দরজার পাল্লা খুলে সে ভেতরে ঢুকল। এই ঘরে কোনো জানালা

www.boighar.com

নেই। কোনো হারিকেন বা কেরোসিনের কুপিও নেই। তাও টিনের ঘরের ফাঁকফোকড় দিয়ে ভোরের আলো আসছে। দরজা খুলে দেওয়ায় ঝট করে যেন এক ঝলক বাড়তি আলোও ঢুকে পড়ল ঘরে। সেই আলোয় পারুল তার মায়ের মুখখানা স্পষ্ট দেখল। দরজার ঠিক উল্টোদিকের টিনের বেড়ার গা ঘেঁষে যে চৌকিখানা রাখা, তার ঠিক নিচে মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন তার মা। পরনে নোংরা তেল চিটচিটে পেটিকোট আর ব্লাউজ। চোখের কোলে শুকিয়ে যাওয়া জলের দাগ। পারুল খানিকটা সামনে এগুতেই বিদঘুটে কিছুর বোটকা গন্ধ যেন দমকা হাওয়ার মতো ভক করে এসে তার নাকে বাড়ি মারল। পারুল অবশ্য সেই গন্ধ পাত্তা দিলো না। সে ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে তার মায়ের পাশে বসল। বসেই রইল। দীর্ঘ সময়। নুরুন্নাহার ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে না তিনি এই জগৎ সংসারের কোথাও আছেন। যেন অন্য কোনো জগতে তিনি নিবিষ্ট মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তার অপাংক্তেয় শরীরখানা কেবল অনাদরে অবহেলায় পড়ে রয়েছে এই পুঁতিগন্ধময় পৃথিবীতে।

পারুল সেই সকালে জুলফিকার আর তাবারনকে ডেকে নুরুন্নাহারের ঘর পরিষ্কার করালো। বিছানায় ধোয়া চাদর পেতে দিলো। নুরুন্নাহারের কাঁথা, কাপড়-চোপড় ধুইয়ে শুকাতে দিলো রোদে। তারপর দীর্ঘ সময় নিয়ে নুরুন্নাহারকে পুকুর ঘাটে বসিয়ে গোসল করালো। নুরুন্নাহার অবশ্য এই পুরোটা সময় ছোট্ট শান্ত মেয়ের মতো বাধ্য হয়েই রইল। ঝামেলা শুরু করল দুপুরে খাবার সময়। তাকে প্লেটভর্তি ভাত দেয়া হলো। সেই ভাত সে মুখে দিলো না। প্রতিটি ভাতের দানা সে আলাদা আলাদা করে আঙুল দিয়ে নেড়ে দেখতে লাগল।

পারুল বলল, 'মা, ভাত খাও'।

নুরুন্নাহার বললেন, 'এই ছেমড়ি, তোর মা কেডা?'

পারুল বলল, 'তুমি'।

নুরুন্নাহার খিলখিল করে হাসলেন, 'আমার তো বিয়াই হয় নাই। বিয়া না হইতেই তোর মতো এতবড় মাইয়া হইল কেমনে?'

পারুল বলল, 'তোমার বিয়া না হইলে তুমি এই বাড়িতে কেন আইছ?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'ফইরসাবে কই? তারে তো দেহি না। সে কই?'

পারুল বলল, 'সে কাজে গেছে। তারে খোঁজো কেন?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'সে না থাকলে আমারে ভাত খাইতে দে'।

পারুল বলল, 'তোমার সামনেই তো প্লেটভর্তি ভাত'।

নুরুন্নাহারের হঠাৎ যেন মনে পড়ল তার সামনে প্লেটভর্তি ভাত। তিনি অনেকক্ষণ ভাতের প্লেটের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ভাতের প্লেটখানা তুলে দরজা দিয়ে বাইরের উঠানে ছুড়ে মারলেন। পারুল

হতভম্ব হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মা ভাত না খেতে চাইলেও এমন আচরণ কখনো করেননি। সে বলল, 'এইটা তুমি কী করলা?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'আমারে বিষ খাইতে দিছস? ভাতের মইধ্যে বিষ খাইতে দিছস? তাবিজও আছে দেখলাম। ভাতের নিচে ফইরসাবের পড়া তাবিজ। এইসব কইরা আমারে পাগল বানাবি? আমারে বলদ পাইছস? আমি বলদ? আমি বলদ না। হা হা হা।'

নুরুন্নাহার শরীর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। পারুল অসহায় চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। নুরুন্নাহার হাসি থামিয়ে বললেন, 'ভাত দে'।

পারুল গামলা থেকে প্লেটে ভাত বাড়তে গেল। নুরুন্নাহার আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হারামজাদী মাগি, তোরে আমি কইছি ভাত দিতে। তুই আমারে আবারো বিষ দিতেছস?'

পারুল বলল, 'ভাতই তো দিতেছি!'

নুরুন্নাহার আবারো হাসলেন। বললেন, 'আমারে বলদ মনে করস? ওই ভাতের মইধ্যে কী আছে, ওই শালুনের মইধ্যে কী আছে, আমি সব জানি। আমারে পাগল বানাবি? আমারে জানে মারবি? হা হা হা। পারবি না। পারবি না।'

পারুলের বুকের ভেতর কি যে হচ্ছে! সে নুরুন্নাহারের গা ঘেঁষে এসে বসল। তারপর বলল, 'মাগো, দুইটা ভাত তুমি খাও মা'।

নুরুন্নাহার গা ঝাড়া দিয়ে পারুলকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'আমার জন্য আবার ভাত রান। আমার সামনে বইস্যা চাউল ধুইবি। ভাত রানবি। তারপর আমি ভাত খাব।'

পারুল আর কিছু বলল না। সে নুরুন্নাহারকে সামনে বসিয়ে চাল ধুলো। ভাত বসালো চুলায়। ভাত রান্না শেষে নুরুন্নাহারকে আবার ভাত খেতে বসালো। নুরুন্নাহার বললেন, 'ভাতে শালুন দিবি না। আমি ভাত খাব শালুন ছাড়া।'

পারুল বলল, 'খালি খালি ভাত খাওন যায় মা।'

নুরুন্নাহার পারুলের কথার জবাব দিলেন না। তিনি ভাতের প্লেট টেনে নিয়ে খানিকটা নুন ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু মুখে দিতে গিয়ে কি হলো! তিনি আবারো ভাতের প্লেট ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'এই ভাত ফালাইয়া আবার ভাত দে।'

পারুল অবাক হলেও কিছু বলল না। সে আরেকটা প্লেটে ভাত দিলো মাকে। নুরুন্নাহার এবার সেই তরকারিবিহীন সাদা ভাত গপগপ করে খেতে লাগলেন। পারুল বলল, 'ভাতে একটু নুন তো ছিটাই নাও মা'।

www.boighar.com

নুরুন্নাহার ভাত মুখে নিয়েই গমগম শব্দে বললেন, 'আবার? আবারো আমারে বলদ মনে করা শুরু করছস? ওই নুন শালুনের মইধ্যে কী আছে সবই আমি জানি। সব।'

নুরুন্নাহার আর কথা বললেন না। তিনি বড় বড় নলা মুখে নিয়ে শব্দ করে নুন তরকারি ছাড়া ভাত খেতে লাগলেন। পারুল একদৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। মাকে দেখে তার মনে হচ্ছে সহস্র বছরের বুভুক্ষু এক মানুষ। এই যেন তার শেষ বেলার আহার। এরপর আর কোনোদিনও সে খেতে পাবে না। জগতের আর কোনো কিছুর প্রতি তার কোনো খেয়াল নেই। তার যাবতীয় খেয়াল ওই প্লেটে। আর প্লেটের ওপর ফুলের মতো ফুটে থাকা নুন শালুনবিহীন ধবধবে সাদা ভাতের ভেতর।

নুরুন্নাহার ভাত খাওয়া শেষে উঠলেন। বিকেলের নরম রোদে পারুল মাকে নিয়ে উঠানে পিঁড়ি পেতে বসল। সে মায়ের মাথার জট হয়ে যাওয়া চুলের জটা ছাড়িয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছে। এই সময়ে সে মায়ের সাথে নানান কথাবার্তা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু নুরুন্নাহার সেইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। তবে অবাক ব্যাপার হলো নুরুন্নাহার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন তারও কিছু পর। আছরের আজান হচ্ছিল। নুরুন্নাহার হঠাৎ স্পষ্ট গলায় বললেন, 'সেয়ানা মাইয়া হইছস। আজানের সময় মাথা উদলা ক্যা? মাথা ঢাক।'

এই বলে তিনি নিজে তার মাথা শাড়ির আঁচলে ঢাকলেন। তারপর বললেন, 'ওজুর পানি দে। নামাজ পড়ব। পরনের কাপড় নাপাক কিনা কে জানে, একখান ধোয়া কাপড় দে। আর তোর কি নামাজ আছে? নামাজ থাকলে ওঠ। কাপড় পাল্টাইয়া ওজু কইরা আয়, একসাথে মা মেয়ে নামাজ পড়ব।'

পারুল ভারি অবাক হলো। কিন্তু কিছু বলল না। সে রোদে শুকাতে দেওয়া কাপড় থেকে এনে মাকে ধোয়া শুকনো কাপড় দিলো। ওজুর পানি দিলো। তারপর মা মেয়ে মিলে আছরের নামাজ পড়ল। নামাজ শেষে পারুলের ভালো ঘরে বিয়ের জন্য দোয়া করে মোনাজাতে উচ্চস্বরে কাঁদলেন নুরুন্নাহার। তারপর তারা মা-মেয়ে হাঁটতে বেরুল। পুকুরের ধারে তখন স্নিগ্ধ বিকেল। সেখানে পুকুরের ঘাটে বসে নুরুন্নাহার মেয়েকে নানান উপদেশ পরামর্শ দিলেন। মেয়ের গায়ের রঙ ময়লা হয়েছে দেখে তিনি ভারি চিন্তিত বোধ করতে লাগলেন। পুকুর পারের বাগানে খানিকটা হলুদের চাষ হয়েছে। তিনি সেখান থেকে ক'খানা হলুদ তুলে এনে পারুলের হাতে দিতে দিতে বললেন, 'প্রত্যেক বেয়ান বেলা খালি প্যাডে এই কাঁচা হলুদ খাবি। নাওনের আগে হলুদ মুখে মাইখা বইসা থাকবি। দেখবি, মুখের রঙ হইব কাঁচা হলুদের লাহান।'

পারুল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কী সুন্দর সুস্থ মমতাময়ী এক মা তার! অথচ সেই ছোটবেলা থেকে সে নিজেকে ভেবে এসেছে ভয়াবহ দুর্ভাগা

মাতৃহীনা এক মেয়ে। নুরুন্নাহার একটানা কথা বলে যাচ্ছেন। সেইসব কথার কিছুই পারুল শুনছে কিনা তা সে জানে না। তবে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল পুরোটা বিকেল। সন্ধ্যা নামার আগে মা-মেয়ে পুকুর ঘাটে নামল। নুরুন্নাহার বললেন, 'মাগরিবের আজান হইব এখন। এতক্ষণ যা বকর বকর করলাম, ওযু থাকনের কথা না। আবার ওযু কইরা নেই।'

পারুল এবারও কোনো কথা বলল না। সে মাকে দেখছে। এই মাকে দেখার সৌভাগ্য তার খুব একটা হয়নি। এই ভর সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে কেউ নেই। জুলফিকার বেরিয়েছে তার বাবার সাথে। তাবারন গিয়েছে তার বোনের বাড়ি। বলে গেছে সন্ধ্যার মধ্যেই সে ফিরে আসবে। এই শূন্য বাড়ি একাকী সময়টুকু তাই পুরোপুরি মাকে কাছে পেতে চাইছে পারুল। ওযু শেষে তারা পুকুর ঘাট থেকে বাড়ির উঠানে ঢুকল। উঠানে রতন দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে বড় একখানা বোয়াল মাছ। সে বোয়াল মাছখানা উঠানের মাটিতে ঝপাট শব্দে ফেলে দিয়ে বলল, 'ও ফুপু, দাদাজানে মাছ পাঠাইছেন। বলছেন, এই মাছ ঝাল পেঁয়াইজ দিয়া রানতে। আপনের মোহে নাকি স্বাদ নাই? এইর লাইগ্যা এই মাছ।'

পারুল অবশ্য মাছ নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাল না। আগ্রহ দেখালেন নুরুন্নাহার। তিনি ঝাঁঝাল গলায় বললেন, 'এই ছ্যামড়া, মাছ আনছস এমনে মাটিতে ফালাই রাখছস ক্যা? যা, যা ঘর থেইকা চালন লইয়া আয়। মাছ মাটিতে রাখলে মাছের স্বাদ কইম্যা যায়। মাছ কি মাটির জিনিস নাকি ছ্যামড়া?'

রতন বাঁশের চালুনি এনে তার ওপর মাছটা রাখল। নুরুন্নাহার পারুলকে নিয়ে নামাজ শেষে উঠানে হারিকেনের আলোয় মাছ কুটতে বসলেন। মাছ কুটতে বসেও তার মুখ আর থামে না, 'শোন, একবার তোর নানায় মাছ আনছে। মাছের নাম আইড় মাছ। যেমন তেমন আইড় না, বাঘা আইড়। জাল টাইন্যা উঠাইতে গিয়া দেখে জাল প্রায় ছিড়া বাইর হইয়া যাইতেছে মাছ। সে লাফ দিয়া পইরা মাছ ধরছে শক্ত কইরা জাপটাইয়া। মাছে লেজ দিয়া বাড়ি মাইরা তোর নানার কান ফাটাই দিছে। সে তাও মাছ ছাড়ে নাই। মাছ নিয়া যহন বাড়ি ফিরল, তহন আমরা দেহি দুইহাত দিয়া সে মাছ বোহে জড়াই ধইরা রাখছে। কিন্তু তার গলা বুক ভাইসা যাইতেছে রক্তে। আহারে। তোর নানী তো দেইখ্যা এক চিক্কুর। কিন্তু বাজানে খালি হাসে। সেই মাছ রানতে রানতে ভোর রাইত হইল। আমরা তহন ঘুমে পইড়া যাইতেছি। বাজানে তো আমাগো ঘুমাইতেই দিব না। আমরা ঘুমাই আর সে টাইন্যা ধইরা জাগায়। শেষ পর্যন্ত যহন মাছ রান্ধা হইল, তহন আর আমাগো জাগাইতে পারল না। আমরা জাগলাম না বইলা বাজানেও আর ভাত খাইল না। যেই মাছ দিয়া ভাত খাইব বইলা সারা রাইত না খাইয়া জাইগা থাকল, সেই মাছ না খাইয়া আমাগো লইয়া

www.boighar.com

ঘুমাইয়া থাকল। বেয়ানে আমরা উঠলে তারপর ভাত খাইব। বেয়ান বেলা উইঠা দেখে বিলাইতে মাছের পাতিল উল্টাইয়া ফালাইছে। মাছ, শালুন সব গড়াগড়ি খাইতেছে মাটিতে। বিলাই যতটুকু পারছে খাইছে। আর বাদ বাকিটা মাটিতে। বাজানের এত শখের মাছ, আমাগো লাইগা আর খাওয়া হইল না। আহারে আমার বাজান। বাজানগো।'

নুরুন্নাহারের চোখ বেয়ে জল নামতে লাগল। সে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'সেই বাজান মরণের সময়ও তারে দেখতে যাইতে পারি নাই। বংশের মোহে চুন কালি দিয়া ভাইগ্যা চইলা আইছিলাম তোর বাপের লগে। তোর বাপেও আর কোনো যোগাযোগ রাখতে দেয় নাই।'

এই কথা যে পারুল জানে না, তা না। সেও এই ঘটনা অল্পবিস্তর জানে। কিন্তু আজ যেন সবকিছুই তার কাছে নতুন মনে হচ্ছে। স্পর্শময় মনে হচ্ছে। রাতে নুরুন্নাহার মাছ রান্না করলেন। মাছের সাথে ফালি ফালি করে কেটে গাছ আলুও দিলেন। এই গাছ আলু নুরুন্নাহারের খুব পছন্দ। বড় কোনো গাছের শরীর বেয়ে ডালপালা অবধি ছড়িয়ে যায় এই আলুর লতা। সেই লতায় ছোট ছোট অসংখ্য আলু ধরে। তবে আসল সুস্বাদু আলু থাকে এই লতার মূলে। মাটির তলায় লতার যে মূল থাকে, সেই মূল মূলত বিশাল আকারের কালচে খয়েরি রঙের একখানা আলু। নুরুন্নাহার সেই আলু দিয়ে বোয়াল মাছ রান্না করলেন।

তাবারন সন্ধ্যার পরপরই ফিরে এসেছে। কিন্তু পারুল বা তাবারনকে কোনো কাজেই হাত দিতে দিলেন না নুরুন্নাহার। রান্নাবান্নার সকল কাজ তিনি একা একাই করলেন। ফলে রান্না শেষ হতে হতে রাত গভীর হয়ে গেল। আব্দুল ফকির জুলফিকারকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন এশার নামাজেরও অনেক পরে। তাকে কী এক জরুরি কাজে পরদিন কাকভোরে মাদারীপুরের শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হবে। এই জন্য বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বেন বলে ভেবেছিলেন আব্দুল ফকির। কিন্তু তাকে খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে হলো দীর্ঘ সময়। গভীর রাতে যখন রান্না শেষ হলো তখন খিদেয় দিশেহারা অবস্থা সকলের। ঘরের মেঝেতে দস্তরখান বসিয়ে খেতে বসল সবাই। কেবল রতন নেই। রতন জুলফিকারের সাথে বাড়ির বাহির ঘরে থাকে। সে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে অনেক ডেকেও তোলা গেল না।

খাবার বেড়ে দিচ্ছিলেন নুরুন্নাহার। বহুকাল পরে একজন পরিপূর্ণ গৃহকর্ত্রীর মতো নিজের ঘরকন্না সামলানোর তৃপ্তির আভা ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। তিনি সকলের পাতে ভাত বেড়ে দিলেন। কাঠের মিটসেফ থেকে তরকারির পাতিল নামিয়ে রাখলেন মেঝেতে। গরম ধোঁয়া ওঠা তরকারির এই সুবাস সবাই চেনে। মাঝে-মধ্যে যখন নুরুন্নাহার সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন কখনো

কখনো এমন করে রান্নার শখও তার হয়। আর সেই রান্নার সুবাস বহুদিন অবধি নাকে লেগে থাকে, স্বাদ লেগে থাকে জিভে। আজও তেমনি এক বিশেষ স্বাদ-আস্বাদের দিন।

আব্দুল ফকির প্লেটের গরম ভাত আঙুলে নেড়ে দিচ্ছেন। আগুন গরম ভাত থেকে ধোঁয়ার সাথে গলগল করে ভাঁপ বেরুচ্ছে। নুরুন্নাহারের সাথে এতক্ষণেও তার কোনো কথা হয়নি। নুরুন্নাহার পারুলের প্লেটে তরকারি বেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই আলু দিয়া বোয়াল মাছ খাওনের সময় এহন না। আসল স্বাদ পাইতে হইলে এই শালুন খাইতে হয় শীতের সময়। আলু আর বোয়ালের লগে কয় টুকরা বাগুন আর ধইন্যা পাতা দিয়া রাইতে রাইন্ধা থুইয়া দিতে হয়। খাইতে হয় পরদিন বেয়ান বেলা ঠান্ডা ঠান্ডা। সব শালুন খাইতে মজা গরম গরম, কিন্তু এই এক শালুন, খাইতে মজা ঠান্ডা। ঠান্ডায় মাছ, আলু আর বাগুন ঝোলের লগে শক্ত হইয়া জমাট বাইন্ধা খাণ্ডা খাণ্ডা হইয়া থাকে। আগুন গরম ভাতের ওপরে সেই শালুন দিতে হয় চামুচ দিয়া কাইটা কাইটা। আহারে! মোহে দিলে মনে হইব বেহেস্তের খানা। এই গরমকালে এই জিনিস খাইলে সেই স্বাদ কি আর পাওন যায়?'

আব্দুল ফকির এতক্ষণে কোনো কথা বলেননি। এবার বললেন, 'তোমার শরীল এহন কেমন নুরুন্নাহার? ভালো ঠেকতেছ?'

নুরুন্নাহার আব্দুল ফকিরের কথার জবাব দিলেন না। তিনি তাবারনকে বাদ দিয়ে জুলফিকারের পাতে তরকারি দিলেন। আব্দুল ফকির বললেন, 'এহনও কি যহন-তহন তারা তোমার লগে দেখা দেয়? নাকি তাগো আনাগোনা কিছু কমছে?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'কারা দেখা দিব?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তুমি জানো না কারা দেখা দিব? আবড়ে-জাবড়ে ঘুইরা বদ জ্বিনের নজর লাগাইছ। চেষ্টা তো আমি কম করতেছি না। কিন্তু বছরের পর বছর ধইরাও তারা তোমারে ছাইড়া যাইতেছে না। কথা তো আমার শুনবা না। এত কই ঘরের মইধ্যে থাকলেও শরীল ঢাইক্যা রাখবা। মাথায় কাপড় রাখবা। তা তো শোনো না। আমার কথা শুইনা চললে, এই বদ জ্বিনের আছড় বেশি দিন থাকত না। আব্দুল ফইর দুনিয়ার সব মাইনষের চিকিৎসা কইরা বেড়ায়, খালি নিজের ঘরের মাইনষের চিকিৎসা করতে পারে না। কেমনে পারব? এই ঘরে কেউ তারে দুই পয়সার দাম দেয়? কেউ তার কথা শোনে? তার কোনো নিয়ম-কানুন মানে কেউ? মানে না। মানলে তাল গাছ, না মানলে দুলফা ঘাসও না। এত বছর ধইরা আব্দুল ফইরের বউরে জ্বীনে আছড় কইরা রাখছে। এইটা তো একটা লজ্জা-শরমেরও ব্যাপার আমার লইগা।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'লজ্জা-শরম লাগলে আপনে বোরকা পইড়া শরীল ঢাইক্যা চলাফেরা করেন। আর এহন ভাত খান। আমার বেশি কথা পছন্দ না। বেশি কথা শুনলে শরীল ঝিমঝিম করে। মাথায় রাগ ওঠে।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'মাইয়া মাইনষের এত রাগ ভালো না নুরুন্নাহার। এই রাগই তোমার সর্বনাশ করছে। আমার কথা শোনো নাই। এহন? এহন নিজের কী অবস্থা করছ দেহো। রাগ পুরুষ মানুষের বিষয়। মাইয়া মানুষ হইব পানির লাহান ঠান্ডা আর নরম।'

নুরুন্নাহার হঠাৎ হি হি হি করে হেসে উঠলেন। তারপর অদ্ভুত গলায় বললেন, 'মাইয়া মাইনষের সবকিছুই খালি নরম হইব, না? গতর নরম হইব, বুক নরম হইব, মন নরম হইব? ব্যাটা মাইনষের তাইলে খুব আরাম লাগে না? পুরুষ মানুষ মাইয়া মানুষের সব নরম জিনিসই খালি পছন্দ করে, এই জন্য সব নরম হইতে হইব! অ্যা?'

নুরুন্নাহারের কণ্ঠ শুনে মুহূর্তেই আব্দুল ফকির আর পারুল সতর্ক হয়ে উঠল। এই গলা আর কথা বলার ভঙ্গি তারা চেনেন। আব্দুল ফকির নরম গলায় বললেন, 'থাউক এই সব কথা। প্লেট আইনা ভাত খাইতে বসো। আর তাবারনরে শালুন দেও। ও খালি প্লেট লইয়া কখন থেইকা বইসা আছে।'

নুরুন্নাহার আচমকা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি তার স্বরে চিৎকার করে বললেন, 'ক্যান? তাবারনের লইগা এত দরদ ক্যান? তাবারনের শরীল খুব নরম না? তার নরম শরীলে খুব আরাম। আমার শরীল এহন শক্ত হইয়া গেছে, না?'

প্রবল খিদে নিয়ে খেতে বসা প্রতিটা মানুষ মুহূর্তেই সচকিত হয়ে উঠল। এ যেন ভয়ঙ্কর কোনো বিপদের পূর্বাভাস। আব্দুল ফকির বললেন, 'এইগুলান তুমি কী বলতেছ আবোল-তাবোল?'

নুরুন্নাহার প্রথমে কোনো কথা বললেন না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি এক লাফে তাবারনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সাক্ষাৎ উন্মাদিনীর ভঙ্গিতে তিনি তাবারনের চুল ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ওই খানকি মাগি। ওই, তোর বোহের কাপুড় কই? তুই এইহানে বড় বড় ওলান বাইর কইরা বইসা রইছস ক্যান? ওই বুড়া শয়তানটারে তোর নরম শরীল দেহাস মাগি? তোর শরীল আমি কি করি দ্যাখ।'

নুরুন্নাহারের হাতের ধোঁয়া ওঠা গরম তরকারির বাটিখানা কেউ এতক্ষণ খেয়াল করেনি। পারুল যতক্ষণে তার হাতের বাটি দেখে চমকে উঠেছে, নুরুন্নাহার ততক্ষণে সেই গরম তরকারিসুদ্ধ বাটিখানা উপুড় করে দিলেন তাবারনের শরীরে। তাবারন তীব্র চিৎকারে দু'হাতে বুক চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আব্দুল ফকির লাফ দিয়ে তার জায়গা থেকে উঠে আসলেন।

কিন্তু মেঝেতে লুটিয়ে পড়া তাবারন তখন কাটা মুরগির মতো তড়পাচ্ছে। জুলফিকার আর পারুলের হতভম্ব ভাব যেন তখনো কাটেনি। চোখের সামনে ঘটা ঘটনাটি এখনও তাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। নুরুন্নাহার যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তেমনই দাঁড়িয়ে আছেন। তবে তিনি ভয়ঙ্কর শব্দে একনাগাড়ে হেসে যাচ্ছেন। হাসির ফাঁকে ফাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগলেন তাবারনকে। আব্দুল ফকির অবশ্য নুরুন্নাহারকে কিছু বললেন না। তিনি পারুলকে ডেকে বললেন, 'মা, তাবারনরে তোমার ঘরে নিয়া যাও। ঘরে ডিম থাকলে অর বোহে কয়ডা ডিম ভাইঙা দেও। পোড়া জায়গায় কাঁচা ডিম উপকারী।'

সেই রাতে আর কারো খাওয়া হলো না। নুরুন্নাহারের পাগলামি আবার বাড়তে লাগল। তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুললেন। আব্দুল ফকির নুরুন্নাহারকে জোর করে তার ঘরে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে রাখলেন। পরদিন ভোরে আব্দুল ফকির যাবেন মাদারীপুর শহরে। তার সাথে যাবে জুলফিকার। তাদের ফিরতে দিন দুই দেরি হবে। এই দুইদিন পারুল একা সবকিছু কীভাবে সামলাবে?

আব্দুল ফকির অবশ্য পারুলকে একা রেখে গেলেন না। তিনি খুব ভোরে রতনকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তাবারনের বড় বোনকে খবর দিতে পাঠালেন। তাবারনের বড় বোনের নাম ছবিরন। ছবিরন খবর পেয়ে সাথে সাথেই চলে এলো। আব্দুল ফকির মাদারীপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন তার ঘন্টাখানেক পরে। তাবারনের ঘটনা নিয়ে তিনি খানিক চিন্তিত। এই আগুনে পোড়া রোগের চিকিৎসা বলতে তিনি যা জানেন তা হলো মধু বা ডিমের সাদা অংশ ক্ষতস্থানে দিয়ে রাখা। এতে জ্বলুনিভাব কমে। বিশেষ করে মধু দিলে ক্ষতস্থানে পচন ধরার সম্ভাবনা কমে। তিনি সেসব পারুল আর ছবিরনকে বুঝিয়ে বলেও এসেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ঘটনা তিনি আড়াল করবেন কী করে? তার বাড়িতে তার পাগল স্ত্রী কেন তাবারনকে পুড়িয়ে দিয়েছে এই নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠবে। দশ জনে দশ রকমের কথা তুলবে। এই মুহূর্তে তিনি বাড়ি থাকতে পারলে হয়তো কিছু একটা করতে পারতেন। কিন্তু মাদারীপুর তাকে যেতে হবে আজই। তিনি দুশ্চিন্তা নিয়েই ট্রলারে উঠলেন। কিন্তু ট্রলারে উঠে তার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। এই দুশ্চিন্তার কারণ তাবারন নয়। এই দুশ্চিন্তার কারণ নয়ন!

নয়নের সাথে তার আরো একবার কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে গেল। তার ট্রলার যখন হোসনাবাদ ঘাট থেকে ছাড়ল, তার কিছুক্ষণ বাদেই আরেকখানা ট্রলার এসে ভিড়ল হোসনাবাদ ঘাটে। তবে ট্রলারখানা যখন হোসনাবাদের নদী ঘেঁষে দাঁড়ানো করাতকল পার হয়েছে, তখন মাঝনদীতে প্রায় মুখোমুখি পড়ে গেল আব্দুল ফকিরের ট্রলারের সাথে। আজ আকাশ আবার মেঘলা। ঝিরিঝিরি

www.boighar.com

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেই বৃষ্টিতে ট্রলারের গলুইয়ে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আব্দুল ফকির। নয়ন তাকে দেখতে না পেলেও আব্দুল ফকির ঠিক ঠিক দেখতে পেলেন নয়নকে। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় নয়ন আর মনির তড়িঘড়ি করে ট্রলারের ছাদ থেকে নেমে আসছিল নিচে।

নয়ন আর মনিরকে চিনতে আব্দুল ফকিরের কষ্ট হলো না। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না, এই অসময়ে এরা দুজন এখানে কেন? আব্দুল ফকির বিষয়টি নিয়ে ভারি চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

তিনি চিন্তিত মুখেই হোসনাবাদ ছাড়লেন।

পারুল জানে তার বাবা আব্দুল ফকির বুদ্ধিমান মানুষ। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে তিনি মোটেই বুদ্ধিমান মানুষ নন। এটি মনে হবার কারণ তাবারনের বোন ছবিরন। খালি বাড়িতে পারুলকে সাহায্য করার জন্য তিনি ছবিরনকে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু সাহায্যের বদলে ছবিরন যা করছে তার নাম হুলস্থুল। সে বাড়িতে ঢোকার পর থেকে বাড়ি-ঘর মাথায় তুলে চিৎকার করে কাঁদছে। তার সাথে তার চার বছরের ছেলে, আর সাত বছরের মেয়ে। এদের দুজনের খানিক পরপর খিদে পায়। খিদে পেলে তারা মুখ ফুটে খাবারের কথা কিছু বলে না। যা করে তা হলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার। সকাল থেকে এই তিনের চিৎকার-চেঁচামেচিতে পারুলের কান ঝালাপালা। এখন আবার তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে তাবারন। মাঝখানে সে খানিক ক্ষ্যান্ত দিয়েছিল, এখন সেও সমানে চেঁচাচ্ছে। পারুলের ভীষণ অসহায় লাগছে।

উঠানে মানুষের ভিড় লেগে গেছে। ভিড় করা মানুষের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। এরা একদল নুরুন্নাহারকে দেখতে চাইছে। আরেকদল দেখতে চাইছে তাবারনকে। পারুলের মাথা সত্যি সত্যি খারাপ হওয়ার দশা। সে অসহায় ভঙ্গিতে বসে রয়েছে ঘরের দাওয়ায়। কারো কোনো প্রশ্নের উত্তর সে দিচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে সে চুপচাপ পুকুর ঘাটে গিয়ে বসে থাকে। কিন্তু সেটিও সম্ভব না। এই অবস্থায় সে পুকুর পারে গিয়ে বসে থাকলে নানান কথা উঠবে। তাবারনের গলায় বুকে ডিমের সাদা অংশ মেখে দিয়েছে সে। এই জিনিস তাবারনকে খানিকটা আরাম দিলেও কিছুক্ষণ পরপরই সে চিৎকার করে উঠছে। আব্দুল ফকির বলেছিলেন তাবারনের পোড়া জায়গায় মধুও মাখাতে। কিন্তু ঘরে মধু নেই। রতনকে পাঠানো হয়েছে মধুর খোঁজে। অবশ্য এই অসময়ে সে মধু কোত্থেকে আনবে, পারুল তা জানে না।

গতরাতের কথা ভেবে পারুলের খুব ভয় হচ্ছে। সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, তার মা ওই কাজ করেছেন! নুরুন্নাহারকে এত ভয়ঙ্কর হতে সে

www.boighar.com

আগে কখনো দেখেনি। তাবারনের কথা ভেবে পারুলের প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। মেয়েটা এমনিতেই জনমদুঃখী। মা-বাবা কেউ নেই। স্বামী-সংসার নেই। পারুল শুনেছে তার জন্মেরও আগে থেকে তাবারন এ বাড়িতে। নিজের থাকার মধ্যে তাবারনের রয়েছে এই এক বড় বোন। কিন্তু সেও তাবারনের খুব একটা খোঁজ-খবর নেয় না। বাঁজা মেয়ে বলে তাবারনকে নিয়ে নানান সংস্কার অনেকের মধ্যে। নিজের বোনেরও কম নয়। সে চায় না, তার ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভরভরন্ত সুখের সংসারে বন্ধ্যা তাবারনের ছায়া পড়ুক। অথচ আজ এসে বোনের দুঃখে সে পাড়া মাথায় করে চেঁচাচ্ছে।

খিদেয় পারুলের গা গোলাচ্ছে। কিন্তু কিছু খেতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই বৃষ্টিতেও উঠানে মানুষের ভিড় কমছে না। বরং বাড়ছে। পারুল অবশ্য ঘরে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। নুরুন্নাহারও মাঝে-মধ্যেই চিৎকার করে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে চলেছে। উঠানে জড় হওয়া মানুষগুলো দুঃখী দুঃখী মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।। যেন তাবারন, নুরুন্নাহার আর পারুলদের দুঃখে তারা কাতর। কিন্তু পারুল স্পষ্ট টের পাচ্ছে, মানুষগুলো এই পরিস্থিতি তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে। নুরুন্নাহারের অশ্লীল গালাগালেও তারা নিষিদ্ধ আনন্দ পাচ্ছে। এইসকল কিছুই অবশ্য অস্বাভাবিক বা ভয়ের কিছু নয়। আসল যা ভয়ের, তা হলো এরা এখান থেকে গিয়ে নানান রসালো গল্প তৈরি করবে। সে সকল গল্প ক্রমশই আরো ডালপালা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারধারে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই এই ঘটনা নিয়ে নানান জায়গায় রসালো আড্ডা বসেও গিয়েছে। হোসনাবাদের বাজারের চায়ের দোকানে, মাছের বাজারে এই গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলার জমায়েত ইতিমধ্যেই বসে যাওয়ার কথা।

পারুলের ধারণা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। রতন বাড়ি ফিরেছে। তবে সে একা ফেরেনি। তার সাথে গাঁয়ের কয়েকজন ছেলে-ছোকড়া, দুয়েকজন বয়স্ক লোকও রয়েছেন। এদের সকলকেই পারুল কম-বেশি চেনে। তবে যাদের চেনে না, তারা হলো দুজন তরুণ। তাদের মধ্য থেকে একজনকে দেখে পারুলের চোখ আটকে গেল। চেহারা, হাঁটা, ভঙ্গি দেখে পারুল এক পলকেই বুঝে গেল, এই ছেলে এই গাঁয়ের নয়। এই গাঁয়ের তো দূরের কথা, সে কোনো গাঁয়ের ছেলেই নয়। সে নিশ্চিত করেই শহুরে ছেলে। ছেলের গায়ের রঙ ফর্সা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। পারুল একদৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। এই এত এত বিপদের মধ্যেও তার হৃদস্পন্দন যেন মুহূর্তের জন্য থেমে গেল।

হারু মুনশী মসজিদে নামাজ পড়ান। বয়স্ক মানুষ। তিনি এগিয়ে এসে পারুলের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'ও পারুল? তাবারনের এহন অবস্থা কী? ফইরসাবের লগে টলার ঘাটে দেহা হইল। সে তো আমারে কিছু

কইল না। তয় এইসব কথা কি আর অগোচর থাহেনি? বাতাসের মতো ছড়ায়। ঘটনা লইয়া তো টলারঘাট, বাজারে মাইনষের মজমা বইস্যা গেছে। কত আজাইর্যা বাজাইর্যা কথা সেইখানে!'

পারুল কোনো কথা বলল না। সে তাকিয়ে আছে হারু মুনশীর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা শহুরে যুবকের দিকে। হারু মুনশী বললেন, 'তায় এহন কী ব্যবস্থা নিলি? পোড়া রুগী। লগে লগে কোনো ব্যবস্থা না নিলে বিপদ। আর তোর মায়ের কী অবস্থা? পাগলামি কি আগেরতনও বেশি বাড়ছে?'

পারুল এবার কথা বলল। সে বলল, 'আব্বায় বইলা গেছিল ডিমের সাদা অংশ মাখাইতে। আমি মাখাইছি। আর বলছিল মধু দিতে। কিন্তু ঘরে মধু আছিল না। এইজন্য মধু আনতে পাঠাইছিলাম রতনরে। কিন্তু রতন তো মনে হয় মধু পায় নাই।'

পারুল সামান্য থেমে পেছনে দাঁড়ানো যুবকের দিকে ইঙ্গিত করে আবার বলল, 'এরা কারা কাকু? উনাগো তো কোনোদিন দেহি নাই।'

হারু মুনশীর যেন এতক্ষণে মনে পড়ল যে তার সাথে দুজন আগন্তুক রয়েছেন। তিনি খানিক সরে গিয়ে বললেন, 'এনারা সম্মানী মানুষ। এই যে ইনি, ইনি হইছেন ফতেহপুরের চেয়ারম্যান খবির খাঁর পোলা মনির খাঁ। আর তার সাথের জন খবির খাঁর বইনের পোলা। এনার নাম নয়ন। ইনি ঢাকা শহর থাহেন। বড় ডাক্তার। আমরা টলারঘাটে বইসা এই ঘটনা নিয়া কথা বলতেছি, এই সময়ে উনারা আইসা হাজির। জিগাইলেন, ফইরসাবের বাড়ি যাইবেন, বাড়িটা কোনদিকে? এরপর কথায় কথায় এ ও বলাবলি করতে লাগল আইজ রাইতের ঘটনাও। আর আল্লাহর কী কুদরত, তহনই জানলাম, উনি ডাক্তারও। এইজন্যই তাড়াহুড়া কইরা ওনারে লইয়া আইলাম। দ্যাখ, কিছু ব্যবস্থা যদি উনি করতে পারেন।'

সাধারণ মেয়েলি লজ্জা-শরমের বালাই পারুলের কোনো কালেই ছিল না। ছিল না অতিরিক্ত আদব-লেহাজের বিষয়ও। সে খানিকটা চাঁছাছোলা টাইপের মেয়ে। যার তার মুখের উপর যখন তখন ইচ্ছেমাফিক কথা বলে দেওয়া তার অভ্যাস। তবে এর বাইরেও পারুলের চরিত্রে আরো একটি ব্যাপার রয়েছে। সেই ব্যাপারটি তেমন দীর্ঘস্থায়ী বা তীব্র নয় বলেই হয়তো সেটি সব সময়ই অপ্রধান হয়ে অগোচরেই থেকে যায়। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সেই চরিত্রটি যেন দুম করে বের হয়ে এলো। সে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'হারু কাকু। ঘরের ভিতর আহেন। বিষ্টির মধ্যেও মাইনষের ভিড় দেখছেন? উঠানের মাটিগুলারেও ক্যাদা ক্যাদা কইরা ফেলছে। আপনেরা টিনের নিচে আহেন। আমি বসনের চেয়ার দেই।'

www.boighar.com

পারুলের চোখ মুখে কেমন এক সলজ্জ ভঙ্গিমা। সে চট করে ঘরের ভেতর গিয়ে রতনকে দিয়ে দুখানা চেয়ার পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু সে নিজে আসলো না। বারান্দায় দীর্ঘ সময় বসে রইল নয়ন, মনির আর হারু মুনশী। সেদিনের সেই বিচিত্র নৌকাযাত্রার পর থেকেই নয়ন ভেতরে ভেতরে আরো একবার আব্দুল ফকিরের সাথে দেখা করবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। আজ তাই নিজের ইচ্ছেতেই ফতেহপুর থেকে সে আব্দুল ফকিরের সাথে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু তার ভাগ্য খারাপ, একটুর জন্য আব্দুল ফকিরের সাথে তার দেখাটা হলো না। মাঝখান থেকে সে এসে পড়েছে আরেক ঘটনার মধ্যে। তবে ট্রলারঘাটে এই ঘটনা শোনার পর থেকেই ঘটনাটি নিয়ে নয়নের মধ্যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহলও তৈরি হয়েছে। এটি যেমন আর আট দশজন মানুষের মতো আব্দুল ফকিরের ঘরের খবর জানার স্বাভাবিক কৌতূহল, তেমনি আবার একটা ডাক্তারসুলভ আগ্রহও রয়েছে। এই গাঁও-গ্রামে এমন পোড়া রোগীর কী ব্যবস্থা এরা করে, কে জানে! এই রোগীর ক্ষেত্রেও আব্দুল ফকিরের বিশেষ কোনো টোটকা রয়েছে কিনা, এটিও নয়নের কৌতূহলের একটি বিষয়।

পারুল আসলো দীর্ঘ সময় পর। এই সময়ে সে ঘরে গিয়ে মুখে পানি ছিটিয়েছে। সামান্য পাউডার মেখেছে। চুলের গোছাটা খানিক গুছিয়ে খোঁপা করে বেঁধেছে। মজার ব্যাপার হলো পারুল তার পরনের শাড়িটাও এই ফাঁকে বদলে নিয়েছে। খানিক আগে তাবারনের ঘটনায় গভীরভাবে আহত, উদ্বিগ্ন যে পারুল, সেই পারুলের সাথে এই প্যারুলের যেন কোনো মিল নেই। যেন আলাদা মনোজগতের ভিন্ন দুই মানুষ। নয়ন পারুলকে দেখে অবাক হলো। তবে সেটি সে তার আচরণে প্রকাশ করল না। সে নরম গলায় বলল, 'উনার কোথায় পুড়েছে?'

পারুল বলতে গিয়েও যেন খানিক সঙ্কোচ করল। তারপর বলল, 'গলা থেইকা পুরা বুক'।

নয়ন পারুলের এই সামান্য সঙ্কোচের কারণটা ধরতে পারল। সে বলল, 'আমি ডাক্তার। ডাক্তারের কাছে কোনো সঙ্কোচ করবেন না। তবে একটা বিষয়, আপনার বাবা আবার কোনো সমস্যা করবেন না তো? তিনি নিজেই তো বড় কবিরাজ। নানান চিকিৎসা পথ্য দেন। এখন বাইরের কোনো ডাক্তার এসে চিকিৎসা দিলে যদি আবার কিছু মনে করেন?'

পারুল ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'না না, আব্বা কিছু বলব না। আমার ওপরে সে কিছুই বলব না।'

নয়ন মৃদু হাসল। বলল, 'আপনার বাবা বুঝি আপনাকে খুব ভালোবাসেন?'

পারুল এই কথার জবাব দিলো না। নয়নই আবার কথা বলল। সে বলল, 'রোগীর এখন কী অবস্থা? কোনো ব্যবস্থা আপনারা নিয়েছেন?'

পারুল মাথা দোলালো। সে বলল, 'আব্বা বইলা গেছিল ডিমের সাদা অংশ আর মধু মাখতে। ডিম মাখাইছি, কিন্তু মধু তো পাই নাই।'

নয়ন বলল, 'আমি শুনেছি গরম ঝোল তরকারি পড়ে পুড়েছে, তাই না?'

পারুল উপর নিচ মাথা ঝাঁকাল। নয়ন বলল, 'আপনি ডিম মাখানোর আগে কী পোড়া জায়গাটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন?'

পারুল মৃদু গলায় বলল, 'তাবারন খালায় তহন চিক্কুর দিয়া কানতেছিল। আমার মাথা কাজ করতেছিল না। একটু পানি দিয়া ধুইয়া তাড়াতাড়ি ডিম মাখাই দিছি।'

নয়ন বলল, 'আমি যেহেতু দেখতে পারছি না, সুতরাং বলতেও পারছি না, রোগীর ক্ষতস্থান কতটা গভীর। তবে একটা কথা, ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে না ফেললে কিন্তু ইনফেকশন হবে।'

পারুল ইনফেকশন কথাটার অর্থ ঠিক বুঝল না। সে যে বোঝেনি সেটি নয়নের বুঝতে সামান্য সময় লাগল। নয়ন সাথে সাথেই আবার বলল, 'পচন ধরবে। মধু থাকলে ভালো হতো। মধু পচন ঠেকাতে খুব ভালো কাজ দেয়। তবে এখুনি ভালো করে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে হবে। আর বলুন তো, পোড়া জায়গাটি কি লালচে সাদা হয়ে আছে?'

পারুল সাথে সাথে জবাব দিলো না। সে এতটা খেয়াল করে দেখেনি। ভেতর থেকে এখনো তাবারনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। তবে নুরুন্নাহার এখন খানিকটা থেমেছেন। পারুল মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি পরিষ্কার কইরা আসব? ভালো কইরা দেইখাও আসব, কী অবস্থা?'

নয়ন বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই পরিষ্কার করবেন। তবে আমার ধারণা পোড়াটা খারাপভাবেই পুড়েছে। কারণ, একে তো আগুন গরম তরকারি। তার ওপর জায়গাটাও পোড়ার জন্য খারাপ। এখানে আশেপাশে তো কোনো ওষুধের দোকান দেখলাম না। আমি একটা মলম লিখে দিচ্ছি, কোনোভাবে সম্ভব হলে কোথাও থেকে আনিয়ে নেবেন।'

পারুল কেবল ডান দিকে মাথা কাত করল। তার কেমন যেন লাগছে। সে বোঝাতে পারবে না। কিন্তু এমন কেন হচ্ছে? তার তো এমন হবার কথা না। সে হঠাৎ কিছু না বলেই টুপ করে ঘরের ভেতরে চলে গেল। কিন্তু ভেতরে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার ফিরে এলো। তারপর বলল, 'আপনেরা কিন্তু দুপুরের না খাইয়া যাইবেন না।'

www.boighar.com

নয়ন বলল, 'না না। আমরা এখুনি চলে যাব। আসলে আমরা এখানে এসেছিলাম একটা কাজে। আপনার বাবার সাথে আমার একটু দেখা করার বিষয় ছিল। কিন্তু এসে শুনি এই ঘটনা'।

পারুল আরো কী কী বলতে চাইছিল, কিন্তু তার কিছুই সে বলতে পারল না। নয়নরা চলে যাওয়ার পর সারাটাদিন তার কাটল ঘোরের মধ্যে। বিকেল নাগাদ মানুষের ভিড় কমতে লাগল। ছবিরনও খানিক ধাতস্থ হয়েছে। সে রান্নাবান্না করে তার বাচ্চাদের খাইয়েছেও। তাবারন সারাদিন বাদে শান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। নির্ঘুম রাত আর সারাদিনের ধকলে পারুলের শরীরটাও ভেঙে পড়ছিল। সে ঘুমাবে বলে ঘর অন্ধকার করে বিছানায় শরীরখানা এলিয়ে দিতেই রাজ্যের ঘুম জেঁকে বসল তার চোখে। কিন্তু সেই ঘুম বেশিক্ষণ থাকল না। সে ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠল। তারপর অন্ধকার ঘরে সে দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইল। আজ সকালে তাদের ঘরের বারান্দায় বসে কথা বলা মানুষটাকে সে মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। কিছুতেই পারছে না। মানুষটা যেন অবচেতনেই তার মাথায় পুরোপুরি গেঁথে গেছে।

লতার দেখাদেখি একটা শহুরে প্রেমিকের তীব্র আক্ষেপ তার ভেতরে ছিল। হয়তো এ কারণেই অমন কারো কথাই সে মনে মনে ভাবছিলও। কোথাও তীব্রভাবেই একটা শহুরে ছেলের অপেক্ষা তার ছিল! কিন্তু আজ চোখের সামনে পারুল যাকে দেখেছে, সে পারুলের কাছে রীতিমতো স্বপ্নেরও বেশি কিছু। একটা মানুষ এত সুন্দর করে হাসে, কথা বলে! পারুল মানুষটাকে কোনোভাবেই তার ভাবনা থেকে তাড়াতে পারছে না। সে ঘুমের মধ্যে মানুষটাকে স্বপ্নেও দেখেছে। স্বপ্ন দেখেই তার ঘুম ভেঙেছে। সে দেখেছে তাদের পুকুর ঘাটে সে আর মানুষটা বসে রয়েছে। মানুষটার পরনে নীল পাঞ্জাবি। আর তার পরনে নীল শাড়ি। আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে পানিতে। তারা দুজন পানির দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষটা হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, 'পারুল, দেখো তো, পানি কাঁপছে, চাঁদও কাঁপছে। দৃশ্যটা সুন্দর না?'

পারুলের কাছে দৃশ্যটা আহামরি সুন্দর কিছু বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু এই মানুষটার পছন্দের বাইরে সে কিছু বলতে চায় না। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুব সোন্দর'।

মানুষটা পারুলের দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। তারপর বলল, 'সোন্দর না পারুল, বলো সুন্দর'।

পারুল অবশ্য তার কথা শুনল না। তার মাথায় গেঁথে আছে মানুষটার হাসি। মানুষ এত সুন্দর করে হাসে কীভাবে! সে নিষ্পলক চোখে মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটা আবারো হাসল। বলল, 'তোমার সাথে আমার কি কথা ছিল পারুল? তুমি শুদ্ধ করে কথা বলবে। পুরোপুরি শুদ্ধ করে কথা বলতে পারলেই তোমাকে আমি ঢাকা নিয়ে যাব।'

পারুল এবারো কোনো কথা বলল না। মানুষটা আবার বলল, 'কী? পারবে না পুরোপুরি শুদ্ধ করে কথা বলতে?'

পারুল যে শুদ্ধ করে কথা বলার চেষ্টা করেনি তা নয়। কিন্তু সে পারছে না। এই শুদ্ধ করে কথা বলার ব্যাপারটি তার কাছে ভারি কঠিন মনে হচ্ছে। সে হঠাৎ বলল, 'আপনে তো ডাক্তার। বড় ডাক্তার। ডাক্তাররা তো সব কিছুই সহজে কইরা দিতে পারে। আপনে আমারে সহজে শুদ্ধ কইরা কথা বলনের কোনো ঔষুধ দিতে পারেন না? টুপ কইরা পানিতে গিল্যা ঔষুধ খাব, আর টপটপ শুদ্ধ বলা শুরু করব। কী এমন ঔষুধ নাই? দিতে পারবেন না?'

মানুষটা পারুলের কথা শুনে হো হো করে হাসতে লাগল। সেই হাসি আর থামছে না। থামছেই না। পারুলের হঠাৎ ভয় করতে লাগল। সে মানুষটার হাসি থামাতে চাইছে। কিন্তু মানুষটাকে কী বলে ডাকবে সে? পারুল বুঝতে পারছে না, মানুষটাকে তার কী বলা উচিত! মানুষটা তার কী হয়, তাও সে জানে না! আচ্ছা কী সম্বোধনে ডাকবে সে মানুষটাকে? মানুষটার নাম ধরে?

কিন্তু কী নাম তার পাশে বসে থাকা মানুষটার?

পারুল হঠাৎ আবিষ্কার করল সে তো মানুষটার নামই জানে না। হয়তো নামটা সে জানত কিন্তু এই মুহূর্তে ভুলে গেছে। কিছুতেই আর নামটা মনে পড়ছে না পারুলের। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না। কোনোকিছুতেই মানুষটার নাম সে মনে করতে পারল না। পারুলের কী যে কষ্ট হচ্ছে! কী যে কষ্ট! কী নাম মানুষটার? বাদল? বেলাল? হাসান?

পারুল কিছুতেই কিছু মনে করতে পারল না। তার ঘুম ভেঙে গেল। সেই ঘুম ভাঙা সন্ধ্যায় পারুল এলোচুলে হেটে চলে এলো পুকুরের ঘাটে। ঘাটে বসে সে আবিষ্কার করল মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে মস্তবড় চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলো পড়েছে পুকুরের পানিতে। পুকুরের পানি সামান্য কাঁপছে। সাথে সাথে কাঁপছে চাঁদটাও। সে অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে পুকুরের পানিতে কম্পমান সেই চাঁদের দিকে। তার হঠাৎ মনে হতে লাগল তার ঠিক অন্য পাশেই ঘাটের আরেক প্রান্তে বসে রয়েছে সেই মানুষটা। সে ঘাড় ঘুরে তাকালেই মানুষটাকে দেখতে পাবে। কিন্তু তার তাকাতে ইচ্ছে করছে না। কারণ তাকালেই যদি দেখে মানুষটা নেই! পারুল তাকালও না। সে তাকিয়ে রইল পুকুরের জল জোছনায়। সেই জল-জোছনায় তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তার হঠাৎ মানুষটার নাম পড়ে গেল। মানুষটার নাম নয়ন। পারুল জানে, নয়ন মানে চোখ।

কী আশ্চর্য! সে তার চোখের সামনে থেকে নয়নকে তাড়াতে পারছে না।

www.boighar.com

ফজরের নামাজ শেষে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হাঁটতে বেরিয়েছেন। তার সাথে আছে এস্কান্দার। এস্কান্দারের হাতে তেল চকচকে বাঁশের লাঠি। এমন বাঁশের লাঠি নিয়ে আজকাল কেউ হাঁটে না। কোনো লাঠিয়ালও না। অবশ্য লাঠিয়ালের চলও আজকাল নেই। তবে এস্কান্দারের অভ্যাস হয়ে গেছে। সে তার এই অভ্যাসটা আর ছাড়তে পারেনি। এস্কান্দার শুনেছে, তার বাবা হায়দার আলী যখন তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে হাঁটতেন, তখন তার হাতে থাকত তীক্ষ্ণ ফলার ঝকঝকে বর্শা। কিন্তু সেই সব বর্শার যুগও আর এখন নেই। এই নিয়ে এস্কান্দারের ভেতরে ভেতরে এক ধরনের হতাশাও রয়েছে। মাঝে-মধ্যে তাই সময় সুযোগ পেলে তার এই হতাশার কথা সে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কাছেও প্রকাশ করে। যেমন আজ সে সুযোগ বুঝে তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে বলল, 'দাদাজান, একখান বন্দুক দরকার। দিনকাল ভালো না। এই বাঁশের লাঠি লইয়া আর চলে না'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর একখানা অতি পুরোনো আমলের বন্দুক রয়েছে। বহুকাল সেই বন্দুক আর ব্যবহার হয় না। তবে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মাঝে-মধ্যেই বন্দুকখানা বের করে তা ঝেড়ে-পুছে, তেল মাখিয়ে আবার যত্ন করে রেখে দেন। তিনি জানেন, সেই বন্দুক খানার প্রতি এস্কান্দারের বড় লোভ। কিন্তু তিনি এই বন্দুক আর ব্যবহার করতে চান না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ গম্ভীর গলায় বললেন, 'বাঁশের লাঠির কী দরকার? কোনো লাঠিরই আর দরকার নাই'।

এস্কান্দার বলল, 'কী বলেন দাদাজান! ঘটনা হোনেন নাই? উত্তর কান্দির খোনকার বাড়ি দিন দুই আগে ডাকাতি হইল। যেই সেই ডাকাতি না, মারাত্মক ডাকাতি। মাডার হইছে তিনডা। পেপার পরতিকার লোকজনও হুনছি আইছে। পুলিশ আর পুলিশ।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এহন কী উড়া চিঠিতে ঘোষণা আইছে নাকি যে আমার বাড়িতেও ডাকাইত পড়ব? এই ডাকাইত ঠেকানোর জন্য তোর বন্দুক দরকার?'

এস্কান্দার থতমত খাওয়া গলায় বলল, 'না দাদাজান, আপনের বাড়িতে ডাকাইত পড়ব, এমুন সাহস এহনো কোনো ডাকাইতের হয় নাই। তারপরও দাদাজান, একখান বন্দুক লগে থাকলে বল পাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তুই হায়দার আলীর পোলা। তোর বলের লইগা বন্দুক লাগে! তোর বাপ খালি হাতে গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ কাইত কইরা ফালাইত।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সাধারণত এত কথা বলেন না। কিন্তু কোনো কারণে আজ তার মন ভালো। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে এস্কান্দারের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'বন্দুক সবাই ধরতে পারে। কিন্তু চালাইতে পারে না।'

এস্কান্দারের চোখে যেন আশার আলো জ্বলে উঠল। সে বলল, 'আমি চালানি শিখ্যা ফেলব দাদাজান। টিগার টানলেই তো গুল্লি বাইরায়।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সামান্য হাসলেন। কিছুক্ষণ আর কথা বললেন না। তারপর আচমকা বললেন, 'বন্দুক হাতে থাকলে গুলি সকলেই করতে পারে। এইটা কঠিন কোনো বিষয় না। কঠিন বিষয় গুলি না করতে পারা। বন্দুকের গুলি আর হাতের কাঁচা-পয়সা, এই দুই জিনিস হাতে থাকলেই খালি খরচ করতে মন চায়। হাত নিশপিশ করে। এই দুই জিনিস হাতে থাকনের পরও খরচ না কইরা থাকতে পারে খুব কম মানুষ। গুলিভর্তি বন্দুক হাতে লইয়াও গুলি না কইরা থাহাটাই আসল বন্দুক চালানি। এইটা শেখন দরকার সবার আগে।'

তৈয়ব উদ্দিনের খাঁর এমন ভাবগম্ভীর কথাবার্তা খুব একটা বোঝে না এস্কান্দার। কিন্তু বন্দুকটার প্রতি তার খুব লোভ। যদিও সে জানে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে ভুলভাল বুঝিয়ে বন্দুক বের করা সম্ভব না। তারপরও মাঝে-মধ্যে সময় সুযোগ বুঝে সে খানিক চেষ্টা চরিত্র করে। তাতে অবশ্য লাভ বিশেষ হয় না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথা শুনে এস্কান্দার চুপ করে রইল।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আবার বললেন, 'তোর বন্দুক দরকার কেন সেইটা বল'।

এস্কান্দার এবারও কোনো কথা বলল না। সে মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, হামুকের বিলে কি হামুক ভাঙা পাখি আইছে? ওই পাখি তো শীতকালে আসনের কথা।'

এস্কান্দারের বুকের ভেতর ধক করে উঠল। সাথের এই মানুষটা যে তার কাছে কী, তা সে কোনোদিন কাউকে বোঝাতে পারবে না। সে কেমন কেমন করে যেন তার বুকের ভেতরটা দেখে ফেলে। শামুকের বিলে বারো মাস পাখি থাকে। শীতের দিকে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে শামুকভাঙা। বর্ষায় লাল শাপলার বিলে ধবধবে সাদা বকে ছেয়ে যায়। তবে শামুকভাঙাও কিছু থাকে। একখানা বন্দুক হলে বেশ হতো! বন্দুক হাতে নিয়ে কাঁধভর্তি শিকার করা পাখি শেকলের মতো ঝুলিয়ে হাঁটার খুব শখ এস্কান্দারের।

www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আরে গাধা। মানুষ মারনের বন্দুক আর পক্ষী মারনের বন্দুক এক না। পক্ষী মারনের বন্দুক আলাদা।'

এস্কান্দার এবারো কোনো কথা বলল না। আজ কেন যেন সামান্য আশাবাদী হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁর শেষ কথায় সেই আশাটুকু হতাশায় পরিণত হলো। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আবারো ধীর পায়ে হাঁটা দিলেন। তার চোখ মাটির দিকে নিবদ্ধ। তারা হেঁটে হেঁটে সলিমুদ্দি দফাদারের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। সলিমুদ্দি দফাদার বেঁচে নেই। তার বৃদ্ধ অসুস্থ স্ত্রী একমাত্র পুত্রের সাথে শহরে থাকেন। চৌচালা ঘরের মূল দরজাখানা বাইরে থেকে তালা মারা। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অনেকক্ষণ সেই বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সামনে বিস্তৃত উঠান। উঠান ঢেকে গেছে ঘন দূর্বা ঘাসে। সাথে বর্ষার হাওয়া জল পেয়ে কিলবিল করে বেড়ে ওঠা জংলি লতাপাতা। কিছু লতা সাপের মতো টিনের বেড়ার গা বেয়ে মাঝামাঝি অবধি উঠে গেছে।

সবুজ নাকি সব সময় প্রাণের স্পন্দন। অথচ এই বাড়ি, বাড়ির উঠান, ঘরের বেড়া অবধি এই যে এত গাঢ় সবুজ, তার সকলই কেবল প্রাণহীনতার গল্প বলছে। বলছে, এই বাড়িখানা শূন্য। এখানে মানুষ নেই, প্রাণ নেই, শব্দ নেই, কোলাহল নেই।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এই শূন্যতাকে তিনি খুব ভয় পান। তার এই দীর্ঘ জীবনে এমন কত দৃশ্য, কত গল্প যে তিনি দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। যৌবনের ভরভরন্ত, বেপরোয়া, প্রমত্ত মানুষকেও প্রৌঢ়ত্বে গিয়ে ভেঙেচুড়ে চুরমার হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখেছেন। সামান্য অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য নতজানু হতে দেখেছেন। যে বাড়ির দহলিজ ঘর জুড়ে রোজ শ'য়ে শ'য়ে মানুষের আনাগোনা হতো, শলিস বিচার বসতো, সেই বাড়ির দহলিজ ঘরের ভিটেয় লাউ, শিম, বড়বটির মাচা বসতে দেখেছেন। সেই মাচায় ঘুঘু, টিয়ের বাসা বসতে দেখেছেন। যে বাড়ির চুলায় রোজ মণকে মণ চালের ভাত, আস্ত খাসি, এক-দেড় মণ ওজনের মাছ রান্না হতো, সেই বাড়িতেও দিনের পর দিন আগুনবিহীন শূন্য চুলা তিনি দেখেছেন। দেখেছেন এক আধবেলা আহারের জন্য পাগলের মতো মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে সেই বাড়ির মানুষ! এই হলো জীবন। মানবজীবন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার আশিবছরের জীবনে এমন অসংখ্য গল্প দেখেছেন। অসংখ্য জীবনের গল্প। আর দেখেছেন বলেই তার ভয়। সবচেয়ে ভয় তার দুই পুত্রকে নিয়ে।

বড়জন খবির খাঁ তাও যতটুকু চোখ কান খোলা রেখে চলা মানুষ। বাবার ছায়ায় ভর করে চেয়ারম্যান অবধি সে হয়েছে। কিন্তু ছোটপুত্র দবির খাঁ এই সকল কিছুরই বাইরে। সে বাড়ি ঘরে থাকে না। কই কই ঘুরে বেড়ায়! চার পাঁচ মাস পরে একবার আধবার বাড়ি ফেরে। আবার কখনো কখনো বছরও কেটে যায়। এই সময়ে বাড়ি ফিরে সে ধানের গোলা থেকে ধান, আঁখের গুড়ের জালা

থেকে গুড়, সরিষা, সুপারি, বড় ডালপালাওয়াল বৃক্ষ এইসব বিক্রি করে টাকা জমায়। সেই টাকা নিয়ে দিন কয়েক পরে আবার উধাও হয়ে যায়। সে বিয়ে-শাদি করেনি। এই নিয়ে তৈয়ব উদ্দিন খাঁও অবশ্য কখনো তাকে কিছু বলেননি। না বলার পক্ষে তার যুক্তিও রয়েছে।

তিনি খুব অল্পতেই বুঝতে পারছিলেন, এই ছেলেদের দিয়ে তার বংশ রক্ষা হবে না। তার চেয়ে নাতিদের দিকে নজর দেয়া জরুরি। তিনি খুব চাইছিলেন খবির খাঁর যেন পুত্র সন্তান হয়। আল্লাহ তার চাওয়া পূর্ণ করেছেন। খবির খাঁর দু'টি পুত্র সন্তান হয়েছে। বড়জনের নাম মবিন। ছোটজনের নাম মনির। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার এই দুই নাতিকে নিয়ে যারপরনাই হতাশ এবং চিন্তিত। আল্লাহ তার প্রার্থনা শুনেছেন। খবির খাঁর ঘরে দুটি ছেলে সন্তান তিনি ঠিকই দিয়েছেন। কিন্তু তাদের বোধ বুদ্ধি খুব একটা দেননি।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর বেশিরভাগ চিন্তাভাবনাই তার আশেপাশের মানুষের কাছে অস্পষ্ট মনে হয়। কিন্তু কেউ সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। খবির খাঁও না। ফলে যেদিন বড় নাতি মবিনকে তিনি কুয়েত পাঠানোর কথা বললেন, সেদিন তার বড় পুত্র খবির খাঁ প্রচণ্ড রকমের অবাক হলেও এই সিদ্ধান্তের পেছনের প্রকৃত কারণটি জিজ্ঞেস করার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি তিনি। এই সময়ে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আরো একটি কাজ করেছেন। সেটি হচ্ছে ছোট নাতি মনিরের নামে একখানা ব্যাংক একাউন্ট খুলিয়েছেন মাদারীপুর শহরে। সেই ব্যাংক একাউন্টের হিসেব দেখভাল করার দায়িত্বও পড়েছে মনিরের কাঁধে। এই দেখভাল, হিসেব-নিকেশ করতেই প্রতি মাসে একবার মাদারীপুর শহরের ব্যাংকে যেতে হয় মনিরকে।

মনিরের মতো কারো জন্য এটি ভারি কষ্টসাধ্য কাজ। এমনিতেই মনিরের টাকা-পয়সার দিকে তেমন আগ্রহ নেই। তার যত আগ্রহ তার সকলই কেবল মাছ ধরায়। তার ওপর ব্যাংকের মতো এমন জটিল বিষয়াদি! বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু গত চার বছরে মবিন কুয়েত থেকে যত টাকা পাঠিয়েছে মনিরের একাউন্টে, তার হিসেব-নিকেশ রাখতে গিয়ে মনির খানিকটা হলেও চোখা হয়ে উঠেছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সম্ভবত এই জিনিসটাই চাইছিলেন। নিজেকে সব সময় অপাংক্তেয়, অযোগ্য মনে করা মনির এই জটিল কাজটি করতে পেরে নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা শুরু করেছে। বছরখানেকের মধ্যে তার নিজেকে খানিকটা দায়িত্ববানও মনে হতে লাগল। সে এখন একা একাই ব্যাংক থেকে টাকা-পয়সার হিসেব-নিকেশ বুঝে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কাছে এসে তার বিস্তারিত হিসেব দেয়। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ পারতপক্ষে মনিরকে তার কাছে ঘেঁষতে দেন না। কেবলমাত্র এই হিসেব-নিকেশ করার সময়টুকু ছাড়া। তিনি এই সময়টুকুতে তীক্ষ্ণ নজরে মনিরকে পর্যবেক্ষণ করেন। মাঝে-মধ্যে তার মনে হয়,

তিনি যা চাইছিলেন তেমনটাই হচ্ছে। আবার কখনো কখনো মনে হয়, তার এই এত এত পরিকল্পনা, শ্রম সকলই ভেস্তে গেছে।

রোদ উঠছে। গাছগাছালির ফাঁকে ভোরের আলোর আনাগোনা টের পাওয়া যাচ্ছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এস্কান্দারকে বললেন, 'চল, বাড়ির দিকে যাই'।

এস্কান্দার বলল, 'আপনে বলছিলেন ফজু ব্যাপারী বাড়ির পিছের সুপারীর বাগান দেখতে যাইবেন।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যেন খানিক চমকালেন। বললেন, 'ও, তাই তো! চল, চল, বাগানটা দেইখাই যাই।'

বেপারী বাড়ির পেছনের সুপারীর বাগান দেখতে যাওয়ার কথাটি যে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ভুলে গিয়েছিলেন, বিষয়টি তা নয়। বরং সেটি তার ভালো করেই মনে আছে। কিন্তু তিনি অবচেতন মনেই বজলু ব্যাপারীর বাড়ি, বাড়ির আশপাশটা এড়িয়ে চলতে চান। এমন না যে সেই বহুবছর আগে ভুলক্রমে খুন করে ফেলা বজলু ব্যাপারীর কথা মনে করে তিনি বজলু ব্যাপারীর বাড়ি এড়িয়ে চলেন। এই নিয়ে তার মধ্যে কোনো অনুশোচনা বোধও নেই। বরং কোনো এক অদ্ভুত কারণে তিনি বজলু ব্যাপারীর উপর ক্ষিপ্তই ছিলেন। তার কন্যা কোহিনূরকে নিয়ে সেই শৈশবে যখন বজলু ব্যাপারীর বাড়ির আমড়া গাছে বসে থাকার গুজব ছড়াল, সেই সময়ও তিনি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক শাস্তিই বজলু ব্যাপারীকে দিয়েছিলেন।

বজলু ব্যাপারীর প্রতি এই সুপ্ত ক্ষোভের পেছনে একটা কারণ হয়তো রয়েছে, কিন্তু সেটি তেমন স্পষ্টও নয়। সেই কারণের কথা তৈয়ব উদ্দিন খাঁও প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছেন। হয়তো সেই প্রায় বিস্মৃত ঘটনাই বজলু ব্যাপারীর প্রতি একটা সুপ্ত ক্ষোভ পুষে রাখতে তাকে অবচেতনেই সাহায্য করেছিল। তবে বজলু ব্যাপারীর ঘটনায় অনুশোচনা না থাকলেও নিজের ভেতরে ভেতরে অবচেতনে যে কিছু একটা রয়েই গেছে, তা তিনি টের পান। এই কিছু একটা কখনোই ধরতে পারেননি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। কিংবা নিজে নিজেই হয়তো অতি সতর্কতায় বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আজ সুপারি বাগান দেখা শেষে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মন কেন যেন খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি হঠাৎ এস্কান্দারকে ডেকে বললেন, 'সলিমুদ্দি দফাদারের বাড়িখান দেখছস?'

এস্কান্দার বলল, 'হ, দাদাজান। আহারে, কী বাড়ির কী সুরৎ হইছে!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এইটাই দুইন্যার রীতি। কথায় আছে না, নদীর এই পাড় ভাঙলে, ওই পাড় গড়ে! আইজ যে আমির, কাইল সে ফইর? এইটা একটা গোল চক্করের মতো। ঘুইরা-ফিইরা এই চক্কর চলতেই থাহে। ওই সলিমুদ্দি দফাদারের দাদা, পর দাদারা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বংশ আছিল।

মাঝখানে মাত্র দুই-তিন পুরুষ। সেই বংশের এহন নাম-নিশানাও নাই। এই যে বজলু ব্যাপারী, তার পোলার নাম জানি কী? ফজু না? ফজলু ব্যাপারী?'

এস্কান্দার বলল, 'জ্বে দাদাজান'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এই বজলু ব্যাপারীর বাপের দাদায় আছিল বিশাল ব্যবসায়িত। বালামি চাউলের নাওয়ে কইরা দ্যাশ-বিদ্যাশ জিনিসপত্র লইয়া সওদা কইরা বেড়াইতো। তহন তো গাঁও গেরামের কারো হাতে নগদ টাকা-পয়সা কিছু থাকত না। কারো কাছে দুই একখান আধলি আছে মানে সে বড়লোক। সেই সময়ে সে দ্যাশ-বিদ্যাশে সওদা কইরা বহুত নগদ কাঁচা পয়সার মালিক হইছিল। বাহারি জিনিসপত্রও কিনত। একবার হুনছিলাম কোনো এক বন্দরে পানির দরে গয়না কিনছিল। বহুত পয়সার সোনার গয়না। সেই গয়না লইয়াও আইছিল। কিন্তু গয়না থাহে নাই। বাজানের কাছে হুনছিলাম, সেই গয়না নাকি সে কিন্যা আনে নাই। কোনো জমিদারের বিরাট বজরা ডুবছিল, বজরার যাত্রীরা কেউ বাঁচে নাই। পরের দিন তার নাও ভিড়ছিল সেই বজরার ধারে। লাশগুলা আশেপাশে সব ভাইস্যা উঠতেছিল। মহিলাগো সংখ্যাই আছিল বেশি। সব জমিদারের মাইয়া, বউ, নর্তকী এইসব। তাগো শরীলভর্তি আছিল সোনার গয়না। সে নাকি সেইসব লাশের শরীলেরতন সেই গয়না ছুটাই আনছিল। শোনা কথা। বাজানে ছোট থাকতে আমারে কইছিল।'

এস্কান্দার হা করে তাকিয়ে আছে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর দিকে। সে কৌতূহলবশত বলল, 'হেরপর? হেই গয়নার কী হইছে?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ব্যাপারী সাবের নাকি বউ আছিল তিন জন। সেই গয়নার ভাগ নিয়া তিন সতিনের মইধ্যে লাগল ঝগড়া। ঝগড়া তো ঝগড়া, একদম রক্তারক্তি কাণ্ড! সেই ঝগড়া গড়াইল চুলাচুলি পর্যন্ত। ব্যাপারী সাবে শেষমেশ সিদ্ধান্ত দিলেন, বড় বউ পাইব সবচেয়ে বেশি। তারপর পাইব মাইঝ্যা বউ। আর সবচাইতে কম পাইব ছোট বউ। ব্যাপারী সাবরে সামনাসামনি সবাই খুব ডরাইতো, এইজন্য তহন আর কেউ উচ্চবাচ্য কিছু করে নাই। কিন্তু দিন দুই বাদে ব্যাপারী সাব গেছেন গঞ্জে। আইস্যা দেহেন বাড়ির উঠানে বড় বউ আর মাইঝ্যা বউর লাশ। ছোট বই তাগো খাওনে বিষ দিয়া রাখছিল। কিন্তু সারা বাড়ি খুইজ্যাও আর ছোট বউরে পাওয়া গেল না। তারে পাওয়া গেল দুই তিন দিন পর গাঙের পানিতে। সে রাগের মাথায় বিষ দিয়া দুই সতীনরে মারছিল ঠিকই, কিন্তু মারনের পর আর নিজেরে সামলাইতে পারে নাই। নিজেও গাঙের পানিতে ডুইব্যা মরছে।'

এস্কান্দার উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'সেই গয়নার কী হইছে?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এইটাই রহস্য। সেই গয়না আর কেউ খুঁইজ্যা পায় নাই।'

এস্কান্দার আরো একবার ভারি হতাশ হলো। সে বলল, 'কেউ পায় নাই? তাইলে গেল কই?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সেইটা কেউ জানে না। তয় সবাই বলছিল, ছোট বউ সেই গয়না কোনো কলসে ভইরা, সেই কলসি গলায় বাইন্ধাই গাঙে ঝাঁপ দিছিল। সে ডুইবা মরছে। দিন কয়েক পর ভাইস্যাও উঠছে তার লাশ। কিন্তু সেই কলসি আর ওঠে নাই। সেই সময় গাঙ আছিল বিরাট বড়। এই কূল ওই কূল ঠিক আছিল না। সেই গাঙে তো আর সেই কলসি খোজন যায় না। তারপরও নানান সময় নানান মানুষজন সাধ্যমতো চেষ্টা করছিল, কিন্তু কেউ পায় নাই। আর আল্লাহরই এমন কুদরত। সেই ঘটনার পর থেইক্যা শুরু হয় ব্যাপারী সাবের পতন। এক ঝড়ে মালামাল সহ নাও ডোবল। ব্যবসায় একের পর এক লোকসান। এর মধ্যে তার হইল কালা জ্বর। তিন দিনের মধ্যে মারা গেলেন তিনি। কয়েক বছরের মধ্যে সেই বংশ পথের ফইর হইয়া গেল।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। তাকে সত্যি সত্যিই দুঃখিত মনে হচ্ছে। তিনি নিজে এইসব ঘটনা মনে করেই নানাভাবে চিন্তিত। একটা চক্র যেন ঘুরছে। সেই চক্র কাউকে তুলে দিচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের, প্রাপ্তির শীর্ষে। আবার কাউকে শীর্ষ থেকে মুহূর্তে নামিয়ে আনছে মাটিতে। এটাই তার ভয়। তিনি ভাগ্যে, অদৃষ্টে বিশ্বাস করা মানুষ। তারপরও চেষ্টা বলে একটা ব্যাপার আছে। দূরদৃষ্টি আর চেষ্টা থাকলে অনেক কিছুই সম্ভব। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ফজু ব্যাপারীর বাড়ির পাশের খেতের আইল ধরে হেঁটে রাস্তায় উঠলেন। তারপর হঠাৎ কী মনে হতে গলা চড়িয়ে ফজু ব্যাপারীকে ডাকলেন, 'ফজলু, ও ফজলু বাড়ি আছনি?'

এস্কান্দার আজ তৈয়ব উদ্দিন খাঁর আচরণে যথেষ্টই অবাক হচ্ছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এভাবে অন্য বাড়ির কাউকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে ডাকার মানুষ নন। সে বলল, 'দাদাজান, আমি ডাকব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'দেখ তো বাড়িতে কেউ আছেনি? অগো বাড়ির ভিটার মাটি তো বিষ্টিতে ধুইয়া সব আমার জমিনে নাইম্যা যাইতেছে। ডাক তো ফজুরে।'

এস্কান্দার হন্তদন্ত হয়ে ফজু ব্যাপারীর বাড়ি ঢুকল। ফজুর ঘরের দরজা খোলা। এস্কান্দার বারকয়েক গলা চড়িয়ে ফজু ব্যাপারীকে ডাকল। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিলো না। বাড়ির উঠান পেরুলেই ডান দিকে ঢাল। ঢাল আরো খানিকটা খোলা সমতল জায়গা রেখে আবার নেমে গেছে খালে। সে সেই ঢাল বেয়ে ফজু ব্যাপারীকে উঠে আসতে দেখল। তার সাথে আরো দুই অল্পবয়স্ক ছেলে। এস্কান্দার ফজু ব্যাপারীকে দেখে বলল, 'ও ফজু, বাড়িঘর ফাঁকা রাইখ্যা, দুয়ার খোলা রাইখ্যা কই থাহো? কতক্ষণ ধইরা গলা ফাটাইয়া ডাকতেছি?'

ফজু বলল, 'আমাগো আর বাড়ি ঘর! দুয়ার খোলা থাকলেই কী, আর না থাকলেই কী! ঘরে কী আর কিছু আছে যে মাইনষে নিব?'

এস্কান্দার বলল, 'বড় খাঁ সাব আইছেন। রাস্তায়। তোমার লগে যেন কী কথা বলবেন।'

ফজু হঠাৎ তটস্থ হয়ে উঠল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত সে দিশেহারার মতো করতে লাগল। তারপর দৌড়ে ঘরে ঢুকল। ঘর থেকে একখানা চেয়ার বের করে উঠানের ছোট আমগাছটার ছায়ায় রাখল। তারপর গলা চড়িয়ে স্ত্রী সালেহাকে ডাকতে লাগল। রাতের এঁটো বাসন ধুতে সালেহা গিয়েছে খালে। সে খালপাড় থেকেই চেঁচিয়ে জবাব দিলো। ফজু বলল, 'বড় খাঁ সাবে আসছে। তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে আসো। তারে কিছু খাইতে তো দিতে হবে!'

সালেহা কি বলল, তা আর শোনা গেল না। ফজু দৌড়ে ছুটে রাস্তায় গেল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ভাবছিলেন তিনি আর বাড়িতে ঢুকবেন না। কিন্তু তাকে বাড়িতে ঢুকতেই হলো। তিনি অতি সামান্য কিছু কথাবার্তা বললেন ফজু ব্যাপারীর সাথে। কিন্তু উঠতে যেতেই ফজু বলল, 'বেয়ান বেলা অনেক হাঁটছেন। এক গেলাস লেমুর শরবত খাইয়া যান দাদাজান।'

সে সালেহাকে গলা চড়িয়ে ডাকল। সালেহা ফুল তোলা কাচের গ্লাসে লেবুর শরবত নিয়ে এলো। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এতক্ষণ বোঝেননি যে তার কী প্রবল তেষ্টা পেয়েছে। তিনি সাধারণত বাড়ির বাইরে কোথাও কিছু খান না। কিন্তু সালেহার হাতে শরবতের গ্লাস দেখে তার বুকটা কেমন হাঁসফাঁস করতে লাগল। তিনি সালেহার হাত থেকে গ্লাসটা নিলেন। তারপর ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে পুরো গ্লাস শেষ করে ফেললেন। সালেহা তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি হঠাৎ গ্লাসটা আবার বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আরেক গ্লাস দেও তো'।

সালেহা শরবত বেশিই করেছিল। সে ঘর থেকে আরো এক গ্লাস শরবত নিয়ে এলো। গ্লাসটা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হাতে দিয়ে সে সামান্য সরে গিয়ে দাঁড়াল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ঢকঢক করে শরবত খেতে গিয়ে আচমকা স্থির হয়ে গেলেন। তার চোখ আটকে গেল সালেহার বাহুতে। তার বাহু কামড়ে ধরে বসে আছে একখানা বাজু। সোনার বাজুবন্দ।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর অভিজ্ঞ চোখ সেই সোনার বাজুবন্দে চুম্বকের মতো আটকে রইল। তিনি শরবত থেকে আর পরের ঢোক নিলেন না। আসলে পরের ঢোক নিতে তিনি ভুলে গেছেন। সালেহার বাহুতে এই গয়না কোত্থেকে এলো? এই গয়নার নকশা তার চেনা। এই নকশা চিনতে তার ভুল হবার কথা না।

www.boighar.com

হেমা খবরটা শুনে দীর্ঘ সময় স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। তার ধারণা ছিল আজকাল কোনোকিছুই তাকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। সে সংবাদটা নিতে পারছিল না। তার মা'র সাথে সব সময়ই একটা দূরত্ব তার ছিল। রেণু গম্ভীর, অন্তর্মুখী-স্বভাবের স্বল্পভাষী মানুষ। এই কারণেই কারো সাথেই তার আলাদা করে তেমন একটা বন্ধুত্ব বা সখ্যতা হয় না। সে তুলনায় বাবা আহমেদ আসলাম ঝলমলে প্রাণবন্ত মানুষ। চট করে মানুষের মনে ঢুকে যাওয়ার ক্ষমতা তার রয়েছে। তিনি গল্প-আড্ডায় সকলের মধ্যমণি হয়ে থাকেন। ভালো গান গাইতে পারেন। সেন্স অফ হিউমার ভালো। দেখতে সুদর্শন। সব মিলিয়ে তার বাবা-মা দু'মেরুর দুজন মানুষ।

সেই দু'মেরুর দুজন মানুষের মধ্য থেকে তাই আর সকলের মতো হেমারও তার বাবার সাথেই সম্পর্কটা ভীষণ গাঢ়। হেমা বাবার সাথে তার কত কী যে শেয়ার করে! নয়নের সাথে তার সম্পর্ক থেকে শুরু করে রাহাতের গল্প। ক্লাসে ঘটে যাওয়া কোনো মজার ঘটনা থেকে শুরু করে কোনো বান্ধবীর দুম করে পালিয়ে বিয়ে করে ফেলা অবধি। আবার দর্শন, আর্ট, রাজনীতির মতো গুরুতর বিষয় নিয়েও তাদের দীর্ঘ আলাপ চলে।

নয়নকে আসলাম সাহেবের পছন্দ। পছন্দের কারণ এই নয় যে, নয়নের কোনো কর্মকাণ্ডে তিনি দারুণভাবে মুগ্ধ। বরং তার মনে হয়েছে, নয়ন আর হেমাও দুই মেরুর দুজন মানুষ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কারণে হলেও এদের পরস্পরকে পরস্পরের দরকার। সেখানে একজন ছায়া বিছিয়ে দিলে, সেই ছায়ায় নির্ভার আশ্রয় খুঁজে পরম শান্তিতে ডুবে থাকতেও তো অন্য একজনকে দরকার। হেমা ছায়াময়ী বৃক্ষ হলে নয়ন সেই অন্য কেউ।

বারকয়েক নয়নের সাথে আসলাম সাহেবের কথাও হয়েছে এবং সেই থেকে আসলাম সাহেবের একটা বদ্ধমূল ধারণা, হেমার জন্য নয়নকে যতটা না দরকার, তার চেয়ে হেমাকেই ঢের বেশি দরকার নয়নের। হেমা যেন লতিয়ে

ওঠা কোনো গাছের পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা খুঁটি। এই অদ্ভুত বিষয়টা কী করে এমন অল্প বয়সেই হেমা রপ্ত করে ফেলল, আসলাম সাহেবের কাছে তা এক বিস্ময়।

জোছনা রাতে বাপ-মেয়ে মিলে যখন এইসব নানান বিষয় নিয়ে খোলা ছাদে খোশগল্প চলে, তার মা রেণু তখন পরীক্ষার খাতা দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে হাই তোলেন। এই সময়ে মাকে ডাকতে এসে মাঝে-মধ্যে তার গম্ভীর গলার ধমকও হেমা খেয়েছে। ফলে মা তার কাছে যতটা না মা, তার চেয়েও বেশি হয়ে উঠেছেন রাগী স্কুল শিক্ষক। আর বাবা হয়ে উঠেছেন ক্রমশ বন্ধু।

খানিক আগে মেজো খালার ফোনটা পেয়ে প্রথমে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি হেমার। এমনিতেই নানা বাড়িতে খুব একটা যাওয়া-আসা নেই তাদের। কোনো এক অদ্ভুত কারণে রেণুও চান না, এই যোগাযোগটা থাকুক। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই হেমার নিজের একটা আলাদা জগৎ গড়ে উঠেছিল। ফলে আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে সেও কখনোই তেমন কোনো আগ্রহ দেখায়নি। একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো যেন এই পরিবারটি। হেমার নানা-নানীও বেঁচে নেই, ফলে কেবল এই মেজোখালাই কালেভদ্রে ফোন দিয়ে খবর নেন। যদিও সেই ফোনের বেশিরভাগ সময় জুড়েই থাকে নানান অভিযোগ-অনুযোগ।

কিন্তু মেজোখালা আজ ফোন দিয়েই কড়া গলায় বললেন, 'এত বড় ধাড়ি মেয়ে হয়েছিস, খোঁজ-খবর কিছু রাখিস?'

হেমা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কী হয়েছে খালা?'

মেজো খালা বললেন, 'আবার জিজ্ঞেস করছিস কী হয়েছে? তোর বাবা কি করেছে শুনেছিস?'

হেমা বলল, 'কী করেছে?'

মেজো খালা ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'তুই কিচ্ছু শুনিসনি? কিচ্ছু জানিস না? নাকি বাপের চরিত্র সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনতে চাস না?'

হেমার এবার বিরক্ত লাগতে শুরু করল। সে বিরক্ত গলায় বলল, 'খালা যা বলার স্পষ্ট করে বলো। এত পেঁচিও না।'

মেজো খালা যেন রেগে গেলেন। তিনি গলা চড়িয়ে বললেন, 'আমি প্যাঁচাই না? আমি প্যাঁচাই? যা আর প্যাঁচাব না। এখন সৎ মা ঘরে আসলে তার গলা জড়িয়ে ধরে আহ্লাদ কর। সে সব প্যাঁচ খুলে দিবে। ধাড়ি মেয়ে হয়েছে, কিন্তু বাপ যে কোথায় কোন নষ্টামি করে বেড়ায় সে খেয়াল নেই! বাপ যে তলে তলে বছরখানেক আগেই আরেকটা বিয়ে করেছে, সে খবর রাখিস? রাখিস না। আমরা আর কে? আমরা এতদিনও কিছু ছিলাম না। আর এখন তো আরো থাকলাম না। এখন নতুন মা হয়েছে, নতুন খালাও হবে। তারা খুব আদর আহ্লাদ করবে।'

www.boighar.com

হেমার আর কথা শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। সে ফোনটা কেটে দিলো। তার বাবা বিয়ে করেছেন! বাবা-মায়ের মধ্যে সব সময়ই একটা শীতল দূরত্ব। তবে সেটি যে মায়ের কারণেই সে বিষয়ে সে এতদিন ধরেই নিশ্চিত ছিল। তাছাড়া বাবাকে তার সবসময়েই বুদ্ধিমান, সংবেদনশীল মানুষ বলেই মনে হয়েছে। সে নানান ঘটনায় দেখেও এসেছে যে বাবা মা'র মাঝে শীতল পরিবেশটা বিভিন্ন উপায়ে উষ্ণ করার চেষ্টাটা সব সময় বাবাই করতেন। মা বরং তাতে খুব একটা সাড়া দেননি। বাবার প্রতি প্রবল আস্থা ছিল বলেই সে কখনো এই বিষয়ে আগ বাড়িয়ে কাউকে কিছু বলতে বা কারো কাছ থেকে কিছু শুনতেও যায়নি।

হেমা চুপচাপ বসে রইল। রেণু কলেজ থেকে ফিরলেন সন্ধ্যাবেলা। হেমার হঠাৎ মনে হলো আজ মার সাথে সে কিছুক্ষণ কথা বলবে। কিন্তু কেমন একটা আড়ষ্টতা কাজ করছিল তার মধ্যে। মাকে গিয়ে কী বলবে সে?

হেমা শেষ অবধি গেল না। তার মধ্যে এখনো একটা দ্বিধা কাজ করছে! বাবা এমন একটা কাজ করতে পারে এটা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। বাবার সাথে তার কথাও হচ্ছে না বেশ কিছুদিন। সে কি বাবাকে একটা ফোন করবে? হেমা পুরোটা সন্ধ্যা বারান্দায় বসে রইল। আজকাল ইলেক্ট্রিসিটি খুব যাচ্ছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই দপ করে নিভে যায় আলো। আজও গিয়েছে। সে চুপচাপ বসে রইল বারান্দায়। কাঁধের উপর আলতো হাতের স্পর্শে হেমা চমকে উঠল। সে ভেবেছিল মা। কিন্তু হেমা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তার বাবা। বাবার মুখে সেই ঝলমলে ভাবটা নেই। খানিক চিন্তিত, বিষাদগ্রস্ত ভাব। আসলাম সাহেব বললেন, 'একটু আমার সাথে আসবি?'

হেমা বাবার কথার জবাব দিলো না। তবে সে উঠে দাঁড়াল। বাবার পেছন পেছন সে তার ঘরে ঢুকল। আসলাম সাহেব কিছুক্ষণ চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'বিষয়টা তোকে আগেই জানানো উচিত ছিল। কিন্তু কিছু বিষয় নিয়ে আমার কারো সাথেই কথা বলতে ইচ্ছে করে না।'

হেমা এবারও কথা বলল না। আসলাম সাহেব বললেন, 'কথা বলতে ইচ্ছে না করার পেছনে কারণ রয়েছে। খুবই যৌক্তিক কারণ। কিন্তু এই যৌক্তিক কারণগুলো বেশিরভাগ মানুষের কাছেই মনে হবে যুক্তিহীন।'

হেমা বাবার দিকে মুখ তুলে তাকাল। আসলাম সাহেব বললেন, 'তুই যথেষ্ট বড় হয়েছিস। আমার ধারণা তোর বয়সের আর আট দশটা মেয়ের চেয়ে তোর বোঝাবুঝিও যথেষ্ট পরিণত। তারপরও আমি বিষয়গুলো নিয়ে কখনো তোর সাথে কথা বলবার মতো সাহস করে উঠতে পারিনি।'

হেমা এবার কথা বলল। সে শান্ত, স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তুমি কী বিয়ে করেছ?'

আসলাম সাহেব সামান্য সময়ের জন্য থমকে গেলেন। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, 'আমি বিয়ে না করলে তুই কোথেকে এলি?'

হেমা হাসল না। সে একইভাবে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি ঠাট্টা করছি না বাবা। সত্যিটা জানতে চাইছি।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'আরো অনেকেই আমাকে ফোন করে জানতে চাইছে। কেউ কেউ সরাসরি। কেউ কেউ আকারে-ইঙ্গিতে। সমস্যা হচ্ছে, আমার বিয়ের খবরটা আমি ছাড়া অনেকেই জানে।'

সামান্য কথা। কিন্তু হেমার বুক থেকে যেন পাথর ভার নেমে গেল। আসলাম সাহেব এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। খানিকটা এলোমেলো পায়চারি করে আবার এসে বসলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আমি এখন যেটি বলব সেটিও কম কষ্টকর কিছু না।'

www.boighar.com

হেমা মুহূর্তের মধ্যে আবার থমকে উঠল। তবে এবার আর কোনো কথা বলল না। আসলাম সাহেব ঠান্ডা গলায় বললেন, 'উই আর গেটিং ডিভোর্স'।

তিনি খানিক থামলেন। হেমা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। সে যেমন করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, তেমনই তাকিয়ে রইল। আসলাম সাহেব বললেন, 'সিদ্ধান্তটা হঠাৎ নয়। দীর্ঘদিনের ভাবনা, প্রস্তুতির ফসল। আর একটা কথা, আশা করি বাবাকে তুই চিনিস। সে এমনি এমনি এই সিদ্ধান্ত নেয়নি। সে আর এই সম্পর্কটা বইতে পারছিল না।'

হেমা বলল, 'তুমি কি অন্য কোনো রিলেশনে ইনভলভড বাবা?'

আসলাম সাহেব হাসলেন। মলিন হাসি। তারপর বললেন, 'এই বয়সে কি অন্য কোনো সম্পর্কে ইনভলভড না হলে মানুষ ডিভোর্স নেয় না?'

হেমা বলল, 'নাহ্। নেয় না। নিলে সবচেয়ে বেশি এই কারণটাতেই নেয় বাবা। তোমার বয়স কত এখন? অলমোস্ট ফিফটি? এই বয়স থেকেই মানুষের ক্রমশই নির্ভরতা দরকার হয়। তার স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজনরা তার সেই নির্ভরতা। যদি না এর চেয়ে বেশি কোনো নির্ভরতার সন্ধান সে পায়, তাহলে সে কেন এত বছরের সম্পর্কটা ভাঙবে বলো?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'নির্ভরতাটা কিসের?'

হেমা সাথে সাথে জবাব দিতে পারল না। সে খানিক চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'লাভ? কেয়ার?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'নির্ভরতাটা একেকজনের কাছে একেক রকমের। মানুষ এই যে বেঁচে থাকে। এই বেঁচে থাকার পুরোটা সময় জুড়ে সে কি চায় জানিস?'

হেমা বলল, 'কী?'

www.boighar.com

আসলাম সাহেব বললেন, 'শান্তি। আনন্দ। মানুষ যা-ই করুক, তার মূল লক্ষ্য হলো শান্তি। ধর কেউ কারো ক্ষতি করছে। কিন্তু মানুষ কেন কারো ক্ষতি করবে? সে কারো ক্ষতি করছে নিজের শান্তির জন্য, লাভের জন্য, আনন্দের জন্য। এই যে ধর মানুষ ধর্ম পালন করে। পুরো পৃথিবী জুড়ে এই যে এত এত ধর্ম। এই প্রতিটি ধর্মের মানুষই ধর্ম পালন করে তার শান্তির জন্য। তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, সে তার ধর্ম পালন করলে, মৃত্যুর পর সে অনন্ত শান্তি পাবে। আবার সে তার এই শান্তির জন্য কিন্তু অন্যের অশান্তির কারণও হচ্ছে! হচ্ছে না? খুন-খারাবি, যুদ্ধ-হানাহানি। রোজ রোজ কত কত কিছু। এই সকল কিছুর পেছনেই কিন্তু যুক্তি এই একটাই, সকলেই তার মতো করে শান্তি চায়। কেউ শান্তির পাওয়ার জন্য খারাপ কাজ করে, খুন করে, কেউ শান্তি পাওয়ার জন্য জীবন বাঁচায়, ভালো কাজ করে। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, সেটি ভালো হোক আর মন্দ, তার পেছনে রয়েছে কারো না কারো শান্তিতে থাকার, আনন্দে থাকার কারণ।'

হেমা বলল, 'তুমি আর মার সাথে থাকতে আনন্দ পাচ্ছ না? শান্তি পাচ্ছ না?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'আমি একা না। সেও পাচ্ছে না। আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছি না।'

হেমা বললে, 'ডিভোর্স নেয়ার মতো এমন তিক্ততা কতদিন থেকে বাবা?'

আসলাম সাহেব সাথে সাথে জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'এমন অনেকবারই হয়েছে। কিন্তু এবার আর কোনো সুযোগ নেই।'

হেমা মৃদু হাসল। তারপর বলল, 'কেন? তুমি কি এর চেয়ে শক্তিপূর্ণ আর কারো খোঁজ পেয়ে গেছ?'

হেমার ওই মৃদু হাসিটুকুতে কী ছিল কে জানে! আসলাম সাহেব সামান্য অপ্রস্তুত হলেন। হেমা বলল, 'আমি বড় হয়েছি বাবা। মার থেকে তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা অনেক বেশি ফ্রেন্ডলি। তুমি বিষয়টা আমার সাথে শেয়ার করতে পারতে। আমার সব সময়ই তোমার প্রতি আলাদা একটা সমীহ কাজ করত। মনে হতো, জগতের কোনো সমস্যাই তোমার কাছে সমস্যা না। তুমি সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারো। আর...'

হেমা কথা শেষ না করেই থেমে গেল। আসলাম সাহেব অবশ্য সাথে সাথেই হেমার কথা ধরলেন। তিনি বললেন, 'আর এই সামান্য সমস্যাটা আমি কেন মেটাতে পারলাম না, তাই তো?'

তিনি প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে হেমার চোখের দিকে তাকালেন। হেমাও তাকিয়ে আছে তার দিকে। আসলাম সাহেব বললেন, 'তোর কি কখনো মনে হয়েছে,

এই ঝলমলে হাসিখুশি আমি মানুষটার ভেতর প্রচণ্ড নিঃসঙ্গ একজন মানুষ বাস করে? মনে হবার কথা না। আমি কাউকে কখনোই মনে হতে দিতে চাইনি। বছরের পর বছর আমি চেষ্টা করে গেছি। কিন্তু ফলাফল শূন্য। এই দীর্ঘ জীবনে এমন কখনো হয়নি যে আমি দেরি করে ঘরে ফিরে দেখেছি যে তোর মা আমার জন্য না খেয়ে অপেক্ষা করছে। এমন কখনো হয়নি। আমি জগতের আর সকলের কাছে স্বতস্ফূর্ত একজন মানুষ। কিন্তু এই একজন মানুষের কাছে আমি সারাটা জীবন কুঁকড়ে থেকেছি, জড়তায়, অপরাধবোধে।'

হেমার আজ মুহুর্মুহু চমকে যাবার দিন। কই, এই এতদিনে হেমা কখনোই তো শোনেনি যে মা'র সাথে বাবা এমন কিছু করেছে, যার জন্য বাবা এমন প্রবল অপরাধবোধে ভুগছে! সে সরু চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল, তারপর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ডাকল, 'বাবা!'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তোর মা'র সাথে আমার বিয়েটা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। তুই জানতি, তোর নানা আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন। তার কোনো পুত্রসন্তান ছিল না বলেই কিনা জানি না, তিনি আমাকে অসম্ভব পছন্দ করতেন। প্রচণ্ড একগুঁয়ে মানুষ ছিলেন তিনি। পরিবারে তার কথাই শেষ কথা। সেই সূত্রেই এই বিয়ে। কিন্তু এর ভেতরে একটা অস্বাভাবিক গল্পও রয়েছে। এই গল্পটা একজন বাবার পক্ষে তার সন্তানকে শোনানো কঠিন।'

আসলাম সাহেব চোখ থেকে চশমা খুলে শার্টের হাতায় চশমার কাচ মুছলেন। তারপর বললেন, 'বিয়ের যখন সবকিছু ঠিকঠাক, তখন, একদম শেষ মুহূর্তে এসে রেণু আমাকে একটা চিঠি লিখল। সে লিখল, সে এই বিয়ে করতে পারবে না। কারণ, তার বিয়ে হয়ে গেছে! রেণুর বয়স তখন বেশি না। ইন্টারমিডিয়েট পড়ে। সদ্য ইউনিভার্সিটি পাশ করা একটা ছেলে রেণুকে পড়াত। সেই সূত্রেই প্রেম। ছেলেটা তখনও চাকরি-বাকরি কিছু পায়নি। অল্প বয়সের সম্পর্ক। রেণু লুকিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে হঠাৎ বিয়ে করে ফেলল। কিন্তু এই ঘটনা বাসায় কেউ জানে না। ছেলেটা তখনও রোজ বাসায় এসে তাকে পড়িয়ে যায়। এদিকে একদম শেষ মুহূর্তে এসে সে এই ঘটনা আমাকে জানাল। তখন বিয়ের মাত্র দু'দিন বাকি। বিয়ের বিশাল আয়োজন। কী করব তখন আমি?'

আসলাম সাহেব সামান্য থামলেন। যেন তিনি হেমার কাছে সমস্যার সমাধান চাইছেন। কিন্তু হেমার মনে হচ্ছে এই মানুষটি যে গল্প তাকে বলছেন, তা পুরোপুরি অসম্ভব কষ্টে-সৃষ্ট একটা গল্প। এই গল্পটি তিনি খুব একটা না ভেবেই তৈরি করছেন। এমন হয়, মানুষ যখন কোনো দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ভেঙে দিতে চায় তখন সে নানান অজুহাত দেয়। হাজারটা যুক্তি দেয়, হাজারটা কারণ

দেখায়। হেমার মনে হচ্ছে তার বাবাও তেমন কিছুই করছেন। কিন্তু গল্পের প্লটটা খুব আনাড়ি আর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হেমা এর শেষটা শুনতে চায়।

আসলাম সাহেব বললেন, 'রেণু আমাকে বলল, সে চায়, আমি যেন বিয়েটা ভেঙে দেই। কিন্তু বিয়ে ভাঙার কারণ হিসেবে যেন কোনোভাবেই সত্যটা না বলি। অন্য কোনো কিছু আমাকে বলতে হবে। কারণ তার বাবা তখন অসুস্থ। রেণু তার জেদটা পেয়েছে তার বাবার কাছে থেকেই। আর সে এও জানে, এই ঘটনা জানার পর এর প্রতিক্রিয়া মোটেই ভালো কিছু হবে না। কিন্তু আমার তখন দিশেহারা অবস্থা। কাল বাদে পরশু বিয়ে, কত কত আয়োজন, গ্রাম থেকে আত্মীয়-স্বজন সব ঢাকায় চলে আসছে। আরো হাজারটা বিষয়। ভয়াবহ অবস্থা। পাগলের মতো হয়ে গেলাম আমি। কাউকে কিছু বলতেও পারছি না। বিয়ের আগের দিন আমি উদ্ভ্রান্তের মতো রেণুদের বাসায় গেলাম। আমার তখন মাথা কাজ করছিল না। মনে হচ্ছিল, এই সমস্যার একমাত্র সমাধান রেণুর বাবা। আমি তার কাছে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। রেণুর চিঠিটা তাকে দেখালাম। আমি ভেবেছিলাম ঘটনা শুনে তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করবেন। কিন্তু তিনি তেমন কিছুই করলেন না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার এক ল'য়ার বন্ধুকে ফোন দিয়ে বাড়িতে আনালেন। আনালেন ছেলেটাকেও। তারপর রেণুকে ডেকে শান্ত গলায় বললেন যত দ্রুত সম্ভব সে যেন ডিভোর্সের ব্যবস্থা করে। রেণু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তিনি হঠাৎ ভয়াবহ চড় বসালেন রেণুর গালে। রেণু ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তারপরের কিছু সময় তিনি রীতিমত উন্মাদ হয়ে গেলেন। কেউ তাকে থামাতে পারছিল না। রেণু সবার সামনে মরা মানুষের মতো পড়ে রইল মেঝেতে।'

আসলাম সাহেব জগ থেকে ঢেলে ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, 'সেখানেই তখনই ডিভোর্সের ফর্মালিটিজ হয়ে গেল। কিন্তু ডিভোর্সের কিছু প্রসিডিওর থাকে। তাতে কিছুদিন সময়ও লাগে। এবং ডিভোর্সের পরও একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগ অবধি আবার বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু রেণুর বাবা বললেন, বিয়ের অনুষ্ঠান যেমন হবার কথা ছিল, তেমনই পরদিনই হবে। কিন্তু বিয়ে হবে আরো পরে। কী অদ্ভুত ব্যাপার! পৃথিবীতে এমন ঘটনা আর হয়েছে কিনা জানি না। আগে বিয়ে হয়ে পরে অনুষ্ঠান হবার ঘটনা অহরহই ঘটে। কিন্তু আমাদের ঘটল সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা। রেণুর সাথে পরদিন জাঁকজমকভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠান হলো। কিন্তু বিয়েটা হলো না। সবাইকে জানানো হলো ঘরোয়াভাবে বিয়ে আগেই হয়ে গেছে। কেবল অনুষ্ঠানটাই বাকি ছিল। রেণু থেকে গেল তাদের বাড়িতেই। আসল বিয়ে হলো সব সমস্যা সমাধান হবার পর। এর মধ্যে রেণুকে আর ঘর থেকে বের হতে

দেয়া হলো না। আমি আমার দিকটা সামলালাম। ওই সময়টা আসলে আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। রেণুর বাবা যা বলতেন, অন্ধের মতো সেটাই করতাম। এরপর পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছর আমি এমন কিছু নেই যা করিনি। রেণু যাতে আমাকে এক মুহূর্তের জন্য হলেও ভালোবাসে। সামান্যতম হলেও যেন একজন স্বাভাবিক স্ত্রীর মতো আচরণ করে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আমি সেই চেষ্টাটা করে গেছি। পঁচিশটা বছর, কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও সে আমাকে বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়নি।'

আসলাম সাহেব সামান্য থেমে আবার বললেন, 'প্রথম দিন থেকেই সে আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি তখন ভেবেছি, যে অন্যায়টি আমি করেছি, সময়ের সাথে সাথে আর আমার চেষ্টায় সেই অন্যায়টি হয়তো মুছে দিতে পারব আমি। কিন্তু পারিনি। আমি রেণুর কষ্টটা বুঝেছি। দিনের পর দিন তার সেই কষ্টকর অনুভূতি মুছে দেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টাটা আমি করেছি। কিন্তু পারিনি। অথচ এই আমার একটা জীবনও কিন্তু আমি নষ্ট করেছি। সবাই বলতো একটা বাচ্চা-কাচ্চা হলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে সেটিও চায়নি। অনেক যুদ্ধের ফসল তুই। কিন্তু কিচ্ছু বদলায়নি। তুই তখন ছোট। আমি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরছি। পথে ভয়াবহ বাস এক্সিডেন্ট হলো। তিনজন স্পট ডেড। হাসপাতাল থেকে রেণুকে খবর দেয়া হলো। রেণু সেই খবর জানালো তার বাবাকে। ব্যস। তিনি ছুটে গেলেন আমাকে দেখতে। কিন্তু রেণু একটা ফোন অবধি করেনি। হাসপাতালে দেখতেও যায়নি। হাসপাতাল থেকে রিলিজ হয়ে বাসায় ফেরার পরও সে একবারের জন্যও জিজ্ঞেস করেনি, কেমন আছ! কি হয়েছে!'

আসলাম সাহেবের গলা ভারি হয়ে এসেছে। তিনি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলালেন। তারপর ভেঁজা গলায় বললেন, 'এই একটা জীবন আমি কাটিয়ে দিয়েছি সেই মানুষটার সাথে, যে আমাকে প্রতিমুহূর্তে কেবল ঘৃণা করেছে, উপেক্ষা করেছে। আর তার প্রতি আমার অনুভূতিটাকে সে জগতের সবচেয়ে সস্তা জিনিস হিসেবে প্রতিমুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলেছে। আমি সেইসব গল্প তোকে বলতে পারব না। এই যে এতসব বলে ফেললাম, হয়তো বাবা হিসেবে এইসব কিছুও তোকে বলা আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু আমি আর পারছিলাম না।'

আসলাম সাহেব চশমা খুলে চোখ মুছলেন। হেমা বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবার জন্য তার মায়া হবার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে কেন যেন তা হচ্ছে না। বরং মা'র সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। জানতে ইচ্ছে হচ্ছে একটা মানুষ বুকের ভেতর কী করে কারো জন্য সুদীর্ঘ সময় এমন তীব্র ভালোবাসা যত্ন করে পুষে রাখে? আবার একইসঙ্গে এমন তীব্র ঘৃণা পুষে রাখে!

www.boighar.com

আসলাম সাহেব দীর্ঘ সময় বসে রইলেন হেমার সামনে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন হেমা তাকে কিছু বলবে। কিন্তু হেমা কিছুই বলল না। সে বসে রইল চুপচাপ, নির্বিকার। একটা কথাও বাবাকে বলল না সে। আসলাম সাহেব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সময় নিয়ে ঘুরলেন। দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। স্পষ্ট শুনতে পাননি, কিন্তু তার কেন যেন মনে হলো তিনি অস্ফুট স্বরে শুনতে পেয়েছেন, হেমা পেছন থেকে তাকে ডেকেছে। এমন হয়, মানুষ যখন খুব করে কিছু চায়, তখন তার অবচেতন মন নানাভাবে বিভ্রম তৈরি করে। আসলাম সাহেব মুহূর্তখানেক দাঁড়ালেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার আবার মনে হলো, তিনি ভুল শুনেছেন। আচ্ছা, সব কথা শুনে হেমাও কী তাকে অপরাধী ভাবছে! তিনি আর পেছন ফিরে তাকালেন না। ত্রস্ত পায়ে হেমার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে হেমা আলতো করে হাত রাখলো বাবার কাঁধে। তারপর ডাকল, 'বাবা!'।

আসলাম সাহেব হঠাৎ হেমাকে জড়িয়ে ধরে ছোট্ট শিশুর মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। হেমা কিছু বলল না। সে দীর্ঘ সময় বাবাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

আসলাম সাহেব সেই রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাতে আর ঘরে ফিরলেন না। মা'র সাথেও দেখা হলো না হেমার। খাবার টেবিলে খাবার ঢাকা ছিল। কিন্তু কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না তার। রাতে ঘুমাতে গিয়েও সারারাত ছটফট করতে লাগল হেমা। শেষরাতে সে ঘুমের ঘোরে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখল। সে দেখল সে ছোট্ট ফুটফুটে এক শিশু। কিন্তু তাকে রাখা হয়েছে একটা করাতকলে করাতের সামনে। তার মাথার কাছে শিষ কেটে চলে যাচ্ছে সুতীক্ষ্ণ করাত। সামান্য এদিক-সেদিক হলেই করাতখানা ফালি হওয়া কাঠের মতো চিঁড়ে ফালি ফালি করে ফেলবে তার শরীর। সে যতটা সম্ভব তার শরীরটাকে গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। করাতখানা ক্রমশই এগিয়ে আসছে তার দিকে। কী করবে সে! প্রবল আতঙ্ক নিয়ে ঘুম ভাঙল হেমার। বাকি রাত সে আর ঘুমাতে পারল না। ভেতরে ভেতরে তার এক অদ্ভুত অনুভূতি হতে থাকল। মনে হতে লাগল, এই পৃথিবীতে সে এক অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু হিসেবে এসেছিল। তার মা তাকে চায়নি। তার বাবা তাকে চেয়েছিলেন বিশেষ এক কারণে। তাকে আলাদা করে তার জন্য কেউ চায়নি। হেমার নিজেকে বড্ড অনাহূত মনে হতে লাগল। বড় অনভিপ্রেত লাগতে লাগল। কী এক অদ্ভুত শূন্যতা, অদ্ভুত অভিমান আর কষ্ট হেমার বুকের ভেতর হু হু করে বয়ে যেতে থাকল!

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ উঠানের মাঝখানে চেয়ারে বসে রয়েছেন। তার পায়ের কাছে বসে আছে এস্কান্দার। এস্কান্দারের হাতে তার সেই পুরনো বন্দুকখানা। সে বন্দুকখানায় তেল মালিশ করছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ফজু ব্যাপারীর বউ সালেহার বাহুতে ওই গয়নাখানা দেখেছেন। নিজের চোখে না দেখলেও ওই গয়নার কথা যদি কেউ তাকে কেবল বর্ণনাও করত, তাহলেও তার চিনতে অসুবিধা হতো না। বছরের পর বছর ধরে তিনি ওই গয়না নানানভাবে খুঁজেছেন। সকালে সলিমুদ্দি দফাদারের বাড়িখানা দেখার পর থেকেই তার বুকের ভেতর কেমন একটা অস্থিরতা কাজ করছিল। তারপর আবার ফজু ব্যাপারীর বউয়ের এই ঘটনা।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দৈবে বিশ্বাস করা মানুষ। নানান ঘটনা, ইঙ্গিত তিনি বোঝার চেষ্টা করেন। এ সকল ঘটনায় কোনো ইঙ্গিত রয়েছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করেন। একইদিনে পরপর এমন দুটো ঘটনা কি তাকে কোনো বিশেষ ইঙ্গিত দিচ্ছে? ফতেহপুরের খাঁ বংশের এই বিশাল শৌর্য-বীর্যের কি তাহলে হাতবদল হতে যাচ্ছে? একসময় এই বিশাল ফতেহপুর অঞ্চল এক নামে শাসন করত ব্যাপারীরা। তারপর অল্প কিছু সময়ের জন্য দফাদাররা। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে খাঁ বংশ। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এই আশি বছরের দীর্ঘ জীবনকালে নানান কিছু দেখেছেন, শুনেছেন। সেইসব থেকেই তিনি জানেন, জগতের কিছু কিছু অদ্ভুত নিয়ম আছে। সেই নিয়ম মানুষ বোঝে না। সকলেই বলে, এ জগতে কোনো কিছুই অবিনশ্বর নয়। এই কথা যে তিনি মানেন না, তা নয়। তবে এই কথার বাইরেও একটা কথা রয়েছে। তা হচ্ছে এই জগতে কোনোকিছু পুরোপুরি নশ্বরও নয়। সকল কিছুই একটা চক্রের মতো। ফলে একই জিনিস ঘুরে-ফিরে নানান বেশে বারবার আসে। আসল বিষয় হচ্ছে সময়। ঘুরে-ফিরে সময়ের ব্যবধানে একই জিনিস বারবার ঘটায়। ফলে কোনো কিছুই পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না।

www.boighar.com

ফজু ব্যাপারী কি তাহলে তার পূর্বপুরুষের সেই অমূল্য সম্পদের খোঁজ পেয়ে গেছে! নাকি ঘটনাচক্রে এই একখানামাত্র গহনা সালেহ্যর কাছে ছিল। বা অন্য কোনো উপায়ে সে পেয়েছে। একটা বিষয়ে অবশ্য তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দ্বিধাগ্রস্ত। সেটি হচ্ছে যদি পুরো কলসভর্তি সোনা যদি ফজু ব্যাপারী পেয়ে থাকে, তবে সে তা এমন করে জনসম্মুখে বের করবে না। বরং যতটা সম্ভব লুকিয়েই রাখবে। তাহলে সালেহা এমন করে গহনা পরে তার সামনে এলো কেন? ভুল করে নয়তো? অনেক সময় এমন হয়, হুটহাট খুব দামি কিছু পেয়ে গেলে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে শখটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। তাছাড়া সবাই সব সময় নিজেকে সামলাতেও জানে না। কিন্তু আসল ঘটনাখানা জানার জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ।

তিনি তার স্ত্রী আমোদি বেগমকে ডাকলেন। আমোদি বেগম বাতের ব্যথায় কাতর। তিনি এসে চোখে মুখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে খানিক কুঁজো হয়ে দাঁড়ালেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমার শইলের অবস্থা কী?'

আমোদি বেগম বললেন, 'এহন আর শইলের ভালো মন্দ কী!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'শইলের এহন আর তহন নাই। একশ বছর বয়সেও শইল ভালো থাকলে মনে হয় বয়স হইছে চল্লিশ বছর। আবার চল্লিশ বছর বয়সেও শইল ভালো না থাকলে মনে হয় বয়স হইছে একশ'।

আমোদি বেগম বললেন, 'সবাই তো আর আপনের মতো না। একেকজনের শইল স্বাস্থ্য একেকরকম।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'শইলের নাম মহাশয়, যাহা সহায়, তাহাই সয়। আগে তো সহাই তো জানতে হইব। যাই হোক, এইসব জাইনা তোমার লাভ নাই। স্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব স্বামীর খোঁজ-খবর নেওয়া। ভালো মন্দ জানা। সেই দায়িত্বও তো তুমি কোনোদিন পালন করো নাই।'

আমোদি বেগম বললেন, 'আপনে রাহেন দুইন্যার মাইনষের খোঁজ। আপনের খোঁজ কে রাখব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ খানিক বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন, 'এই বয়সেও যে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু হইব না, সেইটা আমি ধারণা করি নাই। বয়সের সাথে বুদ্ধি হওনটা জরুরি।'

আমোদি বেগম এবার আর জবাব দিলেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমোদি বেগমের আচার আচরণে বিরক্ত। বহুদিন থেকেই তিনি আমোদি বেগমের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। আমোদি বেগমকে বিয়ে করার পর থেকে জৈবিক কারণ ছাড়া নিজের জীবনে আমোদি বেগমের আর কোনো গুরুত্ব কখনোই খুঁজে পাননি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ।

তিনি কেঁশে গলা পরিষ্কার করলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'পুরুষ মানুষ হইল বাইর, আর মহিলা মানুষ হইল ঘর। ঘর মানে মহল। মহল থেইকাই মহিলা। পুরুষ মানুষ যতই বাইরের দুইন্যা শাসন করুক, সে ঘরে আসলে তারে দেখনের মতো, শাসন করনের মতো একজন মহিলা থাকতে হয়। এই বুড়া বয়সে এইসব জিনিস তোমারে শিখাই কোনো লাভ নাই। যার হয় তার নয়-তেই হয়, আর যার হয় না তার নব্বইতেও হয় না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ খানিক থামলেন। তারপর আবার বললেন, 'শোনো, এইসব প্যাঁচালে কাজ নাই। তোমারে জরুরি কাজে ডাকছি। ফজুর বউরে একদিন কোনো এক ছুঁতায় খবর দিয়া এই বাড়িতে আনো। খেয়াল কইরা দেখবা সে তার গায়ে কী কী গয়না পরছে। বিষয়টা খুব গোপনীয়।'

আমোদি বেগম বেশিরভাগ সময়ই তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথাবার্তা বোঝেন না। এবারও বোঝেননি। তবে বেশ অবাক হয়েছেন, সালেহা শরীরে কী গয়না পরে, তা দিয়ে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কী করবেন? আমোদি বেগম অবশ্য এই প্রশ্ন করলেন না। তিনি এই এত বছরে অন্তত এইটুকু জানেন যে এই বাড়িতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার ভূমিকা আসলে কী!

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এখন যাও। আর যত তাড়াতাড়ি পারো, তারে খবর দিয়া আনাও। পারলে আইজকাই।'

সালেহাকে খবর দেওয়া হলো সেদিন বিকেলেই। কিন্তু শরীর খারাপের অজুহাতে সে আসলো পরদিন ভোরে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সেদিন আর ফজরের নামাজের পর হাঁটতে বের হলেন না। তিনি তার ঘরে বসে সালেহার আসার অপেক্ষায় রইলেন। সালেহাকে উঠান পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকতে তিনি দেখেছেন। কথা ছিল আমোদি বেগমই খেয়াল করে দেখবেন সালেহার শরীরে কোনো গহনা রয়েছে কিনা। কিন্তু আমোদি বেগমের উপর যেন আস্থা রাখতে পারছেন না তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তার খুব অস্থির লাগতে লাগল। এস্কান্দারকে ডেকে তিনি বললেন সালেহা যেন যাওয়ার আগে তার সাথে দেখা করে যায়।

আমোদি বেগমের সাথে দীর্ঘ কথোপকথন হলো সালেহার। কথা শেষ করে সে আসলো তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে দেখা করতে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সালেহার সাথে কথা বললেন। সেদিনের লেবু চিনির শরবত খেয়ে তিনি কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছেন, সে কথা তিনি সালেহাকে বললেন। সালেহার সন্তান-সন্ততি নেই। এই নিয়ে নানান চেষ্টা চরিত্রের কথা গাঁয়ের সকলেই জানে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার চিরাচরিত গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে সেই বিষয়েও সালেহার সাথে কথা বললেন। সালেহা চলে যাওয়ার পরও তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। এ কথা সত্যি যে সালেহার শরীরে কোথাও সস্তা কিছু তাবিজ কবজ ছাড়া

www.boighar.com

www.boighar.com

আর কোনো গহনা তিনি দেখতে পাননি। তার বাহু ঢাকা থাকায় বাজুবন্দ খানা রয়েছে কিনা, সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারলেন না তৈয়ব উদ্দিন খাঁ।

তিনি ডাকলেন আমোদি বেগমকে। আমোদি বেগমও বললেন তিনি সালেহার শরীরে কোনো গয়না দেখতে পাননি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বিভ্রান্ত বোধ করছেন। তবে তার মন বলছে ঘটনা কিছু একটা ঘটেছে।

তিনি জীবনভর ব্যাপারীদের উপর কম অনাচার করেননি। এই অনাচার করার কারণেই হয়তো সেটি আবার চক্রাকারে ফিরে আসার একটা আশঙ্কাই যেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ভেতরে ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার হাতে ঘটনাচক্রে বজলু ব্যাপারী খুন হবার পর তিনি তার ক্ষতিপূরণের চেষ্টার বদলে উপরন্তু তাদের অনেক জমিজমা দখল করেছেন। ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করেছেন। আর তার পরপরই মূলত ব্যাপারীরা ধীরে ধীরে গ্রাম ছাড়তে শুরু করে। বেশিরভাগই শহরে ছোটখাট কাজ করে। ফজুর আর দুই ভাইও শহরে কাজ করে। তারা আর গাঁয়ে সেরকম আসে না। বাড়িতে আর যে কয়েক গেরস্ত আছে, তাদেরও হতদরিদ্র অবস্থা।

সেদিন রাতেই বড়পুত্র খবির খাঁকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তিনি খবির খাঁকে বললেন, 'সব মিলাইয়া ফসলি জমিন কয় বিঘা চাষে আছে?'

খবির খাঁ বললেন, 'বন্যার পানি উঠছে বেশিরভাগ ক্ষেতেই। অনেক চাষের জমিনেও এহন আর চাষ নাই। এইজন্য চাষের জমিনের পরিমাণ বলা একটু কঠিন বাজান। বলতে গেলে একটু হিসাব-নিকাশ করন লাগব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর চোখ বন্ধ করে এই মুহূর্তে মোট কত বিঘা জমিতে চাষ হচ্ছে, কত বিঘা জমি বন্যার পানিতে ডুবে আছে তার হিসেব দিলেন খবির খাঁকে। তারপর বললেন কোন চরে কত বিঘা জমি অনাবাদি আছে তার হিসাব। বললেন কত বিঘা জমিতে কেবল গাছ লাগানো রয়েছে, কত জমিতে বর্গা চাষ হচ্ছে। কত বিঘা জমি খাজনা করে দেয়া হয়েছে। কোন এলাকায় কোন কোন জমি দেখভাল করার বিনিময়ে কোন কোন পরিবারকে বসত বাড়ি করতে দিয়েছেন। কে কে কতটুকু ফসল ফলিয়ে কতটুকু দিচ্ছে, এইসব হিসেব তিনি একের পর এক দিতে লাগলেন খবির খাঁর সামনে। সবার শেষে দিলেন তাদের তালিকা, যারা তাদের ঠিকঠাক জমির ফসলের ভাগ সময়মতো বুঝিয়ে দিচ্ছে না, জমি দেখভাল করার বিনিময়ে বসত বাড়ি করাসহ নানা সুবিধা নিয়েও যারা তাদের দায়িত্ব পালন করছে না, তাদের কথাও বললেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে তিনি সামান্য হাঁপিয়ে উঠেছেন। এবার থামলেন। পুরো ঘর জুড়ে নিস্তব্ধতা। খবির খাঁ'র বুকের ভেতরটা কাঁপছে। তার

মনে হচ্ছে আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগে তিনি তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সামনে বসে যেভাবে ভয়ে থরথর করে কাঁপতেন, যেভাবে তেষ্টায় তার গলা শুকিয়ে আসত, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে এসেও তার সেই অনুভূতির সামান্যতমও হেরফের হয়নি।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এবার বললেন, 'মোঘল আমলের কথা কিছু জানস?'

হঠাৎ করে বাবার এমন প্রসঙ্গ বদলানোয় খবির খাঁ আরো ভীত বোধ করছেন। তিনি কথা বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারলেন না। তার আগেই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'জমিদারি আমলের কথা তো না জাননের কথা না'।

খবির খাঁ ম্রিয়মান গলায় বললেন, 'জ্বে বাজান'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'মোঘল আমলে মোঘল সম্রাটরা যহন দেখতেন, দূরের কোনো জমিদার ঠিকঠাক মতো খাজনা দেয় না, তহন তারা কী করতেন জানস?'

খবির খাঁ কোনো জবাব দিলেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'প্রথমে খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করতেন ঘটনা কী? বাহক পাঠাইতেন খাজনা বিষয়ে সতর্ক করতে। তারপরও যদি না পাঠাইতো তহন ফৌজ পাঠাইতো জমিদাররে ধইরা লইয়া যাওনের জন্য। ক্যান জানস?'

খবির খাঁ চুপ। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ-ই আবার বললেন, 'আসল ঘটনা কিন্তু খাজনার অর্থ না। অনেক জায়গার খাজনার মূল্য তেমন আহামরি কিছু আছিল না, তারপরও পাঠাইতেন। পাঠাইতেন যতটা না খাজনা আদায়ের লইগা, তার চাইতে বেশি এইটা বোঝানোর লইগা যে তাদের রাজত্বে থাইকা তাদের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করনের মতো দুর্বল তারা এহনও হয় নাই। এই কাজ ইংরেজরাও করছে। বিষয়টা যতটা না খাজনা, তার চাইতেও বেশি এইটা বোঝানো যে আমার শক্তি কিন্তু কমে নাই। একবার যদি জনগণ বুইঝা যায় যে তোর শক্তি কম, তুই কমজোর, দুর্বল, তাইলে কিন্তু আর তাগো সামলানো যাইব না। এইজন্য এই জিনিসগুলান খেয়াল রাখন খুব জরুরি। যহনই দেখবি তোর অধস্তন লোকজন তোর কথা মান্য করতেছে না, তোরে ভয় ডর করতেছে না, তহনই বুঝবি, তোর শক্তি নিয়া তাদের সন্দেহ তৈরি হইছে। আমার কথা বুঝছস?'

খবির খাঁ ঢোক গিলে বললেন, 'জ্বে বাজান'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এবার সামান্য গলা চড়িয়ে বললেন, 'তুই কিছুই বুঝস নাই। আশেপাশে চোউখ কান খোলা রাখস না ক্যান? এই খাঁ বংশ এমনে এমনে এমন বড় বংশ হয় নাই। আর চোউখ কান খোলা না রাখলে এমন থাকবও না। অনেকেই ওঁৎ পাইতা আছে, তারা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মরনের অপেক্ষায় আছে। আমি যেই চোউখটা বুজব অমনে তারা পিলপিল কইরা পিঁপড়ার মতো দল বাইন্ধা বাইর হইব। এইটা টের পাস?'

www.boighar.com

খবির খাঁ চুপ।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'চাইরপাশে আমি নানা ফিসফিসানি শুনতেছি। এইটা তোরও শোননের দরকার আছিল। এই ফিসফিসানি শোনন শিখতে হইব।'

খবির খাঁ বললেন, 'আপনেরে কেউ কিছু বলছে বাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'হ। বলছে'।

খবির খাঁ উৎসুক গলায় বললেন, 'কেডা কী কইছে বাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'বাতাসে বলছে, গাছের পাতায় বলছে। যেই পথ দিয়া প্রত্যেকদিন হাইটা যেই সেই পথও কইছে। এইসকল কিছুরা কথা কয়। আমরা যা দেহি না, এরা তাও দেহে। এইজন্য এদের কথা শুনতে জানন দরকার'।

খবির খাঁ এই জীবনে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর বেশিরভাগ কথাই বুঝতে পারেননি। এখনও ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'শোন কোন কোন জমিনের ফসলের হিসাব ঠিকঠাক মতো আসে না। কারা কারা কথা দিয়া কথা রাহে না, আইজ দিব, কাইল দিব কইরা ঘুরায়, তাদের সকলের লগে কথা বল। ধমক-ধামক দিতে হইব। কঠিন হইতে হইব। লাগলে দু'-চাইরডা লাশ ফালাইতে হইব।'

খবির খাঁ যেন আঁৎকে উঠলেন। তিনি মিনমিন করে বললেন, 'এহন আর সেই আগের যুগ নাই বাজান। আগে এই এলাকায় দশটা মাডার করলেও সেই খবর থানা-পুলিশ হইত না। হইলেও তারা কেউ পাত্তা দিত না। পুলিশ ডরেও এই দুর্গম অঞ্চলে আইতে চাইত না। আর এহন ওইরম কিছু হইলে লগে লগে থানা পুলিশ হাজির হয় বাজান।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সবকিছুরই একটা উপায় আছে। মানুষরে ডর দেহাইতে হইব। নিজের কঠিন রূপ না দেহাইলে শাসন করন যায় না। জনগণ দয়ালু শাসক পছন্দ করে না। শাসকের দয়ালু রূপরে তারা ভাবে দুর্বলতা। আর দুর্বল শাসকের অধীনে কেউ থাকতে চায় না। বিদ্রোহ হয়।'

খবির খাঁ বুঝতে পারছেন না তিনি কী বলবেন! তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'যুগ যে বদলাইছে, সেইটা তো ভালো বুঝছস, কিন্তু যুগ বদলানোর লগে লগে যে নিজেগোরও বদলাইতে হইব, সেইটা বুঝস না কেন!'

খবির খাঁ আবারো মৃদু গলায় বললেন, 'বাজান, আমারে একটু খুইলা বলবেন, আপনে কী টের পাইছেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কী টের পাইছি এহনও জানি না। তয় তলে তলে কিছু একটা ঘটতেছে। শোন, এই যে এত এত জমিন, এর বেশিরভাগেরই কিন্তু আসল কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ নাই। চর দখল করা হইছিল,

কাগজপত্র করা হয় নাই। অনেকের জমি নানাভাবে দখল করা হইছে, মুখে মুখে কেনা হইছে, অদল-বদল হইছে, নানা কিছিমের বিষয়-আশয়। তহন তো গায়ের জোরই আসল জোর। কিন্তু ওই যে কইলি সময় বদলাইছে, এহন এইসব জমিন নিয়া যদি জমিনের পুরোনো কোনো ওয়ারিশ কোনো মামলা-মোকদ্দমা করে, তহন কি করবি? তহন ওই কোর্ট-কাছারিতেই কিন্তু যাইতে হইব। এইডা বোঝস?'

খবির খাঁ বললেন, 'বাজান, কেডা আমাগো বিরুদ্ধে মামলা করব? আর মামলা চালাইতেও পয়সা-পাতির ব্যাপার। এই অঞ্চলে তেমন কেডা আছে যে কোর্টে যাইয়া মামলা-মোকদ্দমা চালাইব দিনের পর দিন? আর এইগুলান করতে হইলে যাইতে হইব মাদারীপুর টাউনে। কার এত হ্যাডম এইসব করনের?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ শান্ত গলায় বললেন, 'যদি কারো হ্যাডম হয়, তহন তুই কী করবি?'

খবির খাঁ খানিক থতমত খেয়ে গেলেন। আসলেই তো, এই কথা তো তিনি ভাবেননি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এহন আর আগের দিন নাই। জমিজমা থেইকা নগদ পয়সাপাতিও তেমন আহে না। বড় বংশ হইলে নানাদিকে নানা খরচাপাতি। দিন শেষে আয়-ব্যয় সমান সমানই থাহে। যেমন আয়, তেমনই ব্যয়। এহন যদি হঠাৎ কইরা বিরাট অঙ্কের নগদ টাকা-পয়সার দরকার হয়, কোনো বিপদ আহে, মামলা-মোকদ্দমা চালাইতে হয়, তহন কী করবি? জমিন বেচবি? জমিন বেইচা জমিনের মামলা চালাইবি? এইরকম জমিন বেইচা বেইচা কয় দিন চলবি? বহুত জমিদার, তালুকদার এমনে কইরা পথের ফইর হইছে। এই জীবনে কম তো আর দেহি নাই।'

খবির খাঁ এই সহজ বিষয়গুলো এতদিনেও কখনো চিন্তা করেননি। তার নিজেকে বোকাবোকা লাগছে। একই সাথে ভীতও লাগছে। তার হঠাৎ মনে হচ্ছে এই খাঁ বংশ কোনো বিপদে পড়লে সেই বিপদ থেকে টেনে তোলার সামর্থ্য তার নেই। তার সন্তানদেরও নেই। ঠিক এই মুহূর্তে যদি তার বাবা তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মারা যান, তাহলে তিনি কীভাবে সব সামলাবেন? এতদিন তার মনে হতো বৃদ্ধ তৈয়ব উদ্দিন খাঁর উপস্থিতি তার জন্য এমন কোনো গুরুতর বিষয় না, বরং তিনি নিজে একাই সব কিছু সামলে নিতে পারবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হলো, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আসলে আকাশের মতো বিস্তৃত এক বিশাল বটবৃক্ষ। যে মাথার উপর ছায়া হয়ে থাকলে টের পাওয়া যায় না। মনে হয়, সব কিছুই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিক যেই মুহূর্তে আর থাকবেন না, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে নিজেকে মনে হবে শূন্য, অসহায়। নিজেকে প্রচণ্ড দুর্বল মনে হতে লাগল খবির খাঁর। যেন এক ছোট্ট শিশু। বাবাকে ছাড়া এই কঠিন পৃথিবীতে যে এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারবে না।

www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ চিন্তিত গলায় বললেন, 'খবর পাইছি আব্দুল ফইর দিন কয় আগে মাদারীপুর টাউনে গেছিল। শুনছি সে ভূমি অফিসেও গেছিল।'

খবির খাঁ বললেন, 'আব্দুল ফইর মাদারীপুর টাউনে বা ভূমি অফিসে গেলে আমাগো কি সমস্যা? তার লগে তো আমাগো জমিজমার কোনো সম্পর্ক নাই। তারা সারাজীবন খাইছে ফইরালি কইরা। আর তার বাড়ি রইছে সেই হোসনাবাদ। তাছাড়া ওই বাড়ির জায়গাটুক ছাড়া তার তো আর কোনো জমিনও নাই। আগেও আছিল না। তাইলে কী সমস্যা?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ গম্ভীর গলায় বললেন, 'যার মাথায় চুল আছে, সে চিরুনি পকেটে লইয়া ঘোরলে সেইটা সমস্যার কিছু না। স্বাভাবিক ঘটনা। সমস্যা হইল যার মাথাজোড়া টাক, সে যদি চিরুনি পকেটে লইয়া ঘোরে তহন। এইটা অস্বাভাবিক ঘটনা। আব্দুল ফইরের জমিন নাই, সে ভূমি অফিসে কী করে!'

খবির খাঁ এবার রীতিমত মিইয়ে গেলেন। এই সামান্য বিষয়টাও তার মাথায় ঢুকল না। কিন্তু তিনি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছেন না আব্দুল ফকিরের ভূমি অফিসে যাওয়ার সাথে তাদের সম্পর্কটা কী! তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'বাজান, ফইরসাবের লগে আমাগো জমিজমার কি কোনো সম্পর্ক আছে?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সাথে সাথে জবাব দিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'খালি চোখে দেখলে নাই। তয় আমার মন বলতেছে কিছু একটা ঘটতেছে। জিনিসটা ধরতে আমার বেশি সময় লাগব না। তয় তার আগেই এই সব জমিনের কাগজপত্র বাইর কইরা লইয়া বয়। আলতাফ আর গেসুদ্দিন আমিনরে খবর দে। জমিজমার যেইগুলানের কাগজপত্র ঠিক-ঠাক নাই, সেইগুলানের কাগজপত্র বাইর করনের লইগা কী কী ব্যবস্থা নেওন লাগব, তাদের কাছে জিজ্ঞাস কর।'

এই প্রথম খবির খাঁর মনে হলো তারা বড় ধরনের কোনো ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছেন। এই ঝামেলার বিরাট অংশই যাবে সঠিক কাগজপত্র না থাকা বিশাল পরিমাণ জমির কাগজপত্র করতে। সমস্যা হচ্ছে যথাযথ আইনগত উপায়ে এবং স্বল্প সময়ে এগুলো করা প্রায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে এগুলো করতে হবে অন্য কোনোভাবে। মাদারীপুর বা ফরিদপুর শহরে তাদের যেতে হবে এই কাগজপত্র করতে। কিন্তু ফতেহবাদে তাদের যত বড় প্রভাবই থাকুক না কেন, ফরিদপুর বা মাদারীপুর শহরে প্রভাব খাটিয়ে কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে কীভাবে কী করবে সে?

অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে ও   য়ে কথাগুলো তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে বললেন খবির খাঁ। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কথাগুলো শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তাও ভালো যে এই জিনিস তোর মাথায় ঢুকছে। তয় সব

চাইতে সহজ জিনিসটাই তো ঢোকে নাই। দুইন্যাতে একটা জিনিসের ক্ষমতা সবখানেই আছে। আর সেই জিনিসটা হইল পয়সা। টাকা-পয়সা হাতে থাকলে সব সম্ভব।'

খবির খাঁ মিনমিন করে বললেন, 'কিন্তু বাজান, এ তো অনেক নগদ টাকা-পয়সার ব্যাপার। তার ওপর ধরেন, কেউ যদি মামলা-মোকদ্দমা কইরা বহে, তাইলে তো আরো টাকা-পয়সার ব্যাপার। জমিজমা বেচন ছাড়া তো সেই পরিমাণ টাকা-পয়সার ব্যবস্থা আমাগো নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ খবির খাঁর কথার জবাব দিলেন না। তিনি এস্কান্দারকে ডেকে বললেন মনিরকে খবর দিতে। মনির আসতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এই মাসে মাদারীপুর গেছিলি?'

মনির বলল, 'না, দাদাজান। আর তিনদিন বাদে যাওনের ডেট।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'মবিন এই মাসে টাকা পাঠায় নাই এহনো?'

মনির বলল, 'পাঠাইছে, তয় ব্যাংকে জমা হইতে সময় লাগব। এই জন্যই তিনদিন বাদে যাওনের ডেট।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তিনদিন বাদে না। কাইল হইতে আগামী তিনদিন প্রত্যেকদিন মাদারীপুর টাউনে যাবি। গিয়া ভূমি অফিস আর কোর্টে ঘোরাঘুরি করবি। কোনো কাজ-কামের দরকার নাই। খালি ঘুইরা ফিরা দেখবি কে কী করে। কীভাবে কী করে। কেমনে কথা বলে। চোউখ-কান খোলা রাখবি। জয়নুদ্দিন তহশিলদার নামে একজন আছে। আমার পরিচিত, তার কাছে গিয়া আমার কথা বলবি। আর তিনদিন বাদে ব্যাংকের সব টাকার হিসাব আইনা আমারে দিবি। এতদিনে এই নগদ টাকার প্রয়োজন সামনে চইলা আসছে। এরপর তোর আরো অনেক কাজ আছে। আগে এইগুলান শেষ কর।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হঠাৎ এমন আচরণের বিশেষ কিছুই বুঝল না মনির। তবে গুরুতর কিছু একটা যে ঘটছে, সেটি সেও আন্দাজ করতে পেরেছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ঠান্ডা গলায় বললেন, 'এহন যা'।

মনির অবাক ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তবে সবচেয়ে অবাক হয়েছেন খবির খাঁ। তিনি যে শুধু অবাকই হয়েছেন তাও না, বরং বিস্ময়ে হতবুদ্ধ হয়ে গেছেন। এই এতবছর পরে এসে আজ তিনি বুঝতে পারলেন তার বড় ছেলে মবিনকে কেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কুয়েত পাঠিয়েছিলেন! এই নিয়ে বাবার ওপর ভারি একটা অভিমান, রাগ, ক্ষোভও পুষে রেখেছিলেন তিনি। নিজেদের এত ধন-সম্পদ থাকতে তার ছেলে কিনা বিদেশ-বিভূঁই গিয়ে গায়ে গতরে খাটবে! অনেকবারই বাবাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা তার হয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি আর সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। আজ এতবছর পরে মানুষটার সেদিনের সেই সিদ্ধান্তের পেছনের উদ্দেশ্য খবির খাঁর কাছে পরিষ্কার

হলো। আজকের এমন পরিস্থিতি যে-কোনো সময় তৈরি হতে পারে ভেবেই তিনি মবিনকে নগদ টাকা উপার্জনের জন্য বিদেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আরও একটা বিষয়ে অবাক হয়েছিলেন খবির খাঁ। সেটি হচ্ছে, বিদেশ থেকে মবিনের টাকা পাঠানো ও তা রাখার জন্য তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ব্যাংক একাউন্ট খুলতে বললেন মনিরের নামে। এটি নিয়েও তার মনে নানান জিজ্ঞাসা ছিল। কারণ খবির খাঁর সব সময়ই মনে হয়েছে যে তার ছোট পুত্র মনির খানিকটা সহজ সরল প্রকৃতির ছেলে। এই গণ্ডগ্রাম থেকে নিয়মিত শহরে গিয়ে ব্যাংকের হিসেব-নিকেশ করার মতো জটিল বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য যে পরিমান বুদ্ধি-জ্ঞান প্রয়োজন, তা মনিরের আছে বলে তিনি জানতেন না। কিন্তু খানিক আগে মনিরের সাথে হওয়া তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথোপকথনেই যেন আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল খবির খাঁর কাছে। সেটি হলো, আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে চিন্তা করেই আজ থেকে বছর কয়েক আগেই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মনিরকে প্রস্তুত করে রাখতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যই তাকে ব্যাংকের কাজের সাথে যুক্ত করে দিয়ে নিয়মিত মাদারীপুর শহরে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাহলে কি তাদের অবর্তমানে খাঁ বংশ টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নেয়ার জন্য মনিরকেই তৈরি করছেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এবং এই পুরো বিষয়টিই কি তার একটি সুদূরপ্রসারী সুচিন্তিত পরিকল্পনারই অংশ? চোখের সামনে ঘটা এই ঘটনাগুলো দেখেও এই এতদিনেও কিছুই আঁচ করতে পারেননি খবির খাঁ।

এই অবধি ভাবতেই খবির খাঁর সারা শরীর যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। তার মনে হলো, তার সামনে বসা অশীতিপর এই বৃদ্ধ মানুষটির কপালের দৃশ্যমান ওই চোখজোড়া ছাড়াও হয়তো লুকিয়ে থাকা আরো একখানা চোখও কোথাও রয়েছে। যেই চোখে তিনি এমন সকল বিষয় দেখে বেড়ান, যা অন্যরা সহজে দেখতে পায় না!

www.boighar.com

প্রায় শেষ রাত। এই সময়ে ফতেহপুরের কোনো ঘরেই সামান্যতম আলোর আভাস নেই। সকলেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কেবল ফজু ব্যাপারীর ঘরের কেরোসিনের কুপিখানা চারপাশের অন্ধকারকে আরো খানিক গাঢ় করে দিয়ে মৃদু আলোয় জ্বলছে। উঠানের অন্ধকারও ব্যাপারী বাড়ির আরো তিনখানা ঘরের পুরুষেরা প্রবল সতর্কতায় ঘাপটি মেরে পাহারায় বসে রয়েছে। ফজু ব্যাপারীর ঘরের ভেতর জ্বলা কেরোসিনের কুপির চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে ফজু ব্যাপারী, তার স্ত্রী স্যালেহা আর আব্দুল ফকির। খানিক আগে নিঃশব্দে আব্দুল ফকিরের নাও ভিড়েছে ফজু ব্যাপারীর খালের ঘাটে। তার সাথে জুলফিকারসহ আরো দুজন যুবকও এসেছে। তারাও বাইরের অন্ধকারে বসে চারপাশে নজর রাখছে।

আব্দুল ফকিরের সামনে অনেক কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা। তিনি গভীর মনোযোগ নিয়ে সেইসব কাগজপত্র দেখছেন। দেখছে ফজু এবং সালেহাও। তবে তারা এ সকল কাগজপত্রের তেমন কিছুই বোঝে না। ফজু হঠাৎ কাগজ থেকে মুখ তুলে ফিসফিস করে বলল, 'ফইর কাকু, কী মনে হয়, এই কয়দিনে কাগজপত্র যা দেখলেন, তাতে কি আমাগো কোনো আশা আছে?'

আব্দুল ফকির মুখ না তুলেই বললেন, 'এহনও বেশি কিছু দেখতে পারি নাই। এইসব জমিজমার অফিসে খালি দালাল আর দালাল। আর হইছে পয়সা খাওনের ধান্ধা। তয় আমারে অনেকেই চেনে। এইজন্য আলাদা একটু সুবিধা আছে। আবার অসুবিধাও আছে!'

ফজু বলল, 'অসুবিধা কী?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'অসুবিধা হইছে, আমি যে মাদারীপুর ভূমি অফিসে যাই, এই কথা খাঁ-বাড়িতে পৌঁছাইতে কতক্ষণ?'

ফজু বলল, 'আপনে গেলে তাগো সমস্যা কী? আপনের লগে তো তাগো জমিজমার কোনো বিবাদ নাই। আর এর লইগাই তো আপনেরে পাঠাইছি। আমরা গেলে তো আগেই ধইরা ফালাইব।'

www.boighar.com

আব্দুল ফকির বললেন, 'তোরা যাওনেরতন আমি যাওন ভালো হইছে। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁরে তো চেনোস না! সে...'

ফজু যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল। সে বলল, 'তারে আমি চেনতেই চাই। আপনে তো কিছু ভোলেন নাই কাকু। আমিই সব ভুইলা বইসা আছিলাম। আসলে ভুলি নাই কাকু, ভোলার ভান ধইরা আছিলাম। সুযোগের অপেক্ষায় আছিলাম।'

আব্দুল ফকির ঠোঁটে আঙুল চেপে চুপ করার ইশারা করলেন ফজুকে। তারপর বললেন, 'এই এলাকায় যার যা জমিজমা আছিল, তা তো তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আগেই নামমাত্র দামে হয় কিন্যা নিছে, নইলে ডর দেহাইয়া বা অন্য উপায়ে জোর দখল করছিল। তারপরও পরিমাণে অল্প হইলেও শেষমেষ আরো কিছু ভালো জমিন আছিল তোর বাপের। সেই জমিন নিয়াই তোর বাপের লগে ঝামেলা আছিল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর। প্রথমে সে কিনতে চাইছিল, তোর বাপও ঘাড়ত্যাড়া। সে জমিন বেচবো না। এরপর কতকিছু যে করল সেই জমিনের লইগা, কিন্তু কিছুই কাজে আইল না। শেষে তো আমার বাড়ির ওই ঘটনা। সেই রাইতেও তোর বাপে আমার কাছে গেছিল এই জমিজমা লইয়া কথা বলতেই। কিন্তু আল্লায় আমার জানের বদলে তার জান নিয়া নিলো।'

ফজু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর হঠাৎ একখানা কাগজ হাতে নিয়ে আব্দুল ফকিরের সামনে আলোতে ধরে বলল, 'কাকু, বাপজানের সেই জমিন ছাড়াও নাকি ব্যাপারীগো আরো বহুত জমিন খাঁয়েরা জোর কইরা দখল করছে?'

আব্দুল ফকির গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ। অনেক। সব জমিন যদিও না-ও উদ্ধার করতে পারি। অর্ধেক উদ্ধার করতে পারলেও খাঁয়গো বাড়ির গোড়া লইড়্যা যাইব।'

ফজুর চোখজোড়া হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল। সে বলল, 'আপনে আপনের কাজ করেন কাকু। টাকা-পয়সা নিয়া আপনে চিন্তা করবেন না। মামলা-মোকদ্দমা যেইহানে যা করতে যত টাকা লাগে আমরা দিব। আপনে খালি আমাগো জমিনগুল্য উদ্ধার কইরা দিবেন।'

আব্দুল ফকির গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আচ্ছা ফজু একখান কথা। হঠাৎ কইরা এই এত বছর পর এই জমিনের পিছে লাগছস ক্যান, আমারে বল তো? আর এত টাকা-পয়সাই বা কই পাইবি? এইসব কাজ মানেই খালি টাকা আর টাকা। কথা বলনের দেরী আছে, পকেটেরতন টাকা খসনের দেরী নাই।'

ফজু বলল, 'আমাগো বংশের যারা যেইহানে আছে, সবাই মিল্যা সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা দিব বলছে। আমার দুই ভাইও আছে এর মধ্যে। আপনে টাকা নিয়া চিন্তা করবেন না।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তুই সত্য কইরা বল তো, আমার কাছে কি কিছু গোপন করতেছস তুই?'

ফজু জিভ কেটে বলল, 'তওবা তওবা। কি কথা কন ফইর কাকু! একখান কথা বিবেচনা কইরা দেহেন, এই সময়ে আমাগো মাথার উপরে আপনে ছাড়া আর কেডা আছে? আপনেরতন যদি কিছু গোপন করি তাইলে উপায় কি? আপনে এহন আমাগো ডাক্তার। আমরা হইলাম রুগী। ডাক্তারের কাছে যদি রুগী কিছু গোপন করে, তাইলে সেই রুগীর রোগ কখনো ভালো হয় ফইর কাকু।'

আব্দুল ফকির সামান্য হাসলেন। ফজু ভেবেছিল তার কথায় সে আব্দুল ফকিরকে মুগ্ধ করতে পেরেছে। কিন্তু আব্দুল ফকিরের কথা শুনে তার মনে হলো সে ভুল জায়গায় ভুল কথা বলেছে। আব্দুল ফকির বললেন, 'লক্ষণ তো খারাপ ফজলু'।

ফজলু অবাক গলায় বলল, 'কিসের লক্ষণ খারাপ কাকু'?

আব্দুল ফকির বললেন, 'তোর লক্ষণ। তোরে এই মাসখানেক আগেও দেখছি আলাভোলা একখান পোলা। ঠিকমতো গুছাইয়া কথা বলতে পারস না। বয়স হইছে, বুদ্ধি হয় নাই। আর এহন দেখি মুখে কথার খই ফোটে। খুব হিসাব-নিকাশ কইরা কথা বলতেছস। বুদ্ধিমান মানুষও কহন বলদ হয় জানস? যহন তার পকেটে টাকা না থাকে। আর বলদও বুদ্ধিমান হইয়া যায় যহন তার পকেটে টাকা থাহে। তুই তো মাশাল্লাহ কয়েকদিনেই কি সোন্দর গোছাইয়া কথা বলন শিখ্যা গেছস। ঘটনা কি? মাত্তা মুত্তা পাইছস নাকি?'

এ অঞ্চলে মাত্তা বলতে লোকে বোঝে গুপ্তধন। ফজুর বুকের ভেতরটা আবার ধক করে উঠল। সে বলল, 'মাত্তা পাইলে কি আর এই ঘরে থাহি কাকু! খাইয়া না খাইয়া যে কষ্ট করতেছি, এইটা কোনো মানুষে করে! তাও তো ওই জমিটুকের জন্যই এইসব।'

আব্দুল ফকির আর কথা বাড়ালেন না। ফজুর সাথে আরো কিছু বিষয় আলোচনা শেষ করে নৌকায় উঠলেন। আর কিছুক্ষণ বাদেই ফজরের আজান হবে। তার আগেই ফতেহপুরের লোকালয় থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে খবরটা দিলেন মসজিদের ইমাম নুরুজ্জমান হুজুর। মসজিদের সাথেই একখানা ঘর। সেই ঘরেই নুরুজ্জামান হুজুর থাকেন। শেষরাতের আগে তিনি উঠেছিলেন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে। খালের ঘাটে ওজু করতে গিয়ে তিনি জুলফিকারকে দেখতে পেলেন। ওজু করতে আব্দুল ফকিরকে যাতে নাওয়ের গলুইয়ে না আসতে হয়, সম্ভবত এই কারণেই তার জন্য ওজুর পানি তুলছিল জুলফিকার। নুরুজ্জামান হুজুরের হাতে ছিল

হারিকেন। এত রাতে নৌকার শব্দ পেয়ে তিনি হারিকেনখানা তুলে ধরলেন। তখনই হারিকেনের আবছা আলোয় জুলফিকারকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। প্রতিদিনের মতো ফজরের আজানের সাথে সাথেই মসজিদে এসে হাজির হলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তাকে দেখে নির্দোষভাবেই কথাটা বললেন ইমাম সাহেব, 'আবারো কেউরে সাপে কাটছেনি খাঁ সাব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ প্রশ্নটা শুনে একটু অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'কই? কারে সাপে কাটছে?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'না মানে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়নের লইগা খালঘাটে গেছিলাম অজু করতে। আচুক্কা দেহি একখান নাও। এত রাইতে নাও দেইখা অবাক হইয়া গেছি। হারিকেন তুইলা জিগাইলাম কে যায়? কিন্তু কেউ জবাব দিলো না। তারপর তাকাইয়া দেহি, আব্দুল ফইরের সাগরেদ জুলফিকার। ফইর সাবেও মনে হয় নাওয়ে আছিল। তয় তারে দেহি নাই। তাই ভাবলাম, অত রাইতে ফতেহপুর। আবার কাউরে সাপে কাটে নাই তো!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বাকিটা সময় আর কোনো কথা বললেন না। তিনি যতটা সম্ভব নিজেকে শান্ত রেখে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে দীর্ঘ মোনাজাত করলেন। ভয়ঙ্কর রাগে, ক্রোধে তার শরীর ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি সব সময়ই দেখেছেন, কঠিন মুহূর্তে রাগ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে কার্যকরী কিছু আর নেই। তিনি মোনাজাতের মধ্যেও চেষ্টা করলেন তার রাগ কমানোর। কিন্তু রাগ কমলো না। বরং বাড়ল। এই আশঙ্কাটাই তিনি করেছিলেন। এখন তিনি মোটামুটি নিশ্চিত যে ফজু অবশ্যই সেই গয়নার কলসি খুঁজে পেয়েছে। আর খুঁজে পেয়েই সে কাজে নেমে গেছে। সে তার বাপ-দাদার হারানো সম্পদ ফিরে পেতে চাইছে। আর এইজন্য সে জুটিয়েছে আব্দুল ফকিরকে। নানা কারণে আব্দুল ফকিরের প্রতি তৈয়ব উদ্দিন খাঁর অবিশ্বাস্যরকম রাগ। বিভিন্ন সময় আব্দুল ফকিরের সাথে তার নানা অমীমাংসিত ঘটনাও রয়ে গেছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ইচ্ছে করেই সেই সকল ঘটনা আর বাড়াননি। নিজে নিজেই ক্ষ্যান্ত দিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মতো মানুষের জন্য এই ক্ষ্যান্ত দেওয়া পরাজয়ের শামিল। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সেই পরাজয় মেনেও নিয়েছেন। তার নিজের কাছে নিজের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে তিনি আব্দুল ফকিরকে সমীহও করেন। বুদ্ধিমান, ধূর্ত মানুষমাত্রই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সমীহ করেন, মেপে চলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ধারণা, তার দেখা সবচেয়ে ধূর্ত এবং একইসাথে বুদ্ধিমান মানুষ এই আব্দুল ফকির।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নামাজ শেষ করে এস্কান্দারকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছেন। হাঁটতে হাঁটতেই তার হঠাৎ মনে হলো এই শেষ বয়সে এসে তিনি একটা কঠিন যুদ্ধের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। ঘটনায় ফজু বা অন্য আর কেউ

থাকলেও সমস্যা হতো না। সমস্যা হয়েছে আব্দুল ফকির থাকায়। আব্দুল ফকির কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে খেলতে পছন্দ করেন। কিন্তু তিনি কখনো ধরা দিবেন না যে তিনি খেলছেন। অথচ মুহূর্তের ভুলে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে ফেলবেন তিনি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ একবার ভাবলেন, তিনি কি আজ আরেকবার ফজু ব্যাপারীর বাড়ি হয়ে আসবেন? যদি নতুন কিছু তার চোখে পড়ে! কিন্তু শেষ অবধি তিনি সিদ্ধান্ত বদলালেন। বাড়ি ফিরে এলেন তার কিছুক্ষণ পরেই।

বাড়ি ঢুকতেই নয়নের সাথে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। ছেলেটাকে দেখে আজকাল আর চট করে চেনা যায় না। গায়ের রঙ ময়লা হয়ে গেছে। শুকিয়েছেও অনেকটা। চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে। হাত-পা কেমন খসখসে মলিন হয়েছে। গত বেশ কিছুদিন ধরে নয়ন তার ঘর থেকে খুব একটা বের হয়নি। তিন বেলার খাবারও তাকে ঘরে পৌঁছে দিতে হয়েছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নয়নকে নিয়েও ভীষণ চিন্তিত। তিনি খুব করে চান যত দ্রুত সম্ভব ঢাকা ফিরে যাক নয়ন। নানার মুখোমুখি পড়ে থমকে দাঁড়াল নয়ন। তারপর বলল, 'আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে নানাজান'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নরম গলায় বললেন, 'কথা থাকলে কথা বলবা। এত তাড়াহুড়ার তো কিছু নাই। বেয়ান হইছে, নাস্তা পানি কিছু খাইছ? আগে নাস্তা পানি কিছু খাও।'

নয়ন বলল, 'আমি সকালের খাবার একটু দেরি করেই খাই নানাজান। বেশিরভাগ সময় খাইও না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হাসলেন। তারপর বললেন, 'বয়স হইছে দেইখাই কিনা কে জানে, তোমাগো নিয়ম-কানুন দেহি সব উল্টাপাল্টা। তোমরা ডাক্তাররা যদি এমন অনিয়ম করো, তাইলে আমরা কি করব? শোনো, সকালে খাইতে হইব রাজার মতো। দুপুরে খাইতে হইব প্রজার মতো। আর রাইতে খাইতে হইব ফইরের মতো অল্প। এইগুলান সেই ছোটবেলারতন শুইনা আসছি। আর তোমরা যে কী করো!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর গলায় নয়নের জন্য যে আলাদা খানিক মমতা লেগে থাকে সেটি নয়ন টের পায়। সে ভেবে অবাকও হয়, মানুষটার ভয়ে সবাই থরথর করে কাঁপে। এই খাঁ বংশের সকলেই যার সাথে এক কথার পর দুই কথা বলতে এলে কথা গুলিয়ে ফেলে, সেখানে তিনি নয়নের সাথে কথা বলার সময় আর আট দশজন স্নেহপরায়ণ মানুষের মতোই ঘরের মানুষ হয়ে যান।

www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে সেই সকালে আর দেখা হলো না নয়নের। কী এক জরুরি কাজে তিনি তড়িঘরি করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। নয়নের সাথে তার দেখা হলো রাতে। কেরোসিনের হারিকেনের আলোয় তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ঘরে তার মুখোমুখি বসল নয়ন। তারপর বলল, 'নানাজান, অনেক দিন থেকেই ভাবছি, আপনার কাছে কিছু বিষয়ে জানতে চাইব আমি। কিন্তু নানা কারণে হয়ে উঠছিল না। এদিকে আমাকে ঢাকা যেতে হবে জরুরি। তার আগে আপনার সাথে বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলতে চাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কী জানতে চাও বলো?'

নয়ন বলল, 'এগুলো আমার কৌতূহল। কিন্তু বিষয়গুলো আমার জানা দরকার। আপনার যদি মনে হয় এই বিষয়ে আপনি কোনো কথা বলতে চান না, তাহলে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি নাও দিতে পারেন।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কিঞ্চিৎ ভ্রু কুঁচকে নয়নের দিকে তাকালেন। নয়ন বলল, 'এই যে এত বছর হলো মা এ বাড়ি থেকে গেল, তারপর আর কখনো এ বাড়িতে আসে নাই, এমন কি আমাকে বা বাবাকেও কখনো এখানে আসতে দিতে চায় না। কেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এতদিন পর এই প্রশ্ন?'

নয়ন বলল, 'সব প্রশ্ন কি সব সময় গুরুত্বপূর্ণ হয় নানাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ একটু চুপ থেকে বললেন, 'কারণগুলা তো তুমি তোমার মায়রেই জিজ্ঞাস করতে পারতা নানাভাই।'

নয়ন বলল, 'আমি মাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু সে এইসব বিষয় নিয়ে কখনোই কথা বলতে চায় না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এবার গম্ভীর হলেন। বললেন, 'কেউ যদি কিছু না বলতে চায়, সেই জিনিসটা না জানাই ভালো। যদি জিনিসটা জানা না জানায় তোমার কোনো লাভ ক্ষতি না হয়।'

নয়ন বলল, 'নানাজান, আমার মা খুব একা থাকা এক মানুষ। তাকে আমি কখনো আমার বাবার সাথেও সেভাবে কথা বলতে দেখিনি। হাসতে দেখিনি। এই জগতে তার সবচেয়ে বড় ভালোবাসার মানুষ ছিলেন আপনি। অথচ আপনার সাথেও তার বছরের পর বছর কোনো যোগাযোগ নেই। কী কষ্টকর না বিষয়টা? এখন তার সবচেয়ে কাছের মানুষ আমি। আমার কি উচিত না, তার কী এমন দুঃখ আছে সেটা খুঁজে বের করা?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'জীবনটা তো এত সহজ না নানাভাই যে, তুমি চাইলা আর সব হিসাব মিল্যা গেল। সব সমস্যা সমাধান হইয়া গেল। জীবন বড় কঠিন জায়গা। এইখানে বেশিরভাগ হিসাবই মেলে না।'

নয়ন বলল, 'কিন্তু জানার সুযোগ যেহেতু আছে, আমি জানতে চাই নানাভাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সব সুযোগ নিতে হয় না ভাই। আমরা সব সময় ভাবি, সুযোগ আসামাত্রই সুযোগ নিয়া নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবা, কইনো কইনো সুযোগ না নিয়া ছাইড়া দেওয়াটা আরো বড় বুদ্ধিমানের কাজ।'

নয়ন বলল, 'কিন্তু আপনি তো একজন বাবা। আপনার মেয়ে আপনার কাছ থেকে এই যে এত এত বছর দূরে। আপনার খারাপ লাগে না? আপনার কি উচিত না, তাকে একবারের জন্য হলেও আপনার কাছে নিয়া আসা?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সবাই কাছে আননের মানুষ না। কেউ কেউ খালি দূরে ঠেইলা দেওনের মানুষ। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দূরে ঠেইলা দেওনের মানুষ।'

নয়ন বলল, 'মা'র জন্য আপনের মায়া হয় না? দেখতে ইচ্ছা হয় না?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মনে আল্লায় মায়া-দয়া দেয় নাই। সে মায়া-দয়ার মানুষ না।'

নয়নের হঠাৎ খুব রাগ হতে লাগল। সে বলল, 'নানাজান, আপনি জীবনভর বহু সত্য, মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। এই বিষয়টাও আপনাকে কষ্ট দেয় না?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সত্য লুকাই রাখনের ক্ষমতা আল্লাহপাক কাউরে দেন নাই। সত্যের দায়িত্ব আল্লাহপাকের নিজের। তিনি একদিন না একদিন সত্য বাইর করেনই'।

নয়ন বলল, 'দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকা সত্য বের হয়ে আসলে তা মিথ্যার চেয়েও খারাপ হয় নানাজান'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'দুনিয়ার সব মানুষের খারাপ ভালো বোঝার ধরন কিন্তু এক না। একজনের কাছে যা খারাপ, আরেকজনের কাছে তা ভালো। তো কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ এইটা সকলে বোঝে না।'

www.boighar.com

নয়ন কিছু বলল না। চুপ করে রইল। তবে সামান্য চুপ থেকে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তুমি এইবার গ্রামে আসছ কেন? আসমার মৃত্যুর বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ করো? এইজন্যই গ্রামে আসছ এইবার?'

নয়ন সাথে সাথে জবাব দিলো না। খানিক চুপ থেকে বলল, 'আব্দুল ফকির লোকটা সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না নানাজান। কিন্তু আপনি তার সম্পর্কে একটা কথাও আমাকে বলেননি। আপনি কি আব্দুল ফকিরকে ভয় পান? আপনি জানেন, আসমা কেন মারা গেছে?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'জানি'।

নয়ন বলল, 'কীভাবে জানেন? এই কথা তো কেউ জানে না। আসমার মৃত্যুর পর তার লাশ নিয়ে এসেছিলেন বাবা। আমার পরীক্ষার কারণে আমি আসতেও পারিনি।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আন্দাজ করেছি'।

নয়ন বলল, 'এত বড় একটা অস্বাভাবিক ঘটনা কি কারো পক্ষে এমনি এমনি আন্দাজ করা সম্ভব নানাজান? আমি এই বিষয়টাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি। আব্দুল ফকির নিশ্চয়ই এমন কাজ আরো করেছে এবং সেসব আপনি জানেন। না জানলে এত সহজে আপনার আন্দাজ করতে পারার কথা না। কিন্তু কিসের ভয়ে আপনি আব্দুল ফকিরকে কিছু বলছেন না। কাউকেই কিছু বলছেন না। কেন? আপনি কি তাকে ভয় পান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মাথার টুপিটা খুলে ভাঁজ করে বিছানার পাশে রাখলেন। তারপর এস্কান্দারকে ডেকে পান খেতে চাইলেন। নয়ন নানার দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষটাকে তার এত অদ্ভুত লাগছে! এস্কান্দার পান দিয়ে যেতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সময় নিয়ে নিজের হাতেই পান বানালেন। তারপর একখানা পান নয়নের দিকে তুলে দিয়ে বললেন, 'খাইয়া দেহো। মজা পাইবা'।

নয়ন পান নিলো না। সে উত্তেজিত গলায় বলল, 'আপনি কি জানেন নানাজান, আসমার ঘটনায় আমরা কতবড় বিপদ থেকে বেঁচেছি? সে আমাদের বাসায় কাজ করত। নানীজান তারে চার-পাঁচ বছর আগে আমাদের বাসায় কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন। মা প্রথমে রাজি হয়নি। তারপরও নানীজান জোর করে পাঠালেন, কিছু কিছু কাজ করতে মার কষ্ট হয় বলে। সেই মেয়ে কিছুদিন আগে আত্মহত্যা করে মারা গেল। ঢাকায় একজন কাজের মেয়ে আত্মহত্যা করলেই পুলিশ ধরে নেয় এর পেছনে খারাপ কোনো ঘটনা রয়েছে। সেখানে ওই বাড়িতে আমি থাকি, বাবা থাকেন। দুই দুইজন পুরুষ মানুষ। আসমা পনের ষোল বছরের মেয়ে। সে সেই বাড়িতে মারা গেছে ইঁদুর মারার বিষ খেয়ে। পুলিশ যদি এই ঘটনা জানত, আমরা কতবড় বিপদে পড়তে পারতাম আপনি জানেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নয়নের প্রশ্নের জবাব দিলেন না। নয়ন একটা জিনিস খেয়াল করেছে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার মা কোহিনূর সম্পর্কে যেমন কোনো প্রশ্ন করেন না, কিংবা কিছু জানতে চান না। তেমনি, তার বাবা ফখরুল ইসলাম সম্পর্কেও কিছু জানতে চান না। বিশেষ করে শ্বশুরদের মেয়ের চেয়েও জামাইয়ের ভালো-মন্দের প্রতি একটা আলাদা আগ্রহ থাকে। কিন্তু কোনোদিনও তার বাবা সম্পর্কে এই আগ্রহটি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দেখাননি। এবারও এমন বিপদের আশঙ্কার কথা শুনেও তিনি চুপ করেই রইলেন। নয়ন নানার খানিকটা কাছাকাছি মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার মৃত্যুর সময় মেয়েটা গর্ভবতী ছিল নানাজান! এই কারণেই সে আত্মহত্যা করেছে। আমি যদি আগেভাগেই ঘটনা না জানতাম, তাহলে আমাদের পরিবারের ভেতরই কী ভয়াবহ অবস্থা হতো, আপনি বুঝতে পারছেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ পান চিবুচ্ছেন। তার মুখ নির্বিকার। নয়ন খুব অবাক হচ্ছে তার নানার এমন নির্লিপ্ততা দেখে। সে বলল, 'আত্মহত্যা করার কিছু দিন আগে মেয়েটা গ্রামে এসেছিল বেড়াতে। তখন তাকে সাপে কেটেছিল। তার সাপের বিষ নামাতে গিয়েছিলেন আব্দুল ফকির। আসমা খুবই দরিদ্র ঘরের মেয়ে। আব্দুল ফকির বললেন তাকে কালি জাত নাকি সাপে যেন কেটেছে। ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ। এই সাপে কাঁটা রোগী সাধারণত বাঁচে না। কিন্তু তিনি রোগীরে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন। তবে সেক্ষত্রে রোগীকে নিয়ে তাকে টানা তিন দিন তিন রাত আলাদা একটা ঘরে থাকতে হবে। সেই ঘরের চারপাশে কলাগাছ পুঁতে দিতে হবে। ঢোল-বাদ্য বাজাতে হবে। ধুপের ঘন ধোঁয়া দিতে হবে। এমন আরো অনেক কিছু। একটা ওই অবস্থার মেয়ে, তার মতো একটা মানুষের সাথে তিন দিন তিন রাত আলাদা ঘরে থাকলে কারোই কিছু বলার নাই। আর সকলেই আব্দুল ফকিরকে কী পরিমাণ মানে, ভয় পায়, তা আপনি জানেন। অনেকেই ভাবে, তার অলৌকিক শক্তি অবধি আছে। আমি তো এবার এসে শুনলাম, সে নাকি কুফরি কালাম না কী যেন জানে। আধুনিক মানুষ যাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক বলে। তো, এই এলাকার সকলেই আব্দুল ফকিরকে ভয়ও পায়। আপনিও পান। কি পান না?'

নয়ন সামান্য হাসল। তার সেই হাসিতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর প্রতি সুস্পষ্ট বিদ্রুপ। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সেটি গ্রাহ্য করলেন না।

নয়ন বলল, 'এই তিনদিন বিষ নামানোর কথা বলে আব্দুল ফকির কোনো নেশাদ্রব্য ট্রব্য খাইয়ে মেয়টাকে অচেতন করে নানান সময় ধর্ষণ করেছে। সাপে কাটলে মানুষ যতটা না বিষের কারণে অসুস্থ হয়, তার চেয়ে বেশি অসুস্থ হয় আতঙ্কে। মেয়েটাকে সম্ভবত কোনো বিষধর সাপে কাটেনি। কেটেছে নির্বিষ কোনো সাপেই। কিন্তু সাপের কামড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল সবাই। আর

আব্দুল ফকির যখন বলল, এটা বিষধর সাপের কামড়। রোগী বাঁচানো দুঃসাধ্য। তখন আর যায় কই? মেয়েটা প্রচণ্ড আতঙ্কে পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার পরিবারের অবস্থাও দিশেহারা। আব্দুল ফকিরই তখন একমাত্র ভরসা। এই সুযোগে আব্দুল ফকির মেয়েটাকে অচেতন করে ধর্ষণ করেছে। আব্দুল ফকির নানান জাতের নেশা করা মানুষ। তাকে দেখলে বোঝা যায় না। কিন্তু সেদিন আমি তার চেহারা দেখে, মুখের গন্ধ শুকেই টের পেয়েছি। এই সব বিষয়ে সে পুরোপুরি এক্সপার্ট। আর এই কাজ তো তিনি আজ হঠাৎ করে করেননি। আমার ধারণা এই কাজ সে বহু বছর ধরেই করে। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারগুলোতে। ফলে কেউ জানলেও, বা কোনো কোনো মেয়ে গর্ভবতী হয়ে গেলেও সাহস করে, মান-ইজ্জতের ভয়ে তাকে কেউ কিছু বলে না। কেউ কেউ আবার চুপিচুপি তার কাছেই যায় মেয়ের গর্ভ নষ্ট করার জন্য। কী ভয়ঙ্কর মানুষ সে! কী ভয়ঙ্কর!'

নয়ন থামল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হঠাৎ কথা বলে উঠলেন। বললেন, 'এত কথা তুমি কীভাবে জানলা? এগুলার কিছুই তো আমিই জানি না।'

নয়ন বলল, 'নানাজান, আপনি সবই জানেন। এই অঞ্চলে এখনও গাছের পাতা পড়লেও সেই সংবাদ সবার আগে আপনার কানে আসে। আর এসব আমি কীভাবে জানলাম? আসমা মেয়েটাকে খুব স্নেহ করতাম আমি। ওকে বাসাতে পড়াতামও। সেবার সাপে কাঁটার ঘটনা শেষে সে ঢাকায় যাবার পর থেকেই তাকে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হতে থাকে। আপনি জানেন, আমি ডাক্তার মানুষ। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কী বলব! একদিন জিজ্ঞেস করলাম। প্রথমে সে কিছুই বলল না। তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলল। বলল, ভাইজান আপনে তো ডাক্তার মানুষ, আমারে বাঁচান। আসমা অচেতন থাকলেও সে তো বুঝতেই পেরেছিল কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। কাউকেই না। আমার তখন ফাইনাল পরীক্ষা। আর হঠাৎ করে একটা মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে এইসব টেস্ট করানোরও নানান সমস্যা। ভাবছিলাম পরীক্ষা শেষ হলেই কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগেই...'

নয়ন কথা শেষ করল না। তার গলার স্বর কেমন ভারি হয়ে উঠল। খানিক থেমে সে বলল, 'এখনো ওর মুখটা আমার চোখের সামনে ভাসে নানাজান। আমি ঘুমাতে পারি না। আরেকটা কথা, ওর লাশ গ্রামে আনা কিন্তু সহজ ছিল না। আমি জানতাম ভয়াবহ বিপদে পড়ে যেতাম আমরা। প্রথমত এটা সুইসাইড কেস। পুলিশ জানলে খুব বাজে ট্রিট করত আমাদের। দ্বিতীয়ত তারপর যদি দেখা যেত মেয়েটা প্রেগন্যান্ট! ওহ্ খোদা! কী ভয়াবহ বিপদেই না আমাদের পড়তে হতো!'

নয়ন থামলেও তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কোনো কথা বললেন না। নয়নই আবার বলল, 'নানাজান, বিষয়টা খুবই লজ্জার। এই অঞ্চলের এত বড় একজন মানুষ আপনি। আপনার চোখের সামনে দিনের পর দিন এই মানুষটা এমন ভয়ঙ্কর অন্যায় করে চলছে। কিন্তু আপনি কিচ্ছু বলছেন না! কিচ্ছু না? কিসের ভয় আপনার? কি দুর্বলতা? আমাকে একটু বলবেন নানাজান, প্লিজ?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যেন অনড়, জড় এক বস্তু। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই বসে রইলেন। নয়ন বলল, 'এই আব্দুল ফকির মানুষটা একটা বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ নানাজান। আমি তার বিষয়ে অনেক খোঁজ নিয়েছি। তার সাথে কথাও বলেছি। আমার কী মনে হয়েছে জানেন? আমরা যে নানান বিদেশি সিনেমা দেখি, বই পড়ি, সেইসব বইতে এমন অবিশ্বাস্য বিকৃত সব মানুষের চরিত্র থাকে। আমি এতদিন ভাবতাম, এইসব বিকৃত মানসিকতার মানুষ বোধহয় শুধু গল্প, উপন্যাস বা সিনেমায়ই থাকে। আর বাস্তবে থাকলেও তা ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশে থাকে। সেদেশের নানান পত্র-পত্রিকায় এমন কত খবর যে পড়েছি! কিন্তু বাংলাদেশের এমন একটা গ্রামে, এমন অতি সাধারণ চেহারার একজন মানুষ এমন অবিশ্বাস্যরকম ভয়াবহ হতে পারে, এটা আমার এখনও বিশ্বাস হয় না নানাজান। আমার এখনও মনে হয়, আমি ভুল ভাবছি।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। এবার বিড়বিড় করে বললেন, 'জগতের দুইটা রূপ আছে, একটা কালা রূপ, একটা ভালা রূপ। যারা ভালো মানুষ তাগোর ওই কালা রূপটা না দেহনই ভালো। আর দুনিয়ার কতটুকই আমরা জানি! নিজেরেই পুরাপুরি জানি? জানি না। আর তুমি এইসব নিয়া মাথা ঘামাইও না ভাই। তোমার চেহারা শরীলের অবস্থাও ভালো না। তুমি শহরের পোলা শহরে চইল্যা যাও। গ্রাম-গঞ্জে বিপদ-আপদের হাত পাও নাই। আরেকটা কথা তোমারে বইলা রাখি। তোমরা শহরের মানুষ মনে করো, গ্রামের মানুষ অতি সহজ-সরল। কিচ্ছু বোঝে না। কথাটা ঠিক না। একদম ঠিক না। গ্রামের মানুষের মতো জটিল কিছু দুইন্যায় নাই। এইজন্যই তোমারে বলি, তুমি যহন-তহন এইহানে সেইহানে ঘুইর‌্যা বেড়াইও না। তোমার নানার এহন আর সেই শক্তিটা নাই যে তোমারে দেইখ্যা রাখব। আর ক্ষতি একটা হইয়া গেলে, সেই ক্ষতি আর পোষান যায় না।'

নয়ন বলল, 'এখন না হয় শক্তি নেই। কিন্তু যখন আপনার শক্তি ছিল, তখন আপনি কী করছেন? আর চাইলে এখনও সম্ভব। আপনি কি তাকে ভয় পান? আব্দুল ফকিরের এমন ঘটনা আপনি আগে আর জানতেন না?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। তারপর ধীর স্থির ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি বেশি উত্তেজিত নানাভাই। আমার উত্তেজিত হইলে চলে না। তোমার-বয়সের কয়গুন আমার বয়স, সেইটা হিসাব আছে? নাই। শোনো, আমি

www.boighar.com

কিছু করি নাই, কথাটা ঠিক না। আইজ থেইকা প্রায় পঁচিশ বছর আগে উত্তরকান্দির এক মাইয়ার লগে এই একই ঘটনা ঘটছিল। কিন্তু তারাও চায় নাই, ঘটনা জানাজানি হোক। আমি বাতাসের লগে কান পাইতা ঘটনা শুনলাম। মাইয়ার বাপরে ডাকলাম। ডাইকা ঘটনা জিগাইলাম। সে ঘটনা স্বীকার করল। আমি চাইছিলাম, আব্দুল ফইররে তহনই চিরতরে নিকাশ কইরা ফালাইতে। তহন এই দুর্গম এলাকায় থানা-পুলিশের আসনের ঘটনা সহজে ঘটে না। চর লইয়া দিনে দুপরে মাডার হয়। কেউ গ্রাহ্য করে না। তারপরও, বিনা কারণে আব্দুল ফইররে খুন করলে এই অঞ্চলের লোকজনই খেইপ্যা উঠতে পারে। অনেকের কাছেই সে পীর। দোষ করলেও পীর। এইজন্য তাগো কাছে দেহানোর লইগা একখান কারণ দরকার আছিল। মাইয়ার বাপরে লইয়া গাঙপার বটতলায় বইলাম। এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য লোক রাখলাম লগে। যাতে পরে কোনো ঝামেলা না হয়। মাইয়ার বাপ সকলের সামনে ঘটনা খুইলা বলল। আমার রাস্তা তহন কিলিয়ার। আব্দুল ফইররে যদি খুনও করি, এই গন্যমান্য লোকগুলা তো সবাইরে বলতে পারব, কি কারণে খুন করলাম। সেই রাইতেই দলবল লইয়া গেলাম। লগে আছিল এস্কান্দারের বাপ হায়দার আলী। ঘুটঘইটা আন্ধার রাইত। তার উপর নামল বিষ্টি। হোসনাবাদের একজন খবর দিলো আব্দুল ফইর ঘুমাইছে বাইরের ঘরে। এর চাইতে ভালো সুযোগ আর হয় না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ থামলেন। নয়ন তাকিয়ে আছে নানার মুখের দিকে। এই প্রথম তার মনে হলো তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখে একটা স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। এই ছাপটা সে আগে কখনোই তার নানার মুখে দেখেনি। নয়ন ভারি অবাক হলো।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আব্দুল ফইর ঘুমাই আছে চৌকির উপর। আমার মনে আছে, আমি স্পষ্ট দেখছি। হায়দার আর তিন চাইর জনরে লইয়া গেল। কেউ পাও চাইপ্যা ধরল, কেউ মুখ চাইপ্যা ধরল। হায়দার এক কোপে কল্লা নামাই দিলো। সেই কল্লা বস্তায় ভইরা নিয়া আসলাম ফতেহপুর। মাইয়ার বাপরে দিব। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কি জিনিস, এইটা মাইনষের জানন দরকার!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর গলা যেন শুকিয়ে আসছে। তিনি বার দুই ঢোক গিললেন। তার চোখে ভয়ের ছায়া। নয়নের প্রচণ্ড অবাক লাগছে। তার সামনের এই মহিরুহ মানুষটি কোনো কারণে এমন ভয়ার্ত হতে পারেন, এটি তার বিশ্বাস হচ্ছে না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কেমন ঘোর লাগা গলায় বললেন, 'কিন্তু বস্তা থেইকা কল্লা বাইর কইরা দেহি, কল্লা আব্দুল ফইরের না। কল্লা বজলু ব্যাপারীর। অথচ খুন করনের সময় আমি নিজ চৌক্ষে দেখছি ওইটা আব্দুল ফইর।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখ কেমন ভয়ার্ত, ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। নয়ন অবাক হলেও তা প্রকাশ করল না। সে ডান হাত বাড়িয়ে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হাত

ধরল। এই শক্ত পাথরের মতো মানুষটার জন্য তার হঠাৎ মায়া লাগতে লাগল। সে বলল, 'নানাজান, আপনার কি ধারণা, কোনো জাদু মন্ত্রবলে আব্দুল ফকির বজলু ব্যাপারী হয়ে গিয়েছিল? এই কথা আপনি বিশ্বাস করেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ জবাব দিলেন না। নয়ন বলল, 'শোনেন নানাভাই, ওই রাতে বজলু ব্যাপারী গিয়েছিলেন আব্দুল ফকিরের বাড়ি। তিনিও আব্দুল ফকিরের সাথে রাতে ওই বাইরের ঘরেই ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝরাতে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় তিনি চলে যান ভেতর ঘরে। আর অন্ধকারে তাড়াহুড়ায় আব্দুল ফকির ভেবে বজলু ব্যাপারীকে খুন করা হয়েছিল। আপনি এত বুদ্ধিমান মানুষ হয়েও কি এইসব জাদু-মন্ত্রে বিশ্বাস করেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এই ঘটনা আমি জানি। কিন্তু কিছু ঘটনার আড়ালেও ঘটনা থাহে। বজলু ব্যাপারী ওইদিনই, ওই অতরাইতে ওইহানে কেন যাইব? আর আব্দুল ফইরই বা ঠিক সময় মতো ভেতর বাড়ি চইলা যাইব কেন? বিষয় যত সহজ ভাবো, তত সহজ না। দুইন্যায় চোউক্ষে দেহা যায় না, এমন বহুত জিনিস আছে। আর আল্লাহপাকের কোরআন তো বিশ্বাস করো। এই কোরআন দিয়া ভালো জিনিস যেমন হয়। উল্টাপাল্টা ব্যবহার কইরা মানুষ খারাপভাবেও ব্যবহার করতে পারে। কুফরি কালামের কথা শোনছ? এই কুফরি কালাম কইরা মানুষ বহু কিছু করতে পারে। আব্দুল ফইর লোক ভালো না। কিছু খারাপ ক্ষমতা তার আছে।'

নয়ন মৃদু হাসল। বলল, 'এই যুগে এসেও এইসব কথা আপনি বিশ্বাস করেন নানাজান। এই জন্য আপনি তাকে ভয় পান? বজলু ব্যাপারীর ঘটনার ব্যাখ্যা তো আছেই। আব্দুল ফকির নিজেও আমাকে বলেছে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'নানাভাই, আমার বয়স কম হয় নাই। কম দেহি নাই। এহনও কম দেহি না। তয় একটা কথা বলি, এইসব জিনিস অবিশ্বাস কইর না। এই জীবনে জাদু টোনা, বাণ মাইরা মানুষ খুন করাও দেখছি।'

নয়ন বলল, 'বাণ মেরে খুন করার বিষয়টা কী?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এইগুলার নানান ধরন আছে। ধরো আব্দুল ফইরের মতো এমন কুফরি কালাম, বা জাদু, টোনা জানা কোনো লোকেরতন কেউ অন্য কাউরে ক্ষতি করানের লইগা তার নামে তাবিজ লেইখ্যা আনলা। তারপর সেই তাবিজ কোনো গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখলা। সাতদিনের মইধ্যে সেই গাছ শুকাইয়া মাইরা যাইব। লগে সেই মানুষটাও মরব।'

নয়ন কি ভাবল, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'ধরেন, আমি যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নামে তাবিজ করে এরকম গাছে ঝুলিয়ে রাখি, সে কি সাতদিনের মধ্যে মারা যাবে? নাকি দেশ দূরে বলে সময় বেশি লাগবে?'

নয়নের কথা শুনে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ খানিক আহত হলেন। তিনি বললেন, 'সকল জিনিস লইয়া তামাশা ভালো না। এই আব্দুল ফইররে যে আমি ওই একবারই মারনের চেষ্টা করছি, তা না। এরপরও আরেকবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পারি নাই। তয় সেই চেষ্টা দাগ এহনও তার পায় আছে। পরপর দুইবার নিশ্চিত মরনের হাত থেইকা সে বাঁচছে। আর যে যাই বলুক, এইগুলান কোনো স্বাভাবিক ঘটনা না। আমি ফরিদপুরের বড় পীর সাহেবের ধারেও গেছিলাম। তিনিও আমারে বলছেন, আমি যেন আর আব্দুল ফইরের কোনো ক্ষতি করনের চেষ্টা না করি। সেই থেইকা আমি বাদ দিছি।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ থামলেন। নয়ন কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে এটি সে ভাবেনি। পাহাড়ের মতো বিশাল মানুষটির এই রূপটি দেখবে বলে সে কখনো ভাবেনি। সে হঠাৎ বলল, 'নানাজান, আপনি কি আর কোনো কথা আমাকে বলতে চান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকালেন। নয়ন হাসল। তবে সেই হাসিতে কোথাও যেন হাসি ছাড়া অন্য কী রয়েছে! সে বলল, 'নানাজান, আমি কিন্তু আব্দুল ফকিরকে এত সহজে ছেড়ে দেব না। আমি আবার আসব। আর আপনার কাছে আমার আরো অনেক কিছু জানার আছে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'দুইন্যার সব জিনিস জানতে হয় না। কিছু জিনিস না জানাই ভালো। যত কম জানবা, তত আনন্দে থাকবা। কম জাননের চেয়ে আনন্দ কিছুতে নাই।'

নয়ন কি বলতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেল। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, তৈয়ব উদ্দিনের শেষ কথাটা মিথ্যে না। কম জানা আসলেই আনন্দের।

পারুলের সাথে নয়নের দ্বিতীয়বার দেখা হয়ে গেল কাকতালীয়ভাবে। নয়ন ঢাকা ফিরে যাবে। এ অঞ্চল থেকে ঢাকায় যাওয়ার উপায়টা বেশ কঠিন। ট্রলারে কয়েক ঘণ্টার যাত্রা শেষে পৌছাতে হয় রায়গঞ্জ বন্দরে। রায়গঞ্জ এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় নদী বন্দর। সেই বন্দর থেকে রোজ সন্ধ্যায় বড় দ্বিতল লঞ্চ ছাড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে। সেই লঞ্চে সরাসরি ঢাকা যাওয়া যায়। অন্য উপায়টা আরো কষ্টসাধ্য। বারকয়েক নৌকা, ট্রলার বদলে দীর্ঘ যাত্রা শেষে যেতে হয় মাদারীপুর শহরে। সেখান থেকে বাসে ঢাকা। নয়ন রায়গঞ্জ থেকে সরাসরি ঢাকায় যাওয়াটাকেই ভালো মনে করেছিল। কিন্তু লঞ্চ ছাড়ার সঠিক সময়টা সে কোনোভাবেই জানতে পারেনি। তাকে পৌছে দিতে তার সাথে এসেছে মনির। তারা দীর্ঘ ট্রলার যাত্রা শেষে যতক্ষণে রায়গঞ্জে পৌছাল, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গেছে। তারা তড়িঘড়ি করে লঞ্চঘাট এসে দেখে লঞ্চ ছেড়ে গেছে আরো ঘণ্টাখানেক আগে। এখন উপায়?

মনিরের পরামর্শ আবার ফতেহপুর ফিরে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে পরদিন আরো তাড়াতাড়ি চলে আসা। কিন্তু নয়ন তাতে সায় দিলো না। এই এতটা পথে ট্রলারের ইঞ্জিনের ওই বিদঘুটে শব্দ শুনে শুনে কান ঝালাপালা করতে আর ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে রাতটা বরং এখানেই কোথাও থেকে যাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া নতুন জায়গা, একটা আলাদা রোমাঞ্চও কাজ করছিল নয়নের মধ্যে। থাকার জায়গা শেষ অবধি একটা পেলও তারা। কিন্তু সেটি যে বিশেষ সুবিধাজনক হবে না, তা এক পলক দেখেই বুঝে ফেলেছিল নয়ন।

বন্দরে সাধারণত বিক্রয়যোগ্য মালামাল নিয়ে দূর থেকে কৃষকরা আসেন। তারা হঠাৎ হঠাৎ বিপদে পড়লে এখানে থাকেন। ফলে হোটেল বলতে যা বোঝায় তা এখানে নেই। এখানে যা আছে তার নাম বোর্ডিং। লম্বা স্কুল ঘরের মতো ঘর। তাতে পাশাপশি প্রায় আট দশখানা সরু চৌকি বসানো। সেই চৌকি একেকজনের কাছে ভাড়া হয়। ভাড়ায় খুবই সস্তা। নয়ন ভেবেছিল সবগুলো

www.boighar.com

চৌকিই তারা ভাড়া করে দুইজনই সারারাত নির্ঝঞ্ঝাট আরামে থেকে যাবে। কিন্তু বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার তাতে রাজি হলেন না। তার নিয়মিত অতিথিদের বাইরে রেখে কষ্ট করাতে তিনি পারবেন না। ফলে দু'খানাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো নয়ন আর মনিরকে। তবে রাতটা কাটল ছাড়পোকার ভয়াবহ যন্ত্রণাতে।

সকাল বেলা একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ল নয়ন আর মনির। বাকি দিনটা চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে। তাছাড়া এই অঞ্চলে নদীটা চমৎকার। দু'ধারে বড় বড় দোকানপাট হলেও বুড়িগঙ্গার মতো নোংরা নয়। নদীর পানিও দুর্গন্ধযুক্ত কদাকর নয়। শহর নয়, মফস্বল নয়, আবার পুরোপুরি গ্রামও নয়, এমন একটি জয়াগায় ভোর হয় কী করে, সেটি দেখাটাও একটি নতুন অভিজ্ঞতা। নয়ন চোখ ভরে এই বন্দরের একটি দিনের সূচনা দেখল। হেঁটে হেঁটে মূল বন্দর থেকে অনেকটা দূরে এসেছে তারা। এখানে নদীতে মাছ ধরার কত কত নৌকা। নাও ভর্তি তাজা মাছ চলে আসছে বন্দরের বাজারে। দোকানপাটের ঝাপ খুলছে ঝপাঝপ। ভোরের নাস্তার আয়োজন চলছে হোটেলগুলোতে। সেই হোটেলেই খেয়ে নিলো তারা। চারপাশে ক্রমশই জেগে উঠছে অদ্ভুত ব্যস্ততার একটি দিন।

তখন দশটার মতো বাজে। চারপাশে তুমুল কোলাহল। বন্দরে ছোট বড় নানান জলযান এসে ভিড়ছে। তাতে হরেকরকম পণ্য আসছে যাচ্ছে। মুটেরা মাল মাথায় করে ছুটছে। তিনচাকার ভ্যান গাড়ি ঘটাং ঘটাং শব্দে বেল বাজিয়ে শাঁই করে চলে যাচ্ছে গা ঘেঁষে। এই মুহূর্তে নয়নকে কেউ ডাকল। একটা মেয়েলি কণ্ঠ রাস্তার উল্টোদিক থেকে চিৎকার করে ডাকছিল, 'এই, এইই'।

নয়ন প্রথম বারদুয়েক খেয়াল করেনি। কারণ মেয়েটা তাকে নাম ধরে ডাকছে না। তৃতীয়বার মেয়েটা রাস্তা পার হয়ে চলে এলো। নয়নের সামনে এসে বলল, 'আপনে কি কানে কম শোনেন? কতবার ডাকতেছি?'

নয়ন চট করে মেয়েটাকে চিনতে পারল না। খানিক সময় লাগল তার। আব্দুল ফকিরের মেয়ে পারুল। সে রেগে উত্তর দিতে গিয়েও হেসে ফেলল। বলল, 'সরি। আপনি তো আমার নাম ধরে ডাকেননি। এইজন্য শুনতে পাইনি।'

পারুল বলল, 'আপনে এইহানে কী করেন?'

নয়ন ঘটনা খুলে বলল। ঘটনা শুনে পারুল হেসে কুটিকুটি। সে বলল, 'দেইখেন আইজও আবার লঞ্চ মিস কইরেন না।'

নয়ন বলল, 'না। আজ আর সে উপায় নেই।'

পারুল বলল, 'আমরা এইহানে কেন আসছি জানেন?'

নয়ন বলল, 'কেন?'

পারুল বলল, 'আপনে ভুইলা গেলেন? তাবারন খালায় সেই যে গরম তরকারি পইড়া পুড়ল! আপনেই না বললেন, ডাক্তারের কাছে আনতে। অবস্থা তো খারাপ, পোড়া জায়গাটায় ঘা হইছে।'

নয়ন বলল, 'আপনারা জায়গাটা ঠিকমতো পরিষ্কার করেননি। আর আমি কিছু মলম কিনে এনে দিতে বলেছিলাম, দিয়েছিলেন?'

পারুল বলল, 'না। কীভাবে দিব? আব্বায় ছিল না বাড়িতে। জুলফিকার ভাইও না। আর ওইদিকে তো ডাক্তারও নাই, ওষুধের দোকানপাট নাই। কিচ্ছু নাই।'

নয়ন বলল, 'তা এখন কী অবস্থা?'

পারুল বলল, 'সেই জন্যই তো এইহানে আনা লাগছে। আব্বায় কী সব কাজ লইয়া আইজকাল খুব ব্যস্ত। সে যে দেখব, সেই সময়ও পাইতেছে না। অবস্থা খারাপ দেইখা শেষে নিজেই বলল ডাক্তারের কাছে লইয়া আইতে।'

নয়ন বলল, 'কিন্তু এত ভোরে এখানে আসলেন কীভাবে?'

পারুল বলল, 'আইজ তিন দিন হয় আইছি। লগে রতনও আছে। এইহানে আমার এক বান্ধবী আছে লতা। তার নানাবাড়ি এইহানে। সে তার নানাবাড়ি থাইকা কলেজে পড়ে। তার কাছেই উঠছি। ডাক্তার বলছে কয়েকদিন থাকতে। কী সব ওষুধপত্র দিলো। বলল কয়টা দিন থাইকা ভালো-মন্দ দেখাই যান। একবার চইলা গেলে তো আর সহজে আসতে পারবেন না। এইজন্যই থাইকা গেলাম।'

পারুলের কথার ধরনে একটা সরলতা আছে। বিষয়টা নয়নকে মুগ্ধ করল। সে বলল, 'বাহ্, আপনি তো খুব সুন্দর করে কথা বলেন। বাচ্চাদের মতো।'

পারুলের চট করে সেদিনের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। তার ভারি লজ্জা লাগতে লাগল। সে বলল, 'আমি তো শুদ্ধ কইরা কথা বলতে পারি না। আপনের তো শুদ্ধ কথা পছন্দ।'

নয়ন হাসল। বলল, 'কে বলল আমার শুদ্ধ কথা পছন্দ?'

পারুল প্রায় মুখ ফসকে বলেই বলছিল যে সেদিন রাতে পুকুর ঘাটে বসে যে বললেন! কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে সে নিজেকে সামলে নিলো। আজকাল যে তার কী হয়েছে, সেই রাতের সেই স্বপ্নটা যে স্বপ্ন ছিল, তা সে প্রায়ই ভুলে যায়।

পারুল বলল, 'না, আপনেরা তো শহরের মানুষ। শহরের মানুষ শুদ্ধ কথাই পছন্দ করবে– এইটাই স্বাভাবিক।'

নয়ন বলল, 'তাহলে গ্রামের মানুষেরও তো তাদের কথাই পছন্দ করাটা স্বাভাবিক হবার কথা, তাই না?'

পারুল বলল, 'অত কিছু বুঝি না। আমার শুদ্ধ কথা বলনের খুব শখ। টাউনে যাওনের খুব শখ।'

নয়ন হঠাৎ পারুলকে তুমি করে বলে ফেলল। সে বলল, 'সময় হলে তুমিও শহরে যাবে পারুল। সমস্যা তো নেই। এখনো অনেক সময় আছে।'

পারুল প্রথমে তার কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি। নয়ন তাকে তুমি করে বলেছে। ইশ্! তুমি! তুমি ডাকটা যে কী সুন্দর! কী সুন্দর! সেদিন রাতে স্বপ্নের ভেতরও নয়ন তাকে তুমি করে ডেকেছিল। আনন্দে পারুলের মরে যেতে ইচ্ছে করছে। তার চোখে পানি চলে এসেছে। সে কি করবে এখন? আচ্ছা, নয়ন তাকে হুট করে তুমি বলে ফেলল কেন, কোনো কারণ নেই তো? নাকি ভুলে বলে ফেলেছে?

পারুল বলল, 'আপনে আইজই চইলা যাবেন?'

নয়ন বলল, 'হ্যাঁ'।

পারুল বলল, 'আবার কবে আইবেন?'

নয়ন বলল, 'এখন তো বলতে পারছি না। তবে আসব। এই জায়গাটা আমার ভীষণ ভালো লেগে গেছে। মানুষগুলোও প্রিয়। আমার আসতেই হবে।'

নয়ন চলে যাচ্ছে শোনার পর থেকেই বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল তার। মনে হচ্ছিল জগতের সকল কিছু মুহূর্তেই শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু এই যে নয়ন তাকে বলল, এই জায়গাটা ভীষণ প্রিয় তার। মানুষগুলোও প্রিয়, আবার আসতেই হবে তাকে। এই কথাগুলো শুনেই পারুলের বুকের ভেতর আবার কেমন থইথই করে উঠল। পারুল বলল, 'আপনে কিন্তু আসবেনই। আপনের সাথে আমার অনেক কথা আছে।'

নয়ন হাসল, 'নিশ্চয়ই আসব।'

পারুল বলল, 'আপনেগো লঞ্চ কহন ছাড়ব?'

নয়ন লঞ্চের সময়টা জেনে এসেছে আজ। সে সময়টা বলল। পারুল যেমন এসেছিল তেমনই বিদায় নিয়ে চলে গেল। সেইদিনই পারুলের সাথে নয়নের আবার দেখা হয়ে গেল। সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত নয়ন বিকেলের দিকে খানিক আগেভাগেই লঞ্চঘাট পৌঁছাল। পন্টুনে ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে পারুল আর তার সাথে এক মেয়ে। মেয়েটা পারুলের বান্ধবী লতা। পারুলের হাতে একগাদা কাগজ। সে নয়নকে দেখেই বলল, 'আপনের জন্য সেই কহন থেইকা দাঁড়াই আছি। এতক্ষণে আইলেন।'

নয়ন হাসল। পারুল বলল, 'গ্রাম-গঞ্জের ডাক্তার কী না কী বোঝে, এই জন্য ওষুধপাতি আর কাগজপত্রগুলান লইয়া আইছি। আপনেরে একটু দেখাইয়া নিতে চাই।'

নয়ন ওষুধ আর কাগজপত্রগুলো সময় নিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'ঠিকই আছে। উনি ভালো ডাক্তার। আশা করি আর সমস্যা হবে না।'

পারুল কী ভেবে খানিক চুপ করে রইল। তারপর লতাকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার বান্ধবীর একজন মানুষ আছে, তার নাম আশিক। সেও কিন্তু ঢাকা থাকে।'

নয়ন এবারো মৃদু হেসে বলল, 'তাই নাকি?'

লতা জবাব দিলো না। লজ্জায় আরক্ত হলো। পারুল খানিক প্রগলভ যেন। সে বলল, 'আশিক ভাই মাঝে-মধ্যেই ঢাকারতন এই লঞ্চে আসে। সারাদিন থাকে। তারপর সইন্ধ্যা বেলা আবার চইল্যা যায়। লতা বলছে তারা নাকি লুকাইয়া আগেই বিয়া কইরা ফালাইব। দুইজন আলাদা থাকতে নাকি কষ্ট।'

লতা এবার ভারি লজ্জা পেল। সে তার বাঁ হাতে পারুলকে আলতো আঘাত করল। পারুল বলল, 'আপনের তো ঢাকা যাইতে যাইতে সারা রাইত লাইগা যাইব। কাইল বেয়ান বেলা পৌঁছাইবেন। রাইতে খাইবেন কি লঞ্চে?'

নয়ন এই বিষয়টা ভাবেনি। অবশ্য ভাবনার কিছু নেইও। লঞ্চে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পেয়ে যাবে সে। তাছাড়া দুয়েক রাত না খেয়ে থাকার অভ্যাস তার আছে। সে বলল, 'ওটা আমি ম্যানেজ করে নেব'।

নয়ন এতক্ষণ খেয়াল করেনি। পারুলের হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগও। পারুল হঠাৎ ব্যাগের ভেতর থেকে একটা টিফিন ক্যারিয়ার বের করে বলল, 'লঞ্চের খাওন ভালো না। কী না কী দিয়া রান্ধে। শেষে পেট খারাপ হইব। এই বাটির মইধ্যে মুরগির মাংস আর ভাত আছে। এমনিতে সময় আছিল না, তার উপর অন্য মাইনষের বাড়ি। এইজন্য বেশি কিছু করতে পারি নাই। আমি নিজে কিন্তু রানছি। ভালো না হইলেও পরের বার আইসা বলবেন যে ভালো হইছে।'

নয়ন এবার ভারি বিব্রত বোধ করছে। সে কিছু বলতে যাবে, কিন্তু তার আগেই পারুল একটা পানির বোতল হাতে ধরিয়ে দিলো মনিরের। তারপর নয়নকে বলল, 'লঞ্চের পানিও খাইবেন না। ওই পানিতে কত কী যে থাকে, আল্লাপাকই জানে! এই বোতলের পানি একদম টিউবওয়েলের। এইটাই খাইবেন।'

নয়নের ভারি অবাক লাগছে। একইসাথে বিব্রতও লাগছে। সে বলল, 'পারুল। এতসব কেন করতে গেলে তুমি?'

পারুল জবাব দিলো না। তবে একটা সহজাত গোপন মেয়েলি লজ্জার আভায় তার মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠল। নয়ন বলল, 'তোমার এই বাটি আমি ফেরত দেব কি করে? তাছাড়া এগুলো বয়ে নিতে আমার বাড়তি কষ্টই হবে।'

www.boighar.com

পারুল চট করে বলল, 'আপন মানুষের কষ্ট কষ্ট মনে হয় না। আনন্দ মনে হয়। আর বাটি আপনের ফেরত দেওন লাগব না। দিতে চাইলে ঢাকারতন কিছু নিয়া আইসেন।'

নয়ন বলল, 'তোমার সাথে তো আমার দেখা নাও হতে পারে পারুল।'

পারুল কী বলতে গিয়ে আচমকা থমকে গেল। তার চোখ ছলছল। সে কি কেঁদে ফেলবে? বিষয়টা নয়নের চোখ এড়াল না। তার সামনে দাঁড়ানো সহজ-সরল মেয়েটাকে দেখে তার হঠাৎ ভারি মায়া লেগে গেল। সে সামান্য ঝুঁকে আলতো করে পারুলের মাথায় হাত রেখে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি নিচ্ছি। তুমি ভালো থেকো।'

পারুলের মাথায় ওই সামান্যতম স্পর্শ, কিন্তু পারুলের মনে হলো তার পৃথিবী জুড়ে এক মুহূর্তে অজস্র ফুল ফুটল, হাজারটা প্রজাপতি রঙিন ডানা মেলে ছুটে গেল। এই অনুভূতি সে বোঝাতে পারবে না।

নয়ন বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে এলো। যাও, বাড়ি যাও। আর তাবারনের খেয়াল রাখো। আমাদের উঠে যেতে হবে।'

পারুল তারপর আরো কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু পারল না। একটা শব্দও আর তার মুখ থেকে বের হলো না। নয়ন মনিরকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে উঠে গেল। কিন্তু পারুল দাঁড়িয়েই রইল। লতার কি কাজ ছিল সন্ধ্যাবেলা। সে বারকয়েক তাড়া দিলো পারুলকে। কিন্তু পারুল নড়ল না। সে দাঁড়িয়েই রইল। শেষ অবধি পারুলের সাথে কথা বলেই তাকে রেখে চলে গেল লতা। পন্টুনে ঢোকার পথ থেকে সরে গিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে গিয়ে দাঁড়াল পারুল। ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে চারধারে। নয়ন ছোট দেখে একটা কেবিনও পেয়ে গেল। মালামাল কেবিনে রেখে মনিরকে বিদায় দিতে আসলো সে। মনির নেমে যেতেই একা হয়ে গেল নয়ন। লঞ্চের দোতলার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশটা শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে নয়ন। এই সময়টা কেমন অদ্ভুত এক বিষণ্নতার সময়। আকাশ থেকে ঝুপ করে যেন একটা মন খারাপের চাদর নেমে ঢেকে দেয় পৃথিবী। বহু চেষ্টা করেও সেই চাদরটা আর সরানো যায় না। নয়নের হঠাৎ মনে হলো তার বুকের ভেতরটা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে হু হু করে উঠছে। এই কারণটা হয়তো সে জানে, হয়তো জানে না। কিন্তু মাঝে-মধ্যে তার মনে হয় না জানাই ভালো। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হয়তো ঠিক কথাটাই বলেছিলেন, জগতে সকল কিছু জানতে নেই। যত কম জানা যায়, ততই ভালো। ততই আনন্দময় এই জগৎ।

পুরোপুরি অন্ধকার নামতেই বিকট শব্দে ভেঁপু বাজাল লঞ্চ। ভেঁপুর শব্দে নয়ন হঠাৎ চমকে উঠল। পন্টুনটা বার দুই ঢেউয়ের তালে কাঁপল। তারপর পন্টুন ছেড়ে দিলো লঞ্চের মাথা। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগল। পন্টুনের বাঁ

পাশে ল্যাম্পপোস্টটার নিচে চোখ পড়তেই নয়ন রীতিমতো একটা ধাক্কা মতো খেলো। ল্যাম্পপোস্টের নিচে পারুল দাঁড়িয়ে আছে। সে সরাসরি তাকিয়ে আছে নয়নের দিকে। নয়ন প্রচণ্ড অবাক হয়েছে পারুলকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে।

লঞ্চ দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার আগ অবধি পারুল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটার জন্য অদ্ভুত একটা মায়া হতে লাগল নয়নের। কিন্তু নয়নের ধারণা সেই মায়া স্পর্শ করার ক্ষমতা পারুলের নেই।

পারুল বাড়ি ফিরল পরদিন। তারপর থেকে সে বড্ড চুপচাপ, একা। কারো সাথে কথা বলে না। ঠিকমতো খায় না। বিষয়টা যে আব্দুল ফকিরের চোখে ধরা পড়েনি, তা না। কিন্তু আজকাল তার ব্যস্ততা বেড়েছে। বাড়িতেও সারাদিন নানান ধরনের লোকজনের আনাগোনা। তাদের কাউকে কাউকে পারুল চেনে, কাউকে কাউকে একদমই চেনে না। অবশ্য এসব নিয়ে সে মাথাও ঘামায় না। পুরোটা সময় সে ডুবে আছে তার ভাবনার জগতে। চিরটাকালই সে প্রবল অস্থিরতায় ভোগা এক মানুষ। ভেবে-চিন্তে কখনোই কিছু সে করেনি। যখন যা ইচ্ছে তাইই করেছে। কিন্তু এই প্রথম যেন সব কিছু নিয়েই সে নতুন করে ভাবছে। না চাইলেও ভাবছে। ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে ভাবনাগুলো যে শুধু ভাবনায়ই সীমাবদ্ধ থাকছে, তাও না। সে আজকাল নানান যুক্তি খুঁজছে। সম্ভাবনা খুঁজছে। সেইসকল যুক্তি, সম্ভাবনাগুলোতেও সে স্থির হতে পারছে না। একটার পরপরই অন্য একটা যুক্তি, অন্য একটা সম্ভাবনা এসে আগের সবগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছে। আর এ সকলই নয়নকে ঘিরে। বিষয়টা তার নিজের কাছেই খানিকটা অদ্ভুত লাগছে। সেই এক মুহূর্তের দেখা, তারপর থেকেই কী এক অস্থিরতা সে টের পাচ্ছিল তার বুকের ভেতর।

রায়গঞ্জ থেকে লতা এলো তার দিন চারেক বাদে। সে এসেই সন্ধ্যাবেলা পারুলের সাথে দেখা করতে এলো। পারুল বসেছিল পুকুরঘাটে। লতাকে দেখে পারুল কোনো উচ্ছ্বাস দেখাল না। মৃদু হাসল কেবল। পারুলের প্রতিক্রিয়ায় খানিক অবাক হলেও কিছু বলল না লতা। সে পারুলের পাশে গিয়ে বসল। পারুল চুপ করে তাকিয়ে আছে পুকুরের জলে। সেখানে কতগুলো শুকনো পাতা নৌকার মতো ভেসে যাচ্ছে ধীরে। সেই ভেসে যাওয়া পাতায় কী এমন দেখছে পারুল!

লতা পারুলের পিঠে আলতো ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কীরে, কী হয়েছে তোর?'

পারুল জবাব দিলো না। সে যেমন তাকিয়ে ছিল তেমন তাকিয়েই বসে রইল। লতা বলল, 'এখনও মন খারাপ?'

পারুল এবারও জবাব দিলো না। লতা বলল, 'এমন মন খারাপ করে থেকে কি হবে? চল কিছু একটা করি। তুই না বলছিলি শুদ্ধ করে কথা বলে শিখবি? চল, আমিই তোরে শেখাই?'

পারুল ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। তার চোখে মুখে স্পষ্ট আগ্রহ। কিন্তু তার সেই আগ্রহী মুখ দেখেও লতা থমকে গেল। পারুলের গাল ভেজা। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রুর দাগ নেমে গেছে গাল বেয়ে। সে হঠাৎ দু'হাতে পারুলকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোরে আমি দুনিয়ার সব কিছু আইনা দিব পারুল। তাও আমার জন্য একটু এমনে কইরা কান। প্লিজ।'

বলেই সে পারুলের মাথাটা বুকে চেপে ধরল। পারুল হঠাৎ কেঁদে উঠল। লতা পারুলকে শক্ত করে বুকের সাথে জাপটে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'অনেক কষ্ট হইতেছে?'

পারুল জবাব দিলো না। লতা পারুলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'তোর কেন কষ্ট হয়, আমারে বল তো? সে কি তোরে কিছু বলছে?'

পারুল এবারও জবাব দিলো না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকল। লতাও আর কিছু জিজ্ঞেস করল না পারুলকে। কাঁদুক, কাঁদলে বুকটা হালকা হবে। কষ্টগুলো কান্নার সাথে সাথে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু খানিকবাদেই পারুল উঠে বসল। সে ওড়নায় মুখ মুছল। তারপর লতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, প্রথম প্রথম তোরও কি এমন লাগত?'

লতা বলল, 'কেমন?'

পারুল বলল, 'এই যে বুকের মইধ্যে কেমন খাঁ খাঁ করে। সব সময় মনে হয় বুকটা খালি খালি। গলার গোড়ায় কেমন জানি একটা ব্যথা। কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় না। ঘুমাইতে ইচ্ছা করে না।'

লতা হাসল। বলল, 'হ। লাগছেই তো।'

পারুল বলল, 'আচ্ছা, সে কি টের পাইতেছে যে তার জইন্য আমার এমন লাগতেছে?'

লতা বলল, 'কত পোলা যে তোর জইন্য তোর বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া কানছে। একটু কথা বলতে চাইছে। এক পলক দেইখাই চইলা যাইতে চাইছে। কেন চাইছে জানস? তোর এখন তার জন্য যেমন লাগতেছে, তাদেরও তোর জন্য এমনই লাগত। তুই কি তখন টের পাইতি?'

পারুল মাথা নাড়ল। লতা বলল, 'এইটাই দুনিয়া'।

পারুল আবার চুপ করে রইল। লতাও। সময় চলে যাচ্ছে নিঃশব্দে। পারুল হঠাৎ মাথা তুলে তাকাল, তারপর বলল, 'তার কিচ্ছু মনে হয় না? আমার যে হয়, সেইটাও সে বোঝে না?'

লতা বলল, 'সেইদিন তো দুইজনরেই একসাথে দেখলাম। কিছু তো মনে হইল না।'

পারুল বলল, 'সে যে আমার মাথায় হাত রাখল। সেইটা কি এমনে এমনেই রাখছে?'

লতা হঠাৎ ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল, 'না, এমনে এমনে মনে হয় নাই। দেইখা স্পেশাল কিছুই মনে হইছে।'

পারুলের শূন্য বুকটা যেন আবার ঝলমল করে উঠল। সে লতার শরীরের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো খানিকটা। তারপর উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'বল না, কী এসপেশাল মনে হইছে। বল না?'

লতা হঠাৎ হা হা হা করে হেসে উঠল। পারুল অবাক চোখে লতার দিকে তাকাল। লতা দু'হাতে নিজের মুখ চেপে হাসি বন্ধ করতে করতে বলল, 'মনে হইছে সে তার আপন ছোট বইনের মাথায় হাত বুলাইয়া দোয়া কইরা দিতেছে। বড় ভাই যেমনে ছোট বইনেরে মাথায় হাত দিয়া দোয়া কইরা দেয়, তেমন। হা হা হা।'

লতা হাসছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে তার হাসি থামাতে পারছে না। পারুল চট করে উঠে পড়ল। তারপর গমগম করে হেঁটে চলে গেল ভেতর বাড়ির দিকে। তার পিছু পিছু ডাকতে ডাকতে ছুটল লতাও। কিন্তু পারুল আর ফিরেও তাকাল না।

সে দ্রুতগতিতে হেঁটে ঢুকে গেল ঘরে। তাবারন অসুস্থ বলে তখনও ঘরে আলো দেয়া হয়নি। পারুল আলো জ্বেলে তাবারনের ঘরের দিকে গেল, তাকে সন্ধ্যার ঔষুধ দিতে হবে। দরজার কাছে হারিকেনের এক চিলতে আলো পড়তেই পারুলের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ভয়ের শিতল স্রোত নেমে গেল। তাবারনের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নুরুন্নাহার। নুরুন্নাহারের হাতে বিশাল আকারের একখানা রাম দা। দরজার বাইরের চৌকাঠের ওপরের অংশে শেকল টেনে আংটা দিয়ে বন্ধ করে রেখে গিয়েছিল পারুল। নুরুন্নাহার সেই শেকল খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু অন্ধকার আর উচ্চতার কারণে সে শেকলটা খুলতে পারছে না। পারুল চিৎকার করে ডাকল, 'মা!'

নুরুন্নাহার খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পারুলের দিকে ফিরলেন। তারপর বললেন, 'সেই তহন থেইকা শিকলখান খোলনের চেষ্টা করতেছি। পারতেছি না। শিকলখান একটু খুইলা দে তো মা।'

পারুল বলল, 'শিকল খুইলা তুমি কী করবা?'

নুরুন্নাহার পারুলের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসলেন। তারপর বললেন, 'তাবারনের দুই ঠ্যাংয়ের দুই রানের মাঝখানে এই দাও দিয়া ফারবো। ফইরস্যাবে যেন আর ওইখানে যাইতে না পারে।'

www.boighar.com

পারুল চিৎকার করে বলল, 'মা। দাও ফেলাও। এখুনি দাও ফেলাও।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'না, ফেলব না। তাবারনের ঠ্যাং ফারবো। তারপর তার বড় বড় ওলানগুলান কাটব। ফইরসাবের মজা শ্যাষ করব।'

পারুল বলল, 'এক্ষুণি ফালাও মা। ফালাইয়া ঘরে যাও। তোমার ঘরের দুয়ার খুলছে কেডা?'

নুরুন্নাহারের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা গেল না। তিনি স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বললেন, 'রতনের ধারে পানি চাইছিলাম। সে পানি দিতে গেছিল। ওই ফাঁকে তারে ভিতরে আটকাই থুইয়া বাইর হইয়া আইছি।'

পারুল আবারো বলল, 'দাওখান ফেলাও মা। দাওখান ফালাইয়া চুপচাপ তোমার ঘরে যাও।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'তোর শরম করে না? তোর বাপ এইরকম একখান কুজাত। তোর শরম করে না? তোর মায়রে পাগল বানাইছে কেডা, তুই জানস না? আগে এই মাগিরে শ্যাষ করব। তারপর দেখব ফইরসাবের কেমন লাগে। তুই চাস না?'

পারুল বলল, 'দাওখান ফেলাও মা। এক্ষণ ফালাও।'

নুরুন্নাহার হঠাৎ হি হি হি করে বিকট শব্দে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'তুই কেডা? তোরে তো আমি চিনি না। তোর কথা আমি শুনব কেন? আয়, তুই ধারে আয়। তোরেও একখান কোপ দেই। তুইও দেহি ফইর সাবের পক্ষে কথা কস! ফইর সাবের লগের সকল মানুষ আমার শত্রু। তুইও। আয়, ধারে আয় ছেমড়ি। ধারে আয়।'

লতা এসে দাঁড়িয়েছে পারুলের পিছনে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতভম্ব! পারুল কঠিন গলায় বলল, 'দাওখান দেও বলতেছি মা। এক্ষণ দেও। না হইলে কিন্তু...'

নুরুন্নাহার হঠাৎ ভয়ানক গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। সেই চিৎকারে গা হিম হয়ে এলো লতা আর পারুলের। কোনো মানুষের গলা থেকে এমন বীভৎস, এমন লোমহর্ষক চিৎকার বের হতে পারে তা অবিশ্বাস্য। সেই বিকট চিৎকারের ভেতর থেকেই নুরুন্নাহার বললেন, 'ফেলব না দাও। ফেলব না। দেহি তুই কী করস? আইজ আমি কাজ শ্যাষ না কইরা যাব না।'

নুরুন্নাহারের এই রূপ দেখে লতা ভয় পেয়ে গেছে। ভয় পেয়ে গেছে পারুলও। নুরুন্নাহারের এখন যে অবস্থা, তা দেখে মনে হচ্ছে না তিনি পারুল, লতা বা তাবারন কাউকে আলাদা করতে পারবেন। যে কাউকে আঘাত করতে পারেন তিনি। হারিকেনের আবছা আলোয় বিশাল দা হাতে সংহার মূর্তি ধারণ করেছেন নুরুন্নাহার। তিনি আবারো চিৎকার করলেন। তারপর চিৎকার করেই বললেন, 'দরজাখান খুইলা দে। এক্ষণ খুইলা দে।'

বলার সাথে সাথেই তিনি হাতের দা'খানা দিয়ে সজোরে কোপ বসালেন দরজার গায়ে। চৌকাঠসহ পুরো ঘরই সেই আঘাতে কেঁপে উঠল। নুরুন্নাহার টান দিয়ে দা'খানা দরজার কাঠ থেকে ছাড়ালেন। পারুল এবার ঠান্ডা স্থির গলায় বলল, 'মা, এইবার শেষবার বলতেছি, দাওখান ফালাও। ফালাইয়া চুপচাপ তোমার ঘরে যাও। শেষবার বলতেছি।'

নুরুন্নাহার সশব্দে দ্বিতীয় কোপখানা বসালেন দরজার গায়ে। তারপর ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন পারুলের দিকে। বললেন, 'না ফালাইলে কী করবি তুই? কি করবি?'

পারুল হঠাৎ তার হাতের হারিকেনখানা কাত করল। তারপর হারিকেনে কেরোসিন ভরবার ছিদ্রের ছোট ঢাকনা খুলে গলগল করে কেরোসিন ঢালতে লাগল তার গায়ে। নুরুন্নাহার হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। তিনি খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। পারুলের জামার সামনের দিকটা কেরোসিনে ভিজে জবজবে হয়ে আছে। সে ঠান্ডা চোখে নুরুন্নাহারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি এক্ষণ দাওখান ফালাইয়া তোমার ঘরে না যাও, তাইলে এক্ষণ আমি আমার গায়ে আগুন দিব। তোমার সামনে পুইড়া মরব।'

লতা রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক নিয়ে পারুলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে না তার সামনে এ কী ঘটছে! খানিক বাদে কী ঘটবে, তার কিছুই বুঝতে পারছে না সে। নুরুন্নাহার হঠাৎ দরজার সামনে মাটিতে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লেন। কিন্তু দা'খানা হাত থেকে এখনো ছাড়েনি সে। কিন্তু মাটিতে বসে তার ভাঁজ করা হাঁটুর উপর মাথা রেখে হঠাৎ উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন নুরুন্নাহার।

সে রাতে পারুল সারারাত বসে রইল মায়ের ঘরের দরজার সামনে। আব্দুল ফকিরও রাতে বাড়ি ফিরলেন না। ঘরের ভেতরে নুরুন্নাহার একটানা কেঁদে চললেন সারারাত। সেই কান্না শুনতে শুনতে পারুলের হঠাৎ মনে হলো, একটা মানুষ তার চোখের ভেতর কত জল জমা করে রাখতে পারে? কত জল? কত অশ্রু ঝড়ালে পরে তার কান্না শেষ হয়? চোখ হয়ে যেতে পারে অশ্রুবিহীন? পারুল এইসব প্রশ্নের উত্তর পেল না। তবে তার কেন যেন মনে হতে লাগল, শেষ কিছুদিনে সে আর সেই আগের পারুল নেই। হুট করেই হয়ে অচেনা অন্য এক পারুল হয়ে উঠেছে সে। এই পারুলকে সে নিজেই চেনে না। আচ্ছা অন্য কেউ কি চেনে?

পারুলের আচমকা মনে হলো, কে চিনবে তাকে? এই জগতে অমন গভীর করে চেনার মতো কেউ যে নেই তার! কেউ না।

www.boighar.com

মন খারাপ হলে কী করা যায়? হেমার ধারণা মন খারাপ হলে আকাশ দেখা যায়। বাবা-মার বিষয়টা নিয়ে সে আর মন খারাপ করে থাকতে চাচ্ছে না। চারপাশে এত এত সমস্যা যে কোনটা রেখে কোনটাকে সে সামলাবে! তবে মার সাথে কথা বলার একটা উপায় সে খুঁজছে এবং তার ধারণা সেই উপায়টা সে পেয়েও যাবে। সেদিন বাবার কথা শুনে বাবার জন্য স্পষ্টতই তার খারাপ লেগেছে। কিন্তু মা'র কাছেও সে কথাগুলো শুনতে চায়। আর হেমার কাছে এটিও স্পষ্ট যে হঠাৎ করে নিতে যাওয়া বাবার এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পেছনে অন্য কোনো একটা কারণও নিশ্চয়ই রয়েছে। এই দীর্ঘজীবন তিনি অমন সব ভয়াবহ সমস্যা নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলেও এই প্রায় শেষ বয়সে এসে হঠাৎ-ই এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে কারণ কী? হেমার ধারণা, এই সিদ্ধান্তের পেছনে অন্য কোনো অনুঘটক না থেকেই পারে না। সেই ব্যাপারটা জানাটাও জরুরি। কিন্তু হেমার কেন যেন ইচ্ছে করছে না। একদম ইচ্ছে করছে না। বাবার কি অন্য কোনো সম্পর্ক হয়েছে? তার জীবনে কি অন্য কেউ এসেছে? আজকাল এমন অহরহ হচ্ছে। হেমা দেখেছেও। তার খুব কাছের এক বান্ধবীর বাবার গোপন বিয়ের খবর জানাজানি হয়েছে প্রায় ছ'বছর পর। তার সেই গোপন স্ত্রীটিও বয়সে তরুণী। এমন আরো কত ঘটনা যে হেমা দেখেছে, শুনেছে! তখন বিষয়গুলো স্বাভাবিক মনে হলেও নিজের বাবার ক্ষেত্রে বিষয়টি সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না।

হেমা এ ক'দিন অনেক ভেবেছে। ভেবে একটা কথা খুব স্পষ্ট করেই তার মনে হয়েছে, সেটি হলো বাবা-বা মা তার সন্তানদের কাছে কেবল বাবা-মা হয়েই থাকেন। তারা যে আলাদা করে একজন নারী বা পুরুষও, সেটি তাদের সন্তানরা কখনোই ভাবতে চায় না। এইজন্যই অন্যের বাবা-মায়ের ডিভোর্স, আবার বিয়ে, পরকীয়া প্রেম, অস্বাভাবিক বা অনুনোমোদিত কোনো শারীরিক সম্পর্কের ঘটনা শুনেও সেটিকে তারা যত সহজে নিতে পারে, নিজের বাবা-মায়ের ক্ষেত্রে তা তারা মোটেও নিতে পারে না।

এমন নানা ভাবনা হেমার মাথায় ক'দিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে এও মনে হচ্ছে যে, সে কি অবচেতনভাবেই নিজেকে যে-কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি করার জন্যই এসব ভেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইছে? কিন্তু আজ সারাটা দিনই তার মন ভার হয়ে আছে। কিছুতেই মন ভালো করতে পারছে না সে। এমন কিছু একটা করতে ইচ্ছা হচ্ছে তার, যার কোনো অর্থ নেই, কোনো যৌক্তিক কারণ নেই, কিন্তু সেই কাজটা তাকে তার আর সকল ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

কিন্তু কী করবে সে! হেমা জানে না। তবে এই মুহূর্তে তার খুব আকাশ দেখতে ইচ্ছে করছে। সমস্যা হচ্ছে এখন গভীর রাত। তার ওপর আকাশ জুড়ে মেঘ। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। সুতরাং এই সময় আকাশে দেখার কিছু নেই। এই আকাশজোড়া মেঘ অবশ্য সেই বিকেল থেকেই। সাথে প্রচণ্ড গরম। কিন্তু বৃষ্টি নামছে না। মাঝে-মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হেমা মন খারাপ ভাব নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিছানায় বসে রইল। মন ভালো হবার মতো নানান কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু সব ভাবনাই কেমন এলোমেলো হয়ে আছে! কোনোকিছুই কাজে লাগছে না।

দিন কুড়ি আগে তার বাবা বাসা ছেড়ে গেছেন। তারপর আর ফেরেননি। তার ফোনও বন্ধ। কোথায় আছেন, সে বিষয়েও কোনো খোঁজ নেই। মার সাথে এর মধ্যে বারদুয়েক কথা বলার চেষ্টা করেছিল হেমা। কিন্তু লাভ হয়নি। রেণু তাতে খুব একটা সাড়া দেননি। হেমার আজকাল হঠাৎ হঠাৎ পৃথিবীটা খুব অর্থহীন লাগে। এই যে এত এত কাজ, প্রতিযোগিতা, সম্পর্ক, মায়া– এ সকলই কি শেষ অবধি অর্থহীন নয়? অথচ এই প্রতিটি জিনিসের জন্য কত কত নির্ঘুম রাত, কত কত কান্না, জিঘাংসা! অথচ দিন শেষে সকল কিছুর ফলাফলই স্রেফ শূন্য।

www.boighar.com

শেষ রাতের দিকে হঠাৎ ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেল। প্রচণ্ড গরমে দরদর করে ঘামছিল হেমা। সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বারান্দার বাইরে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ডালপালা ছড়ানো বিশাল এক সজনে গাছ। ঢাকার মতো বৃক্ষহীন শহরে এতবড় সজনে গাছ বিরল। দোতলার বারান্দা অবধি উঠে গিয়ে সবুজ পাতাভর্তি ডালপালা মেলে দিয়েছে গাছটা। হঠাৎ তাকালে চোখে পড়ে কেবল সবুজ আর সবুজ। কিন্তু সেই সবুজ এই অন্ধকারে সামন্যিতমও স্বস্তি দিতে পারল না হেমাকে। গাছের পাতা নড়ছে না। সামান্য হাওয়াও নেই কোথাও। সবকিছু স্থির, স্তব্ধ। হেমা সেই স্থির, স্তব্ধ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল। সে ঘুমাতে গেল শেষ রাতে। ঘুমের ভেতর এলোমেলো নানান স্বপ্ন দেখল। ঘুম ভাঙল ভোরে। অর্ধেকটা চোখ মেলে তাকিয়েই তার মন ভালো হয়ে গেল। রাতে বারান্দার দরজা, জানালা লাগতে ভুলে গিয়েছিল সে। চোখ

মেলতেই সেই বারান্দার দরজা, জানালা গলে দৃষ্টি চলে গেল সজনে গাছের ডালে। সেখানে তুমুল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি সবুজ পাতাগুলোকে আরো সবুজ করে একটানা ঝরে যাচ্ছে।

হেমার বৃষ্টি পছন্দ। তবে মৃদু ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি নয়। আবার খানিক থেমে থেমে ঝরা বৃষ্টিও নয়। তার পছন্দ জগৎ সংসার অন্ধকার করে দিয়ে নামা বিরামহীন তুমুল বর্ষণ। সেই বর্ষণে রাস্তাঘাট শূন্য হয়ে যাবে। লোকজন ঘর থেকে বের হবে না। অফিস-আদালত হবে না। স্কুল-কলেজ খুলবে না। রাস্তায় হাঁটু জল জমে যাবে। সেই জলের ভেতর খইয়ের মতো ফুটতে থাকবে বড় বড় অজস্র বৃষ্টির ফোঁটা। জানালার বাইরে তাকালে মনে হবে আজ বৃষ্টির দিন। কেবলই বৃষ্টির দিন। এই বৃষ্টির দিনে কেবল বৃষ্টির অবিরাম ঝরে যাওয়া ছাড়া আর কারোই কিছু করার থাকবে না। সবাই ঘরের ভেতর বসে বৃষ্টি দেখবে। কেউ কেউ চাইলে ঘর থেকে বেরও হতে পারবে। তবে তা কেবলই বৃষ্টিতে ভেজার জন্য, অন্য কোনো কাজে নয়।

হেমা অনেকক্ষণ আধখোলা চোখে তাকিয়ে রইল। তার হঠাৎ মনে হলো, আজ সেই বৃষ্টির দিন। সেই বিশেষ বৃষ্টির দিন! সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল। তারপর দৌড়ে চলে গেল বারান্দায়। বারান্দার মেঝেয় পানি জমে আছে। সে খুব আলতো করে, সন্তর্পণে মেঝেতে জমে থাকা পানিতে তার আঙুলের ডগা ছোঁয়াল। গা শিরশরে ঠান্ডা অনুভূতি! সে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল। বৃষ্টির ঝাপটায় সে ভিজে যাচ্ছে। শীত শীত লাগছে। কিন্তু সে নড়ল না। চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েই রইল। তার যে কী ভালো লাগছে! তার মনে হচ্ছে, ইশ্, একজোড়া পাখা যদি তার থাকত! তাহলে এখন সে পাখির মতো ডানা মেলে এই বৃষ্টির ভেতর উড়ে যেতে পারত। সে উড়ে উড়ে চলে যেতে পারত কোনো নদীর কাছে, খোলা মাঠের কাছে, উঁচু নিঃসঙ্গ পাহাড়ের কাছে, কোনো এক গাঁয়ের শান্ত পুকুর কিংবা ধান ক্ষেতের ভেতর ঝাঁক বেঁধে হেঁটে চলা হাঁসেদের কাছে। সে উড়ে উড়ে এই অদ্ভুত সব বৃষ্টি দেখত। সব রকমের বৃষ্টি। হেমা হঠাৎ আবিষ্কার করল, সে যা যা ভাবছে, ঠিক তাই তাই যেন সে তার বন্ধ চোখের ভেতর সিনেমার দৃশ্যের মতো একের পর এক ভেসে আসছে। সত্যি সত্যি যেন তার দু'খানা পাখনা হয়েছে। সে সেই পাখনা হাওয়ায় ভাসিয়ে ভিজে ভিজে উড়ে যাচ্ছে প্রবল বর্ষণে।

ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হলো কোথাও। হেমা আচমকা চোখ মেলে তাকাল। বারান্দার ঠিক নিচেই সরু রাস্তা। রাস্তার মাঝখানে রাহাত দাঁড়িয়ে আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে রাহাত যে একা একা দাঁড়িয়ে আছে তা না। তার সাথে দাঁড়িয়ে আছে একখানা তিন চাকার ভ্যানগাড়িও। তবে ভ্যানগাড়িতে কোনো চালক নেই। সম্ভবত চালক রাহাত নিজে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ভ্যানগাড়ি ভর্তি কদম

ফুল। রাহাত সেই কদম ফুলের মাঝখানে বসে তাকিয়ে আছে হেমার দিকে। তার চোখে কালো সানগ্লাস। এই বৃষ্টির মধ্যে সে কালো সানগ্লাস পরে আছে কেন কে জানে! এই ছেলের কাণ্ডকারখানা বোঝা ভারি মুশকিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ঘোর লাগা বৃষ্টিতে রাস্তার মাঝখানে ভ্যানভর্তি কদমফুলের মাঝখানে সানগ্লাস পরা রাহাতকে বসে থাকতে দেখে হেমার কেমন মন খারাপ হয়ে গেল। অবশ্য মন খারাপ ব্যাপারটাকে সে পাত্তা দিলো না। সে জানে, নয়ন কখনোই তার জন্য এমন কিছু করবে না। রাহাতকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে তার ভাবনায় মুহূর্তের জন্য নয়ন চলে এসেছিল। সে বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আমার কাছে ক্যামেরা নেই। ক্যামেরা থাকলে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সেরা ছবিটা তোলা হয়ে যেত।'

রাহাত হাসলো কিনা বোঝা গেল না। তবে সেও চিৎকার করে বলল, 'হতো না। কম্পোজিশনে সামান্য গোলমাল হতো। এই দৃশ্যের সাথে কালো সানগ্লাস পরা কারো ক্যাবলাকান্ত চেহারা যায় না।'

হেমা বলল, 'তুই কি এই সব কদম ফুল নিয়ে এখন বাসায় উঠবি?'

রাহাত বলল, 'না'।

হেমা বলল, 'তাহলে?'

রাহাত বলল, 'তুই নেমে আসবি। তোকে কদমফুলের মাঝখানে বসিয়ে আমি ভ্যান চালিয়ে ঢাকা ঘুরব।'

সিদ্ধান্ত নিতে হেমার মুহূর্তকালও লাগল না।

সে বাসা থেকে বেরুল তার ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায়। তার মাথার মধ্যে কোনো একটা গান গুনগুন করছে। কিন্তু গানটা সে ঠিক ঠিক ধরতে পারছে না। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। একই তীব্রতায় অঝর বর্ষণ চলছে। রাস্তায় পানি জমে গেছে হাঁটু অবধি। তবে স্বস্তির কথা লোকজন একদম নেই। আজ শুক্রবার। এমনিতেই ছুটির দিন। তার ওপর এমন বর্ষণ। অতি প্রয়োজন না থাকলে কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। হেমা বসে আছে ভ্যানের মাঝখানে। তার চারপাশে অসংখ্য কদম ফুল। ভ্যান চালাচ্ছে রাহাত। হেমা বলল, 'তুই সানগ্লাস পরে আছিস কেন?'

রাহাত বলল, 'বৃষ্টির যা ছাট। কতক্ষণ তোর বারান্দার দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে পারতাম? তুই যে এত তাড়াতাড়ি বের হবি, তা তো ভাবিনি।'

হেমা বলল, 'বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে তোকে কে বলল, তুই ফোন দিলেই পারতি।'

রাহাত বলল, 'তোর ফোন অফ'।

হেমার হঠাৎ মনে হলো সে দীর্ঘ সময় ফোন দেখেনি। ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না বলে ফোনে চার্জও দেয়া হয়নি। সম্ভবত এই কারণেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'কিন্তু এই পাগলামি মাথায় উঠল কখন?'

www.boighar.com

রাহাত বলল, 'যখন বৃষ্টি শুরু হলো। ভোর রাতের দিকে। বোঝাই যাচ্ছিল এ সহজে থামার বৃষ্টি না।'

হেমা বলল, 'এত কদম ফুল তুই কই পেলি?'

রাহাত হাসল। জবাব দিলো না। হেমাও আর কথা বলল না। কখনো কখনো চুপ থাকা দরকার। রাহাতের এই পাগলামি নতুন না। সে হেমার ক্লাসমেট। নয়ন আর হেমার ঘটনাও সে জানে। কিন্তু তারপরও হেমার জন্য তার এমন অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ড নিত্য দিনকার ঘটনা। কেউ কিছু বললে সে উদাস গলায় জবাব দেয়, 'ভালোবাসতে ভালো লাগে বলেই মানুষ ভালোবাসে। আমিও ভালো লাগে বলেই ভালোবাসি। কই, ভালোবাসা পাই না বলে তো খারাপ লাগে না! একটা শূন্যতাবোধ হয়। তবে জীবনে এই শূন্যতাবোধটার দরকার আছে।'

রাহাত জানে, হেমার প্রতি তার এই শর্তহীন সমর্পণ নিয়ে প্রকাশ্যে কিংবা আড়ালে মানুষ নানান কথা বলে। হাসাহাসি করে। কিন্তু এসব নিয়ে সে মোটেও চিন্তিত নয়। চিন্তিত না হেমাও। হেমার কাছে বিষয়টা অবশ্য অন্যরকম। রাহাতকে তার আজকাল আর আলাদা করে কেউ মনে হয় না। তাকে কেমন যেন বাসার সামনের চেনা সজনে গাছটার মতো মনে হয়। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত সে যেন অমন দাঁড়িয়েই থাকবে। কোথাও যাবে না। কিন্তু তাকে নিয়ে আলাদা করে ভাবার কিছু নেই। রাহাতও তার কাছে তেমন। রাহাতের এই অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডে যে হেমা খুব একটা মুগ্ধ হয় তাও না। মাঝে-মধ্যে বিরক্তও হয়। তবে সে সেটাও প্রকাশ করে না।

রাহাত অনেকক্ষণ বাদে বলল, 'আমরা এখন কোথায় যাব?'

হেমা হঠাৎ বলল, 'ক্রিসেন্ট লেকের ধারে চল। ওখানে খানিক বসি।'

রাহাত বলল, 'নয়ন ভাই এখনো আসেনি।'

হেমা বলল, 'না'।

রাহাত হাসল। বলল, 'গ্রামে গিয়ে বিয়ে-টিয়ে করে ফেলেছেন নাকি?'

হেমা বলল, 'দাওয়াত তো পাইনি।'

রাহাত বলল, 'কীভাবে পাবি? ওখান থেকে পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা তো নেই।'

হেমা বলল, 'টেলিপ্যাথি বলে একটা ব্যাপার আছে না? বিয়ে-টিয়ে করলে ঠিকঠাক দাওয়াত পেয়ে যাব।'

রাহাত বলল, 'বাহ! তারপর?'

হেমা বলল, 'একখানা নীল শাড়ি পরে তোকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে খেয়ে আসব।'

রাহাত বলল, 'কষ্ট হবে না?'

হেমা বলল, 'হবে তো। বোরহানিতে ঝাল কম হলে কষ্ট হবে। রোস্টটাতে মিষ্টি বেশি হলে কষ্ট হবে। ওর হবু বউটা আমার চেয়ে বেশি সুন্দরী হলে কষ্ট হবে।'

রাহাত হা হা করে হাসল। তারপর বলল, 'মেয়েরা সব সময় তার চেয়ে একটু সুন্দরী অন্য কোনো মেয়ে দেখলেই এমন জেলাস হয় কেন বল তো?'

হেমা বলল, 'ছেলেরা হয় না?'

রাহাত বলল, 'না'।

হেমা বলল, 'কে বলল তোকে?'

রাহাত বলল, 'বলতে হবে কেন? তোর সামনে তো একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ বসে আছে।'

হেমা বলল, 'তুই? তুই আবার জেলাস হবি কেন?'

রাহাত বলল, 'এই যে নয়ন ভাই দেখতে এত সুন্দর। তারপর এই যে এত কিছু করেও তোর একটু কনসান্ট্রেশন আজও পেলাম না। আর কিছু না করেই সে পুরোপুরি তোকে পেয়ে গেল।'

হেমা হঠাৎ চোখ টিপে খানিক দুষ্টুমিমাখা গলায় বলল, 'কনসান্ট্রেশন না দিলে এই তুমুল বৃষ্টিতে এমন এক কথায় তোর জন্য ঘর ছাড়লাম?'

রাহাত হাসল। বলল, 'ছেড়েছিস বলছিস?'

হেমা বলল, 'এত সন্দেহ থাকলে কি ভালোবাসা যায়রে পাগল? ভালোবাসতে হলে সবার আগে খুনি হতে হয়। সন্দেহ খুনি। নির্দয়ভাবে সন্দেহ খুন করে ফেলতে হয়। সন্দেহদের খুন না করলে ভালোবাসা যায় না রে।'

রাহাত বলল, 'আর কী কী করলে ভালোবাসা যায় না?'

হেমা বলল, 'কষ্ট না হলে'।

রাহাত বলল, 'কষ্ট কেন হয়?'

হেমা বলল, 'স্পর্শ করতে না জানলে।'

রাহাত হঠাৎ হাত বাড়িয়ে হেমার হাত স্পর্শ করে বলল, 'এই যে স্পর্শ করলাম। ভালোবাসা হয়ে গেল?'

হেমা হাসল, 'ভালোবাসার স্পর্শ যদি এতই সহজ হতো। তাহলে ভালোবাসার জন্য মানুষ এমন ব্যাকুল হতো না।'

রাহাত বলল, 'তাহলে সেই স্পর্শটা কেমন, আমায় একটু শেখা, দেখি, যদি তোকে ছোঁয়া যায়।'

হেমা আবারো হাসল। বলল, 'এই ছোঁয়ার কোনো সূত্র নেই যে! এই ছোঁয়াটা অদ্ভুত! ধর কেউ একজন দিনরাত তোকে পাগলের মতো ভালোবাসছে। তোর ভালো লাগে এমন সবকিছু করছে। উন্মুখ হয়ে থাকছে তোকে একটু খুশি করবার জন্য। তোর ভালোলাগা, মন্দলাগা সকল কিছু জেনে

www.boighar.com

নিয়ে সে সেইসব কিছুই করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেখবি কী, সেসব কিছুর কোনোটাই তোকে স্পর্শ করছে না। অথচ কেউ একজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডান হাতে নাক পরিষ্কার করে প্যান্টে মুছছে, আঙুলে কান খুচছে। ওই দৃশ্য দেখেও তোর হঠাৎ মনে হতে পারে, আহা, কী সুন্দর করেই না নাক ঝাড়ল, কান খুঁচলো মানুষটা! আহাহা। বুকের ভেতর কেমন একটা ভালোলাগার হাহাকার বয়ে যাবে। সেই হাহাকারভর্তি স্পর্শ। এর কী কোনো সূত্র হয় বল?'

রাহাত হেমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে তার কালো চশমা খুলে ফেলেছে। হঠাৎ করেই মেঘ ডাকছে খুব। মাঝে-মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হেমা আচমকা বলল, 'কী? অমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছিস কেন? নাকি এখনই বলবি, তুই এত সুন্দর করে কথা বলিস কী করে, বলতো হেমা! এইটাই হলো সেই সূত্ররে গাধা। বুঝেছিস? অথচ বোটানির মেয়েটা, কী যেন নাম? শিউলী না? সে যে রাত-দিন তোর পিছে ঘোরে। কী সুন্দর করে প্রোগ্রামগুলোতে কবিতা আবৃত্তি করে, গান গায়, সেগুলোকেও তোর অখাদ্য মনে হয়। তার কিছুই তাকে একটুও স্পর্শ করে না। আর আমি ডান হাতে নাক ঝাড়লেও তোর ভালো লাগে, তাই না? এই হলো সেই সূত্র বুঝলি?'

রাহাত হা হা হা করে হাসল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোর কী হয়েছে বলতো?'

হেমা বলল, 'কী হবে আবার?'

রাহাত বলল, 'কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। ইউ আর নট নরমাল।'

হেমা বলল, 'মেয়েদের মন বোঝার চেষ্টা করে লাভ নেই হে বৎস। স্বয়ং ঈশ্বরও নাকি বুঝতে পারেননি।'

রাহাত বলল, 'নয়ন ভাই কি বুঝেছেন?'

হেমা বলল, 'নাহ্। এই চেষ্টাটা সে কখনো করেইনি। বরং আমিই তাকে বোঝার চেষ্টা করেছি।'

রাহাত বলল, 'পেরেছিস?'

হেমা বলল, 'কখনো কখনো মনে হতো পেরেছি। তারপর আবার মনে হতো একদম না। তবে শেষ কিছুদিন পুরোপুরিই অচেনা।'

রাহাত বলল, 'এইজন্যই বলেছি, দ্যাখ, অন্য কারো প্রেমে পড়েছেন কিনা?'

হেমা বলল, 'আমার ঘর ভাঙতে চাইছিস?'

রাহাত বলল, 'নাহ্। সামান্য ফাটল ধরলেও সেটি জুড়ে দিতে চাইছি।'

হেমা বলল, 'কী করে?'

রাহাত বলল, 'চল। নয়ন ভাইকে গিয়ে নিয়ে আসি। গ্রামের নামটা যেন কী বললি? আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হবো। তিনি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখবেন তার মাথার কাছে তুই দাঁড়িয়ে আছিস।'

হেমা খুব চেষ্টা করছিল আজ আর সে মন খারাপ করবে না। কিন্তু এই প্রথম সে তার চেষ্টাটা রাখতে পারল না। সে শেষরাতে বিচ্ছিন্ন এলোমেলো স্বপ্ন দেখছিল। বাবা-মাকে নিয়ে দেখছিল। নয়নকে নিয়ে দেখছিল। নয়নকে নিয়ে দেখা স্বপ্নটা অদ্ভুত। সে দেখেছে গ্রামের একটা উঠোন বিয়ের লাল, নীল, হলুদ রঙের অসংখ্য কাগজে সাজানো। বাড়িভর্তি নানান লোকজন। তাদের কাউকেই হেমা চেনে না। সে গিয়েছে ঢাকা থেকে। বাড়িতে ঢুকে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে হতভম্ব হয়ে গেল। নয়নের বিয়ে হচ্ছে। যে মেয়েটার পাশে সে বসে আছে, সেই মেয়েটাকে যেন কোথাও দেখেছে হেমা। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে করতে পারছে না সে! মেয়েটা সম্ভবত ওই গ্রামেরই কেউ। সে উঠানে ঢুকতেই নয়ন তাকে দেখল। সে সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে। হেমা কি করবে এখন? সে কি চিৎকার করে কাঁদবে! সবাইকে ডেকে বলবে নয়নের সাথে তার সম্পর্কের কথা? কি করবে? হেমা কিছুই করল না। সে খুব ধীরে ঘুরল। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নয়ন তাকে ডাকল। কিন্তু হেমা ফিরল না। নয়ন হঠাৎ দৌড়ে ছুটে এলো। তারপর হেমার কাঁধ চেপে ধরে বলল, 'কই যাচ্ছ?'

হেমা জবাব দিলো না। নয়নের উপর তার একটুও রাগ হচ্ছে না। যা হচ্ছে তার নাম কষ্ট। মানুষ রেগে গেলে কষ্ট হয়, ঈর্ষান্বিত হলে কষ্ট হয়, হেরে গেলেও কষ্ট হয়। কিন্তু সেই সকল কষ্টের চেয়ে আলাদা যেই কষ্ট, সেই কষ্টের নাম অভিমানের কষ্ট। জগতে অভিমানী মানুষের কষ্টের তুল্য কিছু নেই। হেমার এখন এই মুহূর্তে যেই কষ্ট হচ্ছে, তার নাম সেই অভিমানী মানুষের কষ্ট।

নয়ন বলল, 'সেই কখন থেকে সবাই অপেক্ষা করছে, তুমি আসলেই বিয়ে পড়ানো হবে। আর তুমি কিনা এসেই চলে যাচ্ছ?'

হেমা ঝট করে মুখ তুলে তাকাল। এসব কী বলছে নয়ন!

নয়ন তাকে আরো অবাক করে দিয়ে বলল, 'এই বিয়ের সাক্ষী তো তুমি! আর তুমি এত দেরি করে এসেই আবার চলে যাচ্ছ?'

হেমা কিছু বলল না। সে কেবল নয়নের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। নয়ন হাসছে। হেমার মনে হচ্ছে সেই হাসির ভেতর কোথাও যেন কোনো একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু রহস্যটা সে ধরতে পারছে না। হেমার ধারণা, নয়ন আচমকা এমন কিছু একটা বলবে, যেটি শুনে হেমা চমকে যাবে। তার সামনের এই বিয়ের ঘটনা তখন তার কাছে মনে হবে সবচেয়ে আনন্দময় ব্যাপার। দেখা গেল স্টেজে বসা মেয়েটাকে কনের সাজে সাজিয়ে গুজিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে স্রেফ একটা নাটক করার জন্য। এই নাটকটা করা হয়েছে তাকে চমকে দেয়ার জন্য। আসল ঘটনা হলো, আজ নয়নের সাথে হেমারই বিয়ে। তারা পরিকল্পনা

করেই এই অজপাড়া গাঁয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হেমাকে চমকে দিতেই এটা করেছে নয়ন।

কিন্তু বাকি ঘটনা হেমার আর দেখা হলো না। ভয়াবহ মানসিক চাপ নিয়ে তার ঘুম ভাঙল। বুকের বাঁ পাশে কেমন চিনচিনে এক ব্যথা। চোখ খুলে বৃষ্টি দেখেই সেই ব্যথাটা যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে ব্যথাটা আবার ফিরে আসছে। হেমার হঠাৎ খুব কান্না পেতে লাগল। সে কী কাঁদবে? এই বৃষ্টিতে কাঁদাই যায়। আচ্ছা রাহাত তার সামনে বসে আছে, কিন্তু এমন ঝরঝর বাদল মুখর দিনে, এমন তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে যদি সে কাঁদে, তবে কী রাহাত তা বুঝতে পারবে? নাকি বৃষ্টির জলে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে তার কান্নার জল?

নয়ন বসে আছে বাসার ছাদে। এই সময়ে এই জায়গাটা তার খুব পছন্দের। মোহাম্মদপুর পেরিয়ে আরো অনেকটা ভেতরের দিকে নতুন এই বাড়ি। এখানে এখনো আকাশচুরি হয়নি। চারপাশে মাথা উঁচু ভবনের বালাই নেই। বিকেল হলেই নরম রোদের সাথে ফুরফুরে হাওয়ার সখ্যতা টের পাওয়া যায়। নয়নের সামনে ক'খানা পুরনো ডায়েরি খোলা। ঠিক ডায়েরিও না, রুলটানা খাতা বললেও চলে। খাতার পাতাভর্তি কত কী যে লেখা! তবে লেখাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়। ঝর্না কলমে নিউজপ্রিন্ট কাগজে লেখা হয়েছিল বলে বেশিরভাগ লেখাই লেপ্টে গিয়েছে। যিনি লিখেছেন তার লেখার ধরনটাও কেমন অদ্ভুত! যেন অন্য কারো হাতে পড়ে গেলে সহজে পড়ে ফেলতে না পারে, এইজন্য ইচ্ছে করেই এমন হিজিবিজি করে লেখা। এ যেন কেবলই নিজের জন্য লেখা।

নয়ন নিজে ডাক্তার। লোকে বলে ডাক্তারদের হাতের লেখা ভয়াবহ দুর্বোধ্য হয়। কিন্তু সে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না, এই লেখা যিনি লিখেছেন, তিনি কি ইচ্ছে করেই এমনভাবে লিখেছেন? নাকি তার হাতের লেখাটাই এমন?

এই লেখা লিখেছেন নয়নের মা কোহিনূর। খাঁ-বাড়ির প্রথম কন্যা সন্তান হিসেবে কোহিনূরকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। কোহিনূর অষ্টম শ্রেণি অবধি তার নানাবাড়ি থেকে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু নয়ন কখনো কোনোদিন মাকে কিছু লিখতে দেখেনি। এমনকি বাজারের ফর্দও না। কিন্তু সে জানে, এই খাতাগুলো তার মায়ের। খাতার লেখাগুলোও। খাতাগুলো নয়নের হাতে এসেছে বহু আগে। কিন্তু তখনও বিষয়টি নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখায়নি নয়ন। ছাদের চিলেকোঠার ঘরে কিছু পুরনো বাকসো রাখা ছিল। সেই বাকসে নয়নের পুরনো কিছু বই-খাতাও ছিল। হঠাৎ দরকারে সেগুলো খুঁজতে গিয়েই মায়ের লেখা খাতাগুলো পেয়ে গিয়েছিল নয়ন। প্রথম দেখায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হয়নি। পাতার পর পাতা জুড়ে যেন কেবল দুর্বোধ্য আঁকিবুকি। এমন

www.boighar.com

জটিল করে লেখা হাতের লেখা আগে কখনো দেখেনি নয়ন। প্রথম লেখাটা বুঝতেই তার অনেক সময় লেগে গিয়েছিল এবং তখন অবধিও সে বুঝতে পারেনি লেখাগুলো কার? কোথাও তার মা কোহিনূরের নাম অবধিও লেখা ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে পাতা যত উল্টেছে, ততই বিস্ময়াভিভূত হয়েছে নয়ন। আবিষ্কার করেছে অদ্ভুত সব ঘটনা।

খাতার বেশিরভাগ লেখাই ছোট ছোট গল্প বা কবিতা। নয়ন কবিতা তেমন ভালো বোঝে না, তবে গল্পগুলো যতটুকু সে পড়তে পেরেছিল, তাতে সেগুলোকে গল্প না বলে আত্মকথা বলেই তার মনে হয়েছে। সম্ভবত কারো সাথে তেমন একটা কথাবার্তা বলতেন না বলেই নিজের ভাবনাগুলোকে এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে লিখে রাখতেন কোহিনূর। খাতাগুলো দেখে নয়নের মনে হয়েছে তার মা সেই সকল নিঃসঙ্গ সময়ের প্রায় সকল কথা, সকল ভাবনা তুলে রেখেছিলেন এই খাতাগুলোতে। সম্ভবত ভীষণ অন্তর্মুখী কোহিনূরের কাছে এই খাতাগুলোই ছিল সে সময়ে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, মনের সকল কথা অকপটে বলতে পারা সঙ্গী। সমস্যা হচ্ছে লেখাগুলোতে কোনো দিন, তারিখ, সময় উল্লেখ করা নেই। নয়ন একবার ভেবেছিল মাকে জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু মাকে সে যতটা চেনে, তাতে আর সাহস করেনি।

অনেকগুলো সাপ যেমন একসাথে থাকলে কিলবিল করে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে থাকে, খাতার লেখাগুলোও যেন অনেকটাই তেমন। প্রথম প্রথম পড়তে খুব বেগ পেতে হতো নয়নকে। কিন্তু ক্রমশই লেখায় উল্লেখিত বিভিন্ন চরিত্র, স্থানের নাম, গল্পগুলো সে ধরে ফেলতে পারল। ধরে ফেলতে পারল লেখার নানান কথা, বাক্য, শব্দের ধরনও। ফলে বিষয়গুলো ক্রমশই সহজ হয়ে আসতে লাগল। প্রথম দু'দিন শ্রেফ হাতের লেখা বোঝার কৌতূহল থেকেই খাতাগুলো পড়েছিল নয়ন। কিন্তু সেই কৌতূহল ধীরে ধীরে পরিণত হতে লাগল তার মায়ের ছোটবেলার গল্প ও ভাবনা জানার রুদ্ধশ্বাস নেশায়। রোজ ঘুমানোর আগে দরজা জানালা বন্ধ করে সে খাতাগুলো নিয়ে বসত। কিছু কিছু বিষয় পড়ে কখনো কখনো একটা অপরাধবোধ যে তার কাজ করেনি তা নয়, কিন্তু কৌতূহলটাও দমাতে পারেনি নয়ন।

ফতেহপুরের সাথে নয়নদের সম্পর্ক নেই মানে যে এই কুড়ি-পঁচিশ বছরে আর একবারের জন্যও কোনো যোগাযোগ হয়নি, তা নয়। কোহিনূর কখনো না গেলেও নয়ন বা নয়নের বাবা ফখরুল আলমকে নানান কারণে সামান্য সময়ের জন্য হলেও দুয়েকবার ফতেহপুরে যেতে হয়েছে। তাছাড়া তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এবং খবির খাঁর সাথে কোহিনূরের সরাসরি কোনো যোগাযোগ না থাকলেও মা আমোদি বেগম, ছোট চাচা আইয়ুব উদ্দিন খাঁ আর ফতেহপুর থেকে কালেভদ্রে ঢাকায় আসা কিছু মানুষের সাথে মিহি সুতোর মতো প্রায় অদৃশ্য একটা

যোগাযোগ মাঝে-মধ্যে ছিল। তবে মোটা দাগে তা সে ওই না থাকার মতোই। এদের কাছেই নানান সময়ে নয়ন ফতেহপুরের নানান গল্প শুনেছে। শুনেছে তার মায়ের গল্পও। তবে একটা জিনিস নয়ন খেয়াল করেছে, সেটি হলো, সেই সকল গল্পে কোহিনূরের শৈশব সম্পর্কে সব সময়ই যেন একটা রাখঢাকের ব্যাপার ছিল।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সে তার মা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য পেয়েছে আসমার কাছ থেকে। আসমা দীর্ঘদিন থেকেই তাদের বাড়িতে কাজ করত। নয়নের সাথে একটা ভালো বোঝাপড়াও তার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ফলে নয়নকে সে অনেক কথা অবলীলায় বলে দিত। নয়ন যখন রোজ নিয়ম করে আসমাকে পড়াতে বসাত, তখন প্রায়ই রাজ্যের গল্পের ঝাঁপি খুলে বসত আসমা। বিশেষ করে তার গ্রামের গল্প, বন্ধুদের গল্প, দারিদ্রের গল্প। তবে সেইসব গল্পের সবচেয়ে বড় জায়গা জুড়ে থাকত ভূতপ্রেতের কাহিনি। আসমার এই ভূতপ্রেতের কাহিনি শুনতে গিয়েই প্রথম আব্দুল ফকিরের নাম শুনেছিল নয়ন। মানুষটার নানান অতিপ্রাকৃত শক্তির কথা আসমা তাকে ভয়ার্ত চোখে বলেছিল। যদিও সেসব কথার বেশিরভাগই হেসে উড়িয়ে দিত নয়ন। বিষয়টা আসমাকে ভারি আহত করত। কিন্তু তাতে তার বিশ্বাস এতটুকুও টলত না। এমন এক গল্প বলার মুহূর্তেই আসমা হঠাৎ মুখ ফসকে নয়নকে বলে ফেলেছিল কোহিনূরের কথা।

নয়ন হাসতে হাসতে বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে বলছিল, 'এ ক'দিনে তোকে এত কিছু বোঝানোর, শেখানোর পরও তুই এখনও এইসব বিশ্বাস করিসরে আসমা? আব্দুল ফকির মরা মানুষ বাঁচাই তুলতে পারে?'

আসমা বলেছিল, 'সাপে কাঁটা মানুষ তার কাছে নিলেই সুস্থ। সে ঢোলবাদ্য বাজাইয়া বিষ নামায়। একবার একজনরে মরা ভাইবা কবরও দিয়া দিছিল। আব্দুল ফইর গিয়া বলল, লাশ উঠান, মুর্দা এহনও কবরের মইধ্যে জিন্দা আছে। শুইনা সবাই তো অবাক। লাশ উঠানো হইল কবর খুঁইড়া। ওরে আল্লাহ! সে সেই লাশ জিন্দা বানাইল। শুধুই কি লাশ? জ্বিন, পরী, ভূত সব বশ করতে জানে সে। আপনে বিশ্বাস যান না?'

নয়ন হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'তুই ভূতে বিশ্বাস করিস আসমা? আচ্ছা, জ্বিন ভূতে ধরলে মানুষ তখন কি করে?'

আসমা ঠিক তখনই মুখ ফসকে বলে ফেলল সেই কথাটা। সে হঠাৎ বলল, 'ক্যান? আপনের মায়রে দেহেন না? শোনেন নাই কিছু তার কথা? তার লগেও তো জ্বিন আছে। গ্রামের সবাই তারে ছোটবেলায় ডরাইতো। এহনো মুরুব্বীরা তার কত কেরছা-কাহিনি বলে! রাইত বিরাইতে আমগাছ, জামগাছে উইঠ্যা নাকি সে বইসা থাকত।'

www.boighar.com

আসমার কথা শুনে আচমকা থমকে গিয়েছিল নয়ন। আর মুখ ফসকে কথাটা বলেই ভয়ে একদম চুপসে গিয়েছিল আসমা। সেইদিন তার মুখ থেকে আর কিছুই বের করা গেল না। বরং কান্নাকাটি করে সে নয়নের হাত-পা ধরে মাফও চাইল, যেন নয়ন এইকথা কোনোভাবেই কোহিনূরকে না জানায়। নয়ন জানালও না। এর দিন কয় বাদে আবার সেই প্রসঙ্গ তুলল নয়ন এবং সেদিন নয়নকে অনেক কথাই বলেছিল আসমা। নয়ন সেদিন আর আসমার কথা হেসে উড়িয়ে দিলো না। সে খুব মনোযোগ দিয়েই আসমার সকল কথা শুনল। আসমার কাছে নয়ন যা শুনল, তার বিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ কিছু কিছু কথা বিভিন্ন সময়ে নয়নও শুনেছিল। আসমার মুখে শুনে সেইসব বিচ্ছন্ন কথাগুলোকেই যেন খানিক জোড়া লাগাল নয়ন।

তার মা কোহিনূরের ভেতর একটা অন্যরকম ব্যাপার যে রয়েছে, তা নয়ন জানে। তবে তার মতে, সেই অন্যরকম ব্যাপারটা কোনোভাবেই অতিপ্রাকৃত কিছু নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কোহিনূর খুব গম্ভীর এবং অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষ। সারাক্ষণ একা একা থাকেন। বাইরে বের হন না। কিন্তু এর সাথে অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুরই কোনো সম্পর্ক নয়ন খুঁজে পায়নি। একেকজন মানুষের ব্যাক্তিত্বের ধরন একেকরকম। কোহিনূরের এই আচরণও তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বা।

কিন্তু আসমা কোহিনূরকে নিয়ে একের পর এক এমন এমন সব আজগুবি গল্প নয়নকে শুনিয়েছে যে নয়ন মাঝে-মধ্যে বিভ্রান্তও হয়ে গেছে। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট যে, গ্রামের মানুষ এইসব অতিপ্রাকৃত গল্প শুনতে এবং বলতে ভালোবাসে। ফলে অস্বাভাবিকতার আভাসযুক্ত সামান্য কোনো ঘটনারও যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা না খুঁজে বরং সেটিকেই আরো রসালো এবং রহস্যময় করে প্রচার করতে শুরু করে তারা। এ-কান সে-কান হয়ে সেই কথা ছড়িয়ে পড়তেই তাতে আর আসল ঘটনার লেশমাত্র কিছু থাকে না, হয়ে যায় পুরোপুরি লোমহর্ষক কোনো ভৌতিক কল্পকাহিনি। তার মা'র ব্যাপারেও যে এর ব্যতিক্রম কিছু হয়নি, সে বিষয়ে নয়ন নিশ্চিত।

কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে নয়ন নিশ্চিত নয়, সেটি হচ্ছে তার মা আর তার নানার সম্পর্কের এই সুদীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার কারণ। সকলেই জানে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার দুই পুত্রসন্তানের পর মাঝ বয়সে এক কন্যাসন্তানের পিতা হয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলেন এবং কোহিনূরকে তিনি অস্বাভাবিক রকম ভালোও বাসতেন। তাহলে তাদের এই দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা বা সম্পর্কহীনতার কারণ কি?

সেই কারণ কী এই খাতাগুলোয় লেখা রয়েছে? খাতার প্রথম দিকে ছোট ছোট লেখা। সে সকল লেখার বেশিরভাগই এত বিচ্ছিন্ন যে কোনো বিশেষ ঘটনা বোঝা সম্ভব নয়। তবে ধীরে ধীরে লেখায় একটা ধারাবাহিকতা চলে

এসেছে। অমল বাবু নামের এক শিক্ষকের কথাও রয়েছে ধারাবাহিকভাবে লেখা সেই ঘটনাগুলোতে। আচরণের মতোই কোহিনূরের লেখার মধ্যেও একটা ভাবগম্ভীর ব্যাপার রয়েছে। শুধু তাইই না, লেখার ধরন দেখে নয়নের মাঝে-মধ্যে খুবই অবাক লেগেছে! আজ থেকে বহু বছর আগে এক অজপাড়া গাঁয়ের অস্বাভাবিক গম্ভীর এক কিশোরী মেয়ের এই লেখা অবাক করার মতোই ব্যাপার!

প্রথম পৃষ্ঠায় সেই কিশোরী কোহিনূর লিখেছেন, *'গাছ পছন্দ। পানি পছন্দ। আর যাহা পছন্দ, তাহা হইল অন্ধকার।'*

তিনি প্রথম দিকে সাধু ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে তা আর থাকেনি।

এরপর তিনি লিখেছেন, *'আমার কথা বলতে ভালো লাগে না। লেখতে ভালো লাগে।'*

প্রথম দিককার নানান লেখায় নানান অসঙ্গতি রয়েছে, তবে দ্রুতই কোহিনূরের লেখা ভালো থেকে আরো ভালো হয়েছে। নয়ন বরং অনেক ক্ষেত্রে বিস্মিত হয়েছে। তার মনে হয়েছে, লেখালেখির বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে তার মা জন্মেছিলেন। কিন্তু তিনি জন্মেছিলেন ভুল জায়গায়, ভুল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে।

এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, *'রাবেয়া চুরি করছে। সবাই দোষ দিলো আনোয়ারার। স্যার আনোয়ারাকে অনেক মেরেছে। আনোয়ারার কান্দনের সময় রাবেয়া তারে চোখ মারছে। রাবেয়ার চোখ কলম দিয়া ফুটা করতে ইচ্ছা হয়।'*

নয়ন খেয়াল করল *'কান্দনের'* লেখার সময় অনেক কাটাকুটি করেছেন কোহিনূর। অর্থাৎ এই শব্দটি লেখার সময় বেশ দ্বিধান্বিত ছিলেন তিনি। তিনি নিশ্চয়ই তখনও শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতেন না। আবার তিনি সাধারণত যেভাবে কথা বলতেন, লেখার সময় সেভাবে লিখতেও চাইতেন না। কিন্তু পরিপূর্ণ শুদ্ধ শব্দ জানা না থাকায় প্রায়ই শব্দ ব্যবহারে দ্বিধায় ভুগেছেন তিনি। ফলে এইসব শব্দ লেখার সময় প্রচুর কাটাকুটি করতে হয়েছে তাকে। যেমন কান্না লিখতে গিয়ে তিনি সম্ভবত সঠিক শব্দটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ফলে একাধিকবার কাটাকুটি শেষে লিখেছেন 'কান্দন'। তবে এই সমস্যাগুলো খুব দ্রুতই কেটে গিয়েছিল।

এর পরের পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারায় লেখা, *'একটুর জন্য রাবেয়ার চোখ ফুটা হয় নাই। গাল ফুটা হয়েছে।'*

এই অংশটা পড়ে নয়ন ভারি অবাক হয়েছে। আগের অংশটা পড়ে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে তার ক্লাসের রাবেয়া নামের কেউ চুরি করে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল আনোয়ারা নামের একজনকে। বিষয়টি কোহিনূর দেখেছিলেন। আনোয়ারাকে চুরির দায়ে যখন শাস্তি দেয়া হচ্ছিল, তখন রাবেয়া তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হেসেছিল। কোহিনূর এই পুরো ঘটনা নিজ চোখে দেখে মনে মনে

www.boighar.com

রাবেয়ার চোখ গেলে দিয়ে শাস্তি দেয়ার পণ করেছিলেন। কিন্তু শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি চোখের বদলে রাবেয়ার গালে কলম বিদ্ধ করে ফেলেছিলেন। কী ভয়াবহ! এই অংশটা পড়ে নয়ন শিউড়ে উঠেছিল। তার মায়ের বয়স তখন কত হবে? হয়তো ক্লাস সিক্স সেভেনের ছাত্রী তখন তিনি।

এই ঘটনা পড়ে নয়নের আরো একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। নয়ন শুনেছিল, একদম শিশু বয়সে ঠিক এভাবেই খেঁজুর কাঁটায় খাঁ-বাড়ির এক গৃহপরিচারিকার চোখ গেলে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন কোহিনূর। বিষয়টি নিয়ে নয়ন বেশ কৌতূহলীও হয়ে উঠেছিল। এই নিয়ে আসমার সাথে কথা বলতে গেলে সে এমন সব আজগুবি ব্যাখ্যা দিত যে সেসব শুনে নয়নের নিজেরই মাঝেমাঝে সবকিছু ভারি গোলমেলে লাগত। তবে বিষয়টা বোঝার জন্য শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিঞ্চিৎ পড়াশোনার চেষ্টা করেছিল নয়ন। তাতেও যে খুব একটা লাভ হয়েছিল তা নয়। তবে সহজ কিছু ব্যাখ্যা সে পেয়েছিল। কোনো কোনো শিশুরা ছোটবেলা থেকে একা থাকতে পছন্দ করে। কোনো কোনো শিশুর আচরণ ছোটবেলা থেকেই অস্বাভাবিক রকমের নিষ্ঠুর হয়? এর পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে? এই প্রশ্নগুলোর কিছু উত্তর সে পেয়েছিল।

জনি ই. জনস্টন এর দ্য হিউম্যান ইকুয়েশন নামের বইয়ের একটা আর্টিকেল নয়নকে এই বিষয়ে সহজ কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছিল। সাথে শিশু মনস্তত্বের ওপর আরো কিছু আর্টিকেল ঘেটে নয়ন কিছু ব্যাখ্যাও দাঁড় করিয়েছে। একটি শিশুর ভেতর নৃশংস আচরণ গড়ে ওঠে প্রথমত গৃহপালিত পশুপাখি এবং গৃহপরিচারকদের ওপর নৃশংসতা দিয়ে। তারা বেড়াল, কুকুর, বা মুরগির বাচ্চার পা ভেঙে দেয়, বা এদের দেখলেই ঢিল ছুড়ে মারে, গৃহপরিচারকদের সাথে খারাপ আচরণ করে। এই আচরণগুলো তারা বেশিরভাগই পায় বড়দের কাছ থেকে। বিশেষ করে পরিবারের মধ্য থেকে। বড়রা গৃহপরিচারকদের সাথে খারাপ আচরণ করলে তা থেকে শিশু নৃশংসতা শেখে। কোনো পরিবারে বাবা মায়ের মধ্যে যদি মারমুখী সম্পর্ক হয়, তবে তার প্রভাবও শিশুর মধ্যে পড়ে। শুধু তাই-ই নয়, যদি বাবা-মা সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে নিয়মিত শারীরিকভাবে আঘাত করেন, তবে সেক্ষেত্রেও শিশু নানা অস্বাভাবিক আচরণ করে।

তাহলে কি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আর আমোদি বেগমের মধ্যেও এমন কোনো সম্পর্কই ছিল? যা শিশু কোহিনূরের মনস্তত্ত্বে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল? সমস্যা হচ্ছে এটি নয়নের পক্ষে জানা সম্ভব না। আর নয়ন যতদূর জানে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার একমাত্র কন্যা কোহিনূরকে অসম্ভব ভালোবাসতেন।

খাতায় এরপরও এমন অনেক সংক্ষিপ্ত লেখা রয়েছে। যেমন, *'স্যার যখন মারলেন, তখন অনেক কষ্ট হয়েছে, কিন্তু কাঁদি নাই।'*

অর্থাৎ রাবেয়াকে আঘাত করার কারণে শিক্ষক কোহিনূরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কাঁদেননি।

এরপর লেখা, *'সবাই আমাকে ভয় পায়। আমি একলা বসি। কেউ কাছে বসে না।'*

সম্ভবত রাবেয়াকে ওভাবে আঘাত করার কারণেই ক্লাসের বাকিরা তাকে ভয় পেতে শুরু করে।

এরপর একটা জায়গায় কোহিনূর লিখেছেন যে তিনি দুই লাইনের একখানা কবিতা লিখেছিলেন এবং সেটি অমল বাবু দেখে খুব প্রশংসা করেছেন। অমল বাবু এত সুন্দর করে তার সাথে কথা বলেছেন যে বিষয়টি তার খুব ভালো লেগেছে।

সম্ভবত এর পরপরই অমল বাবুর সাথে তার নিয়মিত কথাবার্তা শুরু হয়। কারণ, এখান থেকেই তার লেখা খুব গোছানো এবং শুদ্ধ হতে শুরু করে। এরপর তিনি লিখেছেন, *'কেউ আমার সাথে কথা বলে না। আনোয়ারাও না। আমিও বলি না।'*

এরপরের লেখাগুলো টানা এবং ধারাবাহিক। এখান থেকেই নিয়মিত কবিতা ও ছড়া লেখা রয়েছে। অমল বাবুকে নিয়ে সুদীর্ঘ ভাবনা এই সকল জায়গা জুড়ে। রয়েছে তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে নিয়েও কিছু কথা। তাতে বাবার বিষয়ে কিছু ক্ষোভই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কেন? লেখাগুলো বিশদ কিছু নয় বলে নয়ন ঠিক বুঝতে পারল না। মা আমোদি বেগমকে নিয়েও টুকরো টুকরো দুয়েকটি কথা রয়েছে। তবে সেসবে আমোদি বেগমের প্রতি স্পষ্টতই এক ধরনের করুণা প্রকাশ পেয়েছে। এরপর অমল বাবুর মাধ্যমে লেখালেখির মতো তুমুল আগ্রহদায়ী একটা বিষয়ের সাথে সে পরিচিত হতে পেরেছে তা প্রকাশ পেয়েছে।

এই অংশটিতে নয়ন তার এতদিনকার পরিচিত মায়ের ভাবনার একটি নতুন দিক আবিষ্কার করেছে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, *'মানুষের সাথে কথা বলার চাইতে, এই খাতায় লিখিয়া রাখা ভালো। ভুল বোঝার সুযোগ থাকে না।'*

এর বিশদ ব্যাখ্যাও রয়েছে। সেই ব্যাখ্যা জুড়ে দীর্ঘ একটা ঘটনা লেখা। ঘটনাটি এরকম, নানাবাড়িতে একরাতে স্বপ্ন দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কোহিনূরের। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন বাড়ির পেছনের শুকনো বিলে ধবধবে সাদা কাশফুল ফুটেছে। সেই কাশফুলের মাঝে প্রবল আনন্দ নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তার কানে ভেসে এলো সদ্যোজাত এক শিশুর চিৎকার। সেই চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ঘুম ভাঙার পরও শিশু কণ্ঠের চিৎকারটি তার কানে লেগে রইল। তিনি বারকয়েক বিষয়টিকে গ্রাহ্য না

করে আবারও ঘুমানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটি কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ অবধি তার পাশে ঘুমিয়ে থাকা ছোটখালাকে ঘুম থেকে ডেকে উঠিয়ে তিনি তাকে বললেন বাড়ির পেছনের কাশবনে যাওয়ার কথা। সদ্য কাঁচা ঘুম ভাঙা ছোট খালার হঠাৎ কী হলো, তিনি হঠাৎ ভয়ে চিৎকার করে বাড়ির সবাইকে জড়ো করলেন! তারপর ওই ঘটনাটুকুকেই নানান রঙ মাখিয়ে বললেন। শুধু তাই-ই না, তিনি কোহিনূরের সাথে আর ঘুমাতেই রাজি হলেন না। এরপর থেকে রোজ রাতে একা একা ঘুমাতে হতো কোহিনূরকে। এমনই এক একা রাতে কোহিনূর আবারও সেই একই স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটি দেখে ঘুম ভেঙে গেলেও আগের মতোই তার কানে বিঁধে রইল সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না। শেষ অবধি সহ্য করতে না পেরে সেই রাতে দরজার খুলে একা একা একাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

বাড়ির পেছনের বিল শুকিয়ে শুকনো হয়ে আছে। সেখানে সাদা কাশফুল ফুটেছে। আবছা অন্ধকারে শুভ্র কাশফুলগুলোকে দেখে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কোহিনূর। তখন শেষ রাত। ফজরের আজানও হয়ে গিয়েছে। তবে কোহিনূরের তা খেয়াল নেই। পাশের বাড়ির বয়স্ক এক লোক ওযু করতে উঠেছিলেন। তিনি বিলের কাশবনের মাঝখানে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলেন। তার চিৎকারে চারপাশের লোকজন জেগে উঠল। সকলেই ধারণা করল কোহিনূরের উপর আবারো জ্বিন ভর করেছে। শুরু হলো ভয়াবহ অবস্থা। ওঝা এনে বীভৎস উপায়ে চিকিৎসা শুরু হলো কোহিনূরের। হাত-পা বেঁধে তাকে ফেলে রাখা হলো উঠানে। তার মুখের কাছে ধূপ জ্বালানো হলো। ধূপের ভেতরে পুড়তে দেয়া হলো শুকনো মরিচ। একখানা ঝাঁড়ু নিয়ে ক্রমাগত কোহিনূরকে পেটানো হলো। তার চোখ-মুখ-নাক দিয়ে পানি ঝড়ছে। কিন্তু কেউ তা গ্রাহ্য করছে না। ওঝা বিড়বিড় করে টানা মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে কোহিনূরের অবস্থা মৃতপ্রায়।

তাকে সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমল বাবু। খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসেছিলেন তাকে দেখতে। অমল বাবু কোহিনূরের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে তাকে উঠান থেকে ঘরে নিয়ে গেলেন। অমল বাবুকে জড়িয়ে ধরে সেই প্রথম কোহিনূর কাঁদল। হাউমাউ করে কাঁদল। অমল বাবুর বড় কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু এরপরও টানা একমাস কোহিনূরকে আর ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হলো না। সে স্কুলে গেল প্রায় মাসখানেক পরে। কিন্তু এই ঘটনা ততদিনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুলে সে হয়ে গেল পুরোপুরি একা। কিন্তু সে যত অন্যদের থেকে একা হতে শুরু করল, ততই কাছাকাছি হতে শুরু করল অমল বাবুর। এ যেন ঠিক পিতা আর কন্যা।

নয়ন স্পষ্টতই বুঝতে পারছিল যে তার মা গ্রামের আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো ছিলেন না। তিনি খানিকটা ভয়ডরহীন, নির্বিকার স্বভাবের ছিলেন। তার ভাবনাটাও ছিল বেশ অন্যরকম। কিন্তু এই সকল ভাবনা তিনি কাউকে বলতে পারতেন না। বলতে গেলেই সকলে তাকে ভয়ের চোখে, সন্দেহের চোখে দেখত। ফলে তিনি ক্রমশই একা হয়ে যেতে থাকলেন। একটা সময় পুরোপুরি কথা বলা বন্ধ করে দিলেন অন্যদের সাথে। আর তখন ক্রমশই তার কথা, ভাবনা বিনিময়ের জায়গা হয়ে উঠল এই লেখার খাতা। আর তার এই সকল আচরণের নানা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে শুরু করল আশেপাশের মানুষ। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। জগতে যুগে যুগে ভিন্ন আচরণ, ভিন্ন মত, ভিন্ন ভাবনাকে মানুষ সহজে মেনে নিতে প্যারেনি।

নয়ন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাতার পর পাতা পড়েছে। বারবার পড়েছে। কোহিনূরের ভাবনার জগৎটাকে একটি চমৎকার সৃষ্টিশীলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন অমল বাবু। তারা পরস্পরের অনুভূতিকে গভীর সংবেদনশীলতায় স্পর্শ করতে পারছিলেন। কিন্তু বিষয়টি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মেনে নিতে পারেননি। কন্যাস্নেহে কাতর তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অমল বাবু আর কোহিনূরের সম্পর্কের এই গভীরতায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। যার ফলে তিনি কোহিনূরের পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, এর কিছুদিন বাদে তিনি তড়িঘড়ি করে তার কন্যাকে বিয়েও দিয়ে দিলেন। কিন্তু বিয়ের আগের দিন গভীর রাতে অমল বাবুর কাছ থেকে একখানা জরুরি বার্তা এসেছিল ফতেহপুরের খাঁ-বাড়িতে। সেই বার্তায় অমল বাবুর গুরুতর দুর্ঘটনার সংবাদ ছিল। ফরিদপুর শহর থেকে ফেরার পথে তিনি মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তখন মৃত্যুশয্যায়। মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো তিনি একবারের জন্য হলেও তার প্রাণাধিক প্রিয় কন্যাসম কোহিনূরকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তাতে সাড়া দেননি। বরং অস্বাভাবিক আড়ম্বরহীনতায়, অত্যন্ত সাদামাটাভাবে পরদিন সকালে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর একমাত্র কন্যা কোহিনূরের বিয়ে হয়ে গেল অচেনা অজানা ফখরুল আলমের সঙ্গে।

ফখরুল আলম ফতেহপুরে ফুপুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি তখন কেবল ছোটখাট একখানা সরকারি চাকরিতে জয়েন করেছেন। আচার-আচরণে নিরীহ নির্বিবাদী ধরনের মানুষ ফখরুল আলম। তার বাবা মা নেই,
www.boighar.com
তেমন কোনো বংশ মর্যাদাও নেই । তিনি মানুষ হয়েছেন বড় বোনের কাছে। নিজেকে নিয়ে সব সময় সঙ্কোচে ভোগা ফখরুল আলম কারো চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না। সেই ফখরুল আলমের সঙ্গে একদিনের মধ্যে নিজের কন্যার বিয়ে দিয়ে দিলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। বিয়ের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোহিনূরকে তিনি ফখরুল আলমের সঙ্গে ঢাকা পাঠানোরও ব্যবস্থা করলেন।

www.boighar.com

সাথে পর্যাপ্ত অর্থকড়ি দিয়ে পাঠালেন তার ছোট ভাই আইয়ুব উদ্দিন খাঁকে। আইয়ুব উদ্দিন খাঁ ঢাকায় এসে দিন দশেক থাকলেন। এই সময়ে তিনি কোহিনূরের থাকার জন্য ভালো বাসা ভাড়া করে দিলেন। সেই বাসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র কিনে দিলেন। তারপর ফখরুল আলমের কাছে প্রচুর পরিমাণে নগদ অর্থ রেখে গেলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ স্পষ্ট করে তাকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন যে কোহিনূরের যেন কোনো সমস্যা না হয়। কোহিনূরের কোনো সমস্যা হয়ওনি। তবে ফতেহপুর থেকে কোহিনূরের সেই শেষ বিদায়। বিদায় তার পিতা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর চোখের সামনে থেকেও।

হয়তো কোহিনূরের সাথে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর এই সুদীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার একটা ব্যাখ্যা এই ঘটনাতেই রয়েছে। কিন্তু নয়ন জানে, ঘটনার মধ্যে রয়েছে এর চেয়েও আরো বেশি কিছু। ফতেহপুরের দোর্দণ্ড-প্রতাপশালী তৈয়ব উদ্দিন খাঁ একদিনের মধ্যে তার কন্যাকে অমন আড়ম্বরহীনভাবে বিয়ে দিয়ে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন কী কারণে? কী কারণে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ ইচ্ছেটা অবধি তিনি পূরণ করলেন না। সেই কারণটিই সে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিল। কিন্তু নয়ন জানে কারণটি তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তাকে কোনোদিন বলবেন না। হয়তো বলবে না আর কেউই।

কিন্তু সেই কারণটি সে জানে। জানে, কারণ তার হাতে রয়েছে এই মলিন মলাটের, ছেঁড়া পাতার, ঝাপসা হয়ে যাওয়া অক্ষরের খাতাখানা।

হেমার ধারণা সে এ পর্যন্ত এক লক্ষ বার হাঁচি দিয়েছে। এখন হাঁচি দেয়ার জন্য যে সে কপাল কুঁচকাবে, সেই শক্তিটুকুও তার অবশিষ্ট নেই। সেদিন বৃষ্টিতে ভেজার পর থেকেই শরীরটা কেমন করছিল! এই মুহূর্তে বাসায় সে একা। কী এক সেমিনারে তার মা রেণু গিয়েছেন চট্টগ্রামে। বলেছেন ফিরতে তিন-চারদিন লাগবে। বাবারও সেদিনের পর থেকে আর কোনো খবর নেই। বাসায় কাজের বুয়াটা ছিল। কিন্তু মা-বাবা কেউ নেই বলে এই সুযোগে আর আসেনি। শরীর খারাপ হলে হেমা কখনোই কাউকে কিছু বলে না। এবারও বলেনি। কিন্তু আজ মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙার পরই তার কেমন অসহায় লাগতে লাগল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সে থার্মোমিটার খুঁজে জ্বর মাপল। কিন্তু কত বুঝতে পারল না। একবার মনে হলো একশ তিন। আরেকবার ন হলো একশ চার। সে আসলে চোখে ঝাপসা দেখছে। তার মাথা ঘুরাচ্ছে। আচ্ছা, এই সময়ে কী করতে হয়? মাথায় খানিক পানি ঢালতে পারলে বোধহয় জ্বরটা কমত। হেমা বিছানা থেকে নেমে দেয়াল ধরে ধরে বাথরুমেও চলে এলো। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় পানি ঢালল সে। তারপর আবার বিছানায় ফেরত এলো। বিছানার চাদর তুলে তার একপ্রান্ত দিয়ে মাথা মুছে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর মনে হলো খানিকটা ভালো লাগছে। কিছুক্ষণ আগের ভয়াবহ অবস্থাটা যেন আর নেই।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে হেমার খুব মরে যেতে ইচ্ছে হতে লাগল। সে অভিমানী টাইপ মেয়ে না। বরং অনেকটাই কাঠখোট্টা টাইপের মেয়ে। অথচ গত কিছুদিন ধরে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে সে। এটা হেমা টের পাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টাকে পাত্তা দিতে চাচ্ছে না। এই যে এই মুহূর্তে, সেদিন রাতের সেই অভিমানটাই আবার ফিরে আসছে তার। এই যে ভয়াবহ জ্বর নিয়ে সে একা একটা ঘরে আটকে আছে। এটা কি তার বাবা-মা টের পাচ্ছে? সে শুনেছে, সন্তানের অসুস্থতার কথা নকি সবার আগে টের পায় মা। আসলেই কী তার মা টের পাচ্ছে?

হেমার হঠাৎ মনে হলো, তার এই দীর্ঘ জীবনে তার মা কি কখনো তার সাথে আহ্লাদ করে কথা বলেছেন? সে মনে করতে পারল না। আচ্ছা, এমনও কি কখনো হয়? নাকি বাবা তাকে সব সময় আগলে রাখতেন বলে, মা আর তেমন খেয়াল রাখতেন না। আসলে বাবা তার কাছে বাবা-মা দুটোই হয়ে উঠেছিলেন। আর সে নিজে থেকেও হয়তো মাকে সেই জায়গাটাই কখনো দেয়নি। কে জানে! কিন্তু আজ এই যে একা একা একটা ঘরে এমন ভয়াবহ জ্বরে প্রায় মারা যাচ্ছে সে, তার মা কি তা টের পাচ্ছে! মনে হয় না। মা তো তাকে কখনো চায়ইনি। সে মা'র কাছে কখনোই প্রত্যাশিত কেউ ছিলই না। বাবার কাছেও কি ছিল? নাকি কেবল একটা সম্পর্ক জোড়া লাগানোর উদ্দেশ্যেই তাকে তার মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জন্ম দেয়া হয়েছিল!

হেমার গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে উঠে আসতে চাইছে। কান্না? হেমা কাঁদতে চায় না। একটুও কাঁদতে চায় না। সে এই ঘরে একা মরে পড়ে থাকলেও কাঁদতে চায় না। শীতে গা কাঁপছে। একটা মোটা কাঁথা হলে ভালো হতো। কিন্তু আলমারি অবধি যেতে ইচ্ছে করছে না। হেমা টের পেল, অসুস্থতার চেয়ে এখানেও একটা সূক্ষ্ম অভিমানবোধ কাজ করছে। সে সুস্থ হবার জন্য কিছুই করবে না। বরং যতটা সম্ভব আরো অসুস্থই হয়ে যাবে। প্রয়োজনে মরেই যাবে। পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষের একটা প্রয়োজন থাকে। কিন্তু এই জগতে তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? না মায়ের কাছে, না বাবার কাছে, না নয়নের কাছে!

নয়নের কথা মনে পড়তেই হেমার বুকের ভেতরটা আবার কেমন করে উঠল! এই এত এত দিন! নয়নের কি মুহূর্তের জন্যও তার কথা মনে পড়ছে না! এক মুহূর্তের জন্যও না? আচ্ছা, ভালোবাসা পাওয়ার জন্য মানুষকে কী করতে হয়? কী করে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে? কী হলে কেউ কাউকে বলে, তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না। আমার কষ্ট হয়। গলা শুকিয়ে যায়। কখন? হেমা জানে না। নয়ন কখনোই তাকে এমন কিছু বলেনি। আচ্ছা, সে কি কখনো শুনতে চেয়েছে? হেমা মনে করতে পারল না।

অসুস্থ হলে মানুষ শারীরিকভাবে যেমন দুর্বল হয়ে যায়, তেমনি দুর্বল হয়ে যায় মানসিকভাবেও। এ সময় সে নানান এলোমেলো বিষয় ভাবে। সেও কি এই দুর্বলতার জন্যই এইসব ভাবছে! আগে কখনোই তো সে এমন কিছু ভাবেনি। নাকি তার অবচেতন মন জুড়ে এই তেষ্টাগুলো সব সময়ই ছিল। কিন্তু বাইরে বাইরে সে নিজেকে সব সময়ই অন্য একটা আলাদা মানুষ হিসেবে দেখাতে চেয়েছে। শক্ত, কঠিন, নিরাবেগ একজন মানুষ। যার মায়ের কাছে, বাবার কাছে, প্রেমিকের কাছে, বন্ধুর কাছে, কারো কাছেই কোনো কিছু চাওয়ার

নেই, কোনো অভিযোগ নেই, অভিমান নেই। সকল কিছুতেই সে স্বাভাবিক। কিছুতেই কিছু যায় আসে না তার।

আচ্ছা, সে কি মাকে একটা ফোন দিয়ে দেখবে! মার ফোন নিশ্চয়ই খোলা এখন? কিন্তু এতরাতে ফোন দিয়ে মাকে কী বলবে সে? সে যদি বলে যে তার জ্বর, আর তারপর মা যদি গম্ভীর গলায় বলেন, 'এত রাতে ফোন দেয়ার মতো তো কিছু হয়নি। দুটো প্যারাসিটামল খেয়ে ঘুমিয়ে থাকো।'

মা কি এমন কিছু বলবেন? নাকি বলবেন, 'আমাকে ফোন দিয়েছ কেন? ডাক্তারকে ফোন দাও। আর তোমার বাবা কই? তাকে কল করো।'

ছি! এসব সে কি ভাবছে! মা নিশ্চয়ই এমন কিছুই বলবেন না। কিন্তু কী বলবেন? হেমা তাও জানে না। এর আগে কখনো সে তার কোনো অসুস্থতার কথা মাকে বলেছে বলে তার মনে পড়ে না। বাবাকে ফোন দিয়েও লাভ নেই। বাবার ফোন সেই থেকে বন্ধ। আচ্ছা সে কি নয়নকে একটা ফোন করে দেখবে? কিন্তু লাভ কী? নয়ন তো সেই ফতেহপুর থেকে এখনো ফেরেইনি। সেখানে ইলেক্ট্রিসিটি নেই, নেটওয়ার্ক নেই। এক আদিম বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেন। হেমা তারপরও ফোনটা হাতে নিলো। নয়নের নাম্বারটা বের করল। নয়নের বহু আগের একটা ছবি ভেসে উঠেছে তার নম্বরের পাশে। ছবিটার দিকে হেমা একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতরটা কেমন করছে তার। এই তিনটে মানুষ। তিনটে মাত্র মানুষ নিয়েই তার পৃথিবী। অথচ তাদের কারো পৃথিবীতেই তার কোনো অস্তিত্ব নেই। অন্তত সে তা খুঁজে পায় না।

হেমা নয়নকে ফোন দেয়নি। কিন্তু কেমন কেমন করে যেন নয়নের নম্বরে ফোন চলে গেল এবং অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে প্রথমবার রিং হতেই নয়ন ফোনটা ধরল। হেমা এত অবাক হয়েছে যে সে হাত থেকে ফোনটা কান অবধি নিতে ভুলে গেল! নয়নের গলা কানে আসছে তার। নয়ন স্বাভাবিকভাবেই হ্যালো হ্যালো বলছে। হেমা বুঝতে পারছে না সে কী করবে! এতটা অবাক সে কখনোই হয়নি! কিন্তু সে কী নয়নের গলা শুনে খুশি হয়েছে? হেমার মনে হলো, সে খুশি হয়নি। বরং তার সেই অভিমানটা আবারো ফিরে আসছে। তার প্রচণ্ড অভিমান হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে। নয়ন ঢাকায়? অথচ তাকে একটা ফোন অবধি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি? হেমার মনে হলো সে ফোনটা কেটে দিয়ে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সেটা আরো ছেলেমানুষি হয়ে যাবে। এমন কিছু সে কখনোই করেনি। নিজের অনুভূতিগুলো চেপে রাখতে সে জানে। সে চায়, তার প্রিয় মানুষগুলো তাকে বুঝুক। তার অভিমান, তার কষ্ট, তার ব্যথার জায়গাটা বুঝে আলতো করে গভীর ভালোবাসায় স্পর্শ করুক।

সে ফোনটা কানে নিলো এবং যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'হ্যালো'।

নয়ন বলল, 'কখন থেকে হ্যালো হ্যালো বলছি, তুমি কথাই বলছ না।'

www.boighar.com

হেমা সত্যি কথাটাই বলল, 'আসলে চাপ লেগে ফোনটা চলে গেছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি।'

নয়ন বলল, 'কেমন আছ তুমি?'

হেমা বলল, 'হ্যাঁ ভালো। তুমি?'

নয়ন বলল, 'ভালোই'।

এ ক'দিনেই কেমন দূরের মানুষের মতো কথা বলছে তারা। হেমা একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। তারপর বলল, 'যখন কেউ ভালোর সাথেই যোগ করে ভালোই বলে, তখন তার মানে হচ্ছে সে ভালো নেই।'

নয়ন মৃদু হাসল। তারপর বলল, 'তুমি তো দিন দিন তাত্ত্বিক হয়ে যাচ্ছ।'

হেমা বলল, 'ভুল কিছু বললাম?'

নয়ন বলল, 'না। তবে তুমি তো জানোই, আমি ভালো নেই।'

হেমা বলল, 'কীভাবে জানব?'

নয়ন বলল, 'আমাকে দেখলেই তো তুমি সব বুঝে যাও।'

হেমা বলল, 'তোমাকে আমি দেখি কই? দেখার সুযোগ কি আছে?'

নয়ন কথা বলল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কেবল। হেমার শরীরটা আবার খারাপ লাগছে। অবশ্য সে কোনোভাবেই নয়নকে বুঝতে দিতে চায় না তার শরীর খারাপ। কিন্তু নয়ন কি তার গলা শুনে একবারের জন্যও বুঝতে পারছে না যে তার শরীর খারাপ? তার কথা শুনেও না?

হেমা বলল, 'কবে ফিরলে?'

নয়ন স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বলল, 'ক'দিন? তিন... চার...। উমমম... পাঁচদিনও হতে পারে। ঠিক মনে নেই।'

হেমার গলার ভেতরের সেই দলা পাকানো জিনিসটা আবার ফিরে আসছে। তার খুব ইচ্ছে করছে সে নয়নকে বলে যে নয়ন তুমি পাঁচদিন হয়ে গেছে ঢাকায় এসেছ, অথচ আমাকে একটু জানাতে ইচ্ছে হয়নি? একটু কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি? দেখা করতে ইচ্ছে হয়নি? এই যে এতক্ষণ ধরে আমি তোমার সাথে কথা বলছি, তুমি কী একবারও টের পাওনি যে আমি ঠিক নেই? আমি সুস্থ নেই? একবারও টের পাওনি? হেমার খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে এসবের কিছুই জিজ্ঞেস করল না। সে কেবল বলল, 'এখন কি করবে?'

নয়ন বলল, 'জানি না'।

হেমা কী বলবে আর? সে আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। নয়নও না। দুজনই ফোন কানে চেপে ধরে চুপ করে বসে রইল। দীর্ঘ সময় পরে নয়ন কথা বলল। সে বলল, 'অনেক রাত হয়েছে এখন ঘুমাও, হ্যাঁ?'

হেমা সাথে সাথে জবাব দিলো না। খানিক চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আচ্ছা'।

নয়ন ফোন কেটে দিলো। হেমা তারপরও দীর্ঘ সময় ফোন কানে চেপে ধরে বসে রইল। সেই কেটে দেয়া ফোনের ভেতর কী এক অবিশ্বাস্য নৈঃশব্দ্য! কী এক অদ্ভুত শূন্যতা। তা হেমা ছাড়া এই জগতে আর কেউ বুঝবে না। কেউ না। সেই নৈঃশব্দ্য, সেই শূন্যতা ক্রমশই ফোনের ভেতর থেকে হেমার বুকের ভেতর ছড়িয়ে যেতে থাকল। হেমার কান্না পাচ্ছে। প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে। গলার কাছে দলা পাকানো ব্যথার মতো কষ্টটা জমাট হয়ে আছে। কী যে কষ্ট হচ্ছে! কী যে কষ্ট! সে যদি খানিক চিৎকার করে, হাউমাউ করে কাঁদতে পারত, তাহলে হয়তো ওই জমাট বাধা কষ্টটুকু গলে গলে ঝরে যেত। কিন্তু সে কাঁদল না।

কীভাবে কাঁদবে সে? কান্নার জন্যও কাউকে দরকার হয় মানুষের। কারো বুকে মাথা রেখে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদবার জন্য হলেও কাউকে দরকার হয়। কিন্তু এই জগতে কারো বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবার মতো কি কেউ আছে হেমার? কাউকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদবার মতো কি কেউ আছে তার? নেই।

হেমা হঠাৎ হড়বড় করে বমি করল। প্রথম দমক শেষ হবার আগেই সে আবারো বিছানা ভাসাল। তারপর আবার। বমিতে ভেসে গেল তার শরীর, বিছানা, মেঝে। সে বার দুই সেই বমির ভেতর থেকে সরে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বরং কাত হয়ে শুয়ে থাকা হেমা বমিতে ভেসে যাওয়া বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। সে জ্ঞান হারাল তার আরো কিছুক্ষণ পর।

হেমার জ্ঞান ফিরল পরদিন ভোরে। সে শুয়ে আছে কোমল কোনো বিছানায়। অদ্ভুত মায়াময় এক সুবাসে তার সারা শরীর ছেয়ে আছে। তার চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এমন অদ্ভুত অনুভূতিতে সময় কেটে যাক। সে চোখ মেলে তাকাল। তার চোখের সামনে রেণুর মুখ! হেমা ঝট করে চোখ বন্ধ করে ফেলল। তারপর আবার তাকাল। রেণু তাকিয়ে আছেন তার দিকে। হেমা বলল, 'মা'।

রেণু হঠাৎ দু'হাতে হেমার গাল চেপে ধরলেন। তারপর আবার পরক্ষণেই সচকিত হয়ে উঠলেন। হাত দু'খানা সরিয়ে নিয়ে স্বভাবসূলভ গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার ফোনে টাকা ছিল না?'

হেমা জবাব দিলো না। সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। রেণু কঠিন গলায় বললেন, 'তোমার এই ফোনটা বদলে ফেলো। একটা পোস্টপেইড সিম কিনে নিও। আর আমি বুয়াকে বলে গেছিলাম রাতেও বাসায় থাকতে। কিন্তু সে যে আর আসেনি সেটি আমাকে জানাবে না?'

হেমা জবাব দিলো না। তার মাথাটা রেণুর কোলে। রেণু আস্তে করে মাথাটা নামিয়ে রাখলেন। তার কাছে বাসায় ঢোকার চাবি ছিল। কিন্তু মা এমন দুম করে চলে এলো কেন? হেমা ভেবে পেল না। তার তো আরও পরে আসার

www.boighar.com

কথা ছিল। রেণু বললেন, 'এই জ্বরে কিছু হয় না। এখন ওঠো। উঠে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও'। বলেই রেণু উঠে চলে গেলেন।

হেমার আবারো মন খারাপ হয়ে গেল। সে জানে, তার শরীর কতটা খারাপ। মারও না বোঝার কথা না। অন্তত এই সময়টায় মা একটু ভালো করে কথা বলতে পারত। হেমার খুব ইচ্ছে করছিল, মাকে বলে যে মা আমি আর কিছুক্ষণ তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকি? তুমি একটু আমার মাথায় বিলি কেটে দেবে মা? আমার চুলে একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

কিন্তু সে সেসবের কিছুই বলল না। সে শুয়ে আছে মা'র বিছানায়। মা একা কীভাবে ওই ঘর থেকে তাকে নিয়ে এসেছে ভেবে পেল না হেমা। সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই শোয়া থেকে উঠে বসার চেষ্টা করল। প্রথম দু'বার পারল না। মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে উঠল। কিন্তু সে উঠবেই। নিজের ঘরে গিয়ে বরং শুয়ে থাকবে। হেমা তৃতীয়বারের চেষ্টায় উঠল। বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এলো। কিন্তু নিজের বিছানার কাছে এসে দেখল খাট থেকে সব কিছু নামিয়ে ফেলা হয়েছে। কোনো বিছানা নেই খাটে। নোংরা হয়েছিল বলেই বোধহয় রেণু পরিষ্কার করতে নিয়ে গেছেন। কিন্তু দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার। মা আর বাবা বহুদিন থেকেই আলাদা ঘরে ঘুমায়। বাবার ঘরটা মার ঘরের পাশেই। হেমা ভাবল সেখানে গিয়ে খানিক শোবে। সে ধীর পায়ে দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে বাবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজা ভেজানো। ধাক্কা দিয়ে খুলতে গিয়ে হেমা থমকে দাঁড়াল। ভেতর থেকে কারো মিহি স্বরে কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সে কিছু সময় স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আলতো হাতে দরজাটা খুলল। এখন সকাল দশটা। চারদিকে চড়চড়িয়ে রোদ উঠে গেছে। কিন্তু ঘরের মেঝেতে একখানা জায়নামাজ বিছানো। সেই জায়নামাজের মাঝখানে রেণু বসে আছেন। তার দুই হাত মোনাজাতের ভঙ্গিতে ধরা। তিনি কাঁদছেন। তার সেই প্রার্থনার পুরোটা জুড়েই ছিল হেমা! কান্নার দমকে দমকে রেণুর শরীর কাঁপছে। হেমা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মায়ের কান্না শুনল। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল তার চোখ বেয়েও পানি নামছে। সে এই পানি তার মাকে দেখাতে চায় না। তার মাও হয়তো তাকে তার চোখের পানি দেখাতে চান না। দরকার কি?

জগতে যা না দেখেও দেখা হয়ে যায়, যা না শুনেও শোনা হয়ে যায়, যা না ধরেও স্পর্শ করা যায়, তার চেয়ে গভীর, তার চেয়ে তীব্র, তার চেয়ে শ্বাশত আর কী আছে?

মানুষের জীবনে কিছু সময় আসে, এই সময় সবকিছু ছেড়েছুড়ে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে হয়। নয়নেরও সেই ইচ্ছেটা হচ্ছে। সে রাতের পর রাত ঘুমাতে পারে না। ঘুমালেও অর্থহীন, এলোমেলো, বীভৎস সব স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। তারপর বাকি রাত কাটে নির্ঘুম। এই সময় জুড়ে কত কত ভাবনা যে সে ভাবে! আসমার মৃত মুখটাও অনবরত ভাসতে থাকে চোখের সামনে। তার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, ঠা ঠা রোদের দুপুরে সে ক্লাস থেকে ফিরেছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে চৌচির। আসমা জানে, এ সময়টা কনকনে ঠান্ডা এক গ্লাস লেবুর শরবত চাই নয়নের। নয়ন ঘরে ঢোকামাত্রই রোজ সে শরবতের গ্লাস নিয়ে দরজায় হাজির হয়। কিন্তু সেদিন বারকয়েক ডেকেও কোনো সাড়া পেল না নয়ন। খানিক বাদে কোহিনূর এলেন। নয়ন বলল, 'আসমা কই মা?'

কোহিনূর নয়নের হাতে শরবতের গ্লাস দিতে দিতে বললেন, 'ওর মা খুব অসুস্থ। বাড়ি থেকে ওর বাবা এসেছিল ওকে নিয়ে যেতে। কিছুক্ষ আগে বেরিয়ে গেছে'।

নয়ন বলল, 'ও'।

ব্যস এইটুকুই। কিন্তু দিন দুই যেতে না যেতেই নয়নের মনে হতে লাগল, বাড়িটা খুব বেশি ফাঁকা। আসমা এ বাড়িতে এসেছে কম দিন হয়নি। চার-পাঁচ বছর তো হবেই! তারপর থেকেই নয়নের সাথে একটা ভাই-বোন ভাব হয়ে গেল তার। একা বলে নয়নও যেন বাড়িতে একটা বোন বা ওরকম কারো অভাব অনুভব করত। তাছাড়া নয়নের নানান এক্সপেরিমেন্ট, ফুট-ফরমায়েশ খাটা, রাগ-বকাঝকা শোনা কিংবা গল্প বলারও একটা মানুষ হয়ে উঠেছিল আসমা। বাড়িতে ঢুকতেই নয়ন সবার আগে চেঁচিয়ে আসমাকে ডাকত। আসমা নয়নের ব্যাগ নিয়ে রেখে দিত জায়গা মতো। নয়নের নেলকাটার থেকে শুরু করে জুতো, মানিব্যাগ, ঘড়ি, খাতা, কলম এমনকি খুচরো কয়েন— সকল কিছুই

www.boighar.com

ছিল আসমার নখদর্পণে। একটা বিশাল নির্ভরশীলতাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল অগোচরে।

তারপরের কয়েকদিন কেটেছে প্রবল বিরক্তিতে। নয়ন জুতো পায় তো মোজা পায় না, মানিব্যাগ পায় তো টাকা পায় না। অতিষ্ঠ হয়েই সে মাকে বলল, 'আসমা আসছে না কেন?'

কোহিনূর জবাব দিতে পারলেন না। আসলে আসমার কোনো খবর তার কাছে নেইও। এই সময়টায় নয়ন রোজ বাড়ি ফিরেই হয় ছাদের চিলেকোঠায় চলে যেত। না হয় ঘরে ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ করে দিত। এর কয়েক মাস আগে থেকেই সে কোহিনূরের আত্মকথা লেখা খাতাগুলো পেয়েছিল। আগে যতটুকুই পড়েছে, আসমা না থাকায় আসমাকে পড়াতে বসানো, তার সাথে এটা সেটা গল্পগুজব করা, টিভি দেখার সময়গুলোও বেঁচে যেতে থাকল। এই সময়ে নয়ন পুরোপুরি ডুবে গেল সেই খাতাগুলোতে। দিনের পর দিন কত কষ্ট করে যে সে একেকটা লাইন পড়ে তার অর্থোদ্ধার করেছে, তা কেবল সে-ই জানে।

আসমা ফিরল প্রায় তিন মাস পর। তাকে দেখে সকলেই হতভম্ব হয়ে গেল। বাড়ি যাওয়ার সময় যে রক্তমাংসের মানুষটা গিয়েছিল, সেই মানুষটাই যেন ফিরে এলো আস্ত একটি কঙ্কাল হয়ে।

আসমাকে দেখেই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নয়ন বলেছিল, 'ভালোই হলো, এবার আর আমার কঙ্কাল কিনতে হবে না। কঙ্কালের কাজটা তোকে দিয়েই চালিয়ে দেয়া যাবে।'

আসমা অবশ্য কোনো জবাব দিলো না। শুধু এই কথায় না, সে মোটামুটি কোনো কথায়ই, কারো সাথেই একদম প্রয়োজন না হলে কোনো কথা বলে না। বিষয়টা নয়নকে খুব অবাক করেছিল। সে নানাভাবে আসমাকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টাও করেছিলে। অসংখ্যবার জিজ্ঞেসও করেছিল কি হয়েছে তার, কিন্তু একটি কথাও মুখ থেকে বের করেনি আসমা। এমনকি তাকে যে সাপে কেটেছিল সে কথাও কাউকে নিজ মুখে বলেনি সে। আসমাকে দিয়ে যেতে এসেছিল তার বাবা, সে-ই যা বলার বলে গিয়েছিল ফখরুল আলমের কাছে। আসমাকে সাপে কাঁটার ঘটনা তাই বাবার কাছেই শুনেছিল নয়ন। কিন্তু সাপে কাঁটার কথা শুনে সবার আগে নয়নের যার কথা মনে হলো, সে হলো আব্দুল ফকির। আসমার কাছে তার বহু গল্প নয়ন শুনেছে। সে আসমাকে দুম করে বলে বসল, 'কী রে, তোর বিষ কে নামাল? সেই যে মুর্দা লাশ যে জিন্দা করে, সেই আব্দুল ফকির?'

আসমা তাও কোনো কথা বলল না। তবে তার মুখ যেন তীব্র আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। সেদিন রাতে আসমাকে নিয়ে বসল নয়ন। দীর্ঘ সময় ধরে আসমার

সাথে কথা বলার চেষ্টা করল সে। কিন্তু আসমা তাতে খুব একটা সাড়া দিলো না। যাও কিছু কথাবার্তা হলো, তাও কেমন অসংলগ্ন মনে হলো নয়নের কাছে। নয়ন একবার ভাবল, মা'র কাছে বিষয়টা খুলে বলে! কিন্তু পরে আর বলল না। তার মা কোহিনূর এমনিতেই কোনো কিছু নিয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখান না। সারাক্ষণ একা একটা ঘরে কাটিয়ে দেন। খুব প্রয়োজন না হলে সেই ঘরে কাউকে ঢুকতে দেন না। কারো সাথে কথা বলেন না। সুতরাং তাকে এসবে যুক্ত করা অর্থহীন।

এর পরের কয়েকটা দিন আসমাকে খুব চোখে চোখে রাখল নয়ন। সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল প্রায়ই একা একা কাঁদে আসমা। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতেই এড়িয়ে যায়। কী হয়েছে তার? কী হয়েছে তার, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নয়নের ডাক্তারী চোখ যেন কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলল। কিন্তু সেই আবিষ্কার বিশ্বাস করার মতো সাহস নয়নের ছিল না। এদিকে মেডিকেলে তার ফাইনাল প্রফ শুরু হয়ে গেছে। এই সময়টা মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জগৎ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সময়। নয়নও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আসমার কথাও প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল। কিন্তু শেষ দুটো পরীক্ষার আগের এক গভীর রাতে অনেকক্ষণ ধরে কারো বমির করার শব্দ পেয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। রান্নাঘরের পাশেই আসমার ঘর। তার বাথরুমটা অনেকটাই দূরে। রান্নাঘরের বেসিনটা সে তুলনায় কাছে। আসমার শরীরটা সম্ভবত এ কদিনে বেশ খারাপ করেছে। নয়ন উঁকি দিয়ে দেখল দেয়ালে হেলান দিয়ে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে বমি করার চেষ্টা করছে আসমা। খুব অস্বাভাবিক কোনো দৃশ্য নয়। কিন্তু নয়নের মনটা কেমন খচখচ করতে লাগল। পরের পরীক্ষাটা দিয়েই সে আসমাকে নিয়ে আবার বসল। কথার মাঝখানে আসমা হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'আমারে বাঁচান ভাইজান। আমারে বাঁচান।'

নয়ন আসমার মাথায় হাত রেখে বলল, 'আমাকে খুলে বল কি হয়েছে!'

আসমা বলল। তার সাপে কাঁটা থেকে আব্দুল ফকিরের বিষ নামানোসহ পুরো ঘটনাই সে খুলে বলল। কিন্তু এখন সে কি করবে? ঘটনা শুনে নয়ন হতভম্ব হয়ে গেল। এত অবাক সে বোধকরি আর কখনো হয়নি। গ্রাম-গঞ্জের ওঝা ফকিরদের এমন নানা ঘটনার কথা সে বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় পড়েছেও। কিন্তু সে সকল কথা ওই পত্রিকা অবধিই, এর বাইরে কখনো চিন্তা করতে পারেনি নয়ন। তার সামনে বসে থাকা আসমা যেন সেই পত্রিকা থেকে বের হয়ে আসা একটা চরিত্র! আসমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারেনি নয়ন। তারপর বলেছিল পরীক্ষাটা শেষ হলেই তাকে নিয়ে ডাক্তারের

কাছে যাবে। আর একটামাত্র পরীক্ষাই বাকি। কিন্তু সেই সুযোগটা তাকে আর দিলো না। নিজেই নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলল আসমা।

আসমার সেই মুখটা নয়ন তাড়াতে পারছে না তার সামনে থেকে। একটা অবর্ণনীয় কষ্ট। নয়নের মনে হচ্ছিল, আব্দুল ফকিরকে পেলে সে খুন করে ফেলবে! কিন্তু সেটি সম্ভব নয়। আসলে তার পক্ষে সম্ভব নয় কিছুই। সে বহুকাল ফতেহপুর যায় না। সেখানে কিছু চেনে না, জানে না। আব্দুল ফকিরকেও না। সে শুনেছে খুবই দুর্গম এলাকা। তাছাড়া আব্দুল ফকিরকে মানুষ ভয় পায়, মান্যগণ্য করে। সেখানে গিয়ে কী করবে সে? তার নানাজান তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে কি ঘটনা খুলে বলবে সে? নয়ন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে নিস্তারও দিতে পারছিল না সে। যেন এক ভয়ঙ্কর আগুনের পিন্ডে অবিশ্রান্তভাবে পুড়ে যাচ্ছিল। পরীক্ষা শেষ হতে খানিকটা অবসর। সেই অবসর সময়ে মায়ের খাতাগুলো নিয়ে আবার বসল নয়ন। নিজেকে যেন আসমার ঘটনা থেকে সরিয়ে নিতে চাইছিল সে। ডুবে থাকতে চাইছিল তার মায়ের অদ্ভুত কৈশোরের রহস্যময় গল্পে। কিন্তু সেই গল্পও তাকে এতটুকু বিরাম দিলো না। বরং এক গভীর রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন হয়ে আসমার গল্পখানা আরো প্রকট হয়ে উঠল তার সামনে। সেই দুঃস্বপ্ন থেকে নয়ন যেন কোনোমতেই আর বের হয়ে আসতে পারল না। প্রচণ্ড দিশেহারা, বিভ্রান্ত, অসহায় লাগতে লাগল তার। নয়ন ভেবে পাচ্ছিল না সে কি করবে! একটা দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত একাকী এক অন্ধকার ঘরে নিজের সাথে সীমাহীন যুদ্ধ করে নয়নের হঠাৎ মনে হলো সে নিজ চোখে সেই ভয়ঙ্কর মানুষটাকে দেখতে চায়। দেখতে চায় মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আব্দুল ফকির নামের মানুষটার সত্যিকারের মুখ ও মানস।

এমবিবিএস শেষ করে যখন অন্য সবাই উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য আটঘাট বেঁধে প্রস্তুতি নেয়া শুরু করছে, নয়ন তখন একটা অদ্ভুত কাজ করল। সে সকলের সাথে যোগযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল ফতেহপুর নামের এক অজপাড়া গাঁয়ে। তার মোবাইল ফোন বন্ধ, ফেসবুক বন্ধ, যোগাযোগের বিকল্প আর কোনো উপায়ও নেই। ফতেহপুরে দীর্ঘ সময় কাটাল নয়ন। এই সময়টা সে সেখানে কী করেছে, কেন করেছে এই নিয়ে তার নিজের কাছেই যেন স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে একটা বিষয় সম্পর্কে নয়ন নিশ্চিত, তা হলো যে ভয়াবহ মানসিক দশার ভেতর দিয়ে সে যাচ্ছে, তাতে এই সময়টা ঢাকায় থাকার চেয়ে ফতেহপুর থাকাটা তার জন্য অনেক বেশি ভালো ছিল।

আব্দুল ফকির নামের মানুষটার প্রতি অবিশ্বাস্য ক্রোধ আর ঘৃণা নিয়েই নয়ন ফতেহপুর গিয়েছিল। কিন্তু সে জানত না, এই ঘৃণা বা ক্রোধে সে আব্দুল

ফকিরকে কতটুকু আঘাত করতে পারবে, কতটুকু আহত করতে পারবে! নাকি মানুষটাকে কেবল দেখতেই চেয়েছিল সে? নয়ন জানে না। তবে আব্দুল ফকিরের সাথে তার দেখা এবং কথোপকথন তার প্রতি নয়নের ঘৃণাকে আরো বহুগুণ বাড়িয়েই দিয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘৃণার সাথে সাথে আব্দুল ফকিরের উপর একটা ভয়মিশ্রিত সমীহও তৈরি হয়েছে নয়নের।

একটা প্রবল দ্বিধা নিয়েই আবার হঠাৎ করেই ঢাকায় ফিরে এসেছে নয়ন। আগামী দিনগুলোতে কি করবে, এই নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না সে। সে কি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিবে? নাকি এই মুহূর্তে এই সকল হিসেব-নিকেশ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে? আজ ভোরে সেই সিদ্ধান্তহীনতা থেকে নিজেকে মুক্তি দিলো নয়ন। আপাতত পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়টা নিয়ে আর ভাববে না সে। তার মস্তিষ্ক জুড়ে একটা বিশাল শূন্যতা। এই মুহূর্তে এই মস্তিস্ক কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারছে না।

তার সিদ্ধান্ত নিয়ে অবশ্য মা তাকে কিছু বলেননি। বাবা ভোরে ফজরের নামাজ শেষ করে তার ঘরে গেলেন। গিয়ে দেখেন নয়ন মশারীর ভেতর বসে আছে। ফখরুল আলম কিছুটা অবাক হলেও কিছু বললেন না। তিনি খুব যত্ন করে নয়নের মশারি সরিয়ে খাটে বসলেন। তারপর মোলায়েম গলায় বললেন, 'এখনো জেগে আছিস?'

নয়ন বলল, 'হু'।

ফখরুল আলম বললেন, 'শরীর খারাপ?'

নয়ন বলল, 'না'।

ফখরুল আলম বললেন, 'তাহলে?'

নয়ন বলল, 'কিছু না'।

ফখরুল আলম ছেলের পিঠে আলতো করে হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'কি হয়েছে বাবা?'

নয়ন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'মেয়ে মানুষের মতো এত প্রশ্ন করছ কেন? এত প্রশ্ন করছ কেন? যাও। এক্ষুণি আমার ঘর থেকে বের হও।'

ফখরুল আলম অত্যন্ত অবাক হলেন। কিন্তু জায়গা থেকে উঠলেন না। নয়ন আবার চোখ বুঁজে ছাদের দিকে মুখ উচুঁ করে মশারীর মধ্যে বসে রইল। তার চোখজোড়া টকটকে লাল। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। ফখরুল আলম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'চা বানিয়ে আনি? একটু চা খেলে ভালো লাগবে।'

নয়ন এবার আর কথা বলল না। সে যেমন বসে ছিল তেমন করেই বসে রইল। ফখরুল আলম ধীরে ধীরে ছেলের খাট থেকে নামলেন। তারপর দীর্ঘ

www.boighar.com

সময় নয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি নয়নের আচরণে কিঞ্চিৎ অবাক হয়েছেন। এর আগে তো নয়ন কখনোই তার সাথে এমন আচরণ করেনি! অবশ্য এতে তিনি যে মন খারাপ করেছেন, এমন না। নয়নের প্রতি তার কোনো অভিযোগও নেই। নিশ্চয়ই কোনো বিষয় নিয়ে ছেলেটা চিন্তিত। তাছাড়া সারারাত জেগে থাকলে মেজাজ একটু-আধটু খিচড়েই থাকে।

ফখরুল আলম রান্না ঘরে গিয়ে ছেলের জন্য যত্ন করে চা বানালেন। বাজারে নতুন এক ধরনের নোনতা টোস্ট বিস্কুট এসেছে। এই বিস্কুটটা চায়ে ভিজিয়ে খেতে ভারি সুস্বাদু। তিনি চা বানানো শেষে সেই বিস্কুটের ক'খানা একটা পিরিচে সাজিয়ে নয়নের জন্য নিয়ে এলেন। নয়নের খাটের সাথেই টেবিল। তিনি টেবিলের কোণায় চায়ের কাপ আর পিরিচখানা রাখলেন। তারপর মশারিটা তুলেলেন। জানালার পর্দাগুলোও সরিয়ে দিলেন। বাইরের আলো মুহর্তেই ঘরটাকে আলোকিত করে তুলল। ফখরুল আলম নয়নের পাশে এসে বসে আলতো করে নয়নের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'একটু চা খেয়ে নে। আর নতুন বিস্কুটটা দেখ, বেশ ভালো বানিয়েছে ওরা।'

নয়ন কোনো কথা বলল না। স্থির বসে রইল যেমন ছিল। ফখরুল আলম এবার টেবিল থেকে চায়ের কাপ আর পিরিচখানা নিয়ে নয়নের সামনে রাখলেন। তারপর বললেন, 'একটা চুমুক দিয়ে দেখ...'

তিনি তার কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই নয়ন চায়ের কাপ আর বিস্কুট সমেত পিরিচখানা ছুড়ে মারল মেঝেতে। ভোরের নিস্তব্ধতায় কাপ আর পিরিচ ভাঙার শব্দটা বড় বেশি কানে বাজল। নয়ন তার চেয়েও জোরে চিৎকার করে বলল, 'তোমাকে বলেছি না, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। এক্ষুণি যাও। এক্ষুণি। বের হও।'

ফখরুল আলম এবার যেন ভয় পেয়ে গেলেন। তবে সেই ভয়ের ভেতরেও একটা বিস্ময়! হঠাৎ কি হলো ছেলেটার? সে জানে, হেমা নামে একটা মেয়ের সাথে নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। তা হেমার সাথে কোনো ঝামেলা হলো না তো! খুব মায়া হতে লাগল তার নয়নের জন্য। কিন্তু কি আর করা?

ফখরুল আলম আবারো ধীর পায়ে উঠলেন। তারপর মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাপ-পিরিচের ভাঙা টুকরোগুলোকে একটা একটা করে কুড়িয়ে জড় করলেন। তারপর সেগুলোকে রান্নাঘরে রেখে এসে ঘরের মেঝেটা যত্ন করে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করলেন। ঝাড়ু দেয়া শেষে আবার নিজের হাতের তালু ঘষে পরখ করে দেখলেন, কোনো সূক্ষ্ম ভাঙা টুকরোও মেঝেতে রয়ে গেছে কিনা!

নয়ন যেমন ছিল তেমনই বসে রইল। সে ঘর থেকে বের হলো দুপুরেরও পর। ফখরুল আলম আজ অফিসে যাননি। তার রান্নার হাত ভালো। তিনি আজ

রান্না করেছেন। রান্না শেষে সারাটাক্ষণ বসে ছিলেন নয়নের ঘরের বাইরে দরজার সামনে। ছেলেটা এখন অবধিও কিছু খায়নি! নয়ন খায়নি বলে তিনিও খাননি। তার অম্বলের সমস্যা আছে। বারকয়েক পেট গুলিয়ে টক পানি উঠে এসেছিল গলা অবধি। তাও তিনি খাননি। একবার ভেবেছিলেন কোহিনূরের ঘরে গিয়ে কোহিনূরকে ডেকে আনবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলাতে পারেননি। কোহিনূরকেও তিনি যথেষ্টই ভয় পান। নয়ন দরজা খুলতেই নয়নের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেলেন তিনি। নয়নের চোখ টকটকে লাল। নয়নের প্রিয় কয়েক পদ রান্না করেছিলেন। ভেবেছিলেন, নয়নকে খাবার কথা বলবেন। কিন্তু নয়নের এই চেহারা দেখে খাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো কিছু বলতে আর সাহস হলো না তার। নয়ন বাবাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ফখরুল আলম বললেন, 'একটা কথা বলি বাবা?'

নয়ন শান্ত এবং কঠিন গলায় বলল, 'না'।

ফখরুল আলম বললেন, 'কিছু খেতে বলব না বাবা। অন্য একটা কথা?'

নয়ন ঠিক একই গলায় বলল, 'না'। www.boighar.com

ফখরুল আলম কাতর গলায় বললেন, 'তোর কষ্ট হলে আমার অস্থির লাগে। আমি খেতে পারি না যে বাবা। আমাকে একটু বলবি, তোর কি হয়েছে?'

নয়ন এবার আগের চেয়েও কঠিন গলায় বলল, 'না'।

ফখরুল আলম ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেলেন। নয়নের চোখের ভাষা ভয়ঙ্কর। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হরিণ শাবকের মতো গুটিয়ে গিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে বাবা'।

ফখরুল আলম জড়োসড়ো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে বড় কোনো অপরাধ করে ধরা খাওয়া অসহায় মানুষের মতো। নয়ন খানিক বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ধপ করে ফখরুল আলমের পায়ের কাছে বসে পড়ল সে। তারপর দু'হাতে ফখরুল আলমের দুই পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ফখরুল আলম কিছুই বুঝলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্বের মতো।

নয়ন বাবার পা জড়িয়ে ধরে একটা ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'আমাকে মাফ করে দাও বাবা, আমাকে মাফ করে দাও। ও বাবা। বাবা। আমাকে মাফ করে দাও। ও বাবা। ও বাবা। বাবা, আমাকে মাফ করে দাও।'

ফখরুল আলম কিছুই বুঝতে পারছেন না। নয়ন একসাথে তার দুই-পা জড়িয়ে ধরে আছে বলে তার দাঁড়িয়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না নয়ন কাঁদছে কেন? এই মুহূর্তে তার কি করা উচিত! তিনি নয়নকে

www.boighar.com

কি বলবেন এখন? আচ্ছা, নয়ন তার কাছে মাফ চাইছে কেন? তিনি কি জিজ্ঞেস করে দেখবেন?

ফখরুল আলম নয়নকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তার গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কী অদ্ভুত! ফখরুল আলমের চোখ বেয়ে গলগল করে পানি বের হচ্ছে। কী বিপদ! তিনি নিজে কাঁদছেন কেন? তার আবার কান্নার কি হলো? তিনি এদিক-সেদিক তাকিয়ে চোখ মোছার কিছু খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু পেলেন না। এই কান্না কেউ দেখে ফেলে ভারি লজ্জার ব্যাপার হয়ে যাবে। কী করবেন তিনি এখন? তিনি হন্যে হয়ে এদিক-সেদিক কিছু খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কিছুই পেলেন না। তার চোখ আটকে গেল বাঁ পাশের বারান্দার শেষ মাথার ঘরের দরজায়। সেখানে দাঁড়িয়ে পিতা-পুত্রের এই দৃশ্য দেখছেন কোহিনূর। কিন্তু তার চোখের ভাষা ফখরুল ইসলাম আজও পড়তে পারলেন না। এই জীবনের কোনোদিন পড়তে পারেনওনি। সেই সুযোগটিই তো কোহিনূর তাকে কখনো দেননি। কী এক অলঙ্ঘনীয় অদৃশ্য দেয়াল তুলে রেখেছেন মাঝখানে।

তাবারনের ঘা শুকিয়েছে। কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও পরিচর্যা না হওয়ায় তার বুকে স্থায়ী ক্ষত রয়ে গেছে। পারুল দেখেছে, তাবারনের দুই স্তনের বেশিরভাগ জায়গাতেই বীভৎস পোড়া দাগ। তবে তাবারন আজকাল আবার কাজকর্ম শুরু করেছে। ফলে পারুলের এখন আবার অনেকটাই অবসর সময়। এই সময়টা তার কাটে নয়নকে ভেবে। তবে পারুল একটা বিষয় খেয়াল করেছে, সে আসলে একটা ছটফটানি চড়ুই পাখি। কোনো কিছু নিয়েই খুব বেশিদিন একনাগাড়ে ভাবতে পারে না সে। পারুলের ধারণা সে আসলে জানে না, কোনো জিনিসে তার আগ্রহ? সেই আগ্রহের পরিমাণ কতটুকু? আর তার ভালো লাগা-মন্দ লাগা হঠাৎ হঠাৎ খুব ওঠানামা করে। তবে এটা সত্যি যে, নয়নকে ভাবতে তার ভালো লাগে। যদিও এমন আগেও অনেকবার হয়েছে তার। দুম করে কাউকে ভালো লেগে গেলে সেই ভালো লাগার মানুষটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই তার দিনমান কেটে যায়।

ভাদ্র মাস শেষ হয়ে আশ্বিনেরও পনের দিন চলে গেছে। এখন শরৎকাল। বৃষ্টি বাদলা তেমন একটা নেই। তবে গ্রামের চারপাশ জুড়ে প্রকৃতিতে কেমন একটা ঝকমকে ভাব। বিশেষ করে নদীর দু'ধার জুড়ে শুভ্রফুলে ছেঁয়ে যাওয়া কাশবন দেখলেই বুকের ভেতরটা কেমন তড়পায়। এমনই এক শরতের বিকেলে লতা এলো। তার প্রচণ্ড মন খারাপ। দু'দিন ধরে আশিকের ফোন বন্ধ। তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পারুল বলল, 'আশিক ভাইর কোনো বন্ধুর নাম্বারে ফোন দে।'

লতা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমার কাছে তো আর কারো নাম্বার নাই।'

পারুল বলল, 'তার ঠিকানায় চিঠি লেখ?'

লতা এবার কেঁদেই দিলো। সে বলল, 'আমার কাছে তো কোনো ঠিকানাই নাই।'

www.boighar.com

পারুল আঁতকে ওঠা গলায় বলল, 'কি বলস?'

লতা পারুলকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসাল। পারুলের মনে তখন অন্য চিন্তা। সে হঠাৎ লতার চুল ধরে টেনে কাঁধ থেকে তার মুখখানা তুলল। তারপর এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, 'ওই ছ্যামড়ি, সবকিছু ঠিকঠাক তো?'

লতা ভেজা গলায় বলল, 'কি ঠিকঠাক?'

পারুল বলল, 'কত জায়গায় দুইজনে গেছ, লঞ্চের কেবিনেও আছিলা। কিছুই কি হয় নাই তোমাগো মধ্যে?'

লতা মাথা নিচু করে ফেলে বলল, 'এগুলান জিগাস কেন?'

পারুল বলল, 'কেন জিগাই বুঝস না?'

লতা এবার আর জবাব দিলো না। পারুল বলল, 'শহরের পোলা পোলা কইরা মরি। কিন্তু তাগো তো চিনি-জানি না। এই কথাখান একবারও ভাবি নাই তো! তারা বহুত চালাক। মৌমাছির মতো, মধু খাওয়া শ্যাষ, উড়াল দিয়া যাইব গিয়া। আর খুঁইজাও পাইব না। এমন কিছু হয় নাই তো?'

লতা জোর গলায় বলল, 'আশিক এমন না। তুই তারে চেনস না। আশিকের মতো মানুষ হয় না। ওর কোনো বিপদ হয় নাই তো পারুল?'

পারুল আর কিছু বলল না। সেও চায় আশিক ঠিকঠাক ফিরে আসুক। লতার প্রতি তার সূক্ষ্ম একটা ঈর্ষার ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে লতার খারাপ কিছু চায়। তবে লতা প্রায়ই আশিকের সাথে লঞ্চে যেত, এটা সে জানে। আশিক ঢাকা থেকে লঞ্চের কেবিন ভাড়া করে সকালে আসত। সেই কেবিনেই আবার বিকেলে ফিরে যেত। ফলে সে যদি সেই কেবিনে লতাকে নিয়ে গিয়ে দরজা আটকায়, কে কি বলবে! বিষয়টা নিয়ে সে বারকয়েক লতাকে সতর্কও করেছিল। কিন্তু হঠাৎই কলেজের ছাত্রী হয়ে যাওয়া লতা কেন ম্যাট্রিক ফেল পারুলের কথা শুনবে!

লতার মন ভালো করতেই তারা গেল নদীর পাড়ে ঘুরতে। ঘুরতে গিয়ে সত্যি সত্যি তাদের মন ভালো হয়ে গেল। বড় খোলা একখানা নৌকায় জুলফিকার আর আব্দুল ফকিরকে দেখা গেল। পারুলকে দেখেই আব্দুল ফকির জুলফিকারকে নৌকা ভেড়াতে বললেন। নৌকা ভেড়াতে পারুলের বায়না, 'আব্বা, আমাগো দুইজনরে একটু নৌকায় ঘুরান। আইজ নদীখান মাশাল্লাহ খুব সুন্দর লাগতেছে।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'একটা জরুরি কাজ আছিল যে মা?'

পারুল বলল, 'জরুরি কাজ তো আপনের সব সময়ই থাকে। আইজ তার চাইতেও জরুরি কাজ আছে। আমার বান্ধবীর মন খারাপ। আইজ সব কাজ বন্ধ আব্বা। আমাগো উঠাইয়া নৌকা ছাড়েন।'

আব্দুল ফকির এক পলক তাকিয়ে লতাকে দেখলেন। মেয়েটার মুখ শুকনা। কিন্তু সেই শুকনা মুখ জুড়েও একটা আলাদা ব্যাপার রয়েছে। ভারি মায়া মায়া চেহারা। নৌকা যেখানে ভিড়েছে, সেখানে সামান্য খাড়া ঢাল। পারুল ছোট্ট লাফে ঢাল পেরিয়ে নৌকায় চলে এলেও লতা পারল না। জুলফিকার নাওয়ের অন্য প্রান্তে বৈঠা ধরে আছে বলে লতাকে নৌকায় উঠাতে যেতে হলো আব্দুল ফকিরকেই। আব্দুল ফকির দেখতে টিনটিনে শুকনো মানুষ হলেও তার শরীরে ভালো শক্তি। তিনি লতাকে ধরে ঢাল পার করালেন। তারপর খানিকটা তুলে নৌকায় উঠালেন। নদীর দুইধারে শুভ্র কাশফুল। আকাশে নীল সাদা মেঘ। ফুরফুরে হাওয়ায় ভারি আনন্দ লাগছিল পারুলের। সে গুনগুন করে গানও গাইছিল। কিন্তু লতা বসে আছে চুপচাপ। বারদুয়েক তাকে কিছুটা আমোদিত করার চেষ্টা পারুল করেছিল, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয়নি।

তারা বড় নদী থেকে ঢুকে গেল সরু একখানা খালে। খালে তুমুল স্রোত। বিলের পানি নামার সময় হয়ে গেছে। এই খাল ধরেই পানি নেমে আসছে। সাথে মাছও। ফলে খালের এখানে-সেখানে গ্রামে তৈরি মাছধরার নানান রকমের ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে। এরমধ্যে একটা ফাঁদের নাম রয়েছে গড়া। খালের এপার থেকে ওপার অবধি পানির সামান্য নিচে বেড়ার মতো করে এই বাঁশের তৈরি গড়া পাতা হয়। গড়ার নিচের অংশ যেখানে মাটির সাথে পুঁতে রাখা হয়েছে, সেখানে মাছ চলাচলের সুবিধার্থে ছোট ছোট ছিদ্র করে দেয়া। আর সেই ছিদ্রপথে পেতে রাখা হয় আরেক ফাঁদ, চাই। খালের এপার থেকে ওপার অবধি দেয়া বেড়ার কারণে মাছ পার হতে পারে না বলে তারা বের হওয়ার পথ খুঁজতে খুঁতে চলে আসে একদম নিচের দিকে মাটির কাছাকাছি। সেখানে হঠাৎ ছিদ্রপথ পেয়ে টুপ করে ঢুকে পড়ে মাছ। আর অমনি ধরা পড়ে যায় চাইয়ে।

গড়ার উপরের দিকের যে অংশটা পানির ওপরে উঠে থাকে আড়াআড়ি খালের এপার থেকে ওপার অবধি, সেই অংশের মাঝখানটা নৌকা চলাচলের জন্য কেটে দেয়া হয়েছে। তিনটে গড়া পার হয়ে এসেছে আব্দুল ফকিরের নাও। চতুর্থ গড়াটার পর থেকেই শুরু ফতেহপুরের তৈয়ব উদ্দিন খাঁর উত্তর কান্দির বিশাল চর। সেই চরের গা ঘেঁষে যে গড়াটা রয়েছে, তার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ থমকে গেল জুলফিকার। থমকে গেল নৌকার আর সকল মানুষও। প্রবল আতঙ্কে যেন শরীরের রক্ত হিম হয়ে এলো। সামনের গড়ার বাঁশের বেড়ায় পানিতে ভেসে আটকে আছে একটা মানুষের লাশ! লাশটা পানি খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। তার মুখখানা বীভৎস ভঙ্গিতে হা করে রয়েছে।

লতা হঠাৎ চিৎকার দিয়ে পারুলকে জড়িয়ে ধরল। তার শরীর কাঁপছে। স্থির হয়ে গেছে পারুলও। প্রথমবার আপনাআপনি চোখ পড়ে গিয়েছিল বলে লাশটা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর চোখ তুলে তাকাল না সে। লতাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল সে। আব্দুল ফকির লাশটা দেখে সামান্য সময় বসে রইলেন। তিনি মানুষটাকে চেনেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর উত্তর কান্দির বিলের ফসল দেখাশোনা করতো মানুষটা। চরের মাঝখানে মাটি কেটে উঁচু ঢিবি করে সেখানে তাকে একখানা বাড়িও করে দিয়েছিলেন খবির খাঁ। কিন্তু শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছু দিন ধরে ঠিকঠাক ফসলের হিসেব দিচ্ছিল না সে।

আব্দুল ফকির মুহূর্তেই পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর হঠাৎ জুলফিকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি নাও ঘোরা জুলফিকার'।

জুলফিকার বলল, 'লাশের বিষয়ে কি করবেন কাকু?'

আব্দুল ফকির মুখে আঙুল চেপে ইশারা করে বললেন, 'চুপ। একদম চুপ। এই লাশ এইখানে দেখছস, এই কথা কাউরেই বলন যাইব না। বললেই বিপদ। মহা বিপদ। আমার নামে মাডার কেস হইয়া যাইব।'

জুলফিকার কিছুই বুঝল না। কিন্তু সে নাও ঘুরিয়ে নিলো। তারা বাড়ি ফিরল মাগরিবের আজানের আগে আগে। লতা তার বাড়িতে বলেই এসেছিল যে সে আজ এই বাড়িতে থাকবে। পারুল আর সে, দুজন ভেতরের ঘরে চুপচাপ বসে রইল। চোখের সামনে এমন করে মৃত মানুষের ভেসে থাকা লাশ তারা আগে কখনো দেখেনি। সেদিন অন্ধকারটা নামল কেমন এক চাপা আতঙ্ক নিয়েই। সেই আতঙ্ক জুড়ে যেন কিসের এক অশনিসঙ্কেতও। এই অশনিসঙ্কেত সবচেয়ে স্পষ্ট যিনি বুঝতে পেরেছেন তিনি হলেন আব্দুল ফকির।

আব্দুল ফকির খানিক সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন বাহির ঘরের দরজার সামনে। তার মাথার ভেতর ঝড়ের গতিতে নানান হিসেব চলছে। এই হিসেবের ফলাফল ভুল হবার কথা না। তিনি বুঝে গিয়েছেন, শেষবারের মতো তিনি তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখোমুখি পড়ে গিয়েছেন। এই লাশ এমনি এমনি উত্তকান্দির চরের খালে পড়ে থাকেনি। এই লাশ তৈয়ব উদ্দিন খাঁর তরফ থেকে আব্দুল ফকির এবং ফজু ব্যাপারীকে সুস্পষ্ট এক বার্তা। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে যুদ্ধে আগের সব ক'বারই আব্দুল ফকির জিতে ফিরেছেন, কিন্তু এবারই সম্ভবত এই যুদ্ধের শেষ অধ্যায়। তবে যুদ্ধটা সরাসরি আব্দুল ফকিরের সাথে না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আব্দুল ফকিরও এই যুদ্ধে জড়িয়ে গেছেন। অবশ্য তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মতো মানুষের সাথে হেরেও আনন্দ। আব্দুল ফকির বুদ্ধিমান, সাহসী মানুষ পছন্দ করেন। সমস্যা হচ্ছে বেশিরভাগ সাহসী মানুষই হয় বোকা। কিন্তু তার দেখা সবচেয়ে সাহসী অথচ একই সাথে বুদ্ধিমান মানুষের নাম এই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ!

খানিকটা গাঢ় করে অন্ধকার নামতেই আব্দুল ফকির বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন। বাড়ি রইল লতা, পারুল, রতন, তাবারন আর নুরুন্নাহার। রতনকে যদি পুরুষ মানুষ ধরা হয়, তবে এই মুহূর্তে সেই বাড়িতে রতন ছাড়া আর কোনো পুরুষ মানুষ নেই। কিন্তু সব সময় হাসিঠাট্টায় মেতে থাকা, তরল স্বভাবের, আপাতদৃষ্টিতে দায়িত্বজ্ঞানহীন পারুলের ভেতর কেমন এক অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে। সে হঠাৎ হঠাৎ পরিস্থিতি এলে মুহূর্তেই নিজেকে বদলে নেয়। খাপ খাইয়ে নেয়। হাসি ঠাট্টায় মেতে থাকা এক চঞ্চলা চপলা গ্রাম্য কিশোরী মুহূর্তেই যেন হয়ে ওঠে অন্য এক মানুষ।

আব্দুল ফকির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ শক্তির মানুষ। তার কন্যার এই বিশেষ গুন তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। আর যায়নি বলেই তিনি কন্যাকে যেমন সমীহ করেন, তেমনি এমন বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কন্যার প্রতি অবলীলায় আস্থাও রাখেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই আব্দুল ফকির জুলফিকার আর বাহির ঘরে থাকা আরো তিন যুবককে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন। যতদ্রুত সম্ভব তাকে পৌছাতে হবে ফতেহপুরের বজলু ব্যাপারীর বাড়ি। তার ধারণা সেই বাড়িতে আজ রাতেই কোনো একটা অঘটন ঘটবে। যদিও তিনি এখনও নিশ্চিত নন, কি ঘটবে! কিন্তু তারপরও দেরী হয়ে গেলে সর্বনাশ। আব্দুল ফকির একখানা কুচকুচে কালো চাদর পরে নিলেন। ঝকঝকে আকাশ দেখেও সাথে নিয়ে নিলেন একখানা কালো ছাতা।

মাঝরাতে তারা ফতেহপুরের নদী থেকে গাঁয়ের দিকে ঢোকা সরু খালখানাতে ঢুকলেন। খালে নৌকা ঢোকার সামান্য সময় পরই নৌকার মাঝি বদলে নেয়া হলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আব্দুল ফকিরদের যেতে হবে খাঁ-বাড়ির সামনে দিয়ে। নৌকার মাঝি ছাড়া আর সকলেই নৌকার ভেতরে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। নৌকার সকল আলো নিভিয়ে সন্তর্পণে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে মাঝি। কিন্তু খাঁ-বাড়ির সামনে কিছুই ঘটল না। কেউ নেই কোথাও। নৌকা খাঁ-বাড়ি পেরিয়ে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সকলে। খাঁ-বাড়ির ঘাটের কিছু পরই খাঁ-বাড়ি জামে মসজিদের বাঁধানো ঘাট। খালের পানি অনেকটাই নেমে যাওয়ায় মসজিদের শান বাঁধানো ঘাটের দু'তিন খানা সিঁড়ি জেগে উঠেছে। তারা সেই সিঁড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। মূল রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে খাঁ-বাড়ি থেকে যতটুকু পথের দূরত্বে ফজু ব্যাপারীর বাড়ি, খাল ধরে গেলে তার অর্ধেকেরও কম পথ। আর সামান্য দূরত্ব সামনে। সকলের মধ্যেই একটা বিপদ কাটানোর স্বস্তি। কেবলমাত্র নৌকার মাঝি তখনও টানটান উত্তেজনায় সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন চারপাশে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নৌকার সামনে একদম নাকের ডগায় একসাথে জ্বলে উঠল প্রায় দশ-পনেরোখানা হারিকেন। অন্ধকার আর তাড়াহুড়ায় আব্দুল

www.boighar.com

ফকিরের নৌকার আর কেউ খেয়ালই করেনি যে তাদের সামনেই পুরো খাল জুড়ে আড়াআড়ি দু'খানা নৌকা রেখে পথরোধ করা আছে। সেই নৌকায় খাঁ-বাড়ির প্রায় দশ-পনেরোটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সকলের হাতেই একেকখানা করে হারিকেন। সমস্যা হচ্ছে আব্দুল ফকিরের নৌকাখানা তারপরও থামল না। সরাসরি গিয়ে আঘাত করল সামনের আড়াআড়ি পথরোধ করে ভেসে থাকা নৌকা দু'খানাকে। গতি কম ছিল বলে তেমন কোনো ক্ষতি না হলেও হৈহৈ করে উঠল খাঁ-বাড়ির ছেলেরা। চারপাশ আলোয় আলোকিত। খবির খাঁ মসজিদের শান বাঁধানো ঘাট বেয়ে নেমে এলেন। তারপর বাঁজখাই গলায় বললেন, 'এই নাও কার? এত রাইতে এই নাও এইহানে কি?'

আব্দুল ফকিরের নাওয়ের ভেতর থেকে জুলফিকার বেরিয়ে এলো। সে বের হয়ে খবির খাঁকে আদবের সাথে সালাম দিয়ে বলল, 'চেয়ারম্যান সাব, গ্রামে এক রুগীরে সাপে কাটছে। তারে নিয়া যাইতে আসছি। ফইর সাবে আছেন দক্ষিণ রূপাতলী তার এক সাগরেদের বাড়িতে। ফইর সাবের শইলডাও খারাপ, এইজন্য তিনি আসতে পারেন নাই। আমরাই রুগী নিয়া রূপাতলী যাইতেছি।'

খবির খাঁ প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথেই এসেছেন। তিনি নিশ্চিত জানেন আব্দুল ফকির এই নাওয়েই আছেন। খানিক আগেও এই খবর তিনি পেয়েছেন। তিনি এই খবরও পেয়েছেন যে আব্দুল ফকির কোনো একটা পরিকল্পনা করার জন্য যাবেন ফজু ব্যাপারীর বাড়ি। কিন্তু জুলফিকারের কথা শুনে তিনি রীতিমত বোকা বনে গেলেন। সামান্য ঝুঁকে উঁকি দিয়ে দেখলেন নৌকার ভেতর আব্দুল ফকির আছে কিনা! কিন্তু নৌকায় আব্দুল ফকিরকে কোথাও দেখা গেল না। অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও তিনি খবর পেয়েছেন, মূল নদী থেকে নৌকা যখন সরু খালে ঢুকেছে, তখনও নাওয়ে আব্দুল ফকিরকে দেখা গিয়েছে। খালে ঢোকার পর নৌকা আর কোথাও ভেড়েও নাই। তার মানে আব্দুল ফকির এখনও নৌকায়ই আছেন। তিনি নৌকায় না থেকে পারেনই না। খবির খাঁ একটা হ্যাজাক লাইটসহ দুজন মানুষ নিয়ে নৌকায় উঠলেন। নৌকার মেঝেতে একটা আঠারো, কুড়ি বছর বয়সের ছেলে শুয়ে আছে। তার পা হাঁটুর নিচ থেকে শক্ত করে বাঁধা। সে পড়ে আছে মৃত মানুষের মতো। তার মুখের কোষ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়েছে। তার মানে এই ছেলেটিকেই সাপে কেটেছে। এর তো ভয়াবহ অবস্থা!

ছেলেটিকে খবির খাঁ চেনেন না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন একে দ্রুত আব্দুল ফকিরের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। তবে সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, নৌকায় আব্দুল ফকির কোথাও নেই! কোথাও না! মানুষটা কোনো জাদুর বলে অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি! খবির খাঁ দীর্ঘ সময় তল্লাশি করেও এর কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। কিন্তু রোগীকে নিয়ে এরা এই পথে কই যাচ্ছে?'

খবির খাঁ সম্ভবত জুলফিকারের প্রথম কথাটি শুনতে পাননি। জুলফিকার প্রথমেই বলেছিল যে আব্দুল ফকির বাড়ি নেই, আর তিনি রয়েছেন দক্ষিণ রূপাতলী। তো দক্ষিণ রূপাতলী যাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ এটিই। খবির খাঁর মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। একটা অজানা আশঙ্কাও কাজ করছে তার মধ্যে। মনির নিজ চোখে দেখে এসে দৌড়ে খবর দিয়েছে তাকে। সে নাকি দেখেছে যে, বড় নদী থেকে খালের মুখে ঢোকার মুহূর্তেও আব্দুল ফকিরকে নৌকায় দেখেছে সে। কিন্তু তাহলে? তাহলে এই এইটুকু পথে সে কই হাওয়া হয়ে গেল?

সবচেয়ে বেশি যেই বিষয়টি নিয়ে খবির খাঁ চিন্তিত, তা হলে তার বাবা তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। আব্দুল ফকিরকে ফজু ব্যাপারীর সাথে বিশেষ কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার এই ঘটনা একদম হাতে নাতে ধরতে চেয়েছিলে তিনি। শুধু তা-ই না, একইসাথে এই মাঝরাতে আব্দুল ফকিরকে যদি চার পাঁচজন মানুষসহ নদী বা খালে নাও নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে আটকে ফেলা যেত, তবে উত্তরকান্দির চরের খুনের দায়টাও তার ঘাড়েই চাপানো যেত! এই পুরো ভাবনাটাই তৈয়ব উদ্দিন খাঁর। কিন্তু আরো একবার পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হলেন খবির খাঁ। আব্দুল ফকির কোথাও নেই!

এখন কি করবেন তিনি? এমন মুমূর্ষু রোগী নিয়ে তাদের আটকে রাখাও ঠিক হবে না। খবির খাঁ নাও ছেড়ে দিতে বললেন। নাওখানা ফজু ব্যাপারীর বাড়ির পাশে না ভিড়ে বাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেল আরো দূরে। কিন্তু আব্দুল ফকির ভোঁজবাজির মতো কোথায় উধাও হলেন?

আব্দুল ফকির তখন ফজু ব্যাপারীর বাড়ির পাশের নলখাগড়ার বনের অন্ধকারে বসে কথা বলছেন ফজু ব্যাপারীর সঙ্গে। আব্দুল ফকিরের সারা শরীর কালো চাদরে ঢাকা। তার গা, মাথা বেয়ে টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে পানি। কিছুটা পথ সাঁতরে আসতে হয়েছে তাকে। মূল নদী থেকে এই সরু খালে নৌকা ঢোকার সময়ই আব্দুল ফকির মাঝিকে সরিয়ে নিজেই মাঝির আসনে বসে পড়েছিলেন। আগে থেকেই কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিলেন তিনি। কালো চাদরে আবৃত আব্দুল ফকির খাঁ-বাড়ির ঘাট পার হতেই হঠাৎ চারপাশে অস্বাভাবিক কিছু শব্দ, নড়াচড়া টের পেয়েছিলেন। মসজিদের ঘাটের সামনে আসতেই সামনের অন্ধকারে নৌকার ছায়মূর্তিগুলোকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। আর দেখামাত্র নিঃশব্দে নৌকা থেকে পানির মধ্যে নেমে গিয়েছিলেন তিন। তারপর দীর্ঘ এক ডুবে পেরিয়ে এসেছিলেন সামনের নৌকাগুলোকেও। সকলেই তখন আব্দুল ফকিরের নৌকা নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত থাকায় আব্দুল ফকিরকে কেউ খেয়ালই করেনি। তিনি ততক্ষণে খালের স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতরে চলে এসেছেন ফজু ব্যাপারীর বাড়ি।

www.boighar.com

আব্দুল ফকির নিচু গলায় বললেন, 'সামনে সময় খুব খারাপ ফজু'।

ফজু বলল, 'কেন? খারাপ কেন কাকু? কি করব সে?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'কি করব সেইটা এখনও বলন যায় না। তয় একখান কথা বলি, আমার ধারণা কোনো কারণে বড় খাঁ সন্দেহ করতেছে।'

ফজু বলল, 'কি সন্দেহ করতেছে?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তুই জমিজমা নিয়া কিছু করতেছস। আর লগে আমিও আছি।'

ফজু বলল, 'এইটা আইজ হোক, কাইল হোক, সে তো জানতোই।'

আব্দুল ফকির চিন্তিত গলায় বললেন, 'তা জানত'।

ফজু বলল, 'এইজইন্যই তো আপনের উপর ভরসা কাকু। আপনে ছাড়া আর কেউ তার লগে সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দিতে পারব না।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তোর লইগ্যা আমি সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দিলে তোর সব গোপন খবর তো আমার জানন লাগব।'

ফজু বলল, আমার তো কোনো গোপন খবর নাই কাকু। যা বলনের সব তো আপনেরে বইলাই দিছি! আর তো বলনের কিছু নাই।'

আব্দুল ফকির কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ অন্ধকারেই তার মুখখানা ফজু ব্যাপারীর মুখের কাছে নিয়ে এলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'আব্দুল ফইর যে বাতাসে ঘ্রাণ পায়, জানস?'

ফজু হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। সে আব্দুল ফকিরের এই রূপের সাথে সরাসরি পরিচিত না। আব্দুল ফকির বললেন, 'তুই কিছু একটা আমার কাছে গোপন করতে আছস ফজু। খুব বড় কিছু। ঘটনাটা আমার জানন দরকার। আমি না জানলে সেই জিনিস তুই তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কাছেরতনও বাঁচাইতে পারবি না। কথাটা মনে রাখিস।'

ফজু কাঁপা গলায় বলল, 'আল্লাহর কছম ফইর কাকু। যা বলনের সব আপনেরে বলছি। আপনেরে না বললে আর কারে বলব? আপনে ছাড়া এই বিপদে আমাগো আর কেডা আছে?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তোগোর বিপদ কিয়ের রে ফজু?'

ফজু প্রসঙ্গ বদলাতে পেরে যেন খানিক স্বস্তি বোধ করল। সে বলল, 'এই যে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ, খবির উদ্দিন খাঁ, পুরো খাঁ বংশ আমাগো শত্রু হইয়া উঠতেছে।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'খাঁ বংশের কি এহন আর তোগো শত্রু হওনের সময় আছে? ছাল নাই কুত্তার বাঘা নাম। ব্যাপারীগো কী আছে যে তাগো লগে খাঁ বংশের নতুন শত্রুতামি শুরু হইব?'

ফজু বলল, 'এই যে নতুন কইরা আবার পুরোনো জমিনের খোঁজ শুরু করছি। কাগজপত্রে ওই জমিন তো ব্যাপারীগো কাকু। আপনে তো সবই জানেন।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'জানি দেইখাই তো জিগাইতেছি। এত বছর তিন ওক্ত ভাত জোটে নাই, আর আচুক্কা সেই ব্যাপারীরা তাগো পুরোনো জমিনের হিসাব লইয়া খাঁয়গো লগে টক্কর লাগতে যাইতেছে, ঘটনা এত সহজ ফজু? আসল ঘটনা বল? না বললে তুই-ই পস্তাইবি। আমি তোর শত্রু না। খাঁয়রা তোর যেমন শত্রু, আমারো শত্রু। আর শত্রুর শত্রু সব সময় বন্ধু হয়। আপন হয়। তাইলে তুই আর আমি তো আপনই।'

ফজু বলল, 'এই জইন্যাই তো আপনের ধারে গেছি কাকু। আপনে ছাড়া তো আমাগো আপন আর কেউ নাই।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তাইলে আসল ঘটনাখান খুইলা বল। আচুক্কা এত পয়সাপাতি কই পাইলি?'

ফজু বলল, 'হেইদিনই তো আপনেরে বললাম কাকু, সবাই মিল্যা দিতাছি। আমার ভাইয়েরাও ঢাকারতন পাঠাইতেছে। এতদিন ধইরা জমাইছে। ব্যাপারী বংশের আর যারা যেইহানে আছে, সবাইই চায় ব্যাপারীগো জমিন ফিরা আসুক। এইজইন্য যে যা পারে দিতেছে।'

আব্দুল ফকির কথা বললেন না। কিন্তু অন্ধকারে তার চোখজোড়া ভয়ঙ্কর কোনো শিকারী জন্তুর মতো ধকধক করে জ্বলতে লাগল।

www.boighar.com

ঘটনা ঘটল পরদিন রাতে। ফজু ব্যাপারীর বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতি হলো। সমস্যা হচ্ছে ডাকাতরা ফজু ব্যাপারীর বাড়ি থেকে কিছুই নিয়ে যায়নি। নেয়ার মতো কিছু অবশ্য ফজু ব্যাপারীর বাড়িতে নেইও। কিন্তু ডাকাতদের ডাকাতি চেষ্টার ধরনে এটি স্পষ্ট যে তারা বিশেষ কোনো কিছুর খোঁজে এসেছিল। ফজু ব্যাপারী ও তার স্ত্রীর হাত মুখ বেঁধে রেখে তারা সারা ঘর তন্ন তন্ন করে কিছু খুঁজেছে। শুধু খুঁজেই যে তারা ক্ষ্যান্ত হয়েছে তা না। ফজুব ব্যাপারীর ঘরের মেঝে, চৌকির তলা, উঠানের মাটি অবধি তারা খুঁড়েছে। সকাল বেলা এই খবর নিয়ে ফজু ব্যাপারী নিজেই গেল খাঁ-বাড়ি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এই গাঁয়ের মাথা। এতবড় ঘটনা তাকে জানানো অতি আবশ্যক। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর খবির খাঁকে ডাকলেন। খবির খাঁ বললেন, 'খুবই চিন্তার বাজান। ফজুর ঘরে কে ডাকাতি করতে যাইব? তার ঘরে ডাকাতি করনের কি আছে?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ গম্ভীর গলায় বললেন, 'এইটাই তো চিন্তার বিষয়। ফজু, বল তো, তোর লগে কারো কোনো শত্রুতা নাই তো?'

ফজু মিনমিনে গলায় বলল, 'আমি গরীব মানুষ। দিন আনি দিন খাই। আমার লগে কার শত্রুতা থাকব?'

তৈয়র উদ্দিন খাঁ বললেন, 'গর্দভের মতো কথা বলিস না ফজু। একখান কথা মনে রাখবি, বন্ধু চেননের আগে শত্রু চেনন অতি জরুরি। বন্ধু না চেনলেও ক্ষতি নাই। কারণ বন্ধু কোনোদিন ক্ষতি করে না। কিন্তু শত্রু চেনন জরুরি। শত্রু না চেনলে সে ক্ষতিটা করতে পারে সহজে।'

ফজু বলল, 'আমি তো কিছুই বোঝতে পারতেছি না। কার কথা কী বলব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার বড়পুত্র খবির খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খোঁজ-খবর নে। আমি বাইচ্যা থাকতে আমার গ্রামে এইসব ঘটনা চলব না। এই ঘটনা দূরের কোনো মানুষ করে নাই। করছে কাছের কোনো মানুষ। ফজুর লগে কথা

বল। অগো বাড়ির অন্যগো লগে কথা বল। ও যাগো লগে কাজ কাম করে তাগো লগে কথা বল। এই কাজ কে করছে, এইটা বাইর করন কঠিন কিছু না।'

খবির খাঁ বললেন, 'জ্বে বাজান'।

ফজু চলে যেতেই খবির খাঁকে আবার ডাকলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তারপর বললেন, 'ঘটনা কিছুই টের পাইছস?'

খবির খাঁ চিন্তিত গলায় বললেন, 'কি ঘটনা বাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'ফজু আগেই জানত তার ঘরে রাইতে ডাকাতি হইব।'

খবির খাঁ তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি ভড়কে যাওয়া গলায় বললেন, 'কী বলেন বাজান? সে জানব কেমনে?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কাইল রাইতে কারে কারে পাঠাইছিলি অর বাড়ি?'

খবির খাঁ একে একে নাম বললেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এদের মধ্যেই কেউ ফজুরে আগেভাগে জানাই দিছে যে রাইতে তার বাড়িতে লোকজন যাইব। ঘরে দামী জিনিসপত্র কিছু থাকলে সে যেন সরাই ফেলায়। যে বলছে, সে এই কথাও জানে, ফজুর ঘরে আমরা কি খুঁজতে লোক পাঠাইছি।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথা শুনে খবির উদ্দিন খাঁ এতটাই অবাক হয়ে গেলেন যে তিনি সাথে সাথে কোনো কথা বলতে পারলেন না। নিজেকে আজকাল সত্যি সত্যিই তার বোকা মনে হচ্ছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সব কিছু পইপই করে শিখিয়ে দেওয়ার পরও তিনি একের পর এক ব্যর্থ হচ্ছেন। কোনোকিছুই ঠিকঠাক করতে পারছেন না।

গতকাল ভোরে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তাকে ডেকে বললেন যেন রাতের অন্ধকারে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে ফজু ব্যাপারীর ঘরে আচমকা তল্লাশি চালানো হয়। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ফজু ব্যাপারী সেই গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে! আর খুঁজে পেয়েই সে তার পূর্বপুরুষের জমিজমা উদ্ধারে উঠে পড়ে লেগেছে। খবির খাঁর উচিত সবার আগে সেই মহামূল্যবান গুপ্তধন হস্তগত করা। সুতরাং এই তল্লাশি এমনভাবে করতে হবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে কে করেছে! ফজুর ঘরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা খুঁজতে হবে, প্রয়োজনে সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে মাটি খুঁড়েও দেখতে হবে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথামতো সব কাজই খবির খাঁ করিয়েছেন। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি। আর এখন তিনি বলছেন ফজু ব্যাপারী আগে থেকেই সবকিছু জেনে গিয়েছিল! এইজন্যই তাহলে সে আসল জিনিস সরিয়ে ফেলেছিল? কিন্তু ফজু ব্যাপারী কি করে জানল? আর ফজু ব্যাপারী এই ঘটনা আগে থেকেই জেনে গিয়েছিল, সেটিই বা আবার তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কি করে জানলেন?

www.boighar.com

খবির খাঁর মাথা কাজ করছে না। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভীত গলায় বললেন, 'বাজান, আপনে কেমনে বোঝলেন যে ফজু এই কথা আগেই জানত?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ফজুর কথাবার্তা শুইনা, ভাবভঙ্গি দেইখা বোঝস নাই? কারো বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটলে তার মইধ্যে যেই ভাব থাকনের কথা, ফজুর মইধ্যে তার কিছুই দেখছস? তার মইধ্যে তার কিছুই ছিল না। তারে দেইখ্যা আরো মনে হইছে, সে আগে থেইকাই রেডি আছিল যে ঘটনা ঘটার পর বেয়ান হইলেই সে আমার কাছে নালিশ লইয়া আসব। আর এই ঘটনায় তার আমার কাছে আসনের কথা না। আসনের কথা তোর কাছে। সে আসলে জানত, সবকিছু হইছে আমার বুদ্ধিতে। এইজন্য সে সরাসরি আমার কাছে আসছে এইটা বুঝাইতে যে, সে ঘটনা নিয়া যারপরনাই ভয় পাইছে। এহন এর বিচার জানি আমি করি। এতে কইরা এই ঘটনা যে সে আগেই টের পাইছে এইটাও যাতে আমি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করি!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথা খুব মনোযোগ দিয়েই শোনার চেষ্টা করলেন খবির খাঁ। কিন্তু তারপরও কিছুই যেন পুরোপুরি বুঝতে পারলেন না তিনি। কিছুক্ষণ বাবার সামনে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকার পর খবির খাঁ বললেন, 'এহন কি করব বাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'একখান কাজ কর। ফজু ব্যাপারীর লগে ওঠা-বসা বেশি, অর লগে রেগুলার কাম কাইজ করে এমন দুই-তিনজনরে খুঁইজা বাইর কর। তাগো সন্দেহ করস বইল্যা সালিশ বসা। সালিশে আমারে ডাকিস না। এলাকার আর যারা মুরুব্বী আছে, তাগো নিয়া একটা কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা কর।'

খবির খাঁ এবার আর অবাক হলেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর চিন্তা ভাবনা যে তিনি এই জনমে বুঝবেন না, এটা তিনি মেনে নিয়েছেন। তিনি বাবার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, 'গত দুই তিন বছর যারা যারা বর্গা জমিনের ফসল ঠিকঠাক মতো না দিয়া নানান সময় উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলছে, এমন উঠতি দুয়েকজন মাতবররেও এই সন্দেহের দলে যোগ কর। শালিসে বিচার যেন কড়া হয়। কিন্তু শাস্তি দেওন দরকার নাই। শাস্তি দেওনের আগে আমার কাছে পাঠাবি। আমি মাফ কইরা দিব। কথা বুঝছস?'

খবির খাঁ বললেন, 'জ্বে বাজান'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হঠাৎ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'কিচ্ছু বুঝস নাই। কিচ্ছু না।'

খবির খাঁ স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার আর কোনো শব্দই উচ্চারণ করলেন না তিনি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ক্ষমতা রাখতে হইলে শক্ত যেমন হওন লাগে, তেমন নরমও হওন লাগে। ক্ষমতায় কঠিন শাস্তি দিয়া নিজের শক্তি যেমন প্রমাণ করন লাগে। তেমনে আবার কোনো কোনো সময় শাস্তি না দিয়া দয়া মায়াও দেহান লাগে।'

খবির খাঁ এবারও কোনো কথা বললেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'উত্তরকান্দির বিলের মতি মেয়ার লাশ নিয়া কিছু হইছে?'

খবির খাঁ বললেন, 'এহনো কেউ কোনো খবর দেয় নাই বাজান।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এস্কান্দাররে তো খুন করতে বলা হয় নাই। তারে বলা হইছিল কঠিন শাস্তি দিতে। খুন ছাড়া কি কঠিন শাস্তি দেওন যায় না নাকি? সেও হইছে তোর মতো একটা গাঁধা। আমার চারপাশ গাধায় ভরপুর। আমি চোউখটা বুজব আর সাথে সাথে এই খাঁ বংশটারে বারো ভূতে লুইটা পুইটা খাইব। খাঁ-বাড়ির উঠানে ঘাস গজাইব। লাঙ্গলের ফলা পড়ব। তারা আনন্দফূর্তি কইরা ধান ফলাইব!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কপালের শিরা কাঁপছে। তাকে এমন রাগতে সচরাচর দেখেননি খবির খাঁ। তিনি রীতিমতো আতঙ্কিত বোধ করছেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, 'তুই এহন যা। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ।'

খবির উদ্দিন খাঁ যত দ্রুত সম্ভব ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তাতে শান্তি পেলেন না। তার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। তার ঘরের এই গোপন ঘটনা ফজু ব্যাপারীকে আগেভাগে জানিয়েছে কে? এ খুবই ভয়ঙ্কর ঘটনা। ঘরের ইঁদুরে বাঁধ কাটলে ঘরের বেড়া রাখা যায় না। এই ইঁদুরকে তাকে অতিসত্বর খুঁজে বের করতে হবে। করতেই হবে।

সে রাতে আবার ঘুম হলো না তৈয়ব উদ্দিন খাঁর। তিনি সারারাত জেগে জেগে ভাবলেন। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলেন না। ফজরের আজান হলে তিনি নামাজে গেলেন। নামাজ শেষ করে সেদিন ভোরে আর হাঁটতে বের হলেন না তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। এস্কান্দার এসেছে তাকে ডাকতে। তিনি এস্কান্দারকে বললেন তার সকালের খাবার দিতে। খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তার মাথার বাম দিকটায় চিনচিন করে কিঞ্চিৎ ব্যথা হচ্ছে। তিনি ব্যথাটাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না। এস্কান্দারকে ডেকে পান খেতে চাইলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। কিন্তু সেই পান তিনি খেতে পারলেন না। পান মুখে দেয়ার আগেই হড়বড় করে বমি করলেন তিনি। এস্কান্দার ছুটে এসে তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে ধরতে গেল। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হাত তুলে নিষেধ করলেন।

www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর নিষেধ অমান্য করার সাহস এস্কান্দারের নেই। সে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তারপর আরো বার দুই বমি করলেন। বমি করা শেষে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর নিজে নিজেই টেবিল থেকে পানির জগ টেনে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানালার বাইরে ভোরের আলোয় ঝলমলে দিন। খাঁ-বাড়ির নানান কাজের মানুষদের পদচারণায়, কোলাহলে মুখরিত উঠান। কার এক ছোট্ট শিশু আদুল গায়ে বসে আছে উঠানে। তার সামনে একখানা বাটিতে কিছু মুড়ি। কিন্তু শিশুটি মুড়িগুলো খাচ্ছে না। সে মুঠো করে মুড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছে উঠানের মাটিতে। সেখানে ভিড় করেছে অনেকগুলো মুরগির ছানা। ছানাগুলি খুটে খুটে মাটি থেকে তুলে মুড়ি খাচ্ছে। শিশুটি তার চোখভর্তি আনন্দ নিয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। আর খানিক পরপর মুড়ি ছুড়ে মারছে।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মুখে পানি নিয়ে বারকয়েক কুলি করলেন। তারপর এস্কান্দারের কাছে জগটা দিয়ে তেমন দাঁড়িয়েই রইলেন। শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে তার ভালো লাগছে। কী আনন্দ নিয়েই না সে মুরগির বাচ্চাগুলোকে খাবার দিচ্ছে। খানিক বাদে বাদে খিলখিল করে হাসছে শিশুটি। আর চোখেমুখে রাজ্যের আনন্দ নিয়ে দেখছে।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হঠাৎ মনে হলো জগতে মানুষ আসলে এই দেখতেই আসে। জীবন জুড়েই মানুষের সবচেয়ে বড় পিপাসার নাম দর্শন। সে সকল কিছুই দেখে নিতে চায়। দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখতে চায়। প্রিয় জায়গা, প্রিয় মানুষ, প্রিয় জিনিস দেখতে চায়। সে দেখতে চায় তার চারপাশে মানুষ তাকে ভয় পাচ্ছে, ভালোবাসছে, সম্মান করছে। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে সে দিনের আলো দেখতে চায়, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখতে চায়, জোছনা রাত, বৃষ্টির দিন দেখতে চায়। জীবন জুড়ে এই দেখাদেখির প্রবল ইচ্ছা মানুষকে বেঁচে থাকতে লোভ দেখায়। হয়তো এইজন্যই মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। কারণ মৃত্যু তার কাছে এক অন্ধকার জগতের নাম। যেই জগতে সে আর কিছুই দেখতে পায় না। বা সে নিশ্চিত করে জানে না, আসলে সেখানে সে কী দেখবে!

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার কাছ থেকে সরে এলেন। তার মধ্যে অবচেতনেই প্রবলভাবে মৃত্যুচিন্তা কাজ করছে। বিষয়টা তিনি সাধারণত গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু আজ কেন যেন গ্রাহ্য না করে পারছেন না। তার বয়স হয়েছে, মৃত্যুচিন্তা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এত বয়স হলেও তিনি সাধারণত মৃত্যুচিন্তা করেন না। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় রাখা চেয়ারে বসলেন। এস্কান্দার একজনকে ডেকে ঘরের নোংরা মেঝে পরিষ্কার করালো। বিছানার চাদর বদলে দিলো। তারপর এসে দাঁড়াল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর পাশে।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এস্কান্দারের তিকে তাকালেন না। তবে খুব ধীরে সময় নিয়ে কথা বললেন। তিনি বললেন, 'এ বমির খবর কাউরে বলিস না'।

এস্কান্দার মাথা কাঁত করে বলল, 'জ্বে, বলব না'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'জীবনরে নিয়া কহনো ভাবছস এস্কান্দার? এই যে জীবন, মৃত্যু?'

এস্কান্দার ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বলল, 'কোনো জীবন দাদাজান? ধলপারের জীবন মাতুব্বর? সে তো মরে নাই। তারেও কী খুন করন লাগব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আর কথা বললেন না। মাঝে-মধ্যে তিনি অবাক হয়ে যান, চারপাশে এমন সব মাথামোটা গর্দভ নিয়ে তিনি এখনও সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো বেঁচে আছেন কীভাবে?

এস্কান্দারই বলল, 'উত্তর কান্দির চরের মতি মেয়ারে কিন্তু আমি খুন করতে চাই নাই দাদাজান। আপনের কথার উল্টা কিছু করনের সাহস আমার নাই। কিন্তু ঘটনা ঘইট্যা গেছে। লাথিখান মারছিলাম তলপ্যাটে, দম আটকাইয়া মইরা গেল। তয় একখান কথা দাদাজান, আপনে বাজানের এত কেরছা-কাহিনি শুনাইছেন, মনে মনে দুই চাইরখান খুন করনের বাসনা আমারও হইছিল। ইচ্ছা কইরা না করলেও, একখান বাসনা কিন্তু পূরণ হইয়া গেল। খুন একখান নেশার লাহান। একবার করলে বারবার করতে ইচ্ছা হয়। আপনে বললে, জীবন মাতবররে খুনটা আমি করতে চাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ঘাড় ঘুরিয়ে এস্কান্দারের দিকে তাকালেন। আপাতঃদৃষ্টিতে দেখতে বোকাসোকা, নিরীহ এই মানুষটার ভেতরও কী ভয়ানক এক খুনি ওঁত পেতে বসে আছে, ভাবতেই অবাক লাগে তার। মানুষ এমন করে রোজ কত কিছু তার ভেতরে লুকিয়ে রাখে? এই লুকিয়ে রাখাটাও আসলে মৃত্যুর মতো। প্রতিটা মানুষের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলার মতো দূরত্বে লুকিয়ে থাকে মৃত্যু। কেউ জানে না সে কখন তাকে গ্রাস করে নেবে। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ঘর থেকে এক পা বাইরে ফেলে দ্বিতীয় পা ফেলার আগেই এই মৃত্যু তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকা কারো জীবনেও বছরের পর বছর মৃত্যু নাও আসতে পারে। কী অদ্ভুত!

আবারো ঘুরে ফিরে সেই মৃত্যুচিন্তায়ই ঢুকে গেলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। আজ কি হয়েছে তার! খানিক আগের ওই হঠাৎ চিনচিনে মাথাব্যথা, তারপর বমি আর তারপর থেকেই এই ক্রমাগত মৃত্যুচিন্তা এ সকল কী কিছুর ইঙ্গিত?

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আবারো কথা বললেন। তিনি বললেন, 'শোন এস্কান্দার, জীবন হইল সময়। ধর তুই এক থেইকা একশ বছর বাঁচলি, এইটা কি? এইটা

www.boighar.com

আসলে আর কিছুই না, সময়। ধর নদীভর্তি পানি থেইকা তুই এক কলসি পানি আনলি, নদীর পানি কিন্তু কমলো না। কারণ ওই নদীভর্তি পানি হইল গিয়া সময়ের মতো। জীবন শেষ হইয়া যায়, সময় কিন্তু শেষ হয় না। সময়ের কোনো শেষ নাই। আর ওই যে এক কলসি পানি আনলি, ওইটুক হইল জীবন। ওই কলসির পানি প্রত্যেকদিন একটু একটু কইরা ঢাললেও শেষ হইতে থাকে। কলসি যতই বড় হোক না কেন, একসময় ওই পানি শেষ হইবোই। জীবনও। তুই যত বছরই বাঁচস না কেন, তোর আয়ু একদিন না একদিন শেষ হইবোই।'

এস্কান্দার এই মুহূর্তগুলোর সথে পরিচিত। সে জানে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ প্রায়ই এমন কিছু কথা বলেন, যেগুলো বোঝার সাধ্য তার নাই। কিন্তু এই সময়গুলোতেও সে খুব মন দিয়ে তার কথা শোনার ভান ধরে থাকে। যদিও সে নিজেও জানে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এই কথাগুলো তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন না, তিনি বলছেন মূলত নিজেকেই। এই কাজটি তিনি মাঝে-মধ্যে করেন। নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলেন। তবে এই সময়ে এস্কান্দার হয়ে ওঠে তার কথা বলার উপলক্ষ মাত্র। এস্কান্দার বরাবরের মতো এবারো মৃদু গলায় বলল, 'জ্বে, দাদাজান।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'জীবনে সকলেই সহজ কাজ করনের চেষ্টা করে। কিন্তু সহজ কাজ করনে কোনো আনন্দ নাই, আনন্দ কঠিন কাজ ঠিকঠাক করনের মইধ্যে। মানুষ খুন করন কোনো কঠিন কাজ না, এইটা হইলো সহজ কাজ। কঠিন কাজ হইলো মানুষ বাঁচাই রাখন।'

এস্কান্দার বলল, 'জ্বে দাদাজান।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমার ওযুর পানি দে, আমি নামাজ পড়ব।'

এস্কান্দার অবাক গলায় বলল, 'এহন কোন ওয়াক্তের নামাজ দাদাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এস্কান্দারের কথার জবাব দিলেন না। তার মাথায় কোনো একটা বিশেষ চিন্তা ঘুরছে। তিনি সেই চিন্তাটাকে ধরতে পারছেন না। ঘরে ঢুকে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ গায়ের জামা বদলালেন। লুঙ্গী বদলালেন। তারপর জায়নামাজ পেতে নামাজে বসলেন। নামাজ শেষ করে সালাম ফিরাতে গিয়ে তার হঠাৎ মনে হলো তিনি চিন্তাটা ধরতে পেরেছেন। খাটের নিচে একটা ধেড়ে ইঁদুর আঁতিপাঁতি করে কিছু খুঁজছে। নামাজে সালাম ফিরাতে গিয়ে তার চোখ পড়েছে সেই ইঁদুরের উপর। সাথে সাথেই তার মনে হলো তিনি চিন্তাটা ধরতে পারছেন। গতকাল ফজু ব্যাপারীকে কে তার ঘরের খবর আগেভাগে পৌঁছে দিয়েছে সেটি তিনি ধরতে পেরেছেন। তিনি প্রবল বিস্ময় নিয়ে ইঁদুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, এতকাল ধরে এমন করেই তার ঘরেই একটা ইঁদুর তিনি পেলে পুষে রেখেছেন, ভাবতেই কেমন অস্বস্তি হতে লাগল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর!

হেমার শরীর এখন খানিকটা ভালো। মাঝখানে আসলাম সাহেব ফোন করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আপাতত কিছুদিন তিনি সকল কিছু থেকে দূরে থাকতে চান। হেমার জন্য তার খুব চিন্তা হচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সকল কিছু থেকে একটা দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা তার প্রয়োজন। মাঝে-মধ্যেই তিনি হেমাকে ফোন করে খোঁজ-খবর নেবেন। হেমার টাকা-পয়সা দরকার হলে কি করতে হবে, সেটিও তিনি বলে দিয়েছেন। বলেছেন, বাবাকে নিয়ে হেমা যেন দুশ্চিন্তা না করে। তার ফোন বন্ধ থাকলেও চিন্তার কিছু নেই। হেমা অবশ্য বাবাকে কিছু বলেনি। এমনকি তার অসুস্থতার কথাও না। ফোনের কথোপকথনের পুরোটা সময় জুড়ে আসলাম সাহেবই কথা বলে গেছেন, হেমা খুব একটা কথাবার্তা বলেনি। এই সময়টায় আসলাম সাহেবের কণ্ঠ বেয়ে প্রবল দুঃখী, বঞ্চিত, আহত এক মানুষের হাহাকার ভেসে এসেছে।

কিন্তু ফোনটা রাখার পরপরই হেমার মনে হলো তার বাবার গলায় একটা চাপা আনন্দ ছিল। তিনি অনেক চেষ্টা করেও সেই আনন্দটা লুকাতে পারেননি। তার এই আনন্দটা মুক্তির আনন্দ।

মানুষ জগতের আর সকল আনন্দ লুকাতে পারলেও মুক্তির আনন্দ লুকাতে পারে না।

বাবা কি তবে এই সংসার, এই সম্পর্ক থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করে ফেলতে পেরেছেন? তার কি একটুও মায়া হচ্ছে না? মানুষ যদি কোনো বন্দিখানায় বছরের পর বছর বন্দি থাকার পর মুক্তি পায়, তারপরও দীর্ঘ সময় অবধি সেই বন্দিখানার জন্য তার মন কেমন করে। হয়তো সেই বন্দিখানার কোনো আনন্দের স্মৃতি তার নেই। হয়তো তার পুরোটা জুড়েই রয়েছে অসহনীয় সব কষ্টের গল্প। তারপরও একটা মন কেমন করা অনুভূতি তার হয়। একটা মায়া হয়। এই মায়ারা থাকেই, থেকেই যায়। সেই বন্দিখানার কঠিন গরাদে, কংক্রিটের শক্ত মেঝেতে, অসংখ্য আঁকিবুকির দেয়ালে, অখাদ্য খাবারের জীর্ণ

www.boighar.com

প্রেটে সেই মায়ারা থেকেই যায়। এই মায়া কাটানো সহজ নয়। এই জীবনটাই তো একটা মায়া। কিন্তু এই সংসার আর সম্পর্কটা কি সেই বন্দিখানার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু ছিল বাবার কাছে?

বাবার এই এত বছরের ভয়ঙ্কর দুঃসহ জীবনটাকে যে হেমা একটুও অনুভব করতে পারে না তা নয়। বরং অনেক বেশিই পারে। কিন্তু সে জন্য এতবছর পর এসে বাবা এই সিদ্ধান্তটা নিচ্ছেন? বাবার জীবনের এই অসহনীয় অনুভূতি হেমাকে প্রবলভাবেই স্পর্শ করে, কিন্তু তারপরও কেন যেন মাকেও সে পুরোপুরি অভিযুক্ত করতে পারছে না। বরং বাবার জন্য যে কষ্টটা তার হচ্ছে, মা'র জন্যও তার চেয়ে কম কষ্ট তার হচ্ছে না। একটা মানুষ বছরের পর বছর কী অব্যক্ত, অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটিয়েছে। বুকের ভেতর পুষে রেখেছে অন্য একটা মানুষের স্মৃতি। অন্য একটা মানুষের গভীরতম স্পর্শের অনুভূতি। অবিশ্বাস্য কষ্টের বিচ্ছেদ। যাকে সে সম্পূর্ণ পেয়ে, সম্পূর্ণের চেয়েও বেশি হারিয়েছে! অথচ তাকে কাটাতে হয়েছে সেই মানুষটাকে যাকে সে ঘৃণা করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। কী ভয়ানক যন্ত্রণাময় এক জীবন!

বাবার যন্ত্রণাটাও মোটেই কম কিছু নয়। প্রতিটি মুহূর্ত তিনি চূড়ান্ত রকমভাবে উপেক্ষিত হয়েছেন। যেই মানুষটাকে ভালোবেসে মুগ্ধ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেছেন অবিরাম, সেই মানুষটা প্রবল নির্লিপ্ততায় তা উপেক্ষা করে নিঃশব্দে ভালোবেসে গেছেন অন্য একজনকে। একই বিছানায় পাশাপাশি ঘুমিয়েও রাতের পর রাত তাদের মাঝখানে বয়ে গেছে যোজন যোজন ব্যবধানের অলঙ্ঘনীয় এক সমুদ্র।

কী অসহ্য কষ্টের এক জীবন!

আচ্ছা, বাবার জীবনে কি কেউ এসেছে? যার সান্নিধ্য তাকে প্রখর খরতাপে পুড়ে যেতে থাকা অন্তহীন মরুভূমিতে হঠাৎ করেই সবুজ সতেজ এক নতুন জীবনদায়ী মরুদ্যান দেখিয়েছে? তেষ্টায় ফেটে যেতে থাকা বুকের ভেতর হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছে? হেমা জানে না, তবে তার কেন যেন মনে হচ্ছে, তার বাবা এমন কোনো অনুভূতিতেই আচ্ছন্ন। এমন কিছু হয়ে থাকলে কি বাবাকে দোষ দিতে পারবে হেমা? সে নিজে বাবার জায়গায় থাকলে কি করত? এমন পরিস্থিতিতে এই সময়ে এসে কেউ যদি তাকে প্রবল মমতায়, ভালোবাসায়, যত্নে আগলে রাখতে চাইত, তাহলে কি সে সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে পারত! একজনমের এইটুকু ভালোবাসার স্পর্শের জন্যই হয়তো মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকে। একটু মমতা আর সান্নিধ্যের তেষ্টায়ই হয়তো তৃষিত হয়ে থাকে হৃদয়!

হেমার আজকাল যেন বিষন্নতার অসুখ হয়েছে। তার কোনো কিছুই ভালো লাগে না। সারাটাক্ষণ কেবল মনে হয়, আজ মন খারাপের দিন। আজ ঘরে বসে বিষাদময় মৌনতায় কাটিয়ে দেয়ার দিন। আর একটা বিষয় হয়েছে, সেটি

হচ্ছে, ঘন্টার পর ঘন্টা একা একা বসে সে কেবল ভাবে, ভাবে আর ভাবে। রাজ্যের বিষয় নিয়ে ভাবে। এই ভাবনার যেন আর শেষ নেই। এই ভাবনারা বুড়ো অশ্বত্থের বিস্তৃত ডালপালার মতো। ক্রমাগত একটা ডাল থেকে আরেকটা ডাল পাতা বেরোতেই থাকে, বেরোতেই থাকে।

কিন্তু এই মুহূর্তে তার হঠাৎ মনে হলো ঘরের ভেতর থেকে থেকে সে ক্রমশই বিষণ্নতায় ডুবে যাচ্ছে। বহুদিন ইউনিভার্সিটিতে যায় না সে। বেশিরভাগ সময়ই ফোন বন্ধ করে রাখে বলে বন্ধুদের সাথেও খুব একটা যোগাযোগ হয় না। নয়নের সাথেও কথা হয়নি আর। হেমা বারকয়েক ভেবেছিল নয়নকে ফোন দিবে। কিন্তু তারপর আবার কি ভেবে নিজেকে সামলে নিলো। হেমা কখনো অভিমানী মেয়ে হতে চায়নি। কথায় কথায় যারা গাল ফুলিয়ে অভিমান করে তাদের খুব একটা পছন্দও করে না সে।

তার ধারণা, যারা কথায় কথায় অভিমানে গাল ফোলায়, তারা একরকমের প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর মানুষ। এরা যুক্তি বুঝতে চায় না, বাস্তবতা বুঝতে চায় না। এরা যে কারণে যে মানুষটার প্রতি অভিমানী হয়ে ওঠে, সেই মানুষটির সেই কারণটির পেছনের ঘটনাটি হয়তো এরা কখনোই জানতেই চায় না, বুঝতেই চায় না। এই কথায় কথায় অভিমানী হয়ে ওঠা শ্রেণি যা বোঝে, তা হলো কেবল নিজের প্রাপ্তি, নিজের আনন্দ। সেই প্রাপ্তি কোনোভাবে অর্জিত না হলেই তারা অভিমানে গাল ফোলায়। কিন্তু হেমা তার আশপাশটা বুঝতে চেয়েছে। যতটা সম্ভব অভিযোগবিহীন থাকতে চেয়েছে।

অনেকদিন হলো, নয়ন হঠাৎ করেই হেমার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। অবশ্য তাদের সম্পর্কটা যে খুব বেশি মাখামাখির ছিল, তাও না। তবে একজন আরেকজনকে ধারণ করত। জানত, ওই মানুষটা যেখানেই থাকুক, যত দূরেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক, মানুষটা আমার। এই জানাজানিটা সম্পর্কে খুব দরকার। একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া। হেমার ধারণা সেই বোঝাপড়াটা তাদের ছিল। কিন্তু জগতে কোনো কিছুই কি নিশ্চিত? সম্ভবত না। এই অবধি এসে হেমার ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়।

তার মনে হয়, আমরা যখন প্রবল ভালোবাসায় আচ্ছন্ন থাকি, তখন মনে হয় সারা জনমের জন্য এই মানুষটা, এই ভালোবাসাটা আমার। নিশ্চিত করেই আমার। এটা আমার আজন্ম অধিকারের বিষয়। কিন্তু এমন অসংখ্য সম্পর্কও মুহূর্তেই ভেঙে যেতে দেখেছে হেমা। সম্পর্ক আসলে কি? কেবলই কি নির্দিষ্ট সময়ের অনুভূতি? এর বাইরেও অবশ্য আছে, সামাজিক, রীতি প্রথায় আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে থাকা সম্পর্ক। কিন্তু সেই সম্পর্কের ভেতর অনুভূতির গভীরতায় প্রবহমান সম্পর্ক কতটুকু?

www.boighar.com

নয়নের সাথে একটা দীর্ঘ যোগাযোগহীনতা চলছে হেমার। সেটি নয়নের কারণেই। নয়ন কোনো একটা ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। কিন্তু বিষয়টা সে হেমাকে বলতে চায় না। হেমা যে জানার চেষ্টা করেনি, তা নয়। সম্ভাব্য সকল উপায়েই সে জানার চেষ্টা করেছে। তবে একটা জিনিস হেমা সব সময় মানে, ভালোবাসি বলেই ভালোবাসার সেই মানুষটার সকল কিছু আমায় জানতে হবে, এটি ঠিক নয়। প্রতিটি মানুষেরই নিজের একান্ত কিছু গোপন বিষয় থাকে, অনুভূতি থাকে। কেবল তার একার, খুব একান্ত একার কিছু হাসি থাকে, কান্না থাকে, আনন্দ থাকে, দুঃখ থাকে। সেই হাসি কান্না, আনন্দ দুঃখের অনুভূতি স্পর্শ করবার ক্ষমতা জগতে আর কারোরই থাকে না। হেমা এই সংবেদনশীলতার জায়গাটুকু বোঝে বলেই কখনোই নয়নের অনুভূতির সেই একান্ত গোপন কুঠুরিতে প্রবেশ করতে চায়নি। কিন্তু ওই যে প্রশ্নটা, সম্পর্ক তাহলে কতটা দূরত্বে, কতটা বিচ্ছিন্নতায়, কতটা স্পর্শহীনতায়, কতদিন টিকে থাকে!

জগতের সকল সম্পর্কই পারস্পরিক। সকল সম্পর্কই স্বার্থযুক্ত। একজন যদি দিনের পর দিন অন্যজনের মন খারাপের বিশেষ সময়ের সঙ্গী হয়, তার খারাপ সময়ে হাতখানা শক্ত করে ধরে, মুঠোবন্দি করে সাহস দেয়, সমর্থন যোগায়, তবে অন্যজনের জন্য তা অবচেতনেই একটা অব্যক্ত ঋণ তৈরি করে। সেও তার অমন দুঃখের সময়, মন খারাপের সময় চায় এই মুহূর্তে তার হাতখানাও কেউ শক্ত করে ধরুক। খানিকটা সময় পাশে বসে কথা বলুক। বলুক আমরা আছি, ছিলাম, থাকব। এমন অসংখ্য দুঃসময় আমাদের শক্ত করে ধরে রাখা হাতের পাশ ঘেঁষে চলে যাবে। কিন্তু আমরা থাকব।

আচ্ছা, এই যে-কোনো একজন যদি কেবল ওই নেয়াটুকুই শুধু জানে, দেয়াটুকু আর না জানে না, তবে সেই সম্পর্কটা কি আর আদৌ টিকে থাকে? সম্ভবত না। বা থাকলেও সেটি ক্রমশই হয়ে ওঠে মৃত সম্পর্ক।

হেমার আচমকা মনে হলো, সে ভাববে না ভাববে না করেও এত কিছু কেন ভাবছে! নয়ন আর তার সম্পর্কটাও কি তাহলে ক্রমশই মৃত সম্পর্ক হয়ে উঠেছে? এই দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা, যোগাযোগহীনতা তাকেও কি দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলছে না? একটা অদৃশ্য শক্তিশালী দেয়া তুলে দিচ্ছে না? এই যে এখন, এই মুহূর্তে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে নয়নের সাথে রিকশায় হুড তুলে ঘুরতে। কিন্তু সে নয়নকে ফোন করে এই কথা বলতে পারছে না। নয়ন যদি না করে দেয়? দিলে দিবে, তার বলতে ইচ্ছে করছে, সে বলুক না? কিন্তু সে পারছে না। কেন পারছে না?

এই প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর হেমা জানে। যদিও উত্তরটি সে মানতে চায় না। কিন্তু জানে। ওই মানুষটা যেখানেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক, মানুষটা আমার, এই অনুভূতিটা, অধিকারবোধটা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। অধিকারবোধ

হারিয়ে গেলে সেই সম্পর্কে আর কি থাকে? কিছুই না। হেমার এই প্রথম মনে হলো, তাদের সম্পর্কটা আর নেই! কিন্তু দুজনের কেউ সেটা স্বীকার করতে চাইছে না। তার ভান করছে সকলই আছে, ঠিক আগের মতোই। একই রকম আছে। আসলে নেই। কিছুই নেই।

হেমা বাসা থেকে বের হলো তার কিছুক্ষণ পর। কিন্তু বাসা থেকে বের হবারও দীর্ঘ সময় অবধি সে বুঝতে পারল না কোথায় যাবে? দুপুর হয়ে গেছে। একটা মৃদু হাওয়া চারধারে। গত কিছুদিনের ভ্যাপসা গরমটা কেটে গেছে। এই সময়টায় রিকশায় ঘোরার চেয়ে আনন্দদায়ক কিছু নেই। কিন্তু সে রিকশাও নিল না। শরীরটা খানিক দুর্বল। তবুও সে লালমাটিয়া থেকে হেঁটে ধানমন্ডি সাতাশের দৃক গ্যালারীর সামনে এলো। গ্যালারিতে কোনো একটা প্রদর্শনী চলছে, কী মনে করে সেখানে ঢুকে পড়ল হেমা। ঢুকেই মন ভালো হয়ে গেল তার। যৌনকর্মীদের সন্তানদের পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করছে একটি সংগঠন। তারাই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। প্রদর্শনী জুড়ে যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের আঁকা ছবি। সে সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখল। বাচ্চাগুলোকেও গ্যালারিতে জড় করেছে আয়োজকরা। তারা মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাতে খেলছে। ছবিগুলো দেখে হেমার যে কী অসম্ভব মন ভালো হয়ে গেল! মন ভালো হয়ে যাবার কারণ তারা অনেকেই একটা কাল্পনিক জগতের ছবি এঁকেছে। সেই ছবিতে তারা অনেকেই তাদের মায়ের ছবি এঁকেছে, বাবার ছবি এঁকেছে, ভাই-বোনের ছবি এঁকেছে। কী অদ্ভুত! অথচ এরা কেউ এদের বাবা কে জানে না। এদের ভাই বোন নেই। অথচ এদের চিন্তার জগতেও কী আশ্চর্যভাবেই না বাস করছেন একজন বাবা! একটি পরিবার?

আচ্ছা, এই শিশুদের কারোর বাবারও কি মনে পড়ে এমন করে তার এই সন্তানের কথা? হয়তো অনেকেই জানেনই না যে এই সন্তান তার, কিন্তু কেউ কেউ নিশ্চয়ই জানেন, যারা জানেন, তাদের কি একবারও মনে হয়?

হেমা কয়েকটা শিশুর সাথে কথাও বলল। তাদের স্বপ্নের গল্প, ভাবনার গল্প, অভিজ্ঞতার গল্প। এইটুকু এইটুকু বাচ্চা কিন্তু এদের অভিজ্ঞতাগুলোও যে কী জীবন্ত আর বৈচিত্র্যময়!

হেমা গ্যালারি থেকে বের হয়ে দেখে বিকেলও মরে আসছে প্রায়। খানিকবাদেই সন্ধ্যা নামবে। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝুপড়ি চায়ের দোকান থেকে এক কাপ চা খেলো। সাথে একটা নোনতা বিস্কুট। খেতে মন্দ লাগল না। বেশ কিছুদিন ধরে কিছুই খেতে পারছিল না সে। এই ঝুপড়ি দোকানের চা আর বিস্কুট যেন জিভের স্বাদটা ফিরে আসার বার্তা দিলো। পুরোপুরি সন্ধ্যা নামতে আরো কিছুটা সময় বাকি। এক কাজ করলে কেমন হয়? রিকশা করে রবীন্দ্র সরোবর অবধি গিয়ে ঘুরে আসলে কেমন হয়? হেমা গেল। শুধু গেলই না। সে

www.boighar.com

একা একা রবীন্দ্র সরোবরের পাশের বটগাছটার তলায় দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইল। চারপাশের এই এত মানুষ, এত এত কোলাহল, তার কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারল না। লেকে অন্ধকার নেমে আসলেও চারপাশের বৈদ্যুতিক আলোর আভায় অন্ধকার খুব একটা পাত্তা পাচ্ছে না। সেখানে নৌকায় করে তরুণ-তরুণীরা ঘুরছে। হাসিখুশি মুখের কত কত সুখী মানুষ। হেমা সহজে ঈর্ষান্বিত হয় না। কিন্তু এই মুহূর্তে তার খুব ঈর্ষা হতে লাগল। নাকি কষ্ট? সে ঠিকঠাক বুঝতে পারছে না। কিন্তু ওই হাস্যোজ্জ্বল তরুণ-তরুণীদের দেখে মুহূর্তের জন্য তার নিজেরও তাদের একজন হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। কম বয়সী কয়েকজোড়া বাবা-মাও আছেন, সাথে তাদের সন্তান। এক তরুণী মেয়ে তার মাঝবয়সী বাবা-মাকে নিয়ে নৌকায় চড়েছে। নৌকার দুলুনীতে বাবা-মা বেশ ভয় পাচ্ছেন। তারা শক্ত করে একে অপরের হাত ধরে রেখেছেন। তরুণী তা দেখে যেন বেশ মজা পাচ্ছে। সে ইচ্ছে করেই নৌকাটি আরো খানিকটা দোলাচ্ছে আর খিলখিল করে হাসছে। কে জানে, হয়তো সে চাইছে, তার এই ঢেউ তোলা দুলুনিতে তার মা-বাবা আরো শক্ত করে পরস্পরকে ধরে রাখুক!

হেমার আচমকা মনে হলো, তার কাছে কি এমন করে ঢেউ তোলার মতো কিছু আছে, যা দিয়ে সে তার বাবা আর মাকে এমন শক্ত করে ধরে রাখাতে পারবে?

মাঝরাতে পলাশীর মোড়ে ডিম পরোটা খেতে এসেছিল রাহাত। এসে দেখে নয়ন বসে আছে। নয়নকে দেখে সে অবাক হয়েছে। হেমার সাথে খানিক আগেই তার কথা হয়েছে। নয়নের কথা জিজ্ঞেসও করেছে সে। কিন্তু হেমা বলেছে তার কাছে নয়নের কোনো খবর নেই। নয়ন যে ঢাকা এসেছে এটা কি তাহলে হেমা জানে না!

বিষয়টা কেমন অদ্ভুত লাগল রাহাতের। সে দীর্ঘদিন থেকেই এই দুজনকে চেনে। হেমা তার ক্লাসমেট। কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু। অন্তত রাহাতের কাছে তো বটেই! আর নয়নকে সে হেমার সূত্রেই চেনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর মেডিকেল গা লাগানো দূরত্বে বলে হেমা আর নয়নের দেখা হওয়া কিংবা গল্পের জায়গাগুলো ওই ঘুরে ফিরে একই। তাতে রাহাত যেমন থেকেছে, থেকেছে অন্য আরো অনেকেই। কিন্তু হেমার ব্যাক্তিত্ব যেমন আলাদা করে কোনো কিছু না করেই আপনা আপনিই মানুষকে কাছে টানে, আকর্ষণ করে। নয়নের ব্যাক্তিত্বটা তেমন নয়। নয়ন মানুষকে আকর্ষণ করে ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন একটা স্পষ্ট দূরত্বও রেখে দেয়। কিন্তু এই এতদিন পর নয়ন ঢাকাতে, অথচ হেমা কিছুই জানে না! বিষয়টা কেমন রহস্যময় মনে হলো রাহাতের কাছে। মুহূর্তের মধ্যে তার বুকের ভেতর একটা সম্ভাবনার আভাসও দেখা দিলো। দুজনের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়নি তো! বড় কোনো সমস্যা!

রাহাত অবশ্য ওই সম্ভাবনাটুকুকে পাত্তা দিলো না। সে নয়নের কাছে গিয়ে বসল। নয়ন ফিরে তাকাতেই রাহাত দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'কেমন আছেন?'

অদ্ভুত ব্যাপার হলো নয়ন যেন রাহাতকে চিনতেই পারল না। সে দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, 'হাঁ ভালো।'

রাহাত বলল, 'নয়ন ভাই, আপনি ঠিক আছেন তো? আপনাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

www.boighar.com

নয়ন বলল, 'কেন বলুন তো?'

রাহাত বলল, 'কারণ, আপনি আমাকে আপনি করে বলছেন।'

নয়ন থতমত খেয়ে গেল। ছেলেটাকে সে চেনে। কিন্তু কোথায় দেখেছে সেটা মনে করতে পারছে না। ছেলেটার নামটাও মনে করতে পারছে না সে। রাহাত নয়নের কাঁধে হাত রাখল। তারপর বলল, 'আপনি কি কোনো কারণে চিন্তিত? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার উপর দিয়ে বড় রকমের কোনো ঝড় বয়ে যাচ্ছে।'

নয়ন বলল, 'না না। আমি ঠিক আছি।'

রাহাত বলল, 'কিন্তু আপনার চোখ টকটকে লাল। দেখেও অসুস্থ লাগছে।'

নয়ন বলল, 'তেমন কিছু না। ইনসমনিয়া যাচ্ছে। ঘুম হচ্ছে না অনেকদিন।'

রাহাত বলল, 'আপনি কি কিছু খাবেন?'

নয়ন বলল, 'নাহ্। আমি খেয়ে এসেছি। তুমি বসো । আমি তাহলে আজ উঠি।'

রাহাত বলল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

নয়ন বলল, 'বাসায় যাব। এখন ক'টা বাজে বলো তো?'

রাহাত বলল, 'দুটা'।

নয়ন বলল, 'আমাকে একটা রিকশা ডেকে দাও তো'।

রাহাত রিকশা ডাকতে গেল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এত রাতে কোনো রিকশাই নয়নের বাসা অবধি অতটা দূর যেতে চাইছে না। রাহাত ফিরে এসে বলল, 'কোনো রিকশাই যেতে চাইছে না ভাই। আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন, আমি হল থেকে আমার একটা ফ্রেন্ডকে ফোন করে তার বাইক নিয়ে চলে আসতে বলতে পারি। সে আপনাকে দিয়ে আসবে।'

নয়ন কিছুক্ষণ কি ভাবল। সে ঠিকমত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। একটা ইলেক্ট্রিকের খামের সাথে ভর দিয়ে সে দাঁড়াল। তারপর রাহাতকে ডেকে বলল, 'আচ্ছা, বলো।'

রাহাত তার এক বন্ধুকে ফোন দিয়ে নিয়ে এলো। নয়ন বাইকের পিছে উঠতে রাহাত বলল, 'নয়ন ভাই, আপনি ওকে লোকেশনটা বলে দিয়েন। আর আপনার অবস্থা খুবই খারাপ। সাবধানে যাবেন।'

নয়ন জড়ানো গলায় বলল, 'আচ্ছা'।

ছেলেটা বাইক চালু করে দু'চার চাকা সামনে বাড়াতেই নয়ন তাকে বাইক থামাতে বলল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে রাহাতকে হাতের ইশারায় ডাকল। রাহাত দাঁড়িয়েই ছিল। সে কাছে আসতে নয়ন তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তোমার

নাম রাহাত। তুমি হেমার সাথে পড়। আমরা বারকয়েক একসাথে আড্ডাও দিয়েছি। রাইট?'

রাহাত মাথা নাড়ল, 'রাইট।'

নয়ন মৃদু হেসে বলল, 'তোমাকে না চেনার তো কিছু নেই। আই ওয়াজ জাস্ট জোকিং।'

রাহাতও হাসল। নয়ন বলল, 'যাচ্ছি তাহলে। শীঘ্রই দেখা হবে।'

রাহাত মাথা নাড়ল। নয়নরা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগ অবধি সে দাঁড়িয়েই রইল। তারপর ফোন বের করে চিন্তিত ভঙ্গিতে হেমাকে ফোন করল। হেমার ফোন বন্ধ। আজকাল হেমারও যে কি হয়েছে! দিনরাত ফোন বন্ধ, ফেসবুক বন্ধ। কি যে হচ্ছে দুজনের! হেমাকে রাহাত ভালোবাসে সত্যি। www.boighar.com এটিও সত্যি এই ভালোবাসা আর আট-দশজনের চেয়ে বেশিই। কিন্তু এই ভালোবাসাটা অদ্ভুত! এখানে কেবল ভালোবাসাই আছে, প্রত্যাশা নেই। মাঝে-মধ্যে যে নিজের এই অনুভূতি নিয়ে রাহাত ভাবে না, তা না। কিন্তু সে চেষ্টা করে দেখেছে, হেমাকে ভালো না বেসে সে থাকতে পারে না। রাহাত তাই নিজেকে নানান যুক্তি দেয়। বোঝায়, পাওয়া হয়ে গেলে পাওয়ার জন্য এই যে দুর্নিবার আকর্ষণ, এ কী থাকে? ছোটবেলায় কত খেলনা পাওয়ার জন্য কেঁদে কেটে অস্থির করে তুলত সে বাবা-মাকে। দিনের পর দিন গোঁ ধরে থাকত। খেত না, ঘুমাত না, স্কুলে যেত না। কিন্তু সেই খেলনা পেয়ে যাওয়ার পর দিন দুই-চার বা বড়জোর সপ্তাহখানেক তা নিয়ে মেতে থাকত! তারপর অবহেলায় পড়ে থাকত ঘরের কোণে। চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে কী আশ্চর্য এক বৈপরীত্য! রাহাতের আজকাল বরং মনে হয়, যা পাওয়া হয় না, তা-ই হয়তো আরো বেশি রয়ে যায় চিরকাল।

রাহাত হলে ফিরে হেমাকে 'আর্জেন্ট' লেখা মেসেজ পাঠিয়ে ঘুমাতে গেল। হেমার সাথে কথা হলো পরদিন দুপুরে। হেমা ফোন খুলে মেসেজ দেখেই ফোন করেছে। রাহাত বলল, 'দেখা করতে পারবি?'

হেমা বলল, 'কেন, এই মুহূর্তে না দেখলে মরে যাবি?'

রাহাত বলল, 'আমি না, তুই।'

হেমা হাসলো। বলল, 'এই মুহূর্তে তোকে না দেখলে আমি মরে যাব?'

রাহাত বলল, 'যেতেও পারিস্।'

হেমা বলল, 'তাহলে আর চোখের সামনে আসিস না। বেঁচে থাকতে ভাল্লাগছে না। তোর কারণে হলেও না হয় মরে যাই।'

রাহাত বলল, 'নয়ন ভাইয়ের বিষয়ে জরুরি কথা আছে।'

হেমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধক করে উঠল। নয়নের বিষয়ে কি এমন জরুরি কথা বলবে রাহাত! আর সাথে সাথে তার মনে হলো, এই যে নয়নের

কথা শুনেই তার বুকের ভেতরটা কেমন ধক করে উঠল, এটা কী? এটাই ভালোবাসা? এই অনুভূতিটুকুকে কোনো কিছুতে ঢেকে রাখা যায় না। অগ্রাহ্য করা যায় না।

রাহাতের সাথে হেমার দেখা হলো তার ঘণ্টাখানেক পর। তারা বসেছে টিএসসিতে। হেমা বলল, 'কি হয়েছে?'

রাহাত বলল, 'তার আগে বল নয়ন ভাইয়ের কি হয়েছে? সে যে ঢাকায় তুই জানিস?'

হেমা বলল, 'হু জানি।'

রাহাত বলল, 'কোনো সমস্যা না তো? আই মিন, তোদের দুজনের মধ্যে?'

হেমা হাসলো, 'উহু। উই আর ওকে। এভ ইউ হ্যাভ নো চান্স অ্যাট অল বন্ধু।'

রাহাত হাসল না। বলল, 'নয়ন ভাইয়ের কি কোনো সমস্যা যাচ্ছে? অন্য কোনো সমস্যা?'

হেমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হু। আমি বলছি শোন। ছোটবেলা থেকেই নয়ন খুব একা একা মানুষ হয়েছে। ওর বাবা-মা একটু চুপচাপ ধরনের। আর ওকে কারো সাথে খুব একটা মিশতেও দিত না। এই ধরনের বাচ্চারা দুইরকম হয়। খুব জেদী, খুব বেপরোয়া অথবা খুব চুপচাপ, শান্ত। ও ছিল দ্বিতীয়টা। সারাদিন বই পড়ত। নিজের একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই জগৎটা ছিল খুব শান্ত-স্নিগ্ধ একটা জগৎ। মানে এই ধর, এমন হয় না যে আঁকা ছবির মতো ব্যাপার-স্যাপার। সবকিছুতেই একটা সৌন্দর্য। তবে সারাক্ষণ বাসায় একা একা থাকতে থাকতে ওর মধ্যে একটা সঙ্গীরও খুব অভাব তৈরি হয়েছিল। ওর মা বলতে গেলে সেই অর্থে কারো সাথেই তেমন কথা বলেন না। টুকটাক যা বলার তা ওই নয়নের সাথেই। তাও না বলার মতোই। বাবাও খুব ইন্ট্রোভার্ট। এমন একটা ছেলে একা একা বেড়ে উঠেছে একটা ঘরের মধ্যে। তার জগৎ বলতে বই আর কল্পনা। সে কেবল জানত বই পড়তে আর ভাবতে। এরপর স্কুল-কলেজ-মেডিকেল। মানুষ ওকে পছন্দ করত, কিন্তু ও মিশতে পারত না কারো সাথে তেমন। খুব ঘরকুনো স্বভাবের। ক্লাস শেষ হতেই বাসায় গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যেত। ওই ঘরটাই ওর জগৎ। ওই সময়ে গ্রাম থেকে একটা মেয়ে আসে ওদের বাসায়। নাম আসমা। বছর চার পাঁচ আগের ঘটনা। মেয়েটা আসে আসলে কাজ করতে। কিন্তু খুব অল্পদিনেই মেয়েটার প্রতি একটা মায়া জন্মে যেতে থাকে নয়নের। একদম অজপাড়া গাঁ থেকে আসা একটা মেয়ে। হঠাৎ শহরে চলে এসেছে। সবকিছুই তার অপরিচিত। বাবা-মা, ভাই-বোনের কথা ভেবে কাঁদে। কেউ কিছু বললেও ভয় পায়, না বললেও ভয় পায়। সারাক্ষণ একটা আতঙ্কে থাকে।

একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়লেও সে আঁৎকে ওঠে। বিষয়গুলো নয়ন খুব খেয়াল করত। ওর কাছে আসমা তখন একটা আবিষ্কারের মতো। একটা খেলনার মতো। আসমার এই জড়োসড়ো হয়ে গুটিয়ে যাওয়া, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকা বিষয়গুলো ও খুব ফিল করত। ও প্রচণ্ড মমতা দিয়ে সেই ভয়গুলো কাটাতে লাগত। নয়নের ভাবনার জগৎটা তখনো খুব চমৎকার একটা কোমলতায় পূর্ণ। মেয়েটার প্রতি ধীরে ধীরে ওর প্রচণ্ড একটা দুর্বলতা তৈরি হয়...'।

রাহাত হঠাৎ হেমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'বয়স কত মেয়ের? কাজের মেয়ের সাথে প্রেম-ফ্রেমের ব্যাপার নয় তো?'

হেমা আচমকা গম্ভীর গলায় বলল, 'রাহাত!'

এই সামান্য রাহাত উচ্চারণেই হেমার গলায় কিছু একটা ছিল। রাহাত চুপ করে গেল। হেমা বলল, 'মেয়েটার প্রতি অসম্ভব একটা মায়া তৈরি হয়েছিল নয়নের। ধর অনেকটা এমন যে ঘরে একটামাত্র মানুষ যার সাথে ও কথা বলতে পারে। গল্প করতে পারে। রাগ উঠলে মারতেও পারে। কিন্তু সেই মার খেয়েও সে কিছু মনে করে না। খানিকবাদে বেড়ালের বাচ্চার মতো গা ঘেঁষে এসে বসে। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলে খুশিতে গলে যায়। ধর একটা ছোট বাচ্চার মতো। ছোট বোনের মতো। নয়নের তো আর কোনো ভাই-বোন নেই। আসমা আসলে ওর বোনই হয়ে গেল। আর সে যে ওর কতটা ছিল, এটা চিন্তাও করা যাবে না।'

হেমা একটু থামল। কিছু একটা ভাবল সে। তারপর বলল, 'একটা বিষয়। ধর নয়নের সাথে আমার পরিচয়েরও আগে আসমা ওদের বাসায় আসে। আমার আর নয়নের চেনা জানাও ঠিক ওই সময়টাতেই। এই ধর চার-পাঁচ বছর। প্রেমের প্রথম প্রথম কি হয়? নিজেদের নিয়ে অনেক কথা হয় না? অনেক প্ল্যান, রোমান্টিসিজম। আমাদের মধ্যে এমন কিছুই হয়নি। নয়নের সাথে আমার সম্পর্কটাই হয়েছিল ওই আসমাকে নিয়ে কথা বলতে বলতেই। আসমা ওর কাছে ছিল ওর দীর্ঘদিনের একঘেঁয়ে একার পৃথিবীতে একটা আলাদা জগৎ। একটা শান্ত পুকুরে ঢেউয়ের মতো। একটা ঘটনা বলি শোন, একবার মাছ কুটতে গিয়ে আসমা হাত কেটে ফেলল। খুবই খারাপভাবে কেটেছিল। নয়ন তখন ঢাকায় নেই। বাসায় কেউ বিষয়টাকে তেমন পাত্তাও দেয়নি। আসমার হাতে ইনফেকশন হয়ে গেল। ভয়াবহ অবস্থা। আমার মনে আছে নয়ন রাতের পর রাত ঘুমায়নি। মেডিকেলের স্টুডেন্ট ও। এই সামান্য বিষয় নিয়ে এমন করা ওর জন্য অস্বাভাবিক। বিষয়টা দেখলে যে কেউ বলবে আদিখ্যেতা। কিন্তু আমি ওকে সামান্য হলেও বুঝতে পারতাম। ও এমনই ছিল আসমার জন্য। আমারো মাঝে-মধ্যে রাগ হতো। অন্য কেউ হলে হয়তো ভুলও বুঝত। কিন্তু আমি তো ওকে বুঝতাম। এরপর নয়ন একদিন ওর বাবাকে বলল বাসায় আর মাছ না

www.boighar.com

আনতে। আসমাকে পড়াত ও। ওর ধারণা আসমাকে ঠিকঠাক টেক কেয়ার করা গেলে, আসমা চমকে দেবার মতো কিছু একটা করে ফেলবে। নয়ন আসলে আসমাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এই নেশাটা ওর ছিল। সৃষ্টির নেশা। ও বলত, আমি একটা অন্য আসমাকে তৈরি করছি। আসমাও বিষয়টা বুঝতে পেরেছিল। সে তার বাবা-মার চেয়েও নয়নকে বেশি ভালোবাসত।'

হেমা আবারো থামল। তারপর খুব গভীর শান্ত গলায় বলল, 'নয়ন ওকে কি ডাকতে শিখিয়েছিল জানিস? দাদা। ও বলত আসমা ওকে যখন দাদা বলে ডাকে, ওর বুকের ভেতর রক্ত ছলকে ওঠে। ওটা ছিল ওর কাছে জগতের সবচেয়ে আনন্দময় বিষয়ের একটা।'

হেমা খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ কথাবার্তাকে রাহাতের তেমন আগ্রহের কিছু মনে হচ্ছিল না। হেমা থামতেই সে বলল, 'তুই তো দেখি ধান ভানতে শীবের গীত গেয়ে ফেললি।'

হেমা সাথে সাথে কোনো জবাব দিলো না। সে ঘাড় উঁচু করে আকাশের দিকে তাকাল। মাথার উপরে নীল-সাদা মেঘের ঝকঝকে আকাশ। সে সেই আকাশের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই দেখল আসমা মারা গেছে। সে এমনি এমনি মারা যায়নি। সে মরেছে বিষ খেয়ে। ইঁদুর মারার বিষ। সে আত্মহত্যা করেছে।'

রাহাত রীতিমতো একটা ঝাঁকির মতো খেলো। এই কথা সে আশা করেনি। সে খপ করে হেমার বাঁ হাতখানা ধরে ফেলল। তারপর বলল, 'কি বলছিস তুই? কেন?'

হেমা বলল, 'কেউ জানে না কেন! নয়ন রীতিমত পাগলের মতো হয়ে গেল। তখন তার ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। শেষ পরীক্ষাটা বাকি। আসমার লাশ পাঠিয়ে দেয়া হলো বাড়ি। পরীক্ষা শেষ হবার পর নয়ন আবার সেই চার-পাঁচ বছর আগের মতো হয়ে গেল। একদম চুপচাপ। একা। কারো সাথে মেশে না। কথা বলে না। ঘর থেকে বের হয় না। ফোন বন্ধ করে রাখে। জগতের সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। মাঝে-মধ্যে গভীর রাতে আমাকে সামান্য সময়ের জন্য ফোন দিত। ফোন দিয়ে কাঁদত। সে ঘুমাতে পারত না। চোখ বুজলেই মৃত আসমার মুখটা চলে আসত চোখের ভেতর।'

হেমা থামতেই রাহাত বলল, 'তারপর?'

হেমা বলল, 'তারপর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল নয়ন। কিছুদিন বাদে জানা গেল সে গিয়েছে ফতেহপুর। ফতেহপুরই আসমাদের বাড়ি।'

হেমা চুপ করে রইল। চুপ করে রইল রাহাতও। অনেকটা সময় কেটে গেল নৈঃশব্দ্যে। তারপর রাহাত হেমার হাতখানা শক্ত করে ধরে বলল, 'আমি জানি

না কি হয়েছে। কিন্তু নয়ন ভাই নিডস ইওর সাপোর্টস। এই মুহূর্তে তোকে খুব দরকার তার। তিনি খুব খারাপ আছেন।'

হেমা মাথা নিচু করে রাহাতের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'তুই কি করে জানলি?'

রাহাত গতরাতের ঘটনা খুলে বলল। হেমা সব শুনে বলল, 'কি হয়েছে ওর? শরীর খারাপ ছিল কোনো কারণে?'

রাহাত বলল, 'ঠিক জানি না। তবে উনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না। ওনার চোখ টকটকে লাল। ঠিকমতো পা ফেলতে পারছিলেন না। আমাকে চিনলেন না অবধি।'

হেমা চুপ করে রইল। রাহাত বলল, 'কিছু মনে করিস না, উনি কি ড্রাগস নিতেন? বা ধর, নিদেনপক্ষে ড্রিংকস করতেন? আমার কেন যেন অমন মনে হলো।'

হেমা ঝট করে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিলো। তারপর কঠিন গলায় বলল, 'কক্ষনো না।'

রাহাত খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আমারও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবে একটা ব্যাপার সিওর, তিনি স্বাভাবিক ছিলেন না। এমনও হতে পারে, রাতের পর রাত ঘুমাতে পারছেন না বলে হয়তো হাই ডোজ কোনো স্লিপিং পিল বা সিডাকটিভ নিয়েছেন। তারপরও ঘুম হচ্ছিল না, এইজন্যই হয়তো রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজেও বলছিলেন, দীর্ঘ ইনসমনিয়া। ঘুম হচ্ছে না কিছুতেই। এমন হয়, খুব বেশি ডোজের ঘুমের ওষুধ খাওয়ার পরও ঘুম না হলে এক ধরনের ইল্যুশন হয়। মাথা ঝিমঝিম লাগে। এলোমেলো লাগে চারপাশ। হাঁটাচলায় ভারসাম্য রাখতে কষ্ট হয়।'

হেমা কথা বলল না। বসে রইল চুপচাপ। রাহাতও। হেমা বুঝতে পারছে না সে এখন কি করবে! সে কি নয়নের বাসায় যাবে? কিন্তু কেমন হবে ব্যাপারটা? নয়নের বাবা-মায়ের কথা সে শুনেছে। কিন্তু কখনোই দেখা বা কথা হয়নি তাদের কারো সাথেই। তার চেয়েও বড় কথা নয়ন কীভাবে নিবে বিষয়টা?

দীর্ঘ সময় ভেবেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না হেমা। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সে যদি নয়নের বাসায় যায়ও, তবে এখন তা সম্ভব নয়। মনটা কেমন ভারি হয়ে উঠছে আবার। মাথার ভেতর চিনচিনে একটা ব্যথা হচ্ছে। বাসায় ফেরা দরকার। এই ব্যথাটা আজকাল প্রায় প্রায়ই হচ্ছে। কখনো কখনো ব্যথাটা অসহনীয়ও হয়ে ওঠে। সে চট করে উঠে দাঁড়াল। রাহাত অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বলল, 'কি হলো?'

হেমা বলল, 'বাসায় যাব। শরীরটা ভালো লাগছে না।'

www.boighar.com

রাহাত বলল, 'চল পৌঁছে দিয়ে আসি।'

হেমা বলল, 'না, আমি যেতে পারব।'

সে রাহাতকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলো না। তাকালও না আর রাহাতের দিকে। সোজা হেঁটে টিএসসি থেকে বেরিয়ে রিকশা ধরল। রিকশায় উঠতেই কেমন স্নিগ্ধ একটা হাওয়া ছুঁয়ে দিলো তাকে। এই হাওয়াটুকু ভারি ভালো লাগল হেমার। সে হঠাৎ রিকশাওয়ালাকে বলল, 'মামা, একটু ঘুরে যাবেন? দোয়েল চত্বর, শহীদ মিনারের ওদিকটা ঘুরে এসএম হল, ইডেন কলেজ হয়ে।'

রিকশাওয়ালা প্যাডেল চাপতে চাপতে বলল, 'আইচ্ছা'।

রিকশা বাংলা একাডেমির সামনে হয়ে দোয়েল চত্বর অবধি পৌঁছাল। সেখানে সামান্য জ্যাম। হেমা রিকশায় বসে কতকিছুই যে ভাবছে! এলোমেলো সব ভাবনা। একটা সহজ, সাধারণ জীবন তার, অথচ মাত্র ক'দিনেই কেমন জটিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই জটিলতা নিয়েও আজকাল আর এত ভাবতে ভালো লাগে না তার। এই ভাবনা রোগটা সে তাড়াতে চায়। ভাবতে বড্ড ক্লান্ত লাগে আজকাল।

কিন্তু হেমার ভাগ্যটা বড় খারাপ। ভাবনারা তার পথ ছাড়ল না। বরং আরো দৃঢ় হয়ে পথ আগলেই রইল। সে এতক্ষণ খেয়াল করেনি। তার ঠিক ডান পাশেই, সামনের রিকশাটাতেই সে যাকে দেখল, তাকে এখানে আশা করেনি হেমা। রিকশায় বসে আছেন তার বাবা আসলাম সাহেব। আসলাম সাহেবের সাথে রিকশায় বসে রয়েছে ঝলমলে হাস্যোচ্ছল এক মেয়ে। দেখতে তরুণী মনে হলেও মেয়েটার বয়স খুব একটা কম হবে বলে মনে হলো না হেমার। চল্লিশের কাছাকাছি হবে হয়তো! তরুণী হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। তার কথা শুনে আসলাম সাহেব হাসতে হাসতে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছেন মেয়েটার গায়ে। তাদের দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে জগতের সুখীতম মানব-মানবী।

তাবারন কাঁদছে। পারুল বারকয়েক কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু তাবারন কিছু বলেনি। বরং পারুল তার সামনে গেলেই তাবারন কান্না বন্ধ করে দেয়। পারুল আজও গেল। সে যাওয়ার সাথে সাথেই তাবারন চুপ মেরে গেল। পারুল রাগল না। সে নরম গলায় বলল, 'তাবারন খালা, কান্দেন ক্যান, কারণটা বলেন। কারণ না বললে সমস্যার সমাধান কি কইরা হইব?'

তাবারন চুপ। পারুল বলল, 'আপনের বুকে কি আবার ব্যথা হইতেছে? ঘা শুকায় নাই পুরাপুরি?'

তাবারন চুপ। পারুল তাবারনের পাশে গিয়ে বসল। তারপর বলল, 'ডাক্তার বলছিল ঘাও না শুকাইলে তারে জানাইতে। আপনে বলেন, ঘাও কি শুকায় নাই? কোনো চুলকানি হইতেছে?'

তাবারন চুপ। পারুলের হঠাৎ রাগ উঠে গেল। সে গলা চড়িয়ে বলল, 'আপনেরা সবাই কি পাইছেন আমারে? আমি তো একটা মানুষ, নাকি? এই বাড়ি একটা পাগলের কারখানা। এহন আপনেরা সবাই মিল্যা কি আমারেও পাগল বানাইবেন নাকি?'

তাবারন এবারও চুপ। পারুল এবার রীতিমত চেঁচাল, 'হয় কথা কইবেন! কান্দনের কারণ কইবেন। না হইলে আর একবারও কানবেন না। একবারও না। যদি কান্দেন তাইলে এই বাড়ির বাইরে গিয়া কানবেন। এই আমার এক কথা। এই বাড়িতে থাইকা আর কান্দন যাইব না। কথা বুঝছেন?'

তাবারন কথা বুঝেছে কিনা বোঝা গেল না। তবে সে এবার শব্দ করল। সে শব্দ করে কান্না শুরু করল। তাবারন বসা ছিল তার ঘরের মেঝেতে মাদুরের ওপর। আচমকা বসা থেকে সে সেই মাদুরের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল।

পারুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সেই কান্না দেখল। তারপর প্রচণ্ড রাগ, বিরক্তি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আজ নুরুন্নাহার সুস্থ। তিনি ভরদুপুরে

www.boighar.com

উঠানের মাঝখানে বসে কচুর লতি কুটছেন। কিছুক্ষণ আগে পুকুর পারের নিচু জলাভূমি থেকে এই কচুর লতি তিনি কুড়িয়ে এনেছেন। পারুল মাকে দেখে বলল, 'এইগুলান যে রানবা, এইগুলান খাইলে যে গলা চুলকায়, সেইটা তুমি জানো না?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'গলা চুলকাইব ক্যান?'

পারুল বলল, 'যদি রোদ না লাগে, আর পানি বা ছেওয়ার মইধ্যে কচু হয়, তাইলে সেই কচুতে যে গলা চুলকায় এইটা তুমি জানো না? এইটা কি নতুন কোনো ঘটনা?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'মাইয়া মাইনষের বয়স হইতে হয় অল্পতেই। তুই দামড়ি মাইয়া হইছস, এহনও তোর বয়স হইল না?'

পারুল মায়ের কথা বুঝতে পারল না। সে আজকাল নুরুন্নাহারকে নিয়ে খুব ভয়ে থাকে। কখন সে সুস্থ আর কখন অসুস্থ এ বোঝা বড় কঠিন। এইজন্য তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনা খুব জরুরি। নুরুন্নাহার বলল, 'মাইয়া মাইনসের মায়ের প্যাটেরতন পইড়াই অনেক কিছু জানতে হয়। না জানলে বিয়ার জইন্য ভালো গেরস্ত পাওন যায় না। আর গেরস্ত পাইলেও বিয়ার পর যায় শ্বশুর-শাশুরির খোঁটা শুনতে শুনতে।'

পারুল বলল, 'এইসব কথা বলতেছ ক্যান?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'এই যে কচু। এই কচু পানিতে হোক আর ছেওয়ায় হোক। রান্ধনের সময় এই কচুর লগে কয় দানা তেঁতুল দিবি। তারপর রানবি। খাইলে মনে হইব বেহেস্তের খানা খাইতে আছস।'

পারুল বলল, 'তোমার বেহেস্তের খানা তুমিই খাও। ওই জিনিস আমি খাইতে পারব না।'

নুরুন্নাহার কথা বললেন না। তিনি এক মনে তরকারি কুটছেন। তাবারন কেঁদেই চলছে। নুরুন্নাহার বললেন, 'ওই ছেমড়ি হারাদিন এমন কান্দে ক্যান? সে কি এই বাড়ির রাজরানী নাকি? তারে তিন বেলা রাইন্ধা-বাইরা সাজাই গোজাইয়া দিতে হইব? মুখে খাওয়াইয়া দিতে হইব না?'

পারুল বলল, 'সে যে অসুস্থ তুমি জানো না? আর তারে এই অবস্থা কে করছে তুমি জানো না?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'মাগী গো আবার সুস্থ-অসুস্থ কী? আর যেইহানে পুড়ছে, ওইহানে ওর চুলকানি বেশি আছিল। চুলকানি কমে নাই এহনো? নাকি আগুন আরো লাগব?'

পারুল বলল, 'মা, একখান কথা বলো তো? তুমি কি আসলেই অসুস্থ? নাকি অসুস্থের ভান ধইরা থাক? এই তাবারন খালারে তুমি সুস্থ থাকলেও

দেখতে পারো না, অসুস্থ থাকলেও দেখতে পারো না। ঘটনা কি, আমারে খুইল্যা কও তো?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'ঘটনা কিছু না। আমি মাগী-ছাগী দেখতে পারি না।'

পারুল বলল, 'তোমার মুখ এত খারাপ ক্যান মা? সব সময় খালি খারাপ ভাষা বাইর হয়।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'আমি নিজে খারাপ মানুষ, এইজইন্য আমার মুখেরতন খারাপ ভাষা বাইর হয়। তুই আর তোর বাপে সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ। এইজইন্য তোগো মুখ দিয়া সাধু কথা বাইর হয়।'

পারুল বলল, 'তুমি খারাপ মানুষ কেন হইবা? তুমি মানুষ ভালো।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'আমি ভালো মানুষ হইলে কি আর আমার ভাতারে আমারে ছাইড়া অন্য মাগী গো ধারে শুইতে যাইত!'

পারুল তার মার মুখে এই কথা অসংখ্যবার শুনেছে। তার বাবা আব্দুল ফকিরকে নিয়ে নানান আজে-বাজে কথা তার মা বলেন। শুধু যে মার মুখে শুনেছে তা-ই নয়। মাঝে-মধ্যে এখান সেখান থেকেও সে টুকটাক কথাবার্তা শুনেছে। কিন্তু বাবাকে সে একজন বাবার বাইরে অন্য কিছু একটি মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেনি। মানুষটা কার কাছে কেমন তা সে জানে না, কিন্তু তার কাছে আব্দুল ফকির একজন অসাধারণ বাবা। মাঝে-মধ্যে এই বাবার জন্যই তার নিজেকে বড় ভাগ্যবতী মনে হয়। বাবাকে নিয়ে তার অসাধারণ সব স্মৃতি আছে। সেইসব স্মৃতি একটা মানুষের এক জীবনের সেরা সংগ্রহ হতে পারে।

তার স্পষ্ট মনে আছে, বাবা তাকে নিয়ে একবার গিয়েছিলেন রায়গঞ্জ ধান ভানাতে। তখন তাদের খুব অভাবের কাল। ধান ভানানো শেষে নৌকায় যে চাল নিয়ে তারা ফিরছিল, তা-ই ছিল বছরের বাকি সময়ে তাদের সকলের খোড়াকি। চাল নিয়ে নৌকায় ফেরার পথে হঠাৎ তুফান উঠল নদীতে। সে কী ভয়াবহ তুফান! নৌকার পাল ছিড়ে উড়ে চলে গেল। আব্দুল ফকির বহুকষ্টে নাওখানা নদীর তীরের কাছাকাছি নিয়ে এলেন। কিন্তু নদীর তীর জুড়ে নলখাগড়ার দীর্ঘ বন। এই বনের মধ্যে নৌকা আটকে গেলে সমস্যা। এখন নৌকা নিয়ে যেতে হবে গুণ টেনে। আব্দুল ফকির দড়ি বেঁধে নিলেন নৌকার গলুইয়ের সাথে। তারপর হাঁটু পানিতে নেমে সেই দড়ির অন্য প্রান্ত কাঁধের সাথে বেঁধে নৌকা টেনে নিয়ে যেতে থাকলেন সামনে। কিন্তু নৌকার ভেতর একা একা প্রচণ্ড ভয়ে কাঁদছিল পারুল। তখন তার বয়স কত হবে? পারুল স্পষ্ট মনে করতে পারে না। তবে চার-পাঁচ হতে পারে। বেশিও হতে পারে। আব্দুল ফকির নৌকা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, আর পারুল সমানে চিৎকার করে কাঁদছে। তিনি তখন গুণ টানা রেখে মেয়ের কাছে গিয়ে বললেন, 'কি গো মা, কান্দো ক্যান?'

পারুল বাবার কথার জবাব দিলো না। সে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতেই বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আব্দুল ফকির দুই হাতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে

www.boighar.com

ধরলেন। বাইরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। এই ঝড়-বৃষ্টিতে নৌকা এভাবে এইখানে রেখে দেওয়া নিরাপদও না। যে-কোনো সময় উল্টে যেতে পারে। তাছাড়া ঝড় বৃষ্টি কখন থামে তার কোনো ঠিকঠিকানাও নেই। এদিকে সন্ধ্যা নামতে দেরীও নেই বেশি। রাতে নৌকা এখানে আটকে গেলে ভয়াবহ বিপদ। তিনি কোনোভাবেই পারুলকে নৌকার ভেতর রাখতে পারলেন না। কী করবেন এখন? শেষ পর্যন্ত সেই চালভর্তি নৌকা কাঁধে করে গুণ টেনে নিয়ে যেতে হলো তাকে। কাঁধের দুইপাশে দুই পা রেখে বসিয়ে দিতে হলো পারুলকেও। পারুল বাবার মাথা ধরে বাবার কাঁধে পা ঝুলিয়ে বসে রইল। তার বাবা অচিন্তনীয় কষ্টে সেই একই কাঁধে অতগুলো চালের ওজনে ভারি নৌকাখানাকে সেই নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে মাইলের পর মাইল গুণ টেনে নিয়ে এলেন।

আব্দুল ফকিরের বাম পায়ের সামনের দিকটা কাটা। ফলে সেই পায়ে তিনি পুরোপুরি শক্তিও পান না। এশার আজানের সময় তিনি নৌকা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। পারুল তখন বাবার কাঁধেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আব্দুল ফকির এক হাতে মেয়েকে শক্ত করে চেপে ধরে আরেক হাতে গুণ টেনে যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন গুণের দড়ির ক্রমাগত ঘর্ষণে তার কাঁধের চামড়া, মাংস ছিলে পিঠ বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছিল। হাঁটু অবধি নলখাগড়ার ঝোঁপের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে তার পা দু'খানা ধারাল নলখাগড়ায় কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। সেইসব ক্ষত বেয়ে অঝর ধারায় রক্ত বইছিল।

এরপর প্রায় দিন সাতেক বিছানা থেকেই উঠতে পারেননি আব্দুল ফকির। পারুলের এমন কত কত স্মৃতি যে মনে আছে! একবার কাঠবাদাম কাটতে গিয়ে সে হাত কেটে ফেলল। তার সেই কাটা হাত দেখে আব্দুল ফকির বাচ্চাদের মতো কেঁদে বুক ভাসালেন। তিনি সারাক্ষণ পারুলের পাশে বসে থাকতেন। পারুল ঘুমালে পারুলের পাশে সারারাত জেগে থাকতেন। যদি ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে বা নড়তে গিয়ে সে ব্যথা পায়!

সেই বাবাকে নিয়ে কেউ কিছু বললে পারুলের সহ্য হয় না। কিন্তু সে কিছু বলেও না। বাবার সাথেও যে তার সম্পর্ক খুব মাখামাখির, তাও না। বরং একটা স্পষ্ট দূরত্ব যেন রয়েই গেছে। বড় হবার সাথে সাথে সেটি আরো বেড়েছে। কিন্তু তারপরও বাবা তার কাছে সব সময়ই আলাদা কেউ। এই মানুষটার কাছে সে যেন এক রাজকন্যা। হতে পারে তার বাবা রাজা নন, কিন্তু পারুল জানে, তার বাবার কাছে সে সত্যিকারের রাজকন্যাই।

পারুল তার মাকে বলল, 'তোমারে আল্লাহর দোহাই লাগে মা, আব্বারে নিয়া সব সময় এমন কুকথা বইল না।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'বাপের আসল রূপখান যদি দেখতি, তাইলে বুঝতি, আকথা-কুকথা কারে কয়?'

পারুল বলল, 'তোমার বাপরে নিয়াও তো তুমি কত ভালো ভালো কথা কও। সেও কি ফেরেস্তা আছিল? তোমার বাপ বিয়া করছিল তিনখান। তার তিন বউর কাছে গিয়া জিজ্ঞাস কইরা দেখতা, তারা তাগো স্বামীর নামে কি কয়!'

নুরুন্নাহার বললেন, 'হেইযুগে, টাকাওয়ালা সব মাইনষেই দুই-তিনখান কইরা বিয়া করত। তহন খারাপ মানুষ ভালো মানুষ বইলা কম বেশি বিয়া করত না। তহন বিয়া করত কাজ-কাম করানির লাইগ্যা। শত শত মণ ধান উঠত, পাট উঠত, গম, মরিচ, ডাইল আরো কত ফসল উঠত। এত ফসল লওনের লোক পাইব কই? এইসময় যাগো আত্মীয়-স্বজন বেশি, তাগো হইত সুবিধা। মাসকে মাস এই আত্মীয়-স্বজনরা আইসা, থাইক্যা কাম কইরা দিয়া যাইত। দুই তিনটা বউ থাকলে আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যাও বাইড়া যাইত। কাজে-কামে সুবিধা হইত।'

পারুল হঠাৎ হা হা হা করে হেসে উঠল। নুরুন্নাহার বললেন, 'ওইরম দাঁত কেলাইয়া হাসনের মতো কিছু কইছি আমি?'

পারুল বলল, 'না, তা কও নাই। তয় এই প্রথম কেউরে দেখলাম যে তার বাপের দুই তিনখান বিয়া করনের পক্ষে কথা কয়। তোমার বাজান মানুষ যেমন হোক, মাইয়া একখান জন্ম দিছে মাশাল্লাহ ভালো।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'খবরদার আমার বাপেরে লইয়া কোনো আজেবাজে কথা কইবি না। সে আছিল ফেরেস্তা। আশেপাশের দশগ্রামের মানুষে তারে এক কথায় মাইন্য করত।'

পারুল বলল, 'আমার বাপরেও করে। তারে দশগ্রামের বেশিই করে।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'এমনে এমনে করে না। ডরায় দেইখ্যা করে। তাও সবাই করে না। করে ওই গরীব যারা আছে তারা। তাগো নানান উপায়ে ডর দেহাইয়া দমাইয়া রাহন যায় তো!'

পারুল বলল, 'হ। অন্যের বাপ সব সময় খারাপ। নিজের বাপ সব সময় ভালো। তা আমার বাপ আমার কাছে ভালো হইলেই হইব। তোমার কাছে ভালো হওনের দরকার নাই।'

নুরুন্নাহার হঠাৎ কচুর লতি কোটা রেখে উঠে গেলেন। পারুল প্রথমে ভেবেছিল নুরুন্নাহার ঘরে কিছু আনতে গেছেন। কিন্তু অনেক সময় পরও যখন তিনি ফিরলেন না, তখন পারুলের বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। আবার কোনো অঘটন নয় তো! সে দৌড়ে প্রথম তাবারনের ঘরে গেল। তাবারন কাঁদতে কাঁদতে ঘরের মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। পারুল একটা লম্বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর নুরুন্নাহারের ঘরে এলো। নুরুন্নাহার অন্ধকার ঘরে বসে আছেন। ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। পারুল মায়ের কাছে গিয়ে বসল। তারপর আচমকা দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ও মা। মাগো'।

www.boighar.com

নুরুন্নাহার কোনো কথা বললেন না। তিনি চুপচাপ বসেই রইলেন। পারুল তার এই মাকে সেভাবে পায়নি। ছোটবেলা থেকেই সে মাকে দেখেছে পাগল। অপ্রকৃতিস্থ। যেটুকু সময় ভালো থাকতেন, সেটুকু সময়ও সারাটাক্ষণ বাবাকে গালমন্দ করতেন। বিষয়টা পারুলের ভালো লাগত না। কারণ এইটুকু বয়সের বেশিরভাগ সময়ই সে বেড়ে উঠেছে বাবার কাছে। সেই বেড়ে ওঠায় মুহূর্তের জন্যও তার বাবাকে খারাপ কিছু মনে হয়নি তার। নাকি পিতৃপ্রেমে অন্ধ সে?

মার সাথে এমন আহ্লাদ করে কথা বলতেও তার কেমন অস্বস্তি হয়। এই বিষয়গুলোর সাথে সে পরিচিত নয়। তবে তার বাবার যে কোনো একটা সমস্যা রয়েছে, সেটি পারুল খুব সামান্য হলেও বোঝে। মানুষ যা বলে তার কিছু না কিছু হলেও তো সত্য । কিন্তু ওই যে, সচেতন কিংবা অবচেতন, কোনোভাবে সে তা কখনোই বিশ্বাস করতে চায় না। তাছাড়া নিজের চোখে সে এমন কিছু কখনো দেখেওনি। তবে তার মায়ের এই সুদীর্ঘ অসুস্থতার পেছনে তার বাবার যে একটা ভূমিকা রয়েছে, তা পারুল অনেকের কাছ থেকেই ঠারে-ঠুরে শুনেছে। কিন্তু এ নিয়ে সে বাবাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করেনি। আসলে কি জিজ্ঞেস করবে সে?

আর মাকে জিজ্ঞেস করার প্রশ্নই আসে না। বাবার বিরুদ্ধে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেই হয়েছে! তার মুখ ছুটবে আগুনের গোলার মতো। পারুল মাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। সে হঠাৎ টের পেল, নুরুন্নাহারের শরীরটা থেকে থেকে কাঁপছে। পারুল হাত বাড়িয়ে মার মুখটা তার দিকে ঘোরাল। নুরুন্নাহার কাঁদছেন। তার চোখের পানিতে গাল ভিজে গেছে। পারুল বলল, 'ও মা, কান্দো ক্যান?'

নুরুন্নাহার কথা বললেন। তবে এবার আর তিনি সবসময়ের মতো ঝাঁঝালো গলায় আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে কথা বললেন না। তিনি খুব ধীরে সুস্থে শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, 'জীবনডা নষ্ট করনের লইগ্যা কান্দি। একলা আমার জীবন না। আরো অনেকের জীবনই। আমার বাপজান কোনোদিন এই ওঝা-ফইরের লগে আমারে বিয়া দিতে চান নাই। আমি তার কথার অবাধ্য হইছি। বংশের মুখে চুনকালি মাখছি। মাইখ্যা তার লগে ভাইগ্যা আইছি। আমার জইন্য আমার আর বইনোগোও বাজান এক লগে বিয়া দিয়া দিছে। আমার লগে কারো কোনো যোগাযোগ রাখতে দেয় নাই। সেই আমি আইসা দেখি এই মানুষটা একটা আস্তা ইবলিশ শয়তান। বাইরে থেইকা কিচ্ছু বোঝা যায় নাই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এর রূপ যে দেখছে, সে জানে এ কত বড় হারামি। আইজ আমি পাগল, আমার কথার কোনো দাম নাই। কেন নাই? আমি কি এইরম আছিলাম? আছিলাম না। আমারে এইরম বানাইছে সে। কত অত্যাচার যে এই মানুষটা আমারে করছে! রাইতের পর রাইত ঘুমাইতে দেয় নাই। জ্বীনে ভূতে ধরছে কইয়া ঘরের মইধ্যে আটকাইয়া

www.boighar.com

আমার চিকিৎসা করছে। খাওন দেয় নাই, পানি দেয় নাই। আমি চিক্কুর দিয়া মাইনষেরে কইছি, আপনেরা একটু শোনেন, আমারে কিছুতে ধরে নাই, আমি সুস্থ স্বাভাবিক একটা মানুষ। সে আমারে পাগল বানাইতেছে। আপনেরা একটু আমার বাপ-ভাইরে খবর দেন। কেউ আমার কথা শোনে নাই। ঘরের মইধ্যে আটকাইয়া পিটাইতো। ভাত দিত না খাইতে। কতদিন মাথার মইধ্যে বাড়ি মারছে! যাতে মাথায় আঘাত পাইয়া পাগল হইয়া যাই। পায় ধইরা কানতাম, লাথি দিত! সারাদিন-রাইত ঘরের মইধ্যে কি জানি পুইড়া ধুয়া দিয়া রাখত। সেই ধুয়া গেলে মাথা ঘুরাইত। চোখে কিছু দেখতাম না। সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা লাগত। পানির লগে মিশাইয়া কত কি যে খাওয়াইছে। আরো কতকিছু কিয়ের লগে মিশাইয়া খাওইয়াছে আল্লায় জানে! আর জানে, ওই ইবলিশ শয়তানটায়। আমার জীবনটা সে নষ্ট কইরা দিলো।'

নুরুন্নাহার ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পারুল মায়ের মাথাটা বুকে চেপে ধরে রাখল। এইসব কথা কম-বেশি সে মায়ের মুখ থেকে শুনেছে। শুনেছে, আরো কত কথাই! সবচেয়ে বেশি যা শুনেছে, তা হলো তার মা সময়ে-অসময়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। তার বাবার কথা শুনতেন না। জ্বিন, পরী, খারাপ শক্তির আছর থেকে বাড়ি-ঘর সুরক্ষিত রাখতে তার বাবা আব্দুল ফকির নানান মন্ত্র পড়ে বাড়ির চারপাশে কি সব পুঁতে বাড়ি বন্ধন দেন। কিন্তু তার মা যখন-তখন সেই বন্ধনের বাইরে চলে যেতেন। এইসব কারণেই তার উপর বদজ্বীনের আছর পড়েছে।

গ্রামে এমন অনেক ঘটনা পারুল নিজ চোখেই দেখেছে। সে এও দেখেছে, সেইসব ঘটনায় তার বাবাকে লোকজন খুব সম্মানের সাথেই নিয়ে যায়। শুধু যে এই গ্রামেই নেয়, তাও না। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসে তাকে নিয়ে যেতে। তার বাবার যে আলাদা একটা ক্ষমতা আছে সেটা সকলেই জানে। কিন্তু মা আজ যখন এমন করে বললেন, পারুলের তখন খুব মন খারাপ হয়ে গেল। এমন করে আগে কখনো সে মায়ের কথাগুলো শোনেনি। অনুভবও করেনি। তবে মা যা যা বলেছেন, তার সবই বাবা করেছে, এটা তার বিশ্বাস হয় না। মার মাথার ঠিক নেই, তিনি কখন কি বলেন, তা নিজেও জানে না।

নুরুন্নাহার কাঁদছেন। পারুল মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ও মা, মাগো'।

নুরুন্নাহার জবাব দিলেন না। পারুল বলল, 'তোমারে এইসব কইরা আব্বার লাভ কি?'

নুরুন্নাহার চট করে কান্না থামালেন। কিছু সময় স্থির স্তব্ধ বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'কত কারণ যে আছে, সেইগুলান শুনলে আমারে আবারো পাগল বানাবি। তয় একটা কারণ শোন। এই একটা কারণ হইল ওই তাবারন!'

পারুল যেন মায়ের কথা বুঝতে পারল না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা কইলা?'

নুরুন্নাহার আবার বললেন, 'জানতাম আমার কথা বিশ্বাস করবি না। ভাববি আমি পাগল। কিন্তু ওই তাবারন। তাবারন একটা কারণ।'

পারুল এবার মোটামুটি নিশ্চিত, মা আবারো আবোল-তাবোল বকবেন। তাবারনের কারণে বাবা তাকে এই অবস্থা করবেন! বিষয়টি যথেষ্ট হাস্যকর। নুরুন্নাহার বললেন, 'তাবারনের যে পোলা মাইয়া হইব না, এই খবর জানস?'

পারুল বলল, 'এই খবর সকলেই জানে। এই কারণে তার দুইবার বিয়াও ভাঙছে।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'তারে যে বাঁজা বানাইছে তোর বাপ, এই কথা তুই জানস? কি খাওয়াইলে, কি পদ্ধতি করলে বাচ্চা-কাচ্চা হয় না, বাচ্চা-কাচ্চা পেটে আইলেও নষ্ট করন যায়, এইগুলানের হাজারটা তরিকা যে তোর বাপ জানে, সেইটা তুই জানস?'

পারুল এবার আর মায়ের কথার জবাব দিলো না। নুরুন্নাহার বলল, 'তোর বাপ যে কি জানে, এইটা কেউ জানে না। এইটা যদি কেউ জানত...!'

কথা শেষ না করেই নুরুন্নাহার থেমে গেলেন। পারুল বলল, 'এইটা কেউ জানলে কি হইত?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'তোর বাপের কিছু হইত না। হইত যে জানত, তার। সে আমার মতো হইয়া যাইত। আধপাগল হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত'।

নুরুন্নাহার সামান্য থেমে আবার বললেন, 'ওই তাবারনের বিয়া ভাঙনের লইগ্যা এইগুলান সব সে করছে। যাতে আজীবন তাবারনের এই বাড়িতে থাকন লাগে। তাবারনের বয়স তহন কত? তেরো-চৌদ্দ বছর। সেই বয়সে সে মাইটার জীবনটা নষ্ট করছে! কেন নষ্ট করছে বুঝস না ছেমড়ি? এত বড় হইছস ব্যাতাসে?'

পারুল কিছু একটা আঁচ করছে। কিন্তু এই এতবছরেও কখনো কোনোদিন এমন কিছু দেখেনি যার জন্য সে কোনো সন্দেহ করবে! নুরুন্নাহার বললেন, 'ওই তাবারনের নরম শরীল। ওই শরীলটা তার খুব...'।

পারুলের হঠাৎ যেন গা গুলিয়ে এলো। সে বলল, 'আল্লারস্তে একটু থামো মা। তোমার পায় পড়ি. একটু থামো। একটা মাইনষের নামে এত খারাপ কথা কইতে তোমার বাধে না মা? খারাপ হোক, ভালো হোক, মানুষটা তোমার স্বামী। আমার বাপ।'

নুরুন্নাহার ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন। পারুলকে ছিটকে ফেলে দিলেন দূরে। তারপর চিৎকার করে বললেন, 'সব নেমকহারাম। সব নেমকহারাম। নিজের প্যাটে যে মাইয়া ধরছি, সেও নেমকহারাম। সবাই ইবলিশ। এই দুইন্যায় আমি থাকত কোনো ইবলিশ রাখব না। আমার দাও কই? আমার দাও?'

তিনি দৌড়ে ঘর থেকে বের হলেন। তারপর চিৎকার করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগলেন তাবারন আর আব্দুল ফকিরকে। পারুল ছুটে গিয়ে মাকে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে নুরুন্নাহার হাতে তুলে নিয়েছে সেই রামদা। তিনি রামদা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'আইছি একা, যাইমু একা, সঙ্গে কেউ যাইব না, এই দুনিয়া ফানা হইব জাইনাও জানো না...'

তিনি সুর করে একের পর এক এলোমেলো গান গাইতে লাগলেন। পারুল মাকে বার বার অনুরোধ করছে দা'খানা ফেরত দিতে, কিন্তু নুরুন্নাহার তার কিছুই খেয়াল করছেন না। পারুল শেষমেশ নুরুন্নাহারের দিকে এগুলো। সে নিশ্চিত, আর যাই হোক, অন্তত পারুলকে নুরুন্নাহার আঘাত করবেন না। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। নুরুন্নাহার চোখ বন্ধ করে সাঁই করে দা চালালেন। পারুল জগতের সকল অবিশ্বাস নিয়ে হতভম্ব চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। সে নিজের অজান্তেই সহজাত প্রবৃত্তিতে সামান্য বাঁ দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু তাতেও বড় ধরনের আঘাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না। তার বাহুর আড়াআড়ি প্রায় অর্ধেকটা মাংস কেটে দা খানা বেরিয়ে গেল। সেখানে বীভৎস এক ক্ষতস্থান তৈরি হয়েছে। হা করা মুখের মতো আড়াআড়ি ফাঁক হয়ে আছে কেটে যাওয়া মাংসপিণ্ড। সেই ফাঁক গলে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে।

পারুল ডান হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল। নুরুন্নাহার তখনো সাইসাই করে তার মাথার উপর দা খানা ঘোরাচ্ছেন। পারুল চূড়ান্ত অবিশ্বাস নিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। নুরুন্নাহার এক পা দু' পা করে এগিয়ে আসছেন। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট হিংস্রতা। যেন এক নৃশংস, খুনি, উন্মাদিনী। পারুলের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আর কিছুক্ষণের মধ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে! তার শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই যে সে এখান থেকে সরে যাবে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে পারুল। নুরুন্নাহারকে দেখে এখন আর মনে হচ্ছে না যে এই মানুষটা তার মা। দেখে মনে হচ্ছে, তার শরীরে অন্য কেউ ভর করেছে। নুরুন্নাহার একদম পারুলের হাতছোঁয়া দূরত্বে চলে এসেছেন। পারুল ভয়াবহ আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল। যে-কোনো মুহূর্তে তার গলায়, মাথায় বা অন্য কোথাও প্রচণ্ড আঘাত পড়বে। তার জীবনের শেষ আঘাত। শেষ মুহূর্তের আঘাত। কিন্তু আঘাতটা পড়ল না। বরং অস্বাভাবিকভাবে নুরুন্নাহারের কণ্ঠে ভয়ার্ত করুণ স্বর শুনতে পেল পারুল। তিনি কাঁদো কাঁদো গলায় করুণ স্বরে বলছেন, 'আমারে মাফ কইরা দেন। আমি আর এরম করব না। আর করব না। আমারে মাফ কইরা দ্যান। এই শেষবারের মতো আমারে মাফ কইরা দেন।'

নুরুন্নাহার কাঁদছেন। প্রচণ্ড ভয়-আতঙ্কের সেই কান্না। পারুল প্রবল বিস্ময় নিয়ে চোখ খুলে তাকাল। নুরুন্নাহার হাতের দা ফেলে তার সামনেই মাটিতে বসে থরথর করে কাঁপছে। তার দৃষ্টি পারুলের মাথার উপর দিয়ে পেছনে।

পারুল ঘাড় ঘুড়িয়ে পেছনে তাকাল। সেখানে আব্দুল ফকির দাঁড়ানো। আব্দুল ফকিরের হাতে পুরনো মোটা একখানা লোহার রড। রডের একটি মাথা আগুনে পুড়িয়ে পিটিয়ে চ্যাপ্টা করা হয়েছে। সেই চ্যাপ্টা মাথাখানা কুচকুচে কালো। পারুল কিছুই বুঝল না। তবে নুরুন্নাহারের অমন করুণ আর্তনাদ দেখে তার বরং মায়াই হতে লাগল। সে আব্দুল ফকিরকে কিছু বলতে যাবে। কিন্তু তার আগেই আব্দুল ফকির ঠান্ডা গলায় বললেন, 'ঘরে যাও মা'।

আব্দুল ফকিরের এই কণ্ঠ পারুল তার এই জীবনে আর কখনো শোনেনি। কী ভয়ঙ্কর, ঠান্ডা, শীতল, গা হিম করা এক কণ্ঠ! মুহূর্তের জন্য পারুলের মনে হলো, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এতদিনকার চেনা মানুষটার মুখে আসলে কথা বলছেন অচেনা অজানা অন্য কোনো ভয়ানক এক মানুষ। সেই মানুষের নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারো নেই। পারুল বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল। সে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। কিন্তু তারপরও টলতে টলতে নিজের ঘর অবধি গেল সে।

গভীর রাত অবধি নুরুন্নাহারের ঘর থেকে তার হাড় হিম করা আর্তনাদ শোনা গেল। কিন্তু পারুল ঘর থেকে বের হতে পারল না। কেউ একজন বাইরে থেকে তার ঘরের দরজা আটকে রেখেছে। সে চিৎকার করে তার বাবাকে, জুলফিকারকে, রতনকে ডাকল। কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিলো না।

আব্দুল ফকির পারুলের ঘরে এলেন মাঝরাতেরও পর। ততক্ষণে নুরুন্নাহারের ঘর শান্ত-চুপচাপ। পারুলের ক্ষতস্থান যথেষ্ট গভীর। সেই ক্ষতস্থান থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝড়ে ঝড়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তীব্র ব্যথায় জ্বর চলে এসেছে পারুলের। আব্দুল ফকির কিছুক্ষণ চুপচাপ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। তারপর জুলফিকারকে ডেকে বললেন নৌকা বের করতে। সেই রাতে পারুলকে নিয়ে নৌকায় রায়গঞ্জ রওয়ানা করলেন আব্দুল ফকির। ক্লান্তি আর দুর্বলতায় পারুলের প্রাণশক্তি নিঃশেষ প্রায়। সে মৃত মানুষের মতো নেতিয়ে পড়ে রয়েছে নৌকার পাটাতনে। তার বোধ ও শ্রবণশক্তি যেন ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। সে কি জ্ঞান হারাচ্ছে?

পারুলের মনে হচ্ছে সে জ্ঞান হারাচ্ছে। কিন্তু জ্ঞান হারানোর আগে পারুল শুনতে পেল আব্দুল ফকির কাঁদছেন। তিনি তার কন্যার মাথা কোলের মধ্যে নিয়ে বসে হাউমাউ করে কাঁদছেন। পারুলের চোখ বন্ধ, কিন্তু তারপরও সে যেন তার বাবার কান্নাভেজা মুখখানা দেখতে পাচ্ছে। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে হাতখানা তুলে বাবার গাল ছুঁয়ে দিতে। বাবার চোখজোড়া মুছিয়ে দিতে। কিন্তু সে তার কিছুই করতে পারল না। সে কেবল টের পেল, তার বাবার কান্নার অশ্রু টপটপ করে ঝরে পড়ছে তার কপালে, চোখে, গালে, মুখে।

সেই অশ্রুরা তাকে স্পর্শ করে চলেছে পিতৃস্নেহের পরম মমতায়।

নয়নের সামনে বসে আছে হেমা। কিছুক্ষণ আগে সে নয়নদের বাসায় এসেছে। তার সাথে এসেছে রাহাত। রাহাত বসে আছে বাইরের ঘরে। নয়ন আধশোয়া হয়ে আছে বিছানায়। হেমা নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি সিওর যে তুমিই নয়ন?'

নয়ন হাসল। বলল, 'কনফিউশন হচ্ছে?'

হেমা বলল, 'না, কনফিউশন হচ্ছে না'।

নয়ন বলল, 'তাহলে?'

হেমা বলল, 'অবিশ্বাস হচ্ছে'।

নয়ন বলল, 'আমি কি খুব শুকিয়ে গেছি?'

হেমা কথা বলল না। নয়নই বলল, 'তুমিও কিন্তু শুকিয়ে গেছ'।

হেমা হাসল এবার। সে বলল, 'মেয়েরা শুকালে সেটা ফ্যাশন। একটু শুকানোর জন্য কতকিছু করে মেয়েরা।'

নয়ন বলল, 'এই শুকানো সেই শুকানো না। রোগা হয়ে যাওয়া।'

হেমা বলল, 'ওই একই হলো'।

নয়ন চুপ। হেমাও। তাদের কথা কি ফুড়িয়ে গেল? অনেকটা সময় চুপ করে বসে রইল দুজন। কথা নেই, শব্দ নেই। স্পর্শও নেই যেন কিছুতে। এই যে কথা বলা, এও যেন কেবল কথা বলার জন্যই কথা বলা। দেয়াল ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দের সাথে এই কথার শব্দের যেন কোনো তফাৎ নেই। আলাদা কোনো অর্থ নেই। অনেকক্ষণ বাদে হেমা বলল, 'আমাদের আর কোনো কথা নেই তাই না?'

নয়ন বলল, 'কেন থাকবে না?'

হেমা বলল, 'কি কথা?'

নয়ন বলল, 'কথা কি নির্দিষ্ট করে হয়?'

হেমা বলল, ' সেই অবাধ, অফুরন্ত কথার দিন কি আমাদের আছে?'

www.boighar.com

নয়ন বলল, 'নেই?'

হেমা বলল, 'কই? একটা দুটা কথার পরই তো কথারা সব ফুড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক খুঁজে, চেষ্টা করেও কেউ আর একটা কথাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

নয়ন বলল, 'এই যে এখন বলছি'।

হেমা হাসলো, বলল, 'হ্যাঁ, তা বলছি'।

তারপর আবার নৈঃশব্দ্য। আবার কথা খোঁজা। আবার দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ। এবার নয়ন বলল, 'ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস হচ্ছে?'

হেমা হাসল, 'খুব হচ্ছে'। তার হাসিতে শ্লেষ।

নয়ন বলল, 'হাসলে যে!'

হেমা বলল, 'ইউনিভার্সিটির ক্লাসের কথা জিজ্ঞেস করলে তো তাই!'

নয়ন বলল, 'কেন? ইউনিভার্সিটির ক্লাসের কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না?'

হেমা বলল, 'তা যাবে না কেন? নিশ্চয়ই যাবে। আসলে গত পাঁচ বছরে আর কখনো এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করোনি তো! আজই প্রথম। তাই হয়তো আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছি।'

নয়ন বলল, 'তুমি কেমন করে যেন কথা বলছ!'

হেমা বলল, 'ঠিক তাই। আমি আসার সময় ভাবিনি এমন করে কথা বলব। ইনফ্যাক্ট আমি এমন করে কথা বলার মানুষও না। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে আমার কিছু একটা হয়েছে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি না। ভেতর থেকে যা আসছে, তাই-ই করছি, তাই-ই বলছি।'

নয়ন বলল, 'নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কেন? যা ভাবছ, তা লুকাতে হবে কেন?'

হেমা বলল, 'এই যে, ভেতর থেকে যা আসছিল তা তুমি নিতে পারছিলে না।'

www.boighar.com

নয়ন আবারো চুপ করে গেল। হেমা বলল, 'যখন খুব কাছের দুজন মানুষ পরস্পরের সাথে দেখা হবার পর অনেকক্ষণ ধরে কেবল কেমন আছ, কি করছ, কি খেয়েছ, পড়াশোনা কেমন চলছে– এই ধরনের প্রশ্নোত্তর করতে থাকে, তখন কি ধরে নিতে হবে জানো? তখন ধরে নিতে হবে এরা আর কাছের মানুষ নেই। এরা এখন অনেক দূরের মানুষ। কিন্তু এরা এখনো সেই আগের কাছের মানুষের ভাবনা থেকে বের হতে পারেনি। অথবা কাছের নেই জেনেও কাছের মানুষের ভান ধরে আছে।'

নয়ন বলল, 'আমরা আর কাছের মানুষ নেই?'

হেমা বলল, 'আমার তো মনে হয় না। তোমার কি মনে হয়?'

নয়ন বলল, 'তোমার কেন মনে হচ্ছে না?'

হেমা বলল, 'আমার এসেই তোমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কাঁদতে কাঁদতেই বলতে ইচ্ছে করছিল, তুমি কী জানো, আমি তোমাকে কী অসম্ভব ভালোবাসি! তুমি যতটুকু ভাবো, তার চেয়েও হাজারগুন বেশি। তোমাকে না দেখতে দেখতে আমার গলা শুকিয়ে গেছে, তোমার গলা না শুনতে শুনতে আমি তোমার কণ্ঠস্বর ভুলে গেছি। তুমি কি আজ সারাদিন আমার সামনে বসে থাকবে? তাহলে আমার তেষ্টাটা মিটবে। আর তুমি কি খানিক পর পর আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলতে থাকবে যে তুমি আমায় ভালোবাসো! অসম্ভব ভালোবাসো। খানিক পরপর এই কথাটা আমাকে বলবে? তাহলে তোমার কণ্ঠস্বরটা হয়তো আবার আমার মনে পড়বে! কিন্তু এই এসবের কিছুই কিন্তু আমি করতে পারিনি। আমার কেবল মনে হয়েছে, এটা ন্যাকামি হয়ে যাচ্ছে না তো! আমি কি আগে কখনো আর এমন করেছি? তার চেয়েও বড় কথা, আমি এটা করলে তুমি কি ভাববে? তুমি কি এটা স্বাভাবিকভাবে নেবে? নাকি বিরক্ত হবে! কি আশ্চর্য না?'

নয়ন হেমার প্রশ্নের উত্তর দিলো না। হেমাই বলল, 'কেউ যখন তার প্রিয়তম মানুষটাকে অধিকারের কথা, স্পর্শের কথা, তেষ্টার কথা, চাওয়ার কথা বলতে গিয়ে দ্বিধায় ভোগে, তাহলে তখন বুঝে নিতে হবে, সেখানে আর যাই থাকুক, অন্তত ভালোবাসাটা আর নেই।'

নয়ন বলল, 'তুমি আজ সবকিছু এমন জটিল করে ভাবছ কেন?'

হেমা হাসল বলল, 'ওই যে! হয়তো ভেতর থেকে আসছে বলে!'

নয়ন বলল, ' তোমাকে কি আমি একটা রিকুয়েস্ট করতে পারি?'

হেমা তার বুকে হাত রেখে অভিবাদনের ভঙ্গিতে বলল, 'ইটস মাই অনার ইওর এক্সিলেন্সি।'

নয়ন হঠাৎ হাত বাড়িয়ে হেমার হাতখানা ধরল। নয়নের স্পর্শে হেমা কি সামান্য চমকে গেল! হেমার মনে হলো সম্ভবত এই প্রথম, নয়নের স্পর্শে সে কেঁপে উঠেছে। কিন্তু কেন? সুদীর্ঘ বিরতির স্পর্শ বলে? নাকি এই স্পর্শটা সত্যি সত্যিই অন্যরকম কিছু ছিল? নয়ন হেমার হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে শক্ত করে ধরে বলল, 'আমার সাথে এমন করে আর কথা বলো না প্লিজ। আমার ভালো লাগে না আর। আমি ক্লান্ত। আমার পাগল পাগল লাগে। আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়।'

নয়নের গলায় কিছু একটা ছিল। হেমা তার হাতের মুঠোয় থাকা নয়নের হাতখানা আরো শক্ত করে ধরল। তারপর বলল, 'আর বলব না'।

নয়ন চুপচাপ হেমার হাত ধরে বসে রইল। বসে রইল হেমাও। মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে নৈঃশব্দ্যের সময়। কিন্তু এই নৈঃশব্দ্যে কথা আছে অনেক। স্পর্শ

আছে। অনুভূতি আছে। আছে খানিক আগের সেই দেয়াল ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দও। কিন্তু ওই শব্দও যেন এই নৈঃশব্দ্যের ভাষা বোঝে।

নয়ন ফিসফিস করে বলল, 'পুরুষ মানুষ হিসেবে আমি খুব দুর্বল তাই না?'

হেমা বলল, 'সাহসী আর দুর্বলের বিষয়টা আমি ঠিক বুঝি না জানো? যে মানুষটা হাসতে হাসতে কাউকে খুন করে ফেলতে পারে, তাকে আমরা সাহসী বলি। আর যে মানুষটা সেই খুন দেখে কেঁদে ফেলে তাকে আমরা দুর্বল বলি। অথচ উল্টোটাই তো হওয়ার কথা ছিল। যে হাসতে হাসতে খুন করছে, সে বরং দুর্বল। মনুষ্যত্বের দিক থেকে দুর্বল। মানবিক অনুভূতির দিক থেকে দুর্বল। আর যে মানুষটি সেই খুন দেখে কেঁদে ফেলছে সে আসলে সবল, সেই মনুষ্যত্বের দিক থেকে সবল, মানবিক অনুভূতির দিক থেকে সবল। তাই না? অথচ দেখো কি অদ্ভুত! আমরা ভাবি উল্টোটাই।'

হেমার কথা শুনে নয়ন ভারি অবাক হলো। মেয়েটা এই ক'মাসেই যেন কত বড় হয়ে গেছে! আচ্ছা, হেমা কি আগেই এমন কথা বলতো? নাকি এই ক'মাসে সে একা একা অনেক বড় হয়ে গেছে! নয়নের মনে হচ্ছে, তাকে ছাড়া হেমা ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আর হেমাকে ছাড়া সে হয়ে গেছে দুর্বল।

নয়ন বলল, 'আমি আমার ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর গোপন কথা আটকে রেখেছি। সেই কথাটি আমি কাউকে বলতে পারিনি। না পারার পেছনে অনেক অনেক কারণ ছিল। কিন্তু কথাগুলো আমি আর আমার নিজের ভেতর আটকে রাখতে পারছি না। এই কষ্টটা আমি আর একা বহন করতে পারছি না। আমি কি কথাটা তোমাকে বলব?'

হেমা বলল, 'তোমার যদি মনে হয় কথাটা আমাকে বললে ভালো লাগবে, তাহলে অবশ্যই বলবে। আর ভালো না লাগলে বলবে না।'

নয়ন বলল, 'আমি এখনো বুঝতি পারছি না কথাটা তোমাকে বলা ঠিক হবে কিনা। বা তুমি কথাটিকে কীভাবে নেবে!'

হেমা বলল, 'আমি ধরে নিচ্ছি তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুততম কথাটি বলবে। কিন্তু আমি সেটা শোনার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছি। তুমি নিশ্চিন্তে বলো।'

নয়ন বলল, 'কথাটা শুনে তুমি আর যা-ই করো কেঁদে দিও না প্লিজ'।

হেমা আরো শক্ত করে নয়নের হাতটা ধরল। তারপর বলল, 'তুমি নিশ্চিন্তে বলো। আমি কাঁদব না।'

নয়ন বলল, কথাটা শোনার পরও তুমি আমার হাতটা ছেড়ে দিবে না'।

হেমা বলল, 'দেবো না'।

নয়ন লম্বা করে বার দুই দম নিলো। তারপর চোখ বন্ধ করল। তারপর আবার খুলল। তারপর হেমাকে বলল, 'তুমি কি তোমার মুখটা আরেকটু আমার

কাছে আনবে? আমি চাই না, আমার এই গোপন কথাটা তুমি ছাড়া আর কেউ শুনুক।'

হেমা তার মুখটা নয়নের কাছে নিয়ে এলো। নয়ন খানিকটা এগিয়ে হেমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। একমুহূর্তও না।'

হেমা তার কথা রাখতে পারল না। সে নয়নের হাত ধরে বসে আছে। কিন্তু তার চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। তার এত এত প্রস্তুতির কোনো কিছুই কাজে লাগল না। নয়ন তাকে ভেঙে-চুড়ে, সমূলে নাড়িয়ে দিয়েছে। সে কাঁদছে। নয়ন হাসি হাসিমুখে তাকিয়ে হেমার সেই কান্না দেখছে। এই দৃশ্য অন্য কেউ দেখলে বলত, কী অদ্ভুত, মেয়েটাকে কাঁদিয়ে ছেলেটা অমন নিষ্ঠুরের মতো হাসছে কেন! কী আশ্চর্য! কিন্তু যিনি এই দৃশ্যটি তৈরি করেছেন, তিনি জানেন, এই দৃশ্যটি এই জগতের সবচেয়ে মায়াময় দৃশ্য।

www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হাতে লাঠি। মাঝখানে বহুদিন তিনি লাঠি ছাড়াই হেঁটেছেন। কিন্তু সেদিনের হঠাৎ বমির ঘটনার পর আজকাল আবার লাঠিখানা সাথে রাখছেন তিনি। তিনি বসে রয়েছেন তার ঘরে। আমোদি বেগম দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। যে ঘটনার জন্য তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমোদি বেগমকে ডেকেছেন, তাতে আমোদি বেগমের চিন্তিত বোধ করার কথা। কিন্তু আমোদি বেগম দাঁড়িয়ে আছেন হাসি মুখে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এস্কান্দারকে বললেন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। তারপর আমোদি বেগমকে বললেন বসতে। আমোদি বেগম তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সামনে রাখা চেয়ারে বসলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ শান্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'কেমন আছ তুমি?'

আমোদি বেগম বললেন, 'ব্যাতের বেদনা ছাড়া, মাশাল্লাহ ভালো আছি'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আর কোনো অসুবিধা আছে?'

আমোদি বেগম বললেন, 'আছে'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কি অসুবিধা?'

আমোদি বেগম বললেন, 'বাতের বেদনা'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সেইটার বিষয় তো আগেই বললা'।

আমোদি বেগম বললেন, 'আসল ঘটনা তো বলি নাই'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কিসের আসল ঘটনা?'

আমোদি বেগম বললেন, 'বাতের'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ভারি বিরক্ত লাগছে। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'বাতের আবার আ্যসল ঘটনা কি?'

আমোদি বেগম বললেন, 'বয়সকালে আপনে প্রত্যেকদিন আমারে নিয়ম কইরা তিন বেলা পিটাইতেন। পিটানোর কারণ আছিল, আমি কথায় কথায় হাসি কেন? হাসি বন্ধ করার চেষ্টা যে আমি করি নাই, তা না। কিন্তু তারপরও হাসি আসত। বন্ধ করতে পারতাম না। কেউ মারা গেছে, সেই সংবাদও আমি

দিতাম হাসতে হাসতে। এই হাসি দেইখ্যাই আপনে আমারে বিয়া করছিলেন। কিন্তু বিয়ার পর আমার হাসন হইলো মানা। অনেক চেষ্টা কইরাও যহন হাসি বন্ধ করতে পারলাম না। তহন এক রাইতে আপনে আমারে ডাইকা কইলেন, আইজ তোরে আমি জন্মের মতো হাসামু। সেই রাইতে আপনে আমারে গরুর মতো বাইন্ধা পিটাইলেন। কিন্তু আপনে কইলেন, ব্যথা পাইলেও আমি কানতে পারব না। আমার হাসতে হইব। কানলেই আরো জোরে পিটান। কোহিনূর তহন ছোট। অর সামনে বইসাই আপনে পিটাইতেন। আপনে পিটান আর আমি হাসি। কী আচানক কাহিনি বলেন খাঁ সাব? আচানক না?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'এই ঘটনার লগে বাতের কি সম্পর্ক?'

আমোদি বেগম বললেন, 'সেই পিটানিতে শরীলে যে বেদনা জমা হইছিল, সেই বেদনা তো শরীল ছাইড়া আর যায় নাই। সেই বেদনা এতদিন শরীলেই লুকাই আছিল। এহন এই বুড়া বয়সে আইসা আবার বাতের বেদনা হইয়া জাইগা উঠছে।'

আমোদি বেগম হাসলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তাকিয়ে আছেন তার দিকে। আমোদি বেগম বললেন, 'এহন আবার যদি একটু আগের মতো বেয়ান, বিয়াল, রাইত– এই তিনবেলা পিটাইতেন, তাইলে মনে হয় বাতের বেদনাটা যাইত'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমোদি বেগমের সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! এমন আমোদি বেগমকে তিনি এর আগে কোনোদিন দেখেননি! এত সাহস সে পেল কোথায়! আমোদি বেগম আরো কিছু বলতে যাবেন, তার আগেই তাকে হাতের ইশারায় থামতে বললেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তারপর বললেন, 'তোমার ঘটনা কি সেইটা নিয়া আমার মাথা ব্যথা নাই। আমার যেইটা নিয়া মাথা ব্যথা সেইটার বিষয়ে যা যা জিজ্ঞাস করব, ঠিক তাই তাই উত্তর দিবা। কথা পরিষ্কার?'

আমোদি বেগম বললেন, 'জ্বে পরিষ্কার'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সেইদিন যে ফজু ব্যাপারীর বউ সালেহারে খবর দিয়া বাড়িতে আনতে বলছিলাম, সেই কথা তো মনে আছে তোমার?'

আমোদি বেগম বললেন, 'জ্বে, মনে আছে'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমারে দেখতে বলছিলাম, সালেহার হাতে বা গায়ে সোনার কোনো গয়না আছে কিনা, তুমি কি দেখছিলা?'

আমোদি বেগম বললেন, 'জ্বে, দেখছিলাম'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তার শরীলে কোনো গয়না আছিল?

আমোদি বেগম বললেন, 'জ্বে আছিল'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, ' সেই কথা তুমি আমার কাছে লুকাইছিলা?'

আমোদি বেগম বললেন, 'জ্বে, লুকাইছিলাম'।

www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সালেহারে যখন আমি আমার ঘরে ডাকছি, তহন তারে তুমি গয়নাখান খুইলা লুকাই রাইখ্যা আমার সামনে আসতে বলছিলা?'

আমোদি বেগম বললেন, 'জ্বে। বলছিলাম'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ফজু ব্যাপারী যে এক কলসী গয়না পাইছে, আর সেইটা যে আমি সন্দেহ করতেছি, এই কথা তুমিই সালেহারে বইলা দিছিলা?'

আমোদি বেগম বললেন, 'জ্বে। ঠিক ধরেছেন'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ফজু ব্যাপারীর বাড়িতে রাইতের আন্ধারে ডাকাতির নামে লোকজন পাঠাইয়া যে সেই গয়নার কলসির খোঁজ করা হইব, এই কথাও তুমি আগেভাগেই জানতা?'

আমোদি বেগম বললেন, 'জ্বে, জানতাম'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এই ঘটনা তোমারে কে জানাইছে?'

আমোদি বেগম বললেন, 'কেউ জানায় নাই'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কেউ না জানাইলে তুমি জানলা কেমনে?'

আমোদি বেগম বললেন, 'খবির আর এস্কান্দার কথা বলতেছিল, আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া শুইন্যা ফালাইছি।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তারপর রাইতের আন্ধারে আগেভাগে গিয়া এই কথা তুমি ফজু ব্যাপারীরে জানাই আসছ?'

আমোদি বেগম বললেন, 'জ্বে। ঠিক ধরেছেন। তবে তাতে আপনের ক্ষতি কিছু হয় নাই। সে আগে থেইকাই জিনিস তার ঘরে রাহে নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তুমি কি বুঝতে পারতেছ যে তুমি কত বড় অন্যায় করছ?'

আমোদি বেগম বললেন, 'না, বুঝতে পারতেছি না'।

তীব্র রাগে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর লাঠি ধরা হাতখানা কাঁপছে। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সেই রাগ প্রকাশ করলেন না। যতটা সম্ভব নিজেকে শান্ত রাখলেন। পরবর্তী কথাটা বলার আগে সময় নিয়ে নিজের রাগ সংবরণ করলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'ক্যান বোঝো নাই যে তুমি একটা অন্যায় করছ?'

আমোদি বেগম বললেন, 'ফজু ব্যাপারী যদি কিছু পাইয়াও থাহে, সেইটা তার জিনিস। সেই জিনিস আপনে চুরি করবেন কেন? আমি তো একখান ভালো কাজ করছি। চুরি হইতে পারে এই কথা গেরস্তরে আগেভাগে জানাই দিছি। এইটা অন্যায় হইব ক্যান? ধরেন, আপনের ঘরে চুরি হইব, এইরম কোনো ঘটনা যদি আমি আগেভাগে জানি, আর সেইটা যদি আপনেরে জানাই দেই, তাইলে সেইটা আমার অন্যায় হইব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমারে তোমার চোর মনে হয়?'

আমোদি বেগম বললেন, 'আমার সবাইরেই চোর মনে হয়'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যেন নিজের উপর সামান্য নিয়ন্ত্রণ হারালেন। তিনি খনিক কঠিন গলায় বললেন, 'হেঁয়ালি করবা না আমোদি বেগম। আমি হেঁয়ালি করনের লোক না।'

আমোদি বেগম বললেন, 'হেঁয়ালি কি করব? হেঁয়ালি কি জিনিস, তাই তো আমি বুঝি না। করব কেমনে?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমারে তোমার চোর মনে হয়?'

আমোদি বেগম বললেন, 'হয়'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার এই দীর্ঘ জীবনে এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি আর কখনো হয়েছিলেন কিনা মনে করতে পারছেন না। কিন্তু তিনি অবাক হচ্ছেন এই ভেবে যে তাকে এই অদ্ভুত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি যিনি ফেলেছেন, তিনি হলেন এমন একজন মানুষ, যাকে তিনি চিরটাকাল সামান্য একজন গৃহকর্মির চেয়ে বেশি কিছু ভাবেননি।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমার নিজেরে কি মনে হয়?'

আমোদি বেগম বললেন, 'আমার নিজেরেও চোর মনে হয়। আপনার চাইতেও বড় চোর।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এবার থতমত খেয়ে গেলেন। এই প্রথম কারো সামনে কি বলবেন, না বলবেন তা নিয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। খানিক চুপ থেকে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমার নিজেরে চোর মনে হয় ক্যান?'

আমোদি বেগম বললেন, 'এইটা কি কথা জিগাইলেন? চুরি করি দেইখ্যাই চোর মনে হয়।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সতর্ক হয়ে উঠলেন। একে বিশ্বাস করা যায় না। এই এতটা বছর ধরে এ এই খাঁ-বাড়ির অন্দরে রয়েছে। কে জানে, এমন করে আর কত ক্ষতি সে খাঁ-বাড়ির করেছে! কত ধনসম্পদ সে চুরি করে সরিয়েছে! যে ছোট ঘর, ছোট বংশ থেকে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমোদি বেগমকে বিয়ে করে এনেছিলেন, তাতে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সামনে সে কথা বলার সাহস কারোই ছিল না। সেই আমোদি বেগমের আজকের এই রূপ দেখে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যারপরনাই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি চিন্তিতও বোধ করছেন। এই বাড়ি থেকে কি কি চুরি করেছে আমোদি বেগম? সেই চুরি করা জিনিসপত্র সে রেখেছেই বা কোথায়?

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার ভেতরের দুশ্চিন্তাটা চেপে রেখে স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কি চুরি করছ তুমি?'

www.boighar.com

আমোদি বেগম হাসলেন। বললেন, 'ডরাইয়েন না। আমি আপনের কোনো ধন-সম্পদ চুরি করি নাই। আমি চুরি করছি দুঃখ-কষ্ট। এইগুলান গোপনে চুরি কইরা নিজের কাছে রাইখ্যা দিছি। যাতে কেউ না দেখতে পারে। আপনে ওই যে প্রত্যেক রাইতে আমারে মারতেন। সেই মাইরের দাগও আমি চুরি করছি। আমার লগে যে খাঁ-বাড়ির ঝি চাকরের মতো আচরণ করতেন, এইগুলানও যাতে বাইরের মাইনষে কোনো দিন না দেখতে পারে, না জানতে পারে, সেইজইন্য এইসব জিনিস চুরি কইরা গোপনে আলাদা কইরা রাখছি। আমি আছিলাম চোর। সব সময় খালি চুরি করছি। জীবনভর চুরি। দুঃখ চুরি'।

আজকের এই আমোদি বেগমকে দেখে, তার কথা শুনে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ক্রমাগত বিস্মিত হচ্ছেন। এই আমোদি বেগম তার অচেনা। এই এতটা বছরেও এই আমোদি বেগমকে তিনি ঘুণাক্ষরেও কখনো চিনতে পারেননি। আমোদি বেগম বললেন, 'আপনেরে চোর বলছি বইলা দুঃখ পাইয়েন না। দুইন্যায় আমরা সকলেই চোর। একেকজন একেকরকম চোর।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমার ঘরে তোমার মতো এতবড় জ্ঞানী মানুষ, আর আমি এতদিনে টের পাই নাই! বড়ই তাজ্জব হইলাম। তায় একখান কথা ভুল বলছ।'

আমোদি বেগম বললেন, 'কোন কথা?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কোনোদিন চুরি করনের মানুষ না। সে যদি এইরম কিছু করেও, করব ডাকাতি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ চুরি করন পছন্দ করে না। তার ডাকাতি পছন্দ। তুমি যেইটা করছ, এইটা হইল চুরি। ঘরের ইন্দুর হইয়া, ঘরের বেড়া কাটতেছ। এহন বলো, এই কাজখান তুমি ক্যান করলা?'

আমোদি বেগম হেসে বললেন, 'মাইর খাইতে। বহুকাল মারেন না, শরীলডাও বাতের ব্যথা-বেদনায় কাতর। আবার মাইর ধইর খাইতে পারি, এই জইন্য করছি। হুনছি, ব্যথায় নাকি ব্যথা যায়।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি যাও আমোদি বেগম। এক্ষুনি আমার চোখের সামনে থেকে যাও।'

আমোদি বেগমও আর কিছু বললেন না। তিনি ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু দরজা অবধি যাওয়ার আগেই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আবার ডাকলেন। তারপর বললেন, 'তুমি ফজুর উপকার করতে গিয়া কিন্তু আসলে তার ক্ষতিই কইরা ফালাইলা।'

আমোদি বেগম কথা বললেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এতদিন পর্যন্ত আমি পুরাপুরি জানতাম না যে ফজু সত্য সত্যই সেই গয়না খুঁইজা পাইছে

কিনা! মনে মনে একটা সন্দেহ করতাম। কিন্তু নিশ্চিত আছিলাম না। আইজ তুমি তো আমার সেই সন্দেহটাও দূর কইরা দিলা!'

আমোদি বেগম বললেন, 'আপনে যেইটা একবার সন্দেহ করছেন, সেইটার শেষ আপনে না দেইখা ছাড়বেন? এই কথাও আমারে বিশ্বাস করতে কন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তারপরও। নিশ্চিত তো আছিলাম না। আর একটা কথা, তুমি এমনে এমনে সব স্বীকার কইরা নিলা? তোমার ডর লাগে নাই?'

আমোদি বেগম বললেন, 'ডর থাহে জ্যাতা মাইনষের। মরা মাইনষের আবার ডর ভয় কিয়ের।' www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তুমি মরা মানুষ? আচ্ছা। কিন্তু ফজু তো আর মরা মানুষ না, সে তো জ্যাতা মানুষ। তারও কি ডর ভয় নাই নাই?'

আমোদি বেগম বললেন, 'ডরের তো কিছু দেহি না। গয়না হাতে না পাওনের আগে তো ফজুর গায়ে ফুলের টোক্কাটাও আপনে পড়তে দিবেন না। ফজুরে সুস্থ রাখন, বাঁচাই রাখন এহন আপনের জইন্যই সব চাইতে বেশি দরকারি। সে না থাকলে গয়নার খোঁজও আপনে পাইবেন না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'ক্যামনে খোঁজ বাইর করতে হয় সেইটা আমি জানি।'

আমোদি বেগম বললেন, 'গয়নার কথা কিন্তু এহন আব্দুল ফইরও জানে । আপনে একলা না, সেও চেষ্টা করব গয়নার খোঁজ বাইর করনের। ফজুরতন গয়না বাইর করন সোজা হইলেও আব্দুল ফইররে ফাঁকি দেওন যে সোজা হইব না, সেইটা তো আপনে জানেন। জানেন না?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যেন আর্তনাদ করে উঠলে, 'আব্দুল ফইরও জানে?'

আমোদি বেগম বললেন, 'সন্দেহ করে। আর সেও কিন্তু আপনের মতোই। একবার যহন সন্দেহ করছে, তহন এর শেষ না দেইখ্যা ছাড়ব না। আরেকখান কথা, গয়নার কথা জানাজানি হইলে কিন্তু সমস্যা। হুনছি, এই ধরনের মালামালের আসল মালিক নাকি হয় সরকার! এই ঘটনাও কিন্তু ফজু ব্যাপারী জানে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আর একটা কথাও বললেন না। তিনি রীতিমতো স্থবির হয়ে গেছেন। এতদিন তার ধারণা ছিল যে তিনি তার আশেপাশের সকলের চেয়েই সব খবর বেশি রাখেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না। সময় পাল্টে গেছে। অনেক কথাই তার কানে আসার আগেই আটকে যায় অন্যদের কানে। এটাও একটা সতর্ক সঙ্কেত। তার ভেতরটা আবরো কেমন করে উঠল! তিনি আমোদি বেগমকে চলে যেতে বললেন। আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের প্রায় সকল কথোপকথনই শুনেছে এস্কান্দার। সে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল আমোদি

বেগমের শাস্তি দেখার জন্য। কিন্তু তার সেই ইচ্ছে পূরণ হলো না! তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে আমোদি বেগমের এই অবিশ্বাস্য কথোপকথনের পরও তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমোদি বেগমকে কিছুই বললেন না।

তিনি ডাকলেন খবির খাঁ আর মনিরকে। তবে আমোদি বেগমের বিষয়ে এদের তিনি কিছুই বললেন না। উঠে জানালার কাছে গিয়ে বার দুই কেশে গলার কফ পরিষ্কার করলেন। তারপর বললেন, 'পুরুষ মাইনষের আসল পরীক্ষা বিপদে। তয় তার চাইতেও বড় পরীক্ষা বিপদ আইসা পড়নের আগেই বিপদ টের পাওনে। যে যত আগে বিপদ টের পাইব, সে তত আগাই থাকব। শুনছি ভূমি অফিস থাইক্যা শিগগিরই হামুকভাঙার বিলের বেয়াল্লিশ বিঘা জমির বিষয়ে নুটিশ আইব। ওই জমিনের দলিলপত্র, রেকর্ড, মিউটেশন, খাজনার কাগজপত্রের বিষয়ে জানতে চাইব। দক্ষিণের খালের ধারেরও বিঘা কুড়ি জমিনেরও একই অবস্থা। আরো কিছু ঘটনা শুরু হইছে। এইগুলান আলামত মাত্র। আসল ঘটনা এহনো শুরু হয় নাই। আসল ঘটনা শুরু হইব আরো পরে।'

জানালার বাইরে দুটো বেড়াল খুনসুটি করছে। কিছু ঘাসের মধ্যে কিছু একটা খুঁজে পেয়ে তারা মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'এহন সকলের আগে কি করন দরকার, সেইটা চিন্তা ভাবনা কইরা বাইর করতে হইব।'

খবির খাঁ বললেন, 'বাজান, এই বিষয়ে হেইদিনই তো কথা হইল। কাগজপত্র বাইর করতে হইব জমিনের। জমা দিতে হইব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ঘটনা তো সব শুনছস তুই। কি মনে হয়, এহন সবচেয়ে কম সময়ে পরিস্থিতি সামলানোর সব চাইতে ভালো উপায় কি?'

মনিরের দুই হাত পেছনে বাঁধা ছিল। সে কথা বলার আগে বার দুই গলা খাকড়ি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল। তাপর হাত দুখানা সামনে এনে আড়াআড়ি বুকের উপর বাঁধল। যেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে প্রথম কোনো গুরুতর বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়ে সে নিজেকে প্রস্তুত করছে, সাহস সঞ্চয় করছে।

মনির যতটা সম্ভব গলা স্থির রেখে বলল, 'দাদাজান, কাগজপত্রের এইসব ঝামেলা মিটাইতে সময় লাগব। অনেক সময়। পয়সাপাতির বিষয় আছে, বহুত দৌড়াদৌড়িরও বিষয় আছে। এহন সবার আগে চিন্তা কইরা বাইর করতে হইব, এইগুলান ছাড়াও আর কোনো শটকাট উপায় আছে কিনা?'

খবির খাঁ মনিরের কথা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কি মনে হয়, এইরম কোনো উপায় আছে?'

মনির বলল, 'আছে। একটা উপায় আছে। উপায়টা সহজ, আবার কঠিনও।'

খবির খাঁ চিন্তিত গলায় বললেন, 'কি উপায়?'

মনির বলল, 'যে কোনো উপায়েই হোক, ফজু ব্যাপারীর গয়নার কলসি হাতে পাইতে হইব। গয়নার কলসি তার হাতছাড়া হওন মানে তার বুদ্ধি, সাহস সব শ্যাস। এতদিন তার হাতে পয়সাপাতি আছিল না, তহন এই কাজ করনের বুদ্ধি সাহসও কোনোটাই তার হয় নাই। এহন এই জিনিস হাতে আসছে, আর লগে লগেই খাঁয়গো লগে তার টক্কর দেওনেরও বুদ্ধি, সাহস হইছে। গয়নাগুলান যদি আমরা একবার পাই, আর কিচ্ছু করন লাগব না। তারপর আস্তে ধিরে জমিজমার বিষয়ে চিন্তা করন যাইব। তহন আর এত পেরেশান হওন লাগব না।'

খুবই সহজ সাধারণ বিষয়। কিন্তু খবির খাঁ পুত্রের কথায় যুগপৎ বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়েছেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'হুম। কিন্তু ঘটনা এহন আর এত সহজ নাই। জটিল হইয়া গেছে। গয়নার কথা আব্দুল ফইর সন্দেহ করতেছে। সে সন্দেহ করা মানে, এই গয়না এহন আর কারো পক্ষেই হজম করন সহজ হইব না। আর গয়নার কথা জানাজানি হইলে বিপদ। এই ধরনের সম্পত্তির আসল মালিক সরকার।'

মনির বলল, 'ফইরসাবে এহনও নিশ্চিন্ত না যে ফজুকাকুর কাছে কি আছে! তার নিশ্চিন্ত হইতে সময় লাগব। কিন্তু আমরা তো এহনই জানি। এইজইন্য যেমনেই হোক তার আগেই জিনিস আমাগো হাতে পাইতে হইব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কিন্তু কেমনে?'

মনির বলল, 'দেহি কি করন যায়! তয় দাদাজান, আমার কেন জানি মনে হয়, ওই কলসি আমি দেখছি!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কি বলস?'

মনির বলল, 'হ, দাদাজান'।

সে নয়নের সাথে ফজু ব্যাপারীর বাড়ির পাশের খালে মাছ ধরতে যাওয়ার দিনের ঘটনা সবিস্তারে খুলে বলল। তারপর বলল, 'সেই দিন তো আর বুঝি নাই, ওই কলসিই সেই কলসি! ফজু কাকুরে দেইখাই মনে হইছিল ঘটনা কিছু একটা আছে। কেমন একটা চোরের মতো ভাবভঙ্গি। ঘাস কাইট্টা সেই কলসির উপরে রাখতে আছিল। আমি তো বুঝি নাই। খুব খেয়াল কইরাও দেহি নাই। ভাবছিলাম পানি নিতে আসছে। কিন্তু এহন মনে হইতেছে, তাইলে অমনে মাটির মইধ্যে কলসি ঢুকাইয়া রাইখ্যা তার উপরে ঘাস রাখব ক্যান? তহন ভালো কইরা খেয়ালও করি নাই।'

মনির কথা বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য মনিরের কথা শুনছেন বলে মনে হলো না। তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে।

www.boighar.com

সেখানে রান্নাঘরের পাশে অনেকটা জায়গা ফাঁকা রেখে গোয়াল ঘর। সেই ফাঁকা জায়গায় ঘাস লতাপাতা হয়ে গালিচার মতো বিছিয়ে আছে। সেখানে সেই বেড়াল দুটি এখনো রয়েছে। তারা একটা ইঁদুরের বাচ্চাকে ধাওয়া করছে। ইঁদুরের বাচ্চাটা ফুড়ুৎ করে লাফিয়ে ঘাসের ভেতর ঢুকে গেল। সেখানে একটা গর্ত। সে সেই গর্তের ভেতর ঢুকে পড়ল। বেড়াল দুটি বুঝতেই পারল না ইঁদুরটি কই লুকিয়েছে! তারা ইঁদুরটাকে খুঁজতে লাগল এদিকসেদিক। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সেই দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকে হঠাৎ খবির খাঁকে বললেন, 'ওই দিন রাইতে গয়নার কলসখান ফজুর বাড়ির কই কই খোঁজা হইছিল?'

খবির খাঁ সেই রাতে ফজু ব্যাপারীর বাড়িতে তল্লাশির বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, 'বড় গাঁধা আমি! ওই জিনিস ফজু তার নিজের বাড়িতে কেন রাখব? আমি ফজুর জায়গায় হইলে আমিও তো ওই জিনিস নিজের বাড়িতে রাখতাম না। রাখতাম অন্য কোনোখানে।'

খবির খাঁ বললেন, 'কই রাখতেন বাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কই রাখতাম, সেইটা ভাবতে হইব। তয় ওই জিনিস লইয়া গ্রামের বাইরে সে যায় নাই। জিনিস আছে এই গ্রামেই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আবার চুপ করে গেলেন। চুপ করে রইল খবির খাঁ আর মনিরও। দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হঠাৎ বললেন, 'আমার ধারণা আমি আন্দাজ করতে পারতেছি জিনিসখান ফজু কই রাখছে!'

খবির খাঁ আর মনির, দুজনেই বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর দিকে। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তখনও তাকিয়ে আছেন বাইরের ঘাস লতাপাতায় ছেঁয়ে থাকা পরিত্যাক্ত জায়গাটুকুতে।

পারুলকে দেখতে এসেছে লতা। পারুল শুয়ে আছে বিছানায়। লতা বলল, 'সেইদিনই আমি ভয় পাইছিলাম, যেইদিন সন্ধ্যায় তাবারন খালার ঘরের দুয়ার খুলতে গেছিল তোর মায়। তুই সাহস কইরা ধারে যাওয়া ধরছিলি। তোর মা'র চোউখ দেখলেই তো বোঝন যায় সে আর সে নাই। যে কোনোসময় যে কেউরে খুন করতে পারে!'

পারুলের ব্যথা অনেকটাই কমে গেছে। তবে ঘা শুকাতে সময় লাগবে। লতার কথার প্রত্যুত্তরে পারুল কিছু বলল না। সে বলল অন্য প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গ আশিক। আশিকের হঠাৎ উধাও হওয়া নিয়ে লতা ভারি ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু আশিকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল দিন দুই বাদেই। তার মোবাইল ফোনে হঠাৎ কী এক সমস্যা হয়েছিল! পারুল বলল, 'আশিক ভাইর খবর কি ভালো?'

লতা গলায় খানিকটা ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল, 'তুই আর কথা কইস না পারুল। সেইদিন তোর কথায় আশিকরে নিয়া কিনা কি সন্দেহ করছিলাম!'

পারুল বলল, 'হিংসা কইরা কইছিলাম লতা'।

লতা বলল, 'কিয়ের হিংসা?'

পারুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোর মতো কপাল না হওনের হিংসা'।

লতা বলল, 'তোর কপাল আমার চাইয়াও ভালো'।

পারুল হাসল। বলল, 'আয়, কাছে আয়। আমার কপাল দিয়া তোর কপালে একখান ঘষা দেই। নিজের কপাল ভালো হইলে কাছের বান্ধবীরেও একটু ভাগ দেওন লাগে।'

লতা হাসল। কিন্তু পারুল হাসল না। এই কৌতুকের ভঙ্গিতে বলা কথাটুকুর কোথায়ও যেন মন খারাপের কী এক গভীর বিষাদ লুকিয়ে ছিল। সে বলল, 'আমার কপালখান আসলেই ভালোরে লতা। ভালো কপাল না হইলে এইরম একখান ঘরে, এইরম এক মায়ের প্যাটে জন্মাই? হা হা হা। কী কপালখান আমার, আরেকটু হইলে মায়ের হাতে মরণ হইত! কী ভালো হইত, নারে লতা? আহারে মা। মারে!'

www.boighar.com

পারুলের বুক চিড়ে যেন দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত বাতাস বের হয়ে এলো। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। তারপর কথা বলল লতা, 'তুই জানি কেমন হইয়া যাইতেছস পারুল! আগে কেমন চঞ্চল আছিলি। সারাক্ষণ হাসি-ঠাট্টা করতি। তোরে দেখলে মনে হইত একটা মানুষ সব সময় এত ফূর্তিতে থাহে কেমনে?'

পারুল মুহূর্তেই আবার হাসল। বলল, 'বয়স হইছে না? বয়স হইলে একটু ভার-ভারতিক হইতে হয়। নাইলে নাকি বিয়ার সম্বন্ধ আহে না।'

লতা বলল, 'এই কথা কেডা কইছে?'

পারুল বলল, 'মায় কইছে'।

লতা বলল, 'আর কি কি কইছে তোর মায়?'

পারুল বলল, 'সব কথা কওন যাইব না। তয় আমার মায় কইছে আমার নাকি হাচা হাচাই শহরের পোলার লগে বিয়া হইব।'

পারুলের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। লতা অবাক চোখে পারুলের দিকে তাকিয়ে আছে। এই মেয়েকে বোঝা বড় মুশকিল! এই সামান্য ঘটনায় কেঁদে কেটে অস্থির। আবার পরক্ষণেই তার চেয়েও সামান্য ঘটনায় আনন্দে ঝলমল।

পারুল বলল, 'আমার শহরে যাওনের খুব শখ। ঢাকা শহরে। তয় একলা না। জামাইর লগে। বিয়ার সাজে শহরে যাব। তোরে কহনো সত্য কথাটা ঠিক কইরা কই নাই। আইজ কই শোন। তোর যে আশিক ভাইর লগে প্রেম, এইটা দেখলে আমার অনেক হিংসা হয়। হিংসায় শরীল জ্বলে। তুই ভাবছস আমি মজা কইরা কইছি? মজা কইরা কই নাইরে! ঘটনা সত্য। আমারো কত শখ, এইরম ঢাকার শহর থাহে, শুদ্ধ কইরা, সুন্দর কইরা কথা কয়, এইরম একটা মানুষ আমারও থাকব। কিন্তু কপাল। কপালে জুটল না। এইজইন্য আমি কত দিন একলা একলা কানছি। ওই ডাক্তার মানুষটারে ওইদিন উঠানে দেইখ্যা এক পলকেই কী যে হইয়া গেল! সবাই মনে করে আমি চালাক মাইয়া। আসলে কিন্তু আমি চালাক মাইয়া না। আমি হইলাম বলদ। বড় রকমের বলদ। বলদ না হইলে এক পলক দেইখাই কারো প্রেমে পড়ে! আমি পইড়্যা গেলাম। তারে আমি চিনি না, জানি না, কিচ্ছু না। তুই-ই ক, রাইন্ধা বাইরা খাওন পর্যন্ত লইয়া গেলাম। কান্নাকাটি কইরা বুক ভাসাইলাম, বলদ না হইলে এমনে কেউ করে!'

লতা বলল, 'সে তো দেখতেও মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর'।

পারুল বলল, 'সেইটা তো আছেই। কিন্তু ওই যে ধর, সুন্দর তো আরো কত মানুষই আছে। এই যে তোর লগে রায়গঞ্জ যাই, এইহানে সেইহানে যাই, সুন্দর পোলার অভাব আছে? নাই। কিন্তু কই? কেউরে তো আমার দুই পয়সার দামও দিতে মন চায় না। ভালোই লাগে না কেউরে। আমার আসলে এই গাঁও-গ্রাম ভালো লাগে না। সাইজাগুইজা শহরের বাড়িতে থাকব। দিন শেষে জামাই আইব অফিস থেইকা। দুইজন মিল্যা কত কিছু করব। সুন্দর কইরা কথা বলব।

সারাদিন টিভি দেখব, নাটক দেখব। জীবনটাও নাটক সিনামার লাহান হইব। আহা, শান্তির জীবন।'

লতা বলল, 'ওই নাটক সিনামাই তোর মাথাটা খাইল পারুল। কয়টা দিন, কতটুক আর নাটক সিনামা দেখছস? তাইতেই তোর মাথার এই অবস্থা?'

পারুল বলল, 'তুই যা-ই কস। আমার গ্রাম ভাল্লাগে না। গ্রামের পোলাপানও না। বিয়া-শাদি যদি করতেই হয়, টাউনের পোলার লগেই করব। এইটাই আমার এক কথা।' www.boighar.com

লতা বলল, 'ডাক্তারের খবর কি? ঢাকা থেইকা আর আহে নাই? তোর বাটি ফেরত দিছে?'

পারুল বলল, 'আমারে জিগাস ক্যান? তুই-ই না কইলি, আমার কপাল ভালো। নে, আমার কপালরে জিগা।'

লতা বলল, 'আমি যদি বিয়া-শাদি কইরা ঢাকা চইল্যা যাই, তোর খুব কষ্ট লাগব না?'

পারুল সাথে সাথে কথা বলল না। লতার এই সামান্য কথাটুকুই যেন তার বুকে কোথায় গিয়ে বিঁধেছে! একটা প্রবল হাহাকার! সে মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ সময়ে কত কী যে দেখে ফেলল! সে দেখল, লতা সুন্দর একখানা শাড়ি পরে, শাড়ির আঁচল কোমড়ে জড়িয়ে একটি ঝা চকচকে ঘরে তার বরের জন্য খাবার তৈরি করছে। আর ঠিক সেই সময়ে পারুল বসে আছে গ্রামের এক উঠানের খোলা চুলার পাশে। সেখানে স্তূপ করে রাখা শুকনো খড়ি, গাছের পাতা। চুলা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সেই ধোঁয়ায় তার চোখ মুখ জ্বালা করে উঠছে। তার স্বামী দুটা গরু নিয়ে বাড়ি ঢুকেই চেঁচিয়ে বলছে, 'দুপার বেলা পার হইয়া যায় যায়, এহনও ভাত রান্ধন হয় নাই? সারাদিন বাড়ি বইস্যা করস কি? চাউলের লগে ডাইল মিশাইয়া আবার বাইছা আলাদা করস?'

পারুলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু সে হাসল। তারপর বলল, 'সত্য কথা বলব?'

লতা বলল, 'মিছা কথা বলবি ক্যান?'

পারুল বলল, 'কষ্ট যতটা লাগব, হিংসা লাগব তার চাইতেও বেশি। তোর লগে আর কোনোদিনই আমার দেহা হইব না। আমিই আর তোর সামনে কোনোদিন যামু না। মুখই দেহামু না তোরে। তয় একখান কথা। আমারও যদি শহরে বিয়া হয়, তাইলে তোর লগে আমার এইরকমই খাতির থাকব। সারাজীবন।'

লতা বলল, 'তুই একটা পাগল পারুল'।

পারুল বলল, 'পাগল না হইলে বাইচ্যা থাকতে পারতাম না রে লতা'।

লতা বলল, 'আশিক আর আমি ভাবছি বাড়িতে ঘটনা খুইলা বলব। বিয়া যত তাড়াতাড়ি করন যায় ততই ভালো। তয় আশিক চায় আমার ইন্টার পরীক্ষাটা প্যাস হোক। বোঝসই তো। শিক্ষিত পোলা। বন্ধু-বান্ধবের কাছে একটা মান-ইজ্জতের ব্যাপার আছে না?'

লতা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই কথাটি বলল। কিন্তু কথাটির কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম, ইচ্ছাকৃত খোঁচা রয়েছে। পারুল এটা টের পায়। লতা প্রায়ই এই কাজটি করে। পারুল অবশ্য ধরা দিলো না। সে বলল, 'এইটা ঠিক বলছে। জামাই শিক্ষিত হইলে আর বউ অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত হইলে সমাজে চলন যায় না। তুই তাড়াহুড়া করিস না। পড়াটা শেষ কর।'

খানিকবাদে লতা বাড়ি চলে গেল। লতা চলে যাওয়ায় পারুলের খুব একা একা লাগতে লাগল। আবার সেই একা একা বসে থাকা। তার মন খারাপ হয়ে গেছে। তীব্র মন খারাপ। সে পড়াশোনায় কখনোই তেমন ভালো ছিল না। তাছাড়া চঞ্চল হোক, খেয়ালি হোক, সেই এতটুকু বয়স থেকেই, এই ঘর-সংসারের দায়িত্ব তারই। মাকে তেমন আলাদা করে কখনোই সে সময় দেয়নি, দেখাশোনা করেনি, এটি যেমন সত্যি, তেমনি এটিও সত্যি যে সে ছিল বলেই মা কোনো অঘটন ঘটাতে পারেনি।

পারুল ভেবেছিল সে ঘর থেকে বের হবে না। কিন্তু সে বের হলো। উঠানে দাঁড়িয়ে কিছু করছিল রতন। পারুল রতনকে ডেকে বলল তাকে ধরে একটু পুকুর ঘাটে দিয়ে আসতে। পুকুর ঘাটে বসে পারুল আবিষ্কার করল বেশ কিছুদিন ধরেই একটু একটু করে পানি নেমে যাওয়া শুরু করছিল। এই কিন্তু শেষ তিন চার দিনে যেন আচমকা পানি নেমে গেছে। শুধু তাই-ই না। এই দুপুর না গড়ানো বিকেলেই চারধারে একটা মিহি শাদা আস্তরণ খেয়াল করা যাচ্ছে। কার্তিক মাস শুরু হয়ে গেছে। তার মানে হেমন্ত চলে এসেছে। গ্রাম-গঞ্জে প্রবল গরম ছাড়া আর সব ঋতুর ছোঁয়াই আগেভাগে চলে আসে। বিশেষ করে শীত। আগামী কয়েক মাস যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব কষ্টের হবে। সব জায়গার পানি শুকাবে না। নদীতে নৌকা-ট্রলার ঠিকই চলবে। কিন্তু সমস্যা হবে বিলের মাঝখান দিয়ে চলা পায়ে হাঁটা রাস্তাগুলোর। এই রাস্তাগুলো বেশ কিছুদিন কাদা মাটি হয়ে থাকবে। শুকিয়ে যুতসই পায়ে হাঁটার পথ হতে সময় লাগবে বেশ।

তাবারন এসেছে ঘাটে পানি নিতে। পারুলের ঘটনার পর থেকে সে আবার কাজকর্মে মন দিয়েছে। কিন্তু কোনো একটা সমস্যা হয়েছে তার, যেটি সে কাউকে বলতে পারছে না। পারুল নানানভাবে জানার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলছে না সে। পারুল খেয়াল করেছে আড়ালে-আবডালে বসে একা একা কাঁদে তাবারন। কিন্তু কারণটা বের করতে পারেনি পারুল।

পারুল তাবারনকে দেখে বলল, 'মায়রে কিছু খাইতে দিছেন?'

তাবারন বলল, 'রতনরে দিয়া পাঠাইছিলাম। তয় তোমার মায় কিছুই খায় নাই।'

সেই ঘটনার পর দুই-তিন দিন কেটেও গেছে। কিন্তু মা'র ঘরে আর যায়নি পারুল। কারো কাছে মা'র খবরও জিজ্ঞেস করেনি সে। মায়ের সেই চেহারাটা পারুল ভুলতে পারছে না। তার প্রতি কি এক ভয়ঙ্কর রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধে তার বুকের ভেতরটা পাথর হয়ে আছে। এই পাথর সে আর ভাঙতে পারেনি। আজ প্রথম মা'র কথা জানতে চাইল সে। পারুল বলল, 'বেয়াল বেলা কি খাইছে?'

তাবারন বলল, 'কিছুই খায় নাই'।

পারুল বলল, 'রাইতে?'

তাবারন বলল, 'প্রথম দেড় দুইদিন ফইর সাব তারে খাওন দিতে দেয় নাই। পানিও না। এরপর একটু পানি খাইছিল। আর একটু ভাত। তারপর থেইকা আর খায় নাই কিছুই।'

পারুল এই ঘটনা জানত না। সে উঠে রতনকে নিয়ে হেঁটে মার ঘরের সামনে এলো। তারপর তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘরখানা আবার সেই আগের মতো নোংরা, দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে। নুরুন্নাহার শুয়ে আছেন চিৎ হয়ে। এই দু তিনটে দিনেই যেন শুকিয়ে তার পেট মিশে গেছে পিঠের সাথে। আবছা অন্ধকারে পারুল হেঁটে গিয়ে মায়ের পাশে বসল। নুরুন্নাহার কি বিড়বিড় করে কিছু বলছেন! পারুল কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। চৌকির বাইরে নুরুন্নাহারের একখানা হাত বেঢপ ভঙ্গিতে ঝুলে রয়েছে। পারুল সেই হাতখানা ধরে চৌকির উপর উঠিয়ে দিতে গেল। কিন্তু হাতখানা ধরতেই চমকে গেল সে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে নুরুন্নাহারের গা। পারুল বারকয়েক মাকে ডাকল। কিন্তু নুরুন্নাহার তাতে সাড়া দিলেন না। পারুল রতনকে ডেকে বালতিতে করে পানি আনাল। তারপর একনাগাড়ে মাথায় পানি ঢালতে লাগল নুরুন্নাহারের।

নুরুন্নাহার সাড়া দিলেন গভীর রাতে। আচমকা চোখ মেলে তাকালেন তিনি। তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পারুলের দিকে। পারুল কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নুরুন্নাহার হঠাৎ পারুলের হাত দুখানা ধরে ঝড়ঝড় করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বললেন, 'আপনে আমারে যা বলবেন, আমি সব শুনমু। আর কোনোদিন আমি কাউরে কিছু বলব না। কোনো দিন বলব না। আমি আপনের পায়ে ধরি, আমারে মাফ কইরা দেন। আর লোহার ছ্যাকা দিয়েন না। আমার জানটা বাইর হইয়া যাইব। আমার জানটা বাইর হইয়া যাইব। আমারে আর মাইরেন না। আমি আর কাউরে কোনোদিন কিছু বলব না।'

www.boighar.com

এমন করুণ গলায় কাউকে কখনো কাঁদতে দেখেনি পারুল। এমন ভয়াবহ আর্তনাদও কখনো শোনেনি সে। সে আলতো করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মায়ের মাথায় রাখল। তারপর বলল, 'ও মা। তোমারে কেডা মারব?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'আপনে আমারে মারবেন না? আমি আপনার পায় ধরি। আপনে যা বলবেন সব আমি শুনব। আপনে আমারে আর মাইরেন না। আমি আপনের পাও ধইরা বইস্যা থাকব। আপনে যা বলবেন সব শুনব। আমারে আর মাইরেন না। আর তইজ্জ্যা দিয়েন না।'

নুরুন্নাহার ঝড়ঝড় করে কাঁদছেন। পারুল মায়ের মাথাটা একহাতে চেপে ধরে বলল, 'ও মা, আমি পারুল। তোমার মাইয়া। আমি তোমারে মারব কেন?'

নুরুন্নাহারের হঠাৎ কি হলো! তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত ছোট্ট এক শিশুর মতো পারুলের গা ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে মিশে গেলেন। তারপর সেই প্রাণপণ আকুতিতে বলতে থাকলেন, 'আপনে তাইলে আমারে মারবেন না? ছ্যাক দিবেন না? তাইলে ফইর সাবে দিব? ফইর সাবে? আপনে আমারে বাঁচান মা। আমারে আপনে বাঁচান।'

পারুল মায়ের মাথাটা কোলে টেনে নিলো। নুরুন্নাহারকে দেখে তার মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপতে থাকা ভীত-সন্ত্রস্ত অসহায় এক শিশু। সেই শিশুর সে ছাড়া এই জগতে আর কেউ নেই।

নুরুন্নাহার দুইহাতে শক্ত করে পারুলের কোমড় জড়িয়ে ধরল। তারপর জান্তব গোঙানির স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'ও মাগো, ও মা, মাগো। আমারে আপনে বাঁচান মা, মাগো। ও মা, মা, মাগো।'

পারুল আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। তার ডান হাত নড়াতে কষ্ট হচ্ছিল খুব তবুও দুইহাতে সে মাকে ধরে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখতে চাইছিল। কিন্তু নুরুন্নাহার হঠাৎ তীব্র চিৎকারে কোঁকিয়ে উঠলেন, 'মাগো, বুকটা ফাইট্টা যাইতেছে মা। গরম লোহার ছ্যাক মাগো। দগদইগ্যা ঘাও মারে। ও মা। মারে। বুকটা ছিড়্যা যাইতেছে। ও মাগো, ও মা, মাগো। ও বাবা। বাবাগো।'

কান্নায় তার গলা বুজে আসছে। পারুল কিছুই বুঝল না। সে আলতো করে নুরুন্নাহারকে ধরে আবার শুইয়ে দিলো। আর ঠিক সেইমুহূর্তে সে দাগটা দেখল। নুরুন্নাহারের গলার নিচে বুকের কাছটায় একটা দগদগে ঘা। সে খুব সাবধানে মায়ের বুকের উপর থেকে কাপড়টা সরাল। আর তখনই দেখতে পেল তার খোলা বুক। নুরুন্নাহারের দুই বুকের মাঝখানের জায়গাটিতে একটা বীভৎস ক্ষত! দাগটা কিসের বুঝতে মুহূর্তকাল সময়ও লাগল না পারুলের। সেদিন রাতে তার বাবা আব্দুল ফকিরের হাতে একটা চ্যাপ্টা মাথার কুচকুচে কালো মোটা লোহার রড সে দেখেছিল। সেই রড আগুনে পুড়ে নুরুন্নাহারের বুকে ছ্যাকা দিয়েছেন তিনি!

পারুলের স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন সেই রডখানা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন নুরুন্নাহার। তাহলে কি মাকে আরো আগেও ওই রড দিয়ে শাস্তি দিয়েছিলেন তিনি? পারুল নুরুন্নাহারের পেটের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে আরো দাগ খুঁজল, কিন্তু পেল না। পেলনা পিঠ, কাঁধ বাঁ পায়েও। সে যতটা সম্ভব দেখল, কোথাও নেই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কী মনে হতে পারুল উরু অবধি মায়ের কাপড় তুলে ফেলল। তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তার দৃষ্টি। সেখানে উরুর আরো উপরে, ঠিক জঙ্ঘার কাছে শুকিয়ে আছে একইরকম পুরনো আঘাতের চিহ্ন। এই এতদিনে পারুলের কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল, নুরুন্নাহারকে ভয়াবহ সব আঘাত করেছেন তার বাবা। কিন্তু সেই আঘাতগুলো এমনভাবে করা হয়েছিল, এমন জায়গায় করা হয়েছিল, যা তিনি যেন কখনোই কাউকে দেখাতে না পারেন। কিন্তু তারপরও বুকে এর আগের আর কোনো আঘাতের চিহ্ন পারুল দেখেনি। তাহলে এবার কেন? পারুলের হঠাৎ মনে হলো, তাহলে কি তাবারনের বুক পুড়িয়ে দেয়ার শোধ?

এই প্রথম পারুলের মনে হলো তার বাবা আব্দুল ফকির নামের সাদাসিধে চেহারার মানুষটার আড়ালে রয়েছেন একটা নির্মম মানুষ। অমন মমতাময় পিতার আড়ালে রয়েছেন একজন নিষ্ঠুর স্বামী। কিন্তু এই এতদিন ধরে এসব তিনি কেন করলেন?

হেমার কাছে ফোনটা আসল অপরিচিত নম্বর থেকে। ফোন করেছেন তার বাবা আসলাম সাহেব। বাবার কণ্ঠ হেমার না চেনার কথা না। কিন্তু সে প্রথম কিছুক্ষণ বাবার কণ্ঠ চিনতে পারল না। আসলাম সাহেব বলার পরও হেমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'তোমার কী ঠান্ডা লেগেছে বাবা?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'ছাতা ছাড়া বেরিয়েছিলাম। অসময়ে চট করে বৃষ্টি। ভিজে যা তা অবস্থা। অথচ এই সময়ে শীত পড়ে যাবার কথা। কিন্তু এখনও কী যে বিশ্রি ভ্যাসপা গরম পড়ছে! আ হরিবল ইফেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ।'

হেমা কিছু বলল না। আসলাম সাহেবই একটু বিরতি দিয়ে বললেন, 'চেঞ্জ না হয়ে উপায় কি? মানুষ ন্যাচারটা ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই যে এতবড় শহর ঢাকা, কোথাও কোনো সবুজ আছে? আশেপাশে যাও কিছু গাছপালা ছিল, তাও কেটেকুটে সাফ করে ফেলা হচ্ছে!'

হেমা বলল, 'তুমি কী খুব বিশেষ কিছু বলবে বাবা?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'কেন? যা বলছি, তা কি ইম্পর্ট্যান্ট কিছু না?'

হেমা বলল, 'অবশ্যই ইম্পর্ট্যান্ট। তুমি কি এই ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়টা নিয়েই কথা বলার জন্য আমাকে ফোন করেছ?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'এই যে এতগুলো দিন আমার কোনো খোঁজ নেই? একবারও মনে হয়নি যে বাবাকে একটা ফোন দেই?'

হেমা বলল, 'তোমার ফোন বন্ধ বাবা! তুমি এই যে এখন ফোন দিয়েছ, তাও একটা অপরিচিত নম্বর থেকে!'

আসলাম সাহেব বললেন, 'ও'।

তারপর ফোনের দু' প্রান্তে দুজনই চুপ। অনেকক্ষণ বাদে হেমা বলল, 'তুমি কি খুব জরুরি কিছু বলতে চাও? কিন্তু কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছ না?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'না বলতে পারার কি আছে? তুই তো আমার স্কুলের হেডমিস্ট্রেস না!'

হেমা বলল, 'বাবা, তুমি ডিভোর্স নিচ্ছ মার কাছ থেকে। কিন্তু তাতে কিন্তু তুমি আমার সৎ বাবা হয়ে যাচ্ছ না। তুমি আমার আপন বাবাই থাকছ। আগে যেমন ছিলে, এখনও তেমনই আছ, মার সাথে ডিভোর্সের পরও থাকবে। কিন্তু তোমার আচারণ দেখে মনে হচ্ছে তুমি অলরেডি আমার সৎ বাবা হয়ে গেছ!'

আসলাম সাহেব যেন থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমি কি তোর সাথে খুব খারাপভাবে কথা বলে ফেলেছি?'

হেমা বলল, 'হয়তো খুব খারাপভাবে বলোনি। ঠিকই বলেছ। কিন্তু আগে কখনো এমন করে আমার সাথে কথা বলোনি তো, হয়তো এইজন্যই আমার এমন লাগছে।'

আসলাম সাহেব মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'সরি'।

হেমা বলল, 'এখন বলো, তুমি কি আমাকে বিশেষ কোনো কথা বলতে চাইছ?'

আসলাম সাহেব চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুই কি আমার সাথে একটু দেখা করতে পারবি?'

হেমা বলল, 'কেন পারব না? অবশ্যই পারব। তুমি বরং বাসায় চলে এসো। বাসায় চলে আসলেই আমাদের দেখা হয়ে যাবে। তোমার সাথে অনেকদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করি না। কফি খাই না। তুমি চলে এসো।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'ওই বাসায় আমি আর ঢুকব না। আমার দমবন্ধ হয়ে আসে।'

হেমা বলল, 'বাসাটা তো তোমার। তুমি ডিভোর্স নিলেও মাকেই বরং বাসাটা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তুমি তো তোমার বাসাতেই থাকবে। তুমি বাইরে বাইরে ঘুরছ কেন?'

আসলাম সাহেব কথা বললেন না। হেমাই বলল, 'তোমাদের ডিভোর্সের পর আমাকেও কি মার সাথে এই বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে? বাবার প্রপার্টিতে সন্তানের একটা রাইট তো থাকেই। আমি এই বারান্দাওয়ালা বাসাটা ছাড়তে চাই না। এটা তোমার প্রোপার্টিতে আমার একমাত্র রাইট।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'কিসব আবোল-তাবোল বকছিস? তুই আবার কই যাবি?'

হেমা বলল, 'ধরো তুমি আবার বিয়ে করে ফেললে, তখন আমার সেই নতুন মা তো আমাকে পছন্দ নাও করতে পারে! তাছাড়া নতুন বিয়ের পর একটা প্রাইভেসির ব্যাপার থাকে। আমার মতো এত বড় একটা মেয়ে তখন বাসার মধ্যে ঘোরাঘুরি করবে, এটা এক্সট্রা একটা পেইন।'

www.boighar.com

আসলাম সাহেব বললেন, 'তুই আমাকে পিঞ্চ করার চেষ্টা করছিস'।

হেমা বলল, 'সরি বাবা। কিন্তু আমি তেমন ভেবে বলিনি'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'আমার ওই বাসাটায় আর ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। তোর মার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি আর ওই মানুষটার মুখ মনে করতে চাই না। আমার জীবনটা সে চেরতার রসের মতো তিতা বানিয়ে ফেলেছে।'

হেমা বলল, 'আচ্ছা। কোথায় দেখা করতে চাও বলো।'

আসলাম সাহেব একটা রেস্টুরেন্টের ঠিকানা দিলেন। হেমা পৌছাতে পৌছাতে খানিক দেরী হয়ে গেল। সে পৌছে দেখল বাবা আগে ভাগেই চলে এসেছেন। খাবার দাবার নিয়ে খুব একটা কথা হলো না তাদের। হেমা সরাসরি বলল, 'বাবা, একটা কথা বলি?'

আসলাম সাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। হেমা গম্ভীর গলায় বলল, 'কখনো ভান করো না বাবা। নিজের যেটা ভালো লাগে, সেটা করো। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যদি তোমার মনে হয়, এই কাজটি করলে অন্যরা তোমাকে খারাপ ভাববে। সুতরাং এই অন্যরা যাতে খারাপ না ভাবে, এই জন্য সেই কাজের পেছনে মিথ্যে কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ো না। সবচেয়ে বড় কথা অন্য কারো উপর দোষ চাপিয়ো না।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তোর ধারণা, আমি মিথ্যে অজুহাত দাঁড় করিয়েছি? তোর মার উপর মিথ্যে দোষ চাপাচ্ছি?'

হেমা বলল, 'আমার ধারণা নিয়ে তুমি ভেবো না বাবা। তুমি তোমার ধারণা নিয়ে ভাবো। অন্যরা কি ভাবছে, সেটি ভাবতে গিয়ে তুমি তোমার ভালো লাগাটা, অনুভূতিটা নষ্ট করো না।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'আমি আমার ফাইনাল ডিসিশনটা নিয়ে নিয়েছি। আই কান্ট টেক ইট এনিমোর।'

হেমা বলল, 'তুমি কি সিওর? নাকি এখনো কনফিউজড?'

আসলাম সাহেব সামান্য সময় নিয়ে বললেন, 'সিওর'।

হেমা বলল, 'কারণটা খুঁজে পেয়েছ?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'কিসের কারণ?'

হেমা বলল, 'এই যে প্রায় পঁচিশ বছরের একটা সম্পর্ক ভেঙে দিচ্ছ। তার কারণ।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তোকে আমি সব বলেছি হেমা। আমি আর নিতে পারছি না। ক্লান্ত হয়ে গেছি। দিন শেষে প্রত্যেকটা মানুষের একটা যাওয়ার জায়গা দরকার। তার মন খারাপ হলে কথা বলার একটা মানুষ দরকার। তার দুঃসময়ে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর, শক্ত করে তার হাত ধরবার

একজন মানুষ দরকার। মানুষ কতদিন বাঁচে? এ সময়টা জুড়ে সে কেবল ভালো কিছু মুহূর্ত চায়, ভালো কিছু স্মৃতি চায়। আর চায়, তার যেন কখনো অসহায় মনে না হয়। তার যেন মনে হয়, তার প্যাশে কেউ একজন আছে! কিন্তু সেই না থাকাটা খুব কষ্টের। যার দিন শেষে ঘরে ফেরার পর একটু যত্ন করার কেউ নেই, খারাপ সময় এলে দুটো কথা বলে ভরসা দেবার কেউ নেই, তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে! এর চেয়ে কষ্টের কিছু নেই, এর চেয়ে শূন্যতার কিছু নেই।'

আসলাম সাহেবেরে গলা ভারি হয়ে এসেছে। হেমা বাবার চোখের দিকে তাকাল না। বাবা হয়তো কাঁদছেন। সে টেবিলের উপর রাখা বাবার হাতখানা শক্ত করে ধরল। বাবার হাত থরথর করে কাঁপছে। হেমা মৃদু গলায় বলল, 'আমি জানি বাবা। বুঝি। তোমার মতো করে সবটা না বুঝলেও অনেকটাই বুঝি। আর বুঝি বলেই আমি তোমাকে একবারের জন্যও দোষ দেইনি। এখনও দিচ্ছি না।'

আসলাম সাহেব হাতের মুঠোয় মেয়ের হাতখানা শক্ত করে ধরলেন। তিনি চেষ্টা করেও আটকাতে পারলেন না। টুপ করে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল পিতা কন্যার শক্ত করে ধরে রাখা হাতের পাশেই। হেমা বলল, 'বাবা, আমি তোমার কষ্টটা পুরোপুরি বুঝতে পারছি। সমস্যা হচ্ছে, মার কষ্টটাও আমি উপেক্ষা করতে পারছি না। আমি অনেকবার মা'র জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখেছি, আমি পারিনি বাবা। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। হ্যাঁ, এর চেয়েও খারাপ পরিস্থিতিও হয়তো অনেক মেয়েই মেনে নেয়। নেয় বলেই তাদের কষ্টের তীব্রতাটা বোঝা যায় না। সবাই ভুলে যায়। মাও যদি মেনে নিত, তাহলেও হয়তো কেউ তার কষ্টটাও বুঝত না। তুমিও না। আমিও না। কখনো জানতামই না হয়তো। মনেও থাকত না কারো। কিন্তু মা মেনে নিতে পারেনি বলেই তার কষ্টটা আমি বুঝতে পারছি। একটা মানুষ কি অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে একটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে!'

আসলাম সাহেব যেন হেমার হাতধরা তার হাতখানা সামান্য শিথিল করে দিলেন। তারপর নিস্তেজ গলায় বললেন, 'আমি আমার সবটা সাধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই বদলাতে পারিনি।'

হেমা বলল, 'বাবা, হয়তো মা'ও সব কিছু মেনে নিতে চেষ্টা করেছে। তার সাধ্যের সবটা দিয়েই করেছে। কিন্তু সেও হয়তো শেষ অবধি কিছুই মেনে নিতে পারেনি। তোমার চেষ্টাটা মা দেখেছে বলেই হয়তো তুমি ভাবছ, এতকিছুর পরও মা নিজেকে বদলাতে পারেনি। কিন্তু মা'র চেষ্টাটা হয়তো মা তোমাকে কখনো দেখাতেই পারেনি। তার চেষ্টাটা ছিল তার মনের সাথে। আর মনের সাথে করা চেষ্টাটা সে তোমাকে দেখাবে কি করে!'

আসলাম সাহেব চুপ করে রইলেন। চুপ করে রইল হেমাও। তারপর আসলাম সাহেব বললেন, 'কিন্তু তাতে তো কিছু বদলায়নি। একটা সম্পর্কহীন সম্পর্ক। বছরের পর বছর। একই ছাদের নিচে পাশাপাশি দুজন মানুষ। কিন্তু কেউ কারো কাছাকাছি নয়। কী দুর্বিষহ জীবন।'

হেমা বলল, 'এই দুর্বিষহ সম্পর্কটা এত বছর কেন টেনে নিয়ে এলে বাবা?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'সব সময় মনে হতো যদি ঠিক হয়! আরেকবার চেষ্টা করে দেখি, যদি ঠিক হয়!'

হেমা বলল, 'এখন তাহলে চেষ্টা ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'আর পারছি না। ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

হেমা বলল, 'কিন্তু যদি এমন হয়, মার চেষ্টাটা এখনো ভেতরে ভেতরে চলতেই থাকে! আর কোনো একদিন সে পেরে যায়?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'সেটি কোনোদিন সম্ভব না'।

হেমা বলল, 'যদি হয়?'

আসলাম সাহেব আবারো সামান্য সময়ের জন্য চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'তাতে কিছু যায় আসে না। আই কান্ট টলারেট হার এনিমোর। আর সহ্য করতে পারছি না আমি। ওকে আমার চোখের সামনেই আর দেখতে ইচ্ছে হয় না আমার।'

হেমা এবার শান্ত, স্থির গলায় বলল, 'এই এত এতকাল, এত এত বছর পর এসে কেন আর দেখতে ইচ্ছে করছে না, ভেবেছ কখনো?'

আসলাম সাহেব কিছু একটা বলতে গিয়েও আর বললেন না। চুপ করে রইলেন। হেমা বললেন, 'বাবা, আমি তোমাদের মেয়ে। আমি বড় হয়েছি। সন্তান কখনো কখনো বন্ধুও হয়ে যেতে পারে। তুমি আমাকে এই এত এত কথা নাও বলতে পারতে। কিন্তু এই যে বলেছ, এতে আমি নিজেকে আর আট দশটা সন্তানের চেয়ে আলাদা ভাবতে পারছি। আর পারছি বলেই তোমাকে আমি এই এত এত কথাও বলতে পেরেছি।'

হেমা সামান্য থামল। তারপর বলল, 'সবচেয়ে বড় কথা, আমি নিজেও চাই না, এইরকম কোনো সম্পর্কে কেউ থাকুক। তোমরা আমার বাবা-মা বলেই যে আমি কেবল ভাবব আমার জন্য হলেও তোমরা থেকে যাও। এটা আমি কখনোই করব না। আমি জানি, কী ভয়ঙ্কর একটা জীবন তোমরা কাটিয়েছ, কাটাচ্ছ। কিন্তু বাবা, ওই যে বললাম, কেন চলে যাচ্ছ, সেটি অন্তত নিজের কাছেই স্পষ্ট হওয়া দরকার। কেবলই কী সম্পর্কটা আর বইতে পারছ না বলেই চলে যাচ্ছ, নাকি সেখানে অন্য আর কোনো কারণও রয়েছে!'

আসলাম সাহেব ঝট করে হেমার মুখের দিকে তাকালেন। হেমা বলল, 'ভয় পেয়ো না বাবা। তেমন কিছু হলেও আমি কিছু মনে করব না। এমন হতেই

পারে। ভালোবাসা, যত্ন, সাপোর্ট এমন প্রয়োজনীয় এবং একইসাথে লোভনীয় বিষয় যে এর জন্য মানুষ সবকিছু ছাড়তে পারে। আর সেখানে এই অনুভূতিগুলোর জন্য সারাজীবন কাঙাল হয়ে থাকা একটা মানুষ যদি হঠাৎ করে এমন কারো দেখা পায়, যে তাকে সেই অনুভূতিগুলো দিয়েই কানায় কানায় পূর্ণ করে দিচ্ছে, তাহলে সে তো সবকিছু ছেড়ে সেখানে যাবেই। এতে তো দোষের কিছু নেই বাবা!'

আসলাম সাহেব ধীরে ধীরে হেমার মুখ থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন বাইরে। বাইরে বিকেলের শহর। সেখানে ক্রমশই ধেয়ে আসছে সন্ধ্যা। অন্ধকার তাড়াতে টুপটাপ জ্বলে উঠছে সড়ক দ্বীপের সোডিয়াম লাইট।

হেমা বাবার হাতখানা আবার ধরল। তারপর আচমকা বলল, 'আমি সম্ভবত মেয়েটিকে দেখেছি বাবা। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী। তোমরা দোয়েল চত্বরের ওখানে আমার ঠিক সামনের রিকশাটায় ছিলে।'

আসলাম সাহেব কোনো সাড়া দিলেন না। চোখ ফেরালেন না। যেন হেমার সামনে থেকে এই মুহূর্তে তিনি পালিয়ে যেতে চান। হেমার চোখে চোখ রাখার সাহস যেন আর নেই তার। হেমা ডাকল, 'বাবা'।

আসলাম সাহেব জানালার বাইরে থেকে চোখ ফেরালেন। কিন্তু সেই চোখ তুলে হেমার দিকে তাকালেন না। তিনি মুখ নিচু করে তাকিয়ে রইলেন তার পায়ের দিকে। হেমা আবারো ডাকল, 'বাবা'।

আসলাম সাহেব বসে রইলেন নির্বাক, নিরুত্তর। হেমা বলল, 'এই কথাটিই আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম বাবা। এই এতটা বছর এই সম্পর্কটাকে তুমি প্রচণ্ড কষ্ট করেও শেষ অবধি বয়ে নিয়েই গেছ। কিন্তু এখন আর বয়ে নিয়ে যেতে চাইছ না। এই না চাওয়ায়, এই সম্পর্কটার দায় নিশ্চয়ই আছে। অনেক বেশিই আছে। কিন্তু অন্য একটা খুব শক্তিশালী কারণও তো রয়েছে। সেই কারণটাকে তুমি অস্বীকার করো না বাবা।' www.boighar.com

হেমা থামল। তারপর ওয়েটারকে ডেকে সামান্য যে খাবারের বিল হয়েছে তা নিজেই দিলো। আসলাম সাহেব চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন। হেমা বলল, 'চলো, বাইরে খানিক হাটি। এখানে ভালো লাগছে না।'

বাপ-মেয়ে দীর্ঘ সময় হাঁটলো পাশাপাশি। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। একটা সময় হেমা বলল, 'তুমি কী ল'য়ারের সাথে কথা বলে ফেলেছ?'

আসলাম সাহেব এই প্রসঙ্গে কোনো কথা বললেন না। তিনি বললেন অন্য কথা। বললেন, 'তুই আমাকে খুব খারাপ ভাবছিস তাই না?'

হেমা বলল, 'একটুও না বাবা'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'কেন ভাবছিস না? আমি তো খারাপ মানুষ। আমি তোর বাবা। আর সে কিনা তোর মাকে রেখে অন্য একটা মানুষের কাছে চলে যাচ্ছে!'

www.boighar.com

হেমা বলল, 'ভাবতাম। যদি মা তোমাকে ডেকে বলত, যেও না। যদি তোমার চলে যাওয়ার জন্য তার একা হয়ে যেতে হতো। যদি তোমরা পরস্পরের কাছে সামান্য হলেও কোনো অর্থ বহন করতে। তাহলে হয়তো ভাবতাম। কিন্তু যেখানে তুমি চলে যাওয়া বা থাকায় মার বা তোমার কিছু যায় আসে না। বরং চলে গেলে অন্তত একজন মানুষ তো ভালো থাকবে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার তোমার এই ভালো থাকায়, মা'র তো আলাদা করে কোনো খারাপ থাকা হচ্ছে না। সে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। কিংবা কে জানে, হয়তো সেও ভালোই থাকবে! তাহলে খারাপ ভাবব কেন তোমায়?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তোর নিজের জন্য? নিজের জন্য খারাপ লাগবে না?'

এই প্রথম হেমা কথা বলল না। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল একটা হলুদ সোডিয়াম লাইটের নিচে। দাঁড়িয়ে গেলেন আসলাম সাহেবও। হেমা দীর্ঘ সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খুব ধীরে, খুব মৃদু গলায় বলল, 'লাগবে বাবা। খুব খারাপ লাগবে। কিন্তু আমি কখনোই চাইনি, আমার ভালো লাগা, মন্দ লাগার জন্য অন্য কারো ভালো থাকা, মন্দ লাগা প্রভাবিত হোক।'

আসলাম সাহেব মেয়ের আরো খানিকটা কাছে এসে দাঁড়ালেন। হেমা বলল, 'তবে আমার যদি ক্ষমতা থাকত। ধরো জাদু টাদু কিছু জানতাম, তবে ফুঁ দিয়ে তোমাদের দুজনের মনের ভেতর থেকে অতীত মুছে দিতাম। তোমরা তখন কেবল আমার বাবা-মা হয়েই থাকতে। আর সকল কিছু হাওয়ায় মিলিয়ে যেত।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি'।

হেমা বলল, 'আমি এখন যাব না বাবা। তুমি যাও। আমি কিছুক্ষণ এখানে ফুটপাতে বসে থাকব একা। সোডিয়াম লাইটের নিচে একা একা বসে থাকার একটা আলাদা ব্যাপার আছে। তুমি যাও।'

আসলাম সাহেব কি করবেন বুঝতে পারছেন না। অবশ্য হেমা যেহেতু বলেছে, সে এখানে বসে থাকবে, সে বসেই থাকবে। কিন্তু হেমাকে এখানে এভাবে একা রেখে যেতে তার মন চাইছে না। তিনি হেমার পাশে দাঁড়িয়েই রইলেন। হেমা হঠাৎ বাবার হাত ধরে বলল, 'আমরা আসলে দিন শেষে সবাই কেবল নিজে নিজেই ভালো থাকতে চাই বাবা। এই যে দেখো, খানিক আগে আমি বললাম না, আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি তোমাদের অতীত মুছে দিয়ে তোমাদের কেবল আমার বাবা মা-ই বানিয়ে দিতাম। কিন্তু দেখো, তোমরা হয়তো তোমাদের অতীত স্মৃতি মুছে দিতে নাও চাইতে পারো। মা হয়তো তার সেই অতীত স্মৃতিগুলো নিয়ে ঠিকই আছে। কিন্তু আমার ক্ষমতা

থাকলে আমি আমার জন্যই কেবল তোমাদের চাইতাম। তোমাদের আলাদা চাওয়া-পাওয়ার কথা মোটেই ভাবতাম না।'

আসলাম সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি সরি মা'।

হেমা বলল, 'সরি কেন বাবা?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'আমি জানি না আমি কেন সরি। বাট আই ফিল গিল্টি।'

হেমা বলল, 'এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এই ফিলিংটা রেখো না। এই ফিলিংটা এই নতুন সম্পর্কটাকেও নষ্ট করে দেবে বাবা। নিজে পুরোপুরি দ্বিধামুক্ত হও। সামান্যতম দ্বিধা রেখেও কিছু করো না। আমি জানি না, সেই মেয়েটা এই সম্পর্কে কেন এসেছে। নিশ্চয়ই সেও একটা আশ্রয়ের জন্যই আসছে। কিছুটা শান্তির জন্য এসেছে। এখন তুমি কোনো দ্বিধা বা অপরাধবোধ নিয়ে সম্পর্কটায় ঢুকলে তাকেও ঠকানো হবে। এটা করো না।'

আসলাম সাহেব আর কিছু বললেন না। তবে সোডিয়াম লাইটের সেই হলদে আলোর নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে তিনি নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়েটা সেই ছোট্ট তুলতুলে পুতুলের মতো কাঁথা জড়ানো, সেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে সারাক্ষণ তার গা ঘেঁষে লেগে থাকা মেয়েটা! তার সেই মেয়েটা চিন্তায়-ভাবনায় এতটা পরিণত হয়ে গেল কখন তিনি এই এত এতদিনে তা যেন কখনো টেরই পাননি! আসলাম সাহেবের হঠাৎ মনে হতে লাগল, এই মুখটা তিনি বহু বহু আগে আরো একবার দেখেছিলেন। ঠিক এই যে এই মুহূর্তে এই সোডিয়াম লাইটের হলদে আলোর নিচে দাঁড়িয়ে থাকা গভীর চোখের মমতাময়ী মুখখানা। বহু বহু বছর আগে। যেই মুখখানা দেখলে মুহূর্তেই তার বুকের ভেতরটা ডুবে যেত মমতার ঘ্রাণে। সেই মুখখানাই যেন এই এত এত বছর পর তিনি আবার তার চোখের সামনে দেখলেন। সেই মুখ। মায়ের মুখ।

www.boighar.com

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। ফজরের আজানের সময়ের এখনও কিছু বাকি আছে। এই অদ্ভুত সময়ে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দাঁড়িয়ে আছেন সলিমুদ্দি দফাদারের বাড়ির সামনে। সলিমুদ্দি দফাদারের বাড়িখানার প্রথমে রাস্তা থেকে দীর্ঘ উঠান। তারপর একখানা টিনের পরিত্যক্ত দহলিজ ঘর। তারপর আবার বিস্তৃত উঠান। তারপর পরিত্যক্ত বসতঘর। তারপর আবার দীর্ঘ উঠান। তারপর মজা পুকুর। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত পড়ে থাকায় বাড়িখানা ঘাস-লতাপাতার জঙ্গল হয়ে আছে। বর্ষার সময়ে এই ধরনের বাড়িগুলো হয় বিষাক্ত সাপের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আশেপাশের মাঠ, জঙ্গল, গর্ত পানিতে ডুবে যাওয়ায় সাপেরা সেসব আশ্রয় ছেড়ে এই ধরনের বাড়ির শুকনো ভিটে মাটিতে এসে বসত গাড়ে। এখানে ইঁদুর, ছুঁচো থেকে শুরু করে নানান খাবারও পাওয়া যায়।

পারতপক্ষে এইসময়ে কেউ এই ধরনের বাড়ির আশেপাশে ঘেঁষে না। কিন্তু এই শেষরাতের সুনসান নিস্তব্ধতায় সেই বাড়িতে এসেছেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তার সাথে আছে এস্কান্দার আর মনির। সামনের উঠানে পায়ের গোড়ালি ডুবিয়ে হাঁটু অবধি তেড়ে আসা ঘাস। খুব সাবধানে তারা সেই ঘন ঘাসের উঠান পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। দহলিজ ঘরের দরজায় মস্ত তালা ঝোলানো। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দহলিজ ঘরখানাকে বাঁ পাশে রেখে চলে এলেন বাড়ির ভেতর দিকের উঠানে। তারপর কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। চারপাশে একটানা পোকামাকড়ের ডাক। সাপখোপের ভয়ঙ্কর বিপদ মাথায় নিয়ে এই নিশুতি রাতে এখানে আসার কারণ রয়েছে। চাইলে তিনি দিনের আলোতেও এই বাড়িতে আসতে পারতেন। কিন্তু সলিমুদ্দি দফাদারের পরিত্যক্ত বাড়িতে হঠাৎ তৈয়ব উদ্দিন খাঁর আগমন এই নিস্তরঙ্গ গ্রামে বড়োসড়ো খবর। এই খবর মুহূর্তেই পাঁচকান হয়ে যাওয়ার কথা। ঘটনা দেখতে চারপাশে উৎসুক জনতার ভিড়ও লেগে যাওয়ার কথা। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এটি চাননি। আর চাননি বলেই তার এত গোপনীয়তা।

মনিরের হাতে সরু লম্বা চার্জার লাইট। এই লাইট আনা হয়েছে বিলকুড়ানির হাট থেকে। ফতেহপুরে ইলেক্ট্রিসিটি না থাকায় এখানে কারো ঘরেই এই ধরনের লাইট দেখা যায় না। কিন্তু আজ বিশেষ প্রয়োজনে এই লাইট নিয়ে আসা হয়েছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এহন বলি এইহানে এই রাইতে ক্যান আইছ'।

মনির বলল, 'দাদাজান, আপনে আইজ সন্ধ্যা রাইতে বলনের পরই সেইটা আমি বুঝছি'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমার সন্দেহ ফজু গয়নার কলসিখান এইহানে লুকাইয়া রাখছে। এই কথা বাড়িতে বইসা তোগো বলতে চাই নাই সাবধান থাহনের লইগ্যা। আইজকাল যা অবস্থা দাঁড়াইছে, দেখতেছি দেওয়ালেরও কান গজাইতেছে! কোনো কথা কারো প্যাটে থাহে না।'

মনির বলল, 'একখান কথা কই দাদাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কী কইবি আমি বুঝছি। কইবি তো এত জায়গা থাকতে এইহানে ক্যান ফজু ওই জিনিস লুকাইতে আইব?'

মনির অন্ধকারে অনুচ্চ স্বরে শব্দ করল, 'হুম'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমি এহনও নিশ্চিত না। তয় অনেকগুলা কারণও আছে। প্রথম কথা, ও যহন কলসিখান পাইছে, তহন বাইস্যাকাল। ওই কলসি রাখতে ও যাইব কই? বাইরে কোনোহানে মাটির তলায় রাইখা মাটি চাপা দিলে সেই মাটি শুকাইতে সময় লাগব। তার উপর বৃষ্টিতে মাটি ধুইয়া যাইতেছিল। কোন সময় কোনখানের মাটি ধুইয়া গিয়া কলসখান আবার মাটির তলা থেইকা বাইর হইয়া যায়, এইটা একটা ডরের বিষয়। জানাজানি হওনের ডরে কারো কাছে রাখতে দিতেও পারব না। তার উপর বাইস্যাকাল হওনে চাইরপাশে পানিতে ভরভরন্ত। কেলাগাছের ভেলা, তালের ডোঙ্গা, ডিঙ্গি নাও থেইকা শুরু কইরা নানান ধরনের নৌকায় সারাদিন লোকজন সবজায়গায় ঘোরাফেরা করে। বাড়ির ভিটা পর্যন্ত যহন তহন যে কেউ চইল্যা আসে। বিপদ থাইক্যাই যাইত। তাইলে জিনিস সে কই রাখব? এমন জায়গায় রাখব, যেইহানে বৃষ্টি বাদলার ডর নাই, লোকজন সহজে আসে না। আবার ওর বাড়ির ধারেই। চাইলে সেইহানে সময় সুযোগমতো ও রাইতও কাটাইতে পারব। কিন্তু বাইরে থেইকা কেউ ওরে দেখবও না। এইরম জায়গা তো এই একটা ছাড়া আর দেহি না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সামান্য থেমে কান পেতে যেন কিছু একটা শোনার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'আরেকটা ব্যাপার হইল বেয়ান বেলা নামাজ পড়া শেষ কইরা হাঁটতে বাইর হইয়া দুই দিন তারে আমি এইদিকে দেখছি। হয়তো এমনেই আইছিল। কিন্তু সবকিছু ভাইবা মনের মধ্যে একটা কামড় মারছে। এই

জইন্যাই এইহানে আইলাম। মনে কিছু সন্দেহ হইলে, সেইটা অগ্রাহ্য করতেও নাই, পুইষাও রাখতে নাই। হেস্তনেস্ত করন দরকার।'

মনির অস্ফুটে বলল, 'আচ্ছা দাদাজান। আমরা দেখতেছি।'

তারপরের কিছুটা সময় বাড়ির সম্ভাব্য সকল জায়গায় আলো ফেলে খুঁজে দেখল এস্কান্দার আর মনির। মূল দরজায় মস্ত তালা ঝোলানো থাকলেও সবগুলো ঘরের দরজা জানালারই এখানে-সেখানে ভাঙা। সেই পথে দহলিজ ঘর থেকে মূল ঘর, ঘাসের উঠান থেকে রান্নাঘর অবধি তারা আলো জ্বেলে দেখল। কিন্তু কোথাও সম্ভাব্য কোনো চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না। ফজরের আজান হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই নামাজ। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তখনো গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন উঠানে। কতটা সময় সেখানে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে কিছু একটা ভাবলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তারপর বাড়ি থেকে বের হতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। মনিরকে ডেকে বললেন তার সাথে সাথে বসতবাড়ির পেছন দিকে মজা পুকুরটার দিকে যেতে। পুকুরটাতে বহুকাল কেউ নামে না। পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটখানা লতাপাতায় ঢেকে আছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সেই ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আচমকা মনিরের কাছ থেকে লাইটখানা নিয়ে ঘাটের বেদির আশেপাশের জঙ্গল, ঘাস, লতাপাতা সরিয়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগলেন। বেশিক্ষণ অবশ্য খুঁজতেও হলো না। ঘাটের শরীর ঘেঁষেই ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর একখানা বড়োসড়ো গর্তের মুখ দেখা গেল। বাঁধানো ঘাটের বেদির পাশ থেকে মাটি খুঁড়ে চলে যাওয়া হয়েছিল একদম বেদির নিচ অবধি। সেখানে গর্তের উপরে ছাদের মতো কাজ করছিল শান বাঁধানো ঘাট। যাতে বৃষ্টি বাদলায়ও কোনো ক্ষতি না হয়। নিচের দিকে বিছিয়ে রাখা হয়েছিল প্লাস্টিকের বস্তা। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর দীর্ঘ সময় সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার ধারণা ভুল ছিল না। ফজু ব্যাপারী এখানেই রেখেছিল সেই গয়নাভর্তি কলসি। কিন্তু কয়েক দিন আগেই কোনো কারণে এখান থেকে তা সে সরিয়ে নিয়েছে!

রায়গঞ্জ বন্দরের সুকুমার কর্মকারের দোকানের পেছন দিকের অন্ধকার ঘরে বসে রয়েছে সালেহা। তার হাতে দুইখানা সোনার গয়না। একখানা হাসুলি আর একখানা রত্নচূড়। গয়না দুইখানা দেখে সুকুমার কর্মকার তাকে বাইরের ঘর থেকে ভেতরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। গয়না বেচতে আসতে ভয়ই করছিল সালেহার। কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই। আব্দুল ফকির বলেছেন, জমির কাগজপত্রের ব্যাপারে জরুরি টাকা-পয়সা দরকার। কিন্তু এই মুহূর্তে এই গয়না বিক্রি ছাড়া নগদ টাকা-পয়সা কই পাবে তারা? ফজু ব্যাপারী অনেক ভেবে-চিন্তে সালেহাকে পাঠিয়েছে গয়না বিক্রি করতে। সালেহার সাথে সেও রায়গঞ্জ

এসেছে। কিন্তু সে দোকান অবধি আসেনি। বসে আছে নৌকায়। রায়গঞ্জে কেউ কেউ তাকে চিনলেও সালেহাকে কারো চেনার কথা না। তাছাড়া পুরুষ মানুষের তুলনায় মেয়ে মানুষ গয়না বিক্রি করতে আসলে মানুষ সন্দেহ করে কম। পুরুষ মানুষ গয়না বিক্রি করতে আসলেই ভাবে নিশ্চয়ই কিছু গড়বড় আছে। হয় চুরি না হয় অন্যকিছুর মাল। ফজু ব্যাপারী অবশ্য এখুনি গয়না বিক্রি করতে চায়নি। সে চেয়েছিল ধীরে-সুস্থে অনেক দূরে কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে এই গয়না বিক্রি করতে। কারণ এই জিনিস দেখেই স্বর্ণকারদের ঘটনা বুঝে যাওয়ার কথা! কিন্তু সেই সুযোগ আর হলো না। তার আগেই জরুরি দরকার হয়ে পড়ল।

সুকুমার কর্মকার লোক ভালো। লোকমুখে শোনা যায়, স্বর্ণকাররা নাকি নিজের মায়ের গয়না বানাতেও ঠকায়। এই ক্ষেত্রে সুকুমার কর্মকারের বেশ সুনাম। তিনি আসলেন খানিক বাদে। এসেই সালেহার হাত থেকে গয়না দু'খানা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন। তারপর চোখ সরু করে বললেন, 'এমন আর কয়খান আছে মা জননী?'

সালেহা বলল, 'আর নাই। এই দুইখানই আছিল। আমার মার। তারে দিছিল আমার নানী।'

সুকুমার কর্মকার সামান্য হাসলেন। তারপর বললেন, 'হ। পুরোনো জিনিস। এমনে না পাইলে আর কেমনে পাইছেন?'

সালেহা কথা বলল না। সুকুমার কর্মকার বললেন, 'এই জিনিস অন্য কারো কাছে না নিয়া ভালো করছেন। নানান হাঙ্গামা করত। আপনেরে পুলিশে দেওনের ডর ভয় দেহাইয়া কম দামে কিন্যা রাখত।'

সালেহার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। সে বলল, 'পুলিশে দিব কেন? আমার জিনিস আমি বেচতে পারব না?'

সুকুমার কর্মকার হাসলেন। বললেন, 'পারবেন না কেন? অবশ্যই পারবেন। তারপরও, থাহে না, কত দুষ্টু মানুষ! শোনেন মা জননী, এই জিনিস সাধারণ সোনার জিনিস না। এই জিনিসের যা দাম, তা আমি আপনেরে দিতে পারব না। আমার দোকান ছোট। ব্যবসা ছোট। আমিও আপনেরে ঠকাব। কিন্তু একটা জিনিস হইল, আমি তাও আপনেরে কিছু পয়সা-পাতি দিব। কিন্তু অন্য কেউ হইলে নানান ঝামেলা করব। বলব, বাকি জিনিস কই? সেইগুলানও বেচতে হইব, না হইলে পুলিশ টুলিশে জানাই দিব। এইসব ঝামেলা কইরা, ডর-ভয় দেহাইয়া সব হাতানোর চেষ্টা করব। আর পুলিশ জানলেও দেশের কোনো লাভ নাই। দুই-চাইরখান ছাড়া বাদ বাকি সব তারাই ভাগবাটোয়ারা কইরা নিয়া যাইব। আপনেরে দেইখ্যা মনে হইতেছে গরীব মানুষ। যদি এই জিনিস বেচনের কয়টা টাকায় আপনের উপকার হয়, তাইলে আমার ক্ষতি কি?'

সালেহা বলল, 'এই দুইখানের দাম কত দিবেন?'

www.boighar.com

সুকুমার কর্মকার বললেন, 'আমি আপনেরে এক লক্ষ টাকা দিব। কিন্তু এই দাম এই জিনিসের আসল দামের এক কণাও না। আসল দাম শুনলে আপনে হার্টফেল করবেন!'

সালেহা আসল দাম শুনে হার্টফেল করবে কি! এই দাম শুনেই তার দম বন্ধ হবার উপক্রম। কিন্তু সে তা বাইরে প্রকাশ করল না। গম্ভীর ভাব নিয়ে বসে রইল। তারপর সুকুমার কর্মকারের হাত থেকে গয়না দুইখানা নিয়ে বলল, 'এত কম দামে এই জিনিস আমি বেচবো না।'

সুকুমার কর্মকার মৃদু হেসে বললেন, 'আপনে না বেচলে আমি জোর করব না মা জননী। আমার সাইধ্য থাকলে আমি আপনেরে ঠকাইতাম না। কিন্তু আমার সাইধ্য নাই। আর এহন গয়নার মার্কেটও ভালো না। এই জিনিস এইরকম বেচতে গেলে আমারও অনেক ঝামেলা পোহান লাগব। নানান ঝামেলা। আর যদি গলাইয়া বেচতে যাই, তাইলে আবার দাম পাব না। এই হইল সমস্যা।'

কিন্তু সুকুমার কর্মকারের এত কথায়ও সালেহা আতঙ্ক হলো না। সে গয়না নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। সালেহার ধারণা ছিল সুকুমার কর্মকার তাকে পেছন থেকে ডাকবে। তারপর দাম বাড়ানো নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। সুকুমার কর্মকার তাকে ডাকল না। সালেহা ধীরে সুস্থে হেঁটে গিয়ে নৌকায় উঠল। ঘটনা শুনে ফজু তাকে আবার ফেরত পাঠাল। গয়নার দাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও ফজু আন্দাজ করতে পারে যে এই ধরনের গয়নার ব্যবহার মূল্যের চেয়ে ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সামনে আর কোনো উপায় খোলা নেই। সালেহা গয়না বিক্রির নগদ টাকা নিয়ে ফিরল। আর দামাদামি না করলেও সুকুমার কর্মকার এক লক্ষ টাকা বলেও গয়নার দাম দিয়েছে দেড় লক্ষ টাকা। বিষয়টা নিয়ে সালেহা দারুণ খুশি হলেও ফজু ব্যাপারী কেন যেন খুশি হতে পারল না। বরং তার মনের মধ্যে কেমন খচখচ করতে লাগল।

নয়নের সাথে হেমার দেখা হলো বেশ কিছুদিন বাদে। হেমার ধারণা ছিল সেদিনের পর থেকে নয়ন আবার স্বাভাবিক আচরণ করবে। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটেনি। বরং নয়নের বাসা থেকে আসার পর থেকেই নয়নের ফোন আবার টানা বন্ধ। তার সাথে কিছুতেই যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। বিষয়টাতে হেমা খুব অবাক হয়েছিল। যেমন অবাক হয়েছিল সেদিন নয়নের অমন অস্বাভাবিক আচরণে। এই দীর্ঘ সম্পর্কে নয়নকে আর কখনোই অমন করতে দেখেনি হেমা। বিষয়টা নিঃসন্দেহে তাকে হতভম্ব করে দিয়েছিল। স্পর্শ করেছিল তুমুলভাবে। একটা অদ্ভুত ভালো লাগায় বেশ কিছুদিন ডুবিয়ে রেখেছিল তাকে। কিন্তু সেটি কেটে যেতেও সময় লাগেনি খুব একটা।

অবশ্য নিজের জীবন নিয়েও নানান অশান্তিতে থাকায় শেষ অবধি আর নয়নকে ঘাটায়ওনি হেমা। বাবা-মায়ের এই ঘটনাটা তার কেন যেন নয়নকে বলতে ইচ্ছে করছিল না। বরং পৃথিবীর আর সকল বিষয়ে নিজের ভেতর ক্রমশই কেমন একটা নির্লিপ্ততা চলে আসছিল। এই সময়টায় গিয়েই তার মনে হলো, নয়নের ভেতরে ভেতরেও নিশ্চয়ই এমন ভয়ানক কোনো অস্থিরতাই চলছে। সে চেষ্টা করেও হয়তো তাই নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারছে না।

তারা বসে আছে ক্রিসেন্ট লেকে। এই জায়গাটা হেমার খুব পছন্দ। নয়ন চুপচাপ। হেমাও। একজন চাওয়ালা এলো। এলো একজন সিগারেট ওয়ালা, বাদামওয়ালা। প্রত্যেকেই বারকয়েক ডেকেও গেল। কিন্তু দুজনের কেউ কোনো সাড়া দিলো না। নিজেদের আলাদা ভাবনার জগতে পুরোপুরি নিমগ্ন দুজন মানুষ বসে আছে একদম পাশাপশি। হাত বাড়ানো স্পর্শের দূরত্বে। অথচ কত দূরে!

নীরবতা ভাঙল নয়ন। সে বলল, 'কোনো কারণে কি তুমি আপসেট?'

হেমা প্রথমে শুনতে পেল না। তারপর মাথা তুলে তাকিয়ে মৃদু হাসল। বলল, 'একটু'।

নয়ন বলল, 'কি নিয়ে?'

www.boighar.com

হেমা বলল, 'বলতে ইচ্ছে করছে না'।

নয়ন বলল, 'শোধ নিচ্ছ?'

হেমা বলল, 'কিসের?'

নয়ন বলল, 'আমি যে আমার অনেক কথাই তোমাকে বলি না'।

হেমা আবারো হাসল। সেই মৃদু হাসি। তারপর বলল, 'বলো না, নাকি বলতে চেয়েও পারো না?'

নয়ন এবার আর কথা বলল না। হেমাই বলল, 'কিছু কথা থাকে না, বলতে চেয়েও পারা হয়ে ওঠে না। মনে হয়, থাকুক নিজের ভেতর। নিজের বলতে খুব আলাদা তো সবারই কিছু থাকে। সেই নিজেকে কি পুরোপুরি অন্যের কাছে মেলে দেওয়া যায়?'

নয়ন বলল, 'আর ধরো যদি এমন হয় যে নিজেকে লুকিয়ে রাখার কারণ হয় অপরাধবোধ? নিজের ভেতরের কথাগুলো সে এই কারণে লুকিয়ে রাখে যে সে চায় না তার এই কথাগুলো জেনে কেউ দূরে সরে যাক।'

নয়নের এই কথাটা শুনে হেমা যেন খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে বলল, 'তুমিও কি তাই করছ? অপরাধ লুকাচ্ছ?'

নয়ন কিছু সময় কি ভাবল! তারপর বলল, 'অপরাধ কিনা জানি না। তবে বলতে যে সাহসটা দরকার, সেটা সঞ্চয় করতে পারছি না। অনেক দ্বিধা, ভয়, জড়তা।'

হেমা বলল, 'অপরাধ হলেও না বলায় ক্ষতি নেই। কিন্তু সেই না বলাটা যেন কারো ঠকার কারণ না হয়। তোমার কিছু না বলা কারো ঠকার কারণ হলে সেটা ক্ষতি।'

নয়ন বলল, 'যদি বুঝতেই না পারি যে এই না বলাটা কাউকে ঠকানোর কারণ কিনা?'

হেমা খানিক চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলল। বলল, 'তুমি কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার ভেতর সন্দেহ ঢুকিয়ে দিচ্ছ। কারো প্রেমে পড়েছ নাকি?'

নয়নও হাসল। শুকনো হাসি। সে বলল, 'নাহ্'।

হেমা বলল, 'তাহলে?'

নয়ন বলল, 'মৃত্যুর সময় আসমা প্রেগন্যান্ট ছিল'।

সম্ভবত এই মুহূর্তে মাথায় বাজ পড়লেও এতটা অবাক হতো না হেমা, নয়নের কথা শুনে সে যতটা অবাক হয়েছে। হাঁটুর ওপর দুহাতে ভর রেখে বাঁ দিকে ঘাড় কাঁত করে নয়নের সাথে কথা বলছিল হেমা। সে ঠিক সেভাবেই তাকিয়ে রইল নয়নের দিকে। কিন্তু সে নয়নকে দেখছে না। তার দৃষ্টি নয়নকে ঝাপসা করে দিয়ে চলে গেছে দূরে। বহুদূরে। সেখানে ক্রিসেন্ট লেকের সেতুর

ওপরের অর্ধচন্দ্রাকার সিলিংয়ের উপর লাল সূর্য ডুবছে। দুটি কাক উড়ে গেল। দুটি শিশু লাফিয়ে পড়ল লেকের জলে। সেই জল ঢেউ তুলে ছিটকে উঠল পাড়ে। অনেকগুলো বৃত্ত কেঁপে কেঁপে বিস্তৃত হয়ে ক্রমশই মিলিয়ে গেল দূরে। হেমার মনে হলো তার চিন্তা করার শক্তিও অমন অসংখ্য বৃত্ত হয়ে কেঁপে কেঁপে দূরে গিয়ে ক্রমশই মিলিয়ে যাচ্ছে।

নয়ন ডাকল, 'হেমা'।

হেমা জবাব দিলো, 'হু'।

কিন্তু নয়নের মনে হলো হেমা যেন দূর কোনো অচেতন ঘোরের জগৎ থেকে জবাব দিলো। নয়ন আবার ডাকল। তারপর আলতো করে হেমার পিঠে হাত রাখল সে। হেমা যেন মুহূর্তেই সেই দূর অচেতন ঘোরের জগৎ থেকে ফিরে এলো। সে নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে কি ঘটনাটা খুলে বলবে?'

নয়ন বলল, 'হ্যাঁ বলব'।

হেমা বলল, 'আমার ধারণা ছিল, আমি আর আট-দশজন মানুষের চেয়ে খানিকটা হলেও আলাদা করে ভাবি। অন্তত ভাবতে চেষ্টা করি। সবচেয়ে বেশি যেটি চেষ্টা করি, তাহলো দুম করে কোনো কিছু নিয়ে সিদ্ধান্তে না পৌঁছে যেতে! কিন্তু আসলে কি জানো, আমরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে এক। আমি তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করেই এইটুকু সময়ে কতকিছু যে ভেবে ফেললাম!'

নয়ন বলল, 'কি কি ভাবলে?'

হেমা বলল, 'সেটা আমি তোমাকে বলতে পারব না।

নয়ন বলল, 'কেন?'

হেমা বলল, 'লজ্জায়'।

নয়ন বলল, 'লজ্জার কিছু নেই। তোমার জায়গায় থাকলে আমিও হয়তো একই কাজ করতাম।'

হেমা বলল, 'আছে। লজ্জার অনেক কিছুই আছে। একটা মানুষকে আমি এতদিন ধরে এতটা কাছ থেকে চিনি, তার সম্পর্কে এইটুকু বিশ্বাস আমার থাকবে না!'

নয়ন বলল, 'মানুষ সারাটা জীবন ধরে নিজেকেই চিনতে পারে না। যে কাজটি সে কখনো করবে বলে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে হয়তো সেই কাজটিও সে করে ফেলতে পারে। পারে না?'

হেমা বলল, 'তা পারে'।

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর যতটা সম্ভব আসমার ঘটনা খুলে বলল। ঘটনা শুনে হেমা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। যেমন ছিল, তেমনই

বসে রইল নিশ্চুপ। কে জানে, তার বুকে হঠাৎ আটকে যাওয়া ভারি পাথর হাল্কা হতে খানিক সময় নিলো কিনা! তারপর ভীষণ অসহায় ভঙ্গিতে নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বাসায় এই ঘটনা আর কেউ জানে না?'

নয়ন বলল, 'হয়তো জানত! আমিই বলতাম। কিন্তু পরিস্থিতিটা তেমন ছিল না। আমার শেষ পরীক্ষাটা সামনে। তার মধ্যে দু'দিন আগে আসমার ওই ঘটনা শুনে ভেতরে ভেতরে পাগলের মতো অবস্থা আমার! আসমা চাইছিল না, মা বা বাবা কেউ জানুক। ওর হয়তো ভয় ছিল যে তাহলে হয়তো গ্রামেও সবাই জেনে যাবে। আমিও ভাবলাম পরীক্ষাটা শেষ হোক। মাত্র তো দু' তিনটে দিন। কিন্তু ও সুইসাইড করে ফেলল। কারণটা কেউ জানে না। সবাই নানান কিছু ভাবছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তখন যেটা মাথায়, সেটা হচ্ছে পুলিশ। সুইসাইডের কথা পুলিশ জানাজনি হলে নানান সমস্যা। একবার ভাবো, তখন যদি এটা রিভিলড হতো যে শী ইজ প্রেগন্যান্ট! আমি তখন কিছু ভাবতে পারছিলাম না। বাবা মাকে বললাম, সুইসাইড যে করেছে, এটাই কাউকে জানানোর দরকার নেই। ভাগ্যও ভালো ছিল, কোনো ঝামেলা হয়নি। লাশ বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো'।

হেমা বলল, 'তারপর?'

নয়ন বলল, 'তারপর আর কিচ্ছু নেই। আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। এই কথা এখন বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না। বরং সন্দেহটা হবে উল্টো। ইউ নো, হোয়াট আই মিন।'

হেমা বোঝে। কিন্তু নিজের ভেতরটা কেমন খচখচ করছে। সে বলল, 'তোমার উচিত বিষয়টি নিয়ে তোমার মায়ের সাথে কথা বলা। দ্যাট কালপ্রিট শুড বি পানিশড!'

নয়ন কথা বলল না। চুপ করে রইল। হেমা হঠাৎ বলল, 'তুমি কি ভাবছ, সব শুনে আন্টি যদি তোমাকেই জিজ্ঞেস করে বসেন যে, তুমি আগে কেন তাকে জানাওনি? বা ধরো, উল্টো তোমাকেই যদি সন্দেহ করে বসেন, এই ভয় পাচ্ছ?'

নয়ন আচমকা চিৎকার করে উঠল। সে দু'হাতে তার মাথার দু'পাশের চুল মুঠি করে ধরে চিৎকার করে বলল, 'আমি জানি না। আই রিয়েলি ডোন্ট নো'।

হেমা নয়নের আচরণে অবাক হলেও সেটা প্রকাশ করল না। সে নয়নের পিঠে আলতো হাত রেখে বলল, 'শান্ত হও নয়ন। তিনি তোমার মা। তিনি তার ছেলেকে চেনেন। আর সবার চেয়ে ভালো করেই চেনেন। আ আমি শিওর, উনি এমন কখনোই ভাববেন না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করে বলতে পেরেছ। আমার প্রতি তোমার এই বিশ্বাসটুকু আছে যে আমি তোমাকে সন্দেহ করব না। আর তার উপর নেই? শী ইজ ইওর মাদার! তার চেয়ে ভালো আর তোমাকে কে চেনে?'

নয়ন চাপা রাগে ফুঁসতে থাকা কণ্ঠে বলল, 'আমি সেটা ভাবছি না হেমা। আমি সেটা ভাবছি না। আমি তার চেয়েও বেশি কিছু ভাবছি। সামথিং হরিবল হেমা!'

নয়নের সারা শরীর কাঁপছে। তাকে দেখতে লাগছে হিস্টিরিয়ার রোগীদের মতো। হেমা উঠে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর দু'হাতে নয়নের মাথা চেপে ধরে বলল, 'কি হয়েছে নয়ন? আমাকে বলো। এমন করছ কেন? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

নয়ন দু'হাতে হেমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে হেমা। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি এই যন্ত্রণা আর নিতে পারছি না।'

হেমার ধারণা ছিল নয়ন কাঁদবে। কিন্তু নয়ন কাঁদল না। সে স্থির মূর্তির মতো বসে রইল। সন্ধ্যা নামার পরও দীর্ঘ সময় তারা বসে রইল সেই একই জায়গায়। কিন্তু বাকিটা সময় জুড়ে আর একটা কথাও বলল না নয়ন।

হেমা বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল নয়নের দিকে। নয়ন বসে আছে শান্ত, স্থির। তার নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি সামনে। কিন্তু সেই নিষ্পলক চোখে সে কিছু দেখছে বলে মনে হলো না হেমার। তার কেবল মনে হলো, আপাতদৃষ্টিতে শান্ত স্থির এই মানুষটা তার বুকের ভেতর বয়ে বেড়াচ্ছে আস্ত একখানা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি।

www.boighar.com

দিনের প্রথম ক্লাসটা নিয়ে নিজের রুমে কেবল বসেছেন রেণু। আর তখনই বুকের ভেতর কেমন অস্থির লাগতে শুরু করল। দোতলায় তার রুমের বাঁ দিকটায় বড় একটা জানালা। জানালার বাইরে অন্ধকার করে দিয়ে ঝাকড়া এক আমগাছ। সেখানে একটা চড়ুই। চড়ুইটা লাফিয়ে এসে জানালার গ্রীলে বসল। তারপর আরেকটা চড়ুই। তাদের একজনের ঠোঁটে ছোট্ট এক পোকা। সে পোকাটা খাচ্ছে না। সাথের চড়ুইটার ঠোঁটের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে খেতে চাইতেই টুক করে ঠোঁট সরিয়ে নিচ্ছে। বার তিন চারেক এমন করার পর সাথের চড়ুইটা আর ঠোঁট বাড়াল না। যেন সঙ্গী চড়ুইর এমন খুনসুঁটিতে বড্ড অভিমান হয়েছে তার। সে লাফিয়ে পাশের গ্রীলে সরে গেল। আগের চড়ুইটাও তার পিছু নিলো। কিন্তু সঙ্গীর অভিমান তাতে কিছু কমল না। বরং সে আবার সরে গেল। আগের চড়ুইটাও পিছু ছাড়ল না একদম। তাদের এই মান-অভিমান খুনসুটি চলতেই লাগল। রেণু দীর্ঘ সময় সেই চড়ুই জুটির খুনসুটি, মান-অভিমান দেখলেন। তারপর উঠে গেলেন দ্বিতীয় ক্লাসটা নিতে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ক্লাসের পুরোটা সময় জুড়েই তার মাথায় ঘুরতে লাগল সেই জানালার গ্রীল আর চড়ুই জুটি। তিনি ক্লাসের ফাঁকেই বারকয়েক ক্লাসরুমের জানালায় তাকালেনও, যেন সেই চড়ুই জুটিকে এখানেও দেখা যাবে!

ক্লাস শেষ করে রেণু তড়িঘড়ি করে তার রুমে ফিরলেন। তারপর চুপচাপ বসে রইলেন অনেকটা সময়। এই চড়ুইজুটির বিষয়টা নিয়ে তিনি কিছুটা বিরক্ত। এরকম দৃশ্য নিশ্চয়ই রোজই প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু কখনোই হয়তো খেয়াল করা হয়ে ওঠে না। অথচ আজ বিষয়টা তার মাথায় ঢুকে গেছে। তিনি বহু চেষ্টা করেও বিষয়টা মাথা থেকে তাড়াতে পারছেন না। শরীরটা হঠাৎ ভালো লাগছে না। আজ আরো একটা ক্লাস তার নেয়ার কথা। কিন্তু ইচ্ছে করছে না। রেণু উঠে ব্যাগ গোছাতে শুরু করলেন। কিছু পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আজ ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন

বলেনিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুই হলো না। তিনি ব্যাগ গুছিয়ে রুম থেকে বের হতে যাবেন। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে তিনি দরজার দিকে না গিয়ে গেলেন জানালাটার কাছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। নাহ্, পাখি দুটি কোথাও নেই। তিনি একই সাথে বুকের ভেতরে খুব সূক্ষ্ম ধরতে না পারা মন খারাপ আর ধরতে পারা রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে রুম থেকে বের হলেন। সামান্য চড়ুই পাখির জন্য এমন করার কোনো মানে হয়!

বাসায় ফিরে খাতা দেখতে বসেছিলেন রেণু। কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থেকেও মনোযোগ বসাতে পারলেন না। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। এক ধরনের অবসাদ শরীর জুড়ে। খানিক ঘুমও পাচ্ছে। টেবিল থেকে খাতাগুলো নিয়ে তিনি চলে এলেন বিছানায়। বুকের নিচে একটা বালিশ দিয়ে আবার খাতা দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। ঘুম ঘুম ভাবটা প্রবল হচ্ছে। তারপর কখন যে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়লেন, টেরই পেলেন না। লম্বা ঘুম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার পর। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে উঠল। প্রেসারটা সমস্যা করছে বোধ হয়! তিনি ঘরে ঢুকে প্রেসার মাপার যন্ত্রটা খুঁজলেন। পেলেন না। ওষুধের বাক্সটা খুঁজলেন। পেলেন না। মাথা ব্যথাটা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে। তিনি দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে চারপাশের পৃথিবীটা ভনভন করে ঘুরছে।

প্রয়োজন না হলে হেমা সাধারণত খুব একটা মায়ের ঘরে আসে না। ক্লাস শেষে সন্ধ্যার আগে আগে সে বাসায় এসেছে। তারপর গোসল করে এক মগ কফি নিয়ে বারান্দায় বসেছে। রাহাত তাকে নতুন একটা গান পাঠিয়েছে। সে গান টান করে। নিজে নিজে লেখে, নিজে নিজেই সুর দেয়। তারপর গিটার বাজিয়ে গেয়ে ফেলে। একবার কি একটা অ্যালবামও বেরিয়েছিল তার। কিন্তু তারপর আর আগ্রহ দেখায়নি সে। তবে মাঝে-মধ্যেই সে গান গেয়ে মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে হেমাকে পাঠায়। সেসব গান বেশিরভাগ সময়ই খুলেও দেখা হয় না হেমার। কিন্তু আজ কি মনে করে সে গানটা ছাড়ল। তরল প্রেমের গান।

'তোর জন্য কান্না পাচ্ছে খুব, তোর জন্যই কান্না চেপে রাখা,
আমার অশ্রু ভাসায় যদি তোকে, তাই তো এমন অশ্রু চেপে থাকা।
তোর জন্য ঘুমের ঘরে খিল, তোর জন্যই ভীষণ রাত্রি জাগা,
তবুও চোখ সানগ্লাসটায় ঢেকে, তোর জন্যই আমার ভালো থাকা।
তোর জন্য কষ্ট হচ্ছে খুব, তোর জন্যই কষ্ট চেপে রাখা,
আমার কষ্ট কাঁদায় যদি তোকে, তাই তো এমন কষ্ট চেপে থাকা'।

www.boighar.com

কী সব অসহ্য কথাবার্তা! রাহাত কবে থেকে এমন হয়ে গেল। হেমা গানটা বন্ধ করে দিলো। সে তাকিয়ে রইল বাইরে। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে সে মাথা থেকে গানটা বের করতে পারছে না। আরো অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তারও কিছুক্ষণ বাদে সে আবিষ্কার করল, গুনগুন করে সে গানটা গাইছে, 'তোর জন্য কান্না পাচ্ছে খুব, তোর জন্যই কান্না চেপে রাখা, আমার অশ্রু ভাসায় যদি তোকে, তাই তো এমন অশ্রু চেপে থাকা।'

সে নিজের উপর ভারি বিরক্ত হলো। এই ধরনের অতি প্রেম প্রেমভাব গান, সিনেমা, বই তার ভালো লাগে না। হেমা বারান্দা থেকে ঘরে চলে গেল। তারপর বাতি বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে রইল। শুয়ে থাকতে থাকতেই সে গানটা আবার চালু করল। গানের কথা যা-ই হোক, সুরটা অদ্ভুত মন কেমন করা!

'তোকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব, তোর জন্য ইচ্ছে চেপে রাখা,
আমার ইচ্ছে পোড়ায় যদি তোকে, তাই তো এমন ইচ্ছে চেপে থাকা।
তোর জন্য আকাশ ছেড়ে দিয়ে, আমিই না হয় বেছে নিলাম খাঁচা,
তোর জন্য কান্না বুকে রেখে, আমার এমন হাসি মুখে বাঁচা'।

হেমা গানটা শুনল। একবার, দুইবার, তিনবার। সে তার পরের কয়েক ঘন্টা একটানা বারবার গানটা শুনল। তার হঠাৎ মনে হতে লাগল, এই কথাগুলো রাহাতের এবং রাহাত তাকে ভেবেই কথাগুলো লিখেছে! কী তীব্র অনুভূতি নিয়েই না কথাগুলো রাহাত লিখেছে! কিন্তু রাহাতের এই অনুভূতিগুলো সে কখনোই স্পর্শ করতে পারেনি। কোনোদিন হয়তো পারবেও না। গানটা হেমা যতবার শুনেছে, তার কেবল নয়নের কথা মনে হয়েছে। ঠিক এই অনুভূতিগুলোই সে তার বুকের ভেতর সযতনে নয়নের জন্য পুষে রাখে। কিংবা তার আরো কারো কারো কথা মনে পড়েছে। বাবা? মা? হেমা চুপচাপ অন্ধকারে বসে রইল। রাহাতের জন্য তার খুব মায়া হচ্ছে। এই মায়াটা অদ্ভুত। তার জন্য রাহাতের যে কষ্টটা, সেই কষ্টের কথা ভেবে তার মায়া হচ্ছে। কিন্তু সেই মায়াও রাহাতের জন্য তার ভেতরে বিশেষ কোনো ভালোবাসা তৈরি করতে পারছে না। রাহাতের প্রতি তার তীব্র এক ধরনের সহানুভূতি তৈরি হচ্ছে। সেই সহানুভূতি জুড়ে হয়তো ভালোবাসাও রয়েছে। তবে সেই ভালোবাসা আর নয়নের জন্য তার ভালোবাসা এক নয়। হেমা জানে, এই জগৎ যেমন ঘৃণার জগৎ। তেমনি ভালোবাসারও জগৎ। কিন্তু এখানে সকল ঘৃণা এক হলেও, সকল ভালোবাসা এক নয়। এখানে সম্পর্ক ও মানুষভেদে ভালোবাসা আলাদা।

হেমা রাতে খেতে গিয়ে দেখে খাবার টেবিলে কোনো খাবার নেই। মায়ের ঘরের বাতি জ্বলছে। সে দরজার পর্দা ফাঁক করে দেখল, রেণু কেমন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তার চোখ বোজা, কিন্তু পা দু'খানা

বিছানার বাইরে বিকটভাবে ভাঁজ হয়ে মেঝে ছুঁয়ে আছে। সে ছুটে এসে মায়ের পাশে বসল। রেণুর সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজব করছে। হেমা হাত বাড়িয়ে ফ্যানটা ছাড়ল। তারপর ডাকল, 'মা'।

বার দুই ডাকের পর চোখ মেলে তাকালেন রেণু। তারপর বুঝে উঠতে যেন খানিক সময় নিলেন যে তিনি কোথায় আছেন! হেমা বলল, 'তোমার শরীর খারাপ লাগছে?'

রেণু ডানে-বায়ে মাথা নেড়ে মৃদু হাসার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'না। ঠিক আছি'।

হেমা বলল, 'মিথ্যে কেন বলছ মা? কি হয়েছে?'

রেণু বললেন, 'এই মাথা ব্যথা হচ্ছিল। সম্ভবত প্রেসারটা একটু বেড়েছে'।

হেমা বলল, 'মেপেছ?'

রেণু বললেন, 'মেশিনটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না'।

হেমা বলল, 'ওষুধের বাক্সের সাথে থাকে না?'

রেণু বলল, 'থাকে তো। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না'।

হেমা উঠে বাক্সটা খুঁজল। আলমারিতে, টেবিলের ড্রয়ারে, তাকে। নেই। কোথাও নেই ওষুধের বাক্সটা।

হেমা মার পাশে এসে বসে বলল, 'কোথায় থাকে ওটা? রাখো কোথায় মনে করতে পারো না?'

রেণু কি বলতে গিয়েও আচমকা চুপ করে গেলেন। হেমা বলল, 'কোথায় রাখো সব সময়?'

রেণু মৃদু গলায় বলল, 'আমি তো রাখি না'।

হেমা বলল, 'তাহলে কে? বুয়া? তোমার এত প্রেসারের সমস্যা, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলা কই থাকবে, তুমি জানবে না? বুয়াকে ফোন দিব?'

রেণু বলল, 'না। বুয়াও জানে না'।

হেমা বলল, 'তাহলে? কে জানে? তুমিও না। বুয়াও না'।

রেণু খানিক চুপ করে থেকে অস্ফুট স্বরে বললেন, 'তোর বাবা'।

হেমা আচমকা যেন বুঝতে পারেনি। সে বলল, 'কে? বাবা!'

রেণু বললেন, 'হুঁ। এসবের খবর সব তার কাছেই থাকত'।

হেমা বলল, 'তাহলে? তোমার এমন হুটহাট প্রেসার হলে, মাথা ব্যথা হলে তখন পেতে কি করে? বাবার কাছে চাইতে?'

রেণু বলল, 'না। ও নিজ থেকেই দিত'।

হেমা বলল, 'বুঝত কি করে যে তোমার কখন কি দরকার?'

রেণু বলল, 'কী জানি কীভাবে বুঝত! কিন্তু দিত তো!'

www.boighar.com

খুব ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু হেমা কেমন চমকে গেছে। সে বলল, 'বাবা না থাকলে?'

রেণু বলল, 'দরকারি জিনিসগুলো কোথায় কি আছে, কাগজে লিখে বালিশের তলায় বা টেবিলে রেখে যেত। মোবাইল ফোনে মেসেজও দিয়ে যেত কখনো কখনো।'

হেমা বলল, 'কই? দেখি তোমার মোবাইল ফোনটা?'

রেণু বালিশের তলা থেকে তার মোবাইল ফোনটা বের করে দিলেন। কিন্তু ফোনে বাবার নাম কোথাও খুঁজে পেল না হেমা। সে বলল, 'বাবার নাম কি নামে সেভ করা মা?'

রেণু বললেন, 'সেভ করা নেই'।

হেমা কিছু বলল না। সে বাবার মুখস্ত নম্বরে ডায়াল করে মেসেজ খুঁজে বের করল। কোনো মেসেজই খুলে দেখা হয়নি। সব আনরিড হয়ে আছে। তবে মেসেজ না খুললেও নম্বরের নিচে প্রতিটি মেসেজের প্রথম লাইনটা দেখা যায়। সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেসেজের ভেতরে আর কি কি আছে! হেমা দীর্ঘ সময় মা'র পাশে বসে বাবার পাঠানো মেসেজগুলো পড়ল। একটার পর একটা মেসেজ খুলছে সে, আর কী যে অবাক হচ্ছে! একের পর এক মেসেজ পাঠিয়ে গেছেন বাবা। কিন্তু কোনো একটি মেসেজও মা খুলে দেখেননি। রিপ্লাইও করেননি।

বাবার পাঠানো মেসেজগুলোতে অবশ্য তেমন কিছু নেইও। সেই মেসেজগুলো ভর্তি কেবল রেণুর ওষুধের বাক্স কোথায় রাখা আছে তার খোঁজ, জরুরি মোবাইল ফোনের কার্ড, পুরনো মেডিকেল টেস্টের রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন, প্রেসার মেশিন, জরুরি ডাক্তারদের ফোন নম্বর, পাসওয়ার্ডসহ ডেবিট কার্ডের খোঁজ, শুকনো খাবার, অতিরিক্ত কলম-কাগজের প্যাকেটসহ কত কত জিনিসের যে খোঁজ! এইসবগুলো জিনিসই রেণুর জরুরি প্রয়োজনের। বাবা যে এই সকল কিছুর খোঁজ একবারে একটি মেসেজেই দিয়েছেন, তা না। মেসেজগুলো তিনি দীর্ঘদিন পরপর পাঠিয়েছেন। মেসেজ পাঠানোর তারিখগুলো দেখেই হেমা বুঝল, বাবা যখন অফিসের কাজে ঢাকার বাইরে যেতেন এই মেসেজগুলো তখনকার।

মা সব সময়ই খানিকটা অগোছালো, সারাক্ষণ নিজের ভেতর ডুবে থাকা মানুষ। কিন্তু সেই মানুষটাকে এত যত্ন করে খেয়াল করতেন বাবা! হেমা বাবার মেসেজ থেকেই ওষুধের বাক্স খুঁজে বের করল। তারপর মাকে বলল, 'বাবার মেসেজ দেখলেই তো ওষুধের বাক্সটা খুঁজে পেতে!'

রেণু বলল, 'ওগুলো কখনো খুলে পড়া হয়নি আমার'।

হেমা বলল, 'কেন পড়া হয়নি মা?'

রেণু এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। হেমাও আর কথা বলল না। সেই রাতটা আবার প্রবল অস্থিরতায় কাটল হেমার। সারারাত সে ঘুমাতে পারল না। বাবার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল হেমার। কষ্ট হচ্ছিল মার জন্যও। তবে মার জন্য হওয়া এই কষ্টটা আগের কষ্টের মতো না। এই কষ্টটা বাবার এমন প্রবল ভালোবাসা, এমন গভীর যত্ন পেয়েও তা গ্রহণ না করার কষ্ট। প্রবল নির্লিপ্ততায় এমন গভীরতম অনুভূতিকে উপেক্ষা করে নিজেকে বঞ্চিত করার কষ্ট।

www.boighar.com

রাহাতের আজকাল ঘুমে খুব সমস্যা হচ্ছে। রাত জেগে হলের ছাদে বসে একা একা গিটারে টুংটাং করে সে। সিগারেটের পর সিগারেট খায়। সারাক্ষণ বুকের ভেতর কী জানি কী এক অস্থিরতা। বিষয়গুলোকে প্রথম কয়েকদিন সে পাত্তা দিতে চায়নি। এসব কেন হচ্ছে তা সে জানে। এই ভয়টা ভেতরে ভেতরে তার ছিল। কিন্তু কখনোই গ্রাহ্য করতে চায়নি সে। হেমাকে রাহাত ভালোবাসে। সব জেনেশুনেই ভালোবাসে। হেমার সাথে থাকা প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে অপার্থিব অনুভূতির মনে হয়। যতক্ষণ হেমার সাথে সে থাকে না, ততক্ষণ হেমাকে নিয়ে ভাবতে তার ভালো লাগে। শাহবাগ মোড়ে ফুলের দোকান দেখলে তার হেমার কথা মনে পড়ে। রিকশায় কোনো মেয়েকে হুড তুলে এলো চুল উড়িয়ে যেতে দেখলে তার হেমার কথা মনে পড়ে। লালমাটিয়া-মোহাম্মদপুরের বাস দেখলে, বিলবোর্ডে মন ভালো করে দেয়া হাসিমুখের কোনো মেয়ের ছবি দেখলে, আকাশে মেঘ দেখলে তার হেমার কথা মনে পড়ে। আকাশে মেঘ না দেখলেও তার হেমার কথা মনে পড়ে। তখন তার মনে হয়, আকাশে মেঘ নেই কেন? বৃষ্টি নেই কেন?

হেমার প্রতি তার এই ভালোবাসাটা একপাক্ষিক সে জানে। কিন্তু সে সব সময়ই বিশ্বাস করত, এতে তার কিছু যায় আসে না। তার কেবল এই ভালোবাসাতেই আনন্দ। এই অদ্ভুত সম্পর্কটার নামও সে জানে না। হেমা তার না প্রেমিকা, না বন্ধু। তবুও এই অসংজ্ঞায়িত, স্বার্থহীন, প্রাপ্তির প্রত্যাশাবিহীন সম্পর্ক নিয়েও সে কখোনেই বিব্রত বোধ করেনি। লুকায়ওনি কখনোই। না হেমার কাছে, না অন্যদের কাছে। কিন্তু আজকাল সেই প্রত্যাশাবিহীন সম্পর্কের ভাবনারা তাকে আর স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কোথায় যেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাপ্তির বাসনারা তাকে ক্রমশই অস্থির করে তুলছে। হেমার জন্য আজকাল সারাটা ক্ষণ তার মন কেমন করে!

www.boighar.com

সেদিন প্রথম সে হেমার জন্য কাঁদল। কী যে দেখতে ইচ্ছে করছিল হেমাকে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার যেটা, হেমাকে তার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে

করছিল। বুকের ভেতর হেমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তার। মনে হচ্ছিল, বুকের ভেতর একটা হু হু করা শূন্যতা, কেবল হেমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারলেই বুঝি সেই শূন্যতারা মুহূর্তেই কান্নায় কান্নায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু এই অনুভূতির কথাগুলো সে কোনোভাবেই হেমাকে জানতে দিতে চায় না। কোনোভাবেই না। সে জানে, কতটা গভীরভাবে নয়নকে ভালোবাসে হেমা!

কিন্তু সেই রাতে হেমার জন্য তার এই তেষ্টা, এই ব্যাকুলতাই যেন গান হয়ে এলো। সে লিখে ফেলল, 'তোর জন্য কান্না পাচ্ছে খুব, তোর জন্যই কান্না চেপে রাখা, আমার অশ্রু ভাসায় যদি তোকে, তাই তো এমন অশ্রু চেপে থাকা'। গুনগুন করে সুর দিয়ে গেয়েও ফেলল। তারপর হেমাকে গানটা পাঠিয়েও দিলো সে। রাহাত জানত না, হেমা গানটা আদৌ শুনবে কিনা! এর আগেও এমন কতকিছু সে হাসির ছলে হেমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু হেমা তার কিছু নিয়েই আর কখনো কথা বলেনি। তার মানে সেসব হেমা কখনো শোনেইনি।

গানটা পাঠানোর পর থেকেই কেমন অস্থির হয়ে ছিল রাহাত। সেই সন্ধ্যা থেকে সারারাত সে বসে রইল ছাদে। ঢাকা শহরের কেবল এই ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসটাতেই এ সময় শীত টের পাওয়া যায়। আর কোথাও না। খোলা ছাদে গভীর রাতে সেই শীতটা যেন কাঁপুনি হয়ে আসে। সে শীতে কাঁপছিল। তার কেন যেন বারবার মনে হচ্ছিল, হেমা হয়তো তাকে একটা ফোন দিবে। হেমা ফোন না দিলে সে আর হেমাকে ফোন দিবে না। এই অভিমানটুকুও নতুন। এমন আর কখনোই হয়নি রাহাতের। দিনের পর দিন সে হেমাকে ফোন করে যায়, মেসেজ পাঠিয়ে যায়, হেমা সেইসব ফোন না ধরলেও, না রিপ্লাই করলেও রাহাত তাতে কখনোই কিছু মনে করে না। সে পরদিন আবার ফোন দেয়। হেমা ধরলে ভালো, সে খুশি হয়, কথা হয় খানিক, না ধরলেও সমস্যা নেই। সে পরদিন তো আবার ফোন দিবেই! কিন্তু আজকের এই যে অভিমান, এই অভিমানটুকুকেও ভয় পায় রাহাত। কিন্তু সে এই অভিমানটা কাটাতে পারে না। তার বুকের ভেতরটা কেমন ভারি হয়ে যেতে থাকে। রাত যত ফুরাতে থাকে, তার তত কান্না কান্না লাগে। সে কাঁদেও। সেই সদা হাস্যোজ্জ্বল রাহাত, রাতের এই গভীর অন্ধকারে নিঃসীম আকাশের নিচে বসে একা একা কাঁদে। তার এই কান্না দেখার কেউ নেই। নেই বলেই হয়তো সে কাঁদে। জগতে কিছু কিছু মানুষ থাকে, যাদের জন্ম একা একা কাঁদার জন্য। যারা হাসলে জগতের সবাই দেখে, কিন্তু কাঁদলে কেউ দেখে না। এই জগতে তাদের কান্না দেখার কেউ থাকে না। রাহাত হয়তো তাদের একজন।

www.boighar.com

হেমার ফোনটা এলো শেষ রাতের দিকে। ফোন দেখে রাহাতের প্রথম বিশ্বাস হয়নি যে এটা হেমার ফোন। এতরাতে হেমার ফোন দেয়ার কথা নয়। তার ঘুমিয়ে থাকার কথা। রাহাত ফোনটা ধরল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। কী বলবে হেমা?

হেমা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুই এখনো ঘুমাসনি?'

রাহাত স্বাভাবিক গলায় বলল, 'বাই এনি চান্স, তুই কি আমাকে স্বপ্নের ভেতর ফোন করেছিস?'

হেমা বলল, 'ফাজলামো করিস না রাহাত। আমার মন খারাপ'।

রাহাত বলল, 'কেন? মন খারাপ কেন?'

হেমা আবারো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'আচ্ছা ধর, কেউ কাউকে অসম্ভব ভালোবাসে। সেই মানুষটার একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য সে করেনি এমন কোনো কাজ নেই। কিন্তু তারপরও কোনোদিন একমুহূর্তের জন্যও সে সেই মানুষটার এতটুকু ভালোবাসাও সে পায়নি। তখন কি করা উচিত তার?'

হেমার কথা শুনে রাহাতের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। হেমা কি তার কথা বলছে? রাহাত সামান্য চুপ করে থেকে বলল, 'ভালোবাসা কি কিছু করে হয় হেমা? আমার তো মনে হয় ও আপনাআপনি হয়ে যায়। যার হয়, তার কিছু না করেই হয়। আর যার হয় না, তার বহু কিছু করেও হয় না।'

হেমা বলল, 'মানুষ তাহলে মানুষকে ভালোবাসে কেন?'

রাহাত বলল, 'ওই যে ভালোবাসতে ভালো লাগে বলে'।

হেমা বলল, 'তাহলে কি মানুষ কেবল নিজের অনুভূতিটাকেই মূল্য দিচ্ছে না? সে কি খুব স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে না? একটা মানুষ তাকে ভালোবেসে দিনের পর দিন কতকিছু করে যাচ্ছে। তার কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না?'

রাহাত হেমার কথায় খুব অবাক হচ্ছে। আজ এসব কেন বলছে হেমা! সে বলল, 'এই স্পর্শ জিনিসটা বড় রহস্যময়। কেউ কাউকে সারা জনম চেষ্টা করেও স্পর্শ করতে পারে না। আবার কেউ কাউকে কিছু না করেও একমুহূর্তেই স্পর্শ করে ফেলতে পারে।'

হেমা কথা বলল না। চুপ করে রইল। রাহাতও। তারপর হেমা আচমকা বলল, 'তোর গানটা আজ শুনলাম। কী যে ভালো লিখেছিস! একদম বুকের ভেতরটা খামচে ধরে যেন!'

রাহাত হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, 'কার জন্য খামচে ধরে?'

হেমা বলল, 'ভালোবাসার জন্য'।

রাহাত বেপরোয়া গলায় বলল, 'এই ভালোবাসাটা কে?'

হেমা কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, 'আমরা বেশিরভাগ সময়ই ভালোবাসা বলতে দেখি মানুষ। কিন্তু ভালোবাসা হচ্ছে একটা পূর্ণতার অনুভূতি। ফিলিং অফ ফুলফিলনেস। ধর, কোনো একটা ফুল, একটা পাখি, একটা প্রজাপতি দেখে হঠাৎ মন ভালো হয়ে গেল। একটা পূর্ণতার অনুভূতি হলো, ওটাও ভালোবাসা। আবার কোনো মানুষকে দেখে যখন অমন ফুলফিলনেসের অনুভূতি হয়, ওটাও ভালোবাসা। আসলে ভালোবাসার রকম এত ভিন্ন, এত বেশি যে ভালোবাসাকে এক কথায় ডিফাইন করা সম্ভব না। তবে এই প্রত্যেকটা ভালোবাসার জন্যই আমাদের একটা কমন ফিলিং হয়। সেটা হলো, পেলে পূর্ণ মনে হয়, না পেলে শূন্য। তোর গানটা শুনে আমার সত্যি সত্যি কান্না পাচ্ছিল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমার বোধহয় নয়নের জন্য কান্না পাচ্ছে। তার কিছুক্ষণ পর মনে হলো, হ্যাঁ নয়নের কথা আমার মনে পড়ছে ঠিক, কিন্তু আমার বাবার কথাও মনে পড়ছে। বাবার জন্যও কান্না পাচ্ছে আমার। তার কিছুক্ষণ পর মনে হলো আমার মার কথাও মনে পড়ছে। শেষ অবধি মনে হলো আমার আসলে বাবা-মা, নয়ন এদের তিনজনের কথাই মনে পড়ছে। তুই জানিস না বোধহয়, বাবা আর মার ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়টা আমার ভেতর একটা শূন্যতা তৈরি করছে। এটা কিন্তু ভালোবাসা। তারা একসাথে থাকলে কিন্তু আমার একটা ফুলফিলনেসের ফিলিং হবে। দ্যাট ইজ লাভ। আমার বাবা-মাকে একসাথে দেখতে ইচ্ছে করছিল। এই জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল, কান্না পাচ্ছিল। তুই জানিস না তুই কি অদ্ভুত সুন্দর একটা গান লিখে ফেলেছিস।'

রাহাত কথা বলল না। হেমার বাবা-মার ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে শুনে সে ভারি অবাক হয়েছে। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে তার ইচ্ছে করছে না। হেমাই বলল, 'চুপ করে আছিস কেন?'

রাহাত মৃদু গলায় বলল, 'এমনি'।

হেমা হঠাৎ গাঢ় গলায় বলল, 'এমনি না'।

রাহাত একটু অবাক হলো। তারপর বলল, 'তাহলে?'

হেমা বলল, 'আমি অনেক কিছু টের পাই রাহাত। কিন্তু সব সময় সবকিছু ধরা দিতে ইচ্ছে হয় না। ভালো লাগে না। ক্লান্ত লাগে। বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে নিয়ে তোর খুব সমস্যা হচ্ছে এটা আমি খুব বুঝতে পারি। তোর জন্য আমার মায়া হয়। কিন্তু সেটা ভালোবাসা না।'

রাহাত বলল, 'জগতের সকল মায়ার মধ্যেই ভালোবাসা থাকে। ভালোবাসা ছাড়া মায়া হয় না।'

হেমা বলল, 'একদম ঠিক। কিন্তু ওই যে বললাম, সেই ভালোবাসার ধরন থাকে। তুই যেই ভালোবাসাটা চাইছিস, এই মায়ায় সেই ভালোবাসাটা নেই

রাহাত। তোর জন্য আমার কষ্টও হয়। জগতের সকল কষ্টেও ভালোবাসা থাকে। কিন্তু তোর জন্য আমার কষ্টে যে ভালোবাসাটা আছে, সেটা সেই ভালোবাসাটা না রাহাত।'

রাহাত চুপ করে আছে। হেমা বলল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

রাহাত হাসল। সেই হাসি কান্নার চেয়ে কম কিছু নয়। সে বলল, 'নাহ্। কষ্ট হবে কেন?'

হেমা বলল, 'আমি জানি হচ্ছে। তুই আমায় বল তো, আমি কি করব? আমার একটা সময় অবধি মনে হতো, তোর সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেই। কিন্তু তুই-ই বললি সেটা আরো বেশি কষ্টের। সেটা আরো বেশি খারাপ হবে। তাছাড়া উই আর সেম ব্যাচ, সেম ডিপার্টমেন্ট। চাইলেই যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া যায় না। আমাদের রোজ ক্লাসে দেখা হবে। তাহলে? তোর কষ্টটা আমি নিতে পারছি না। এখন তোর যেটা হচ্ছে, এই আশঙ্কাটা আমি আগেই করছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, তুই যতই হালকাভাবে নিস না কেন, কোনো এক্সপেক্টেশনই না রাখিস। কিন্তু এই নিয়মিত যোগাযোগ, কথা বলা, এগুলো ধীরে ধীরে তোকে ডুবিয়ে দেবে। একটা প্রত্যাশা তৈরি করবে। এটা হুট করে ধরা যায় না রাহাত।'

রাহাত বলল, 'আচ্ছা, আমি অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারি না কেন, বল তো? চেষ্টা যে করিনি তা কিন্তু না, চেষ্টা করেছি। কিন্তু আই কান্ট। কী যে অসহ্য লাগে। আমি সাবকনসাসলি তোর সাথে কম্পেয়ার করি।'

হেমা বলল, 'তুই অন্যদের মাঝে আমাকে খুঁজলে তো হবে না। তোকে যে যেমন, তাকে তেমন করেই ভালোবাসতে হবে।'

রাহাত বলল, 'তুই তো কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছিস। এভাবে কন্ডিশন দিয়ে কি হয়?'

হেমা বলল, 'তুইও কিন্তু একটা কন্ডিশনই দিয়ে দিচ্ছিস। যে মেয়েটাকে তুই ভালোবাসবি, তাকে আমার মতো হতে হবে।'

রাহাত বলল, 'আমি পারি না তো। আমি কি করব!'

এই প্রশ্নে হেমার খুব অসহায় লাগতে লাগল। কি বলবে সে রাহাতকে! সে কিছুই বলতে পারল না। সবচেয়ে ভালো হয় রাহাতের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারলে। কিন্তু সেটি এখনই সম্ভব নয়। আচ্ছা, সে কি কখনো মুহূর্তের জন্য হলেও রাহাতকে অন্য কোনোভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে? এমনটা হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না হেমা। কিন্তু সে অনেক ভেবেও তেমন কোনো ঘটনার কথা মনে করতে পারল না। কখনোই বিন্দুমাত্র প্রশ্রয়ও সে রাহাতকে দেয়নি। তাছাড়া রাহাত তার আর নয়নের সম্পর্কের আদ্যোপান্ত জানে।

ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। ফজরের আজান হচ্ছে। হেমা বলল, 'তোকে একটা কথা বলি?'

রাহাত বলল, 'হু'।

হেমা বলল, 'তোর গান নিয়ে সিরিয়াস হওয়া উচিত'।

রাহাত কথা বলল না। হেমাই বলল, 'আমি তোর গানে প্রচণ্ড মুগ্ধ। আজ কতবার যে গানটা শুনেছি। বোঝাতে পারব না। একটা কথা বলি শোন। কিছুক্ষণ আগে বললাম না, আমরা ভালোবাসা বলতে শুধু মানুষ বুঝি। কিন্তু ভালোবাসা হলো ফিলিং অফ ফুলফিলনেস। পূর্ণতার অনুভূতি। তোর এই গানটা আমাকে সেই অনুভূতিটা দিয়েছে। এটা কিন্তু তোর গানের প্রতি আমার ভালোবাসা। প্রথম প্রথম তোর সাথে আমার যখন পরিচয়। এই গান নিয়ে তোর কত কত স্বপ্ন ছিল। কী ভালোবাসা ছিল। কিন্তু সেসব তুই হারিয়ে ফেললি। কেন?'

রাহাত এবারও জবাব দিলো না। হেমা বলল, 'আমার জন্য? তোর সব ভাবনার, ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলাম আমি। এটা আমার জন্য কষ্টের। এটা অনেকটা ড্রাগসের মতো, তাই না? আর সবকিছুকে যে তুচ্ছ করে ফেলে। কিন্তু তুই-ই বল, এটা ভাবতে আমার কেমন লাগে? আমি একটা মানুষকে ধ্বংস করে দিচ্ছি। তার স্বপ্নগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছি। কি জঘন্য এই অনুভূতিটা একবার ভেবে দেখ তো!'

রাহাত এবারও কথা বলল না। হেমা বলল, 'মানুষের যখন মন খারাপ হয়, তখন সে তার প্রিয় সঙ্গীকে কাছে চায়। তার সঙ্গ চায়। এই সময়ে যারা মানুষের কাছে থাকে, শক্তি হয়ে থাকে, তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলতে তার জীবনে আর কিছু নেই। আমিও চাই তোর এই অদ্ভুত সুন্দর সব কথারা গান হয়ে আমার মন খারাপের সঙ্গী হোক। আমার দুঃসময়ের সঙ্গী হোক। তারা আমার মন ভালো করে দিক। আমি তোর অনেক অনেক গান শুনতে চাই। অনেক।'

হেমা থামলেও রাহাত কথা বলল না। হেমা আবার বলল, 'ভেবে দেখ তো, আমার মতো এমন কত কত মানুষ তোর গান শুনে মন ভালো করবে। আনন্দে কাঁদবে। তার প্রিয়জনকে বলবে, এই গানটা শুনে দেখো তো, ছেলেটা একদম আমাদের কথা বলেছে। শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়। এই অনুভূতির চেয়ে বড় আর কি আছে! এই ভালোবাসার চেয়ে বড়? কিছু কিছু মানুষ কারো একার জন্য হয় না। সে হয় সকলের। তুই তাদের একজন। তুই যদি কারো একার জন্য হয়ে যাস, তবে আর সবার প্রতি সেটা একটা অন্যায়। তুই জানিস না, কী অবিশ্বাস্য শক্তি তোর ভেতর আছে। এটা জানা তোর জন্য খুব দরকার।'

www.boighar.com

রাহাত জানে, হেমা তাকে তার এই অবস্থা থেকে বের করতে চেষ্টা করছে। সে তাকে তার গান নিয়ে উৎসাহিত করতে চাইছে। তাকে কোনো একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত করতে চাইছে। হয়তো এই ব্যস্ততা তাকে হেমার প্রতি তার এই দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে ধীরে ধীরে বের করে আনবে। কিন্তু সে হেমার প্রতি তার এই প্রবল ভালোবাসা থেকে বের হতে চায় না। সে এভাবেই থাকতে চায়। হেমাকে ভালো না বেসে সে থাকতে পারবে না।

রাহাত চুপ করে রইল। হেমাও। অনেকটা সময়। তারপর রাহাত হঠাৎ একটা অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করল, এই সবকিছু বোঝার পরও হেমার কথাগুলো তাকে উদ্দীপ্ত করছে। তার মনে হচ্ছে, সে চাইলে আবার গানটাকে ভালোবাসতে পারে। হেমাকে নিয়েই তো তার কত কত কথা, গল্প, গান। এইসব সে তো হেমাকে কখনোই বলেনি। বলতে পারবেও না। কিন্তু সে চাইলে তার সকলই গান হয়ে যেতে পারে। হেমা শুনবে। নিশ্চয়ই শুনবে। আর হ্যাঁ, অন্যরাও শুনুক। চারপাশে মানুষ আজকাল কেবল ঘৃণার কথা বলে, ঘৃণার কথা শোনায়, সে না হয় তার অনুচ্চারিত অন্তহীন ভালোবাসার কথা শোনাবে।

হেমা ডাকল, 'রাহাত?'

রাহাত সাড়া দিলো, 'হু?'

হেমা বলল, 'আমাকে আবার গানটা একটু শোনাবি?'

রাহাত কথা বলল না। তবে সে সেই ভোরের অদ্ভুত আলোয় হেমাকে গানটা শোনাল,

'তোর জন্য কান্না পাচ্ছে খুব, তোর জন্য কান্না চেপে রাখা,
আমার অশ্রু ভাসায় যদি তোকে, তাই তো এমন অশ্রু চেপে থাকা।
তোর জন্য কষ্ট হচ্ছে খুব, তোর জন্য কষ্ট চেপে রাখা,
আমার কষ্ট কাঁদায় যদি তোকে, তাই তো এমন কষ্ট চেপে থাকা'।
তোর জন্য একা একা এই, একা একা আমি একা কথা কই,
তোর জন্যই হাজার ভিড়েও রয়ে যাই আমি একা।
তোর জন্য কান্না চেপে রাখা'।

রাহাত কাঁদছে। কিন্তু রাহাতের সেই কান্না হেমা দেখতে পাচ্ছে না। কে জানে হেমাও কাঁদছে কিনা! খুব ধীরে ভোরের আলো ফুটছে। শুরু হচ্ছে আরো একটি নতুন দিন। সেই নতুন দিনের অদ্ভুত আলোয় ভেসে যেতে যেতে রাহাতের হঠাৎ মনে হলো এই কান্নার সবটা জুড়ে কেবল কষ্টই নেই। এই কান্নার কোথাও যেন খুব স্পষ্ট করেই রয়ে গেছে আনন্দ। নতুন সৃষ্টির আনন্দ। নতুন জন্মের আনন্দ। সেই জন্মে সে প্রেমিকই হবে। তবে সেই প্রেম হবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির। জগতে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির প্রেমের চেয়ে বড় কোনো প্রেম নেই।

ফজু ব্যাপারীর বড় ভাই নজরুল গ্রামে এসেছে। তবে তার স্ত্রী-পুত্রদের সে আনেনি। ফজু হোসনাবাদ এসেছে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। তারা বসে আছে আব্দুল ফকিরের বাড়ির বাইরের ঘরে। আব্দুল ফকিরকে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছে ফজু ব্যাপারী।

আব্দুল ফকির টাকা গুনে জুলফিকারের কাছে দিতে দিতে বললেন, 'কুড়ি হাজার টাকায় কি হইব ফজু? একখান দলিল-পর্চার পিছে একবার খোঁজ লাগাইতেই যায় দুই তিন হাজার টাকা। দুইজন মাইনষের যাওন আসনের খরচ আছে। মাঝে-মইধ্যে থাকন লাগে। তহন হোটেল ভাড়া, খাওন খরচ। তারপর আছে দালাল ধরন। পেশকার, তহশিলদার, উকিলের লগে একখান কথা কইতে গেলেও পয়সা লাগে। পয়সা ছাড়া একখান কথা কেউ কয় না। তারপর ধর, আমি এই যে আর সব কাজ কাম বাদ দিয়া দৌড়াইতেছি। আমারও তো একখান সংসার আছে। খরচাপাতি আছে! এই কয়টা টাকায় তো পানি গরমও হয় না।'

ফজু ব্যাপারী বলল, 'ফইর কাকু, এহন তো আর দিতে পারব না। ভাই ঢাকারতন কিছু পয়সা লইয়া আইছে বইল্যাই দিতে পারলাম। তয় আপনে চিন্তা কইরেন না। টাকার আরো ব্যবস্থা হইতেছে। আপনে এহন কাম চালান, ইনশাল্লাহ, টাকা-পয়সার সমস্যা হইব না।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'এই কাম বড় ঝামেলাররে ফজু। এহনো তো খাঁ'য়রা কিছু করন শুরু করে নাই। তারা শুরু করলে পয়সা লাগব দ্বিগুন। কারণ তারাও তো ঘুষ দিব। যারা বেশি দিতে পারব, তাগো কাম হইবো আগে।'

ফজু বলল, 'তাড়াতাড়ি করনের কোনো উপায় নাই কাকু?'

আব্দুল ফকির গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তাড়াতাড়িই হইতেছে। জমিজমার কাম বছরের পর বছর চইল্যা যায়, তারপরও মেটে না। আর সব জমিন হইছে খাঁ'য়গো দখলে। এই দখল একটা ব্যাপার বুঝছস!'

www.boighar.com

ফজু বলল, 'আপনেই ভরসা কাকু। আপনে তো সবই জানেন। যত বছর ল্যাগুক, এই জমিনের পাই টু পাই হিসাব আমরা চাই।'

ফজু তার ভাইয়ের কাছ থেকে আরো হাজার দুই টাকা নিয়ে আব্দুল ফকিরের হাতে দিয়ে বলল, 'এইটা দিয়া আপনে চা পান খাইয়েন কাকু।'

আব্দুল ফকির টাকাটা পকেটে রেখে বললেন, 'আর একখান কথা ফজু। তোর বাড়িতে শুনলাম ডাকাতি হইছে। তায় তোর বাড়িতে ডাকাতি হওনের ঘটনা তো বুঝলাম না? ডাকাইত কি তোর ছনের ঘরের বেড়া নিতে আইছিল?'

ফজু বলল, 'সেইটা এক রহস্য কাকু। আমিও বুঝতে পারলাম না ঘটনা। তয় একখান কথা, আমরা সবাই মিল্যা হাজার দশেক টাকা জমাইছিলাম। সেই টাকা আছিল ঘরে। ডাকাইত সেই টাকাটা কিন্তু লইয়া গেছে। তয় আমরা সেইটা বাইরে হুনান দেই নাই। ধরেন এইটা বাইরের মাইনষে জানল, সাথে সাথেই তো বড় খাঁ সাব আমারে ডাইক্যা নিয়া জিগাইব, এত টাকা আমি কই পাইছি? কি করব? এইজন্য কেউরে কিচ্ছু কই নাই।'

আব্দুল ফকির ফজুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোরে আমি যতটা ভ্যাবলা ভাবছিলাম। তুই কিন্তু আসলে তত ভ্যাবলা না ফজু। তোর মাথায় কিন্তু বুদ্ধি আছে।'

ফজু বলল, 'কি যে কন না কাকু! মাথায় যদি বুদ্ধিই থাকত, তাইলে কী আর যার বাপ-দাদারা থাহে সওদাগর, জমিদার, তাগো বংশ হইয়া আমরা হই ফহির-মিসকিন? কথায় কয় না, বুদ্ধি থাকলে ঘরজামাই থাহন লাগে না! আমাগো অবস্থা তো হেই বলদ ঘরজামাইর চাইতেও খারাপ। নিজেগো ঘরেই আমরা ঘরজামাইর চাইতেও অধম।'

আব্দুল ফকির হাসলেন, 'তুই তো দেহি কথাও শিখ্যা গেছস ফজু। নাহ্। তোরে আর ড্যাবাছ্যাবা ভাবন যাইব না। তোর বাইরে সদরঘাট হইলেও, তুই কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফিটফাট।'

ফজু কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আব্দুল ফকির বললেন, 'একখান কথা বলি ফজু। আমি বাতাসে ঘ্রাণ পাই। আন্দাজও পাই। ঘটনা যে উড়া উড়া কিছু আমার কানে আহে নাই তা না। ঘটনা আমার কানেও আইছে কিছু। যাই হোক এইসব জিনিস একলা একলা ভোগ করলে কিছুই ভোগ করন যায় না। ভাগশাক করতে হয়। আর আপন মাইনষের কাছে গোপন করলে তো বিপদরে ফজু। ডাক্তারের ধারে রোগ লুকাইলে হয়? তহন বিপদ হইলে বাঁচাইব কেডা?'

ফজু আর বেশি কথা বাড়াল না। তবে আব্দুল ফকিরের কথাগুলোও তার ভালো লাগল না। তার হঠাৎই কেন যেন মনে হলো, সে আব্দুল ফকিরের একটা চক্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এই চক্র তৈয়ব উদ্দিন খাঁর চক্র থেকে কম বিপদের নয়। কিন্তু মাথা গরম করলে হবে না। বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। সে

আজকাল বুঝে-শুনে কথা বলার চেষ্টা করছে। সে এখন জানে, কোথায় কতটুকু কথা বলতে হবে এইটা বোঝা খুব জরুরি! তার ভাই নজরুলও অবশ্য খুব একটা কথাবার্তা বলেনি। সে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে।

ফজু চলে যেতেই আব্দুল ফকির জুলফিকারকে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'ঘটনা কি বুঝলি জুলফিকার?'

জুলফিকার বলল, 'কোন ঘটনা কাকু?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'ফজুর ঘটনা। পোলা তো দেহি মারাত্মক পাকনা। তার ঘরের ডাকাতি লইয়া আমি সন্দেহ করব, এই জইন্য আমারে বুঝ দিয়া গেল!'

জুলফিকার হাসল। তবে কথা বলল না। আব্দুল ফকির বললেন, 'টাকা বাইর হওয়া শুরু হইছে। কিন্তু আসল জিনিস বাইর হয় নাই এহনও। সকলের আগে আসল জিনিস বাইর করতে হইব।'

জুলফিকার বলল, 'আসল জিনিস কি কাকু?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'গয়নার কলসি। এই কলসির কথা বহু আগে শুনছিলাম। তারপর আর মনে পড়ে নাই। সেইদিন রাইতে ফজুর টাকা-পয়সার কথা চিন্তা করতে গিয়া আচুক্কা মনে পড়ল। তয় ঘটনা যে কিছু একটা আছে, সেইটা তো বুঝতে পারতেছি। এইটাও কম না। হঠাৎ কইরা এত আটঘাট বাইন্ধা জমিন লইয়া নামছে, বিষয়টা এত সহজ না। খালি সহজই যে না, তাও না। জটিল, খুবই জটিল।'

জুলফিকার আর কথা বললেন না। আব্দুল ফকির তিন-চারদিন পরে বাড়িতে ফিরেছেন রাতে। তার সাথে এখনও পারুলের দেখা হয়নি। ভোর বেলা পারুল গেছে লতাদের বাড়িতে। আব্দুল ফকির ভেতর বাড়িতে গেলেন। তাবারন ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিল। আব্দুল ফকির তাবারনকে দেখে বললেন, 'তোরে আমি কি কইছিলাম তাবারন?'

তাবারন আব্দুল ফকিরের কথার জবাব দিলো না। সে একমনে ঝাড়ু দিতে থাকল। আব্দুল ফকির সামান্য গলা চড়িয়ে বললেন, 'আমার কথা তোর কানে যায় না? আমি কিন্তু কথা কেমনে কানে যায়, সেইটা জানি!'

তাবারন ঝাড়ুটা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তার মুখ নিম্নমুখি। আব্দুল ফকির বললেন, 'এক কথা আমার বারবার কইতে ভাল্লাগে না তাবারন। আরো ভাল্লাগে না কেউ আমার কথা না শুনলে। আর কেউ না চেনলেও তুই তো আমারে চেনস? আব্দুল ফইর কেডা?'

তাবারন হঠাৎ আব্দুল ফকিরের পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি এহন কই যাব? আমার তো যাওনের আর কোনো জায়গা নাই। আপনে আমারে খেদাই দিয়েন না।'
www.boighar.com

আব্দুল ফকির এদিক-সেদিক তাকিয়ে হিসহিসে কণ্ঠে বললেন, 'পায়ের উপরতন ওঠ তাবারন। এহনি ওঠ কইতেছি।'

তাবারন বলল, 'আপনে আগে কন, আমারে খেদাই দিবেন না। আমি তো এই বাড়ি তো দাসী বান্দির মতোই আছি। দাসী বান্দির মতোই থাকব।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'এক কথা বারবার বলন আমার পছন্দ না। তুই এইহানে আর থাহোস– এইটা আমার পছন্দ না।'

তাবারনের কান্না যেন এবার বেড়ে গেল। সে বলল, 'আমার কি এই দুইন্যায় আর কোনো যাওনের জায়গা আছে? আপনেই কন? আছে কোনো জায়গা? আপনে আমার জীবনডা ধ্বংস করছেন! এহন আর কি চান আপনে আমার কাছে?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'আমি তোর কাছে আর কিছু চাই না।'

তাবারন যেন খানিক শক্ত হলো। সে বলল, 'হ। এহন আর চাইবেন ক্যা? এহন তো আর কিছু দেওনের নাই। এহন আমার গতর পোড়ছে, বুক নষ্ট হইছে, আমার শইল ভাঙছে, এহন আর আমারে চাইবেন ক্যা? আমার জীবনডা লণ্ডভণ্ড কইরা এহন অন্য কেউরে আবার বিচরাইবেন।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তাবারন। বেশি কথা বলন আমি পছন্দ করি না। নুরুন্নাহারের অবস্থা দেইখ্যাও তোর শিক্ষা হয় নাই? পায়ের উপর থেইক্যা ওঠ কইলাম।'

তাবারন ঝট করে পায়ের উপর থেকে উঠে বসল। আব্দুল ফকির চকিতে তাবারনের পেট বরাবর সজোরে লাথি বসালেন। তাবারন কোঁৎ শব্দ করে নেতিয়ে পড়ল মেঝেতে। আব্দুল ফকির অবশ্য সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি গটগট করে হেঁটে চলে গেলেন উঠান পেড়িয়ে।

লতার কলেজে লম্বা ছুটি চলছে, সেই ছুটিতেই সে বাড়িতে এসেছে। আর এই সুবাদে সারাক্ষণ পারুলের সাথে সময় কাটছে তার। লতাদের বাড়ি থেকে পারুল ফিরল সন্ধ্যাবেলা। তার সাথে এলো লতাও। রাতে খেতে গিয়ে আব্দুল ফকিরের সাথে দেখা হলো পারুলের। সেদিন মায়ের ঘরের ঘটনার পর থেকে আর বাবার সাথে সেভাবে কথা হয়নি পারুলের। কিছুদিন থেকে খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আব্দুল ফকির। বাড়িতে বলতে গেলে থাকেনই না। মাঝে-মধ্যে আসলেও সে ওই মাঝরাতে। আবার ভোরবেলা বের হয়ে যান।

রাতে খেতে বসেও মায়ের বিষয়ে বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না পারুল। সে রোজকার মতো স্বাভাবিক গলায়ই বাবার সাথে কথা বলল। বাইরে বাইরে ঘুরে আব্দুল ফকিরের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখে পারুল তার শরীর

স্বাস্থ্যের খবর নিলো। সে বলল, 'আপনের শরীলডা তো দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে আব্বা।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'একটু দৌড়াদৌড়ির মইধ্যে আছিরে মা।'

পারুল বলল, 'এই বয়সেও এত দৌড়াদৌড়ি করতে আপনের ভাল্লাগে আব্বা?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'জীবনটাই তো দৌড়াদৌড়ির। মরনের পর তো সব বন্ধ। এইজন্য দুনিয়ায় যতটুক পারন যায়, দৌড়াদৌড়ি কইরা নেওন ভালো।'

পারুল বলল, 'এহন আপনে কি নিয়া ব্যস্ত আব্বা? বহুকাল আপনে কোনো বাড়িতে জ্বিন পরী ছাড়াইতে যান না। সাপের বিষ নামাইতেও যান না।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'আইজকাল আর ওইগুলানে প্যাট চলে না রে মা। এই এত বড় সংসার। কতগুলান মাইনষের খাওন পরন। সবকিছুর চিন্তাই তো করন লাগে।'

পারুল বলল, 'তাইলে অন্য কোনো কাম ধরছেন?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'দেহি কি হয়! বয়স তো আর কম হইল না। এহনো আল্লায় শরীলে তাগত রাখছে দেইখ্যা খাইট্টা খাইতে পারি। কোনদিন বিছনায় পইর‍্যা যাব, তহন চলব কেমনে? এইজন্য চেষ্টা করতেছি কিছু পুঁজিপাতির ব্যবস্থা করনের। নগদ বেশি কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা হইলে নিশ্চিন্ত থাহন যাইব।'

www.boighar.com

পারুল বলল, 'নগদ বেশি টাকার ব্যবস্থা করনের উপায় কি আব্বা?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তোমার আব্বায় পয়সাপাতিতে গরীব হইতে পারে, নামে ধামে গরীব না। তারে আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষজনে চেনে। দশজনে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। সে চাইলে একটা না একটা ব্যবস্থা হইয়াই যাইব।'

পারুল বলল, 'তারপরও শরীলের দিকে একটু খেয়াল রাইখেন আব্বা। আপনের শরীলটা খুব খারাপ হইয়া গেছে। দেখলে মায়া লাগে আব্বা।'

আব্দুল ফকির মেয়ের এই সামান্য কথায় খুবই আপ্লুত বোধ করলেন। ভাত খেতে গিয়ে তার গলাটা কেমন আটকে গেল। এই দুনিয়ায় এই তার একমাত্র মায়া, একমাত্র দুর্বলতা। এই মেয়ের জন্য তিনি এই পৃথিবী ওলটপালট করে দিতে পারেন। একবার মেয়ের জলবসন্ত হলো, মেয়ে কিছু খেতে পারে না। যা খায়, তাই বমি করে ফেলে দেয়। রাতভর কাঁদে। দিন সাতেক বিছানার সাথে মিশে ছিল মেয়েটা। এই সাতদিন তিনি রাতে ঘুমাননি। সারারাত মেয়ের পাশে বসে থাকতেন। দিনের বেলা ঘণ্টাখানেক ঘুমালেও ঘুম ভেঙে জেগে উঠেই সবার আগে মেয়ের মুখ দেখতে চাইতেন। জোর করে তাকে সামান্য খাবার গেলানো যেত। কিন্তু মেয়ের জন্য তার বুকটা সারাটাক্ষণ যেন এফোঁড় ওফোঁড়

www.boighar.com

হয়ে যেতে থাকল। সেই মেয়েটা এমন মায়া করে একটা কথা তাকে আগে কোনোদিন বলেনি। মেয়েটা তাকে কতটুকু ভালোবাসে, কতটুকু মায়া করে, তা আব্দুল ফকির কখনোই বুঝতে পারেননি। বুঝবেন কি করে, মেয়েটা তো কখনো তার সাথে ভালো করে কথাই বলেনি। কেমন একটা দূরত্ব ছিল সব সময়।

আব্দুল ফকির মনে করতে পারেন না, তিনি কখনো কেঁদেছেন কিনা! অথচ আজ এই সামান্য ক'টা কথায় আব্দুল ফকিরের গলা ধরে এলো। এই খেতে বসে, মেয়ের বান্ধবীর সামনে বসে, এই অবস্থায় চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লে, তা ভারি বিশ্রি একটা ব্যাপার হবে। আব্দুল ফকির যেন নিজেকে ব্যস্ত রাখতেই সামনের জগ থেকে পানি ঢেলে ঢকঢক করে দুই গ্লাস পানি খেয়ে ফেললেন।

মেয়েটা দেখতে দেখতে কেমন বড় হয়ে গেল! এই সেদিন মেয়েটাকে নিয়ে কাঁধে করে ঘুরতেন তিনি। আর সেই মেয়ের নাকি বিয়ের বয়স হয়ে গেছে! অনেকদিন থেকেই আশেপাশের লোকজন মেয়ের বিয়ের জন্য নানান সম্বন্ধও নিয়ে আসছেন। সেসব শুনে আব্দুল ফকিরের যে কি রাগ হয়! কিন্তু তিনি নিজেও বোঝেন, মেয়ে বড় হয়েছে, মেয়ের বিয়েও দেয়া দরকার। কিন্তু পারুলের বিয়ে হয়ে গেলে এই বাড়িতে তিনি পারুলকে ছাড়া থাকবেন কি করে! তিনি যেখানেই থাকেন, যতদূরেই থাকেন, দিন শেষে তার একটা কথাই শুধু মনে হয়, বাড়ি ফিরলেই মেয়ের মুখটা তিনি দেখতে পাবেন। এইটুকু ভাবলেই তার সকল ক্লান্তি, সকল কষ্ট নিমেষেই দূর হয়ে যায়।

পারুল বলল, 'আব্বা, এহন আপনের হাতে টাকা-পয়সা কেমন আছে?'

আব্দুল ফকির মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'টাকা-পয়সা দিয়া কি করবা মা?'

পারুল বলল, 'রৌদে রৌদে ঘুইর‍্যা আপনের জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখছেন? আপনের জইন্য আমি নিজে পছন্দ কইর‍্যা দুইখান পাঞ্জাবি বানাব।'

আব্দুল ফকিরের বুকের ভেতর যেন টুপ করে এক ফোঁটা হিম শীতল শিশির ঝড়ে পড়ল। সেই শিশিরের স্পর্শে তিনি অবর্ণনীয় এক অনুভূতিতে অবশ হয়ে রইলেন। তিনি বললেন, 'তোমার টাকা লাগলে তুমি নিও মা। আমি নানান কাজ কামে থাকি, অনেক কিছুই খেয়াল করি না। তোমার জামা, কাপুড়, স্নো, পাউডার লাগলেও কিন্যা নিও। ওই লতারে লইয়া রায়গঞ্জ যাইয়ো।'

আব্দুল ফকির ভাত খাওয়া শেষে জুলফিকারকে দিয়ে মেয়ের জন্য টাকা পাঠালেন। সেই রাতে বহুকাল পর তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে ঘুমাতে গেলেন।

দিন চারে বাদে আবার আব্দুল ফকিরের সাথে দেখা পারুলের। পারুলের হাতে দু'খানা পাঞ্জাবি। সে আব্দুল ফকিরের সামনে পাঞ্জাবি দু'খানা রেখে বলল,

'আব্বা, একটু গায় দেন দেহি। দেহি আপনেরে কেমন দেহায়। আমি নিজে লতারে লইয়া রায়গঞ্জ গিয়া কাপুড় কিন্যা আনছি। তারপর ছাইদুল খলিফারে দিয়া বানাইয়া আনছি।'

আব্দুল ফকির জামা গায়ে দিবেন কি! সেই জামা ধরেই তার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। তিনি অতি কষ্টে গলা স্বাভাবিক রেখে বললেন, 'আমি পরে গায় দিব মা। গায় দিয়া তোমারে দেহামু।'

পারুল অবশ্য বাবাকে জোর করল না। তবে বাবার সামনে থেকে চলে যাবার আগ মুহূর্তে হঠাৎই সে বলল, 'আরেকখান কথা আব্বা। কথাখান জরুরি'।

পারুলের বলার ভঙ্গিতে কিছু একটা ছিল। আব্দুল ফকির ঝট করে মেয়ের দিকে তাকালেন। পারুল বলল, 'আমার আরো কিছু টাকা লাগব আব্বা'।

আব্দুল ফকির যেন ফোঁস করে বুকে আটকে রাখা দম ছেড়ে নির্ভার হলেন। পারুল কী এক অদ্ভুত, শীতল, রহস্যময় গলায় যে বলেছিল 'আরেকখান কথা আব্বা'!

তিনি মানুষ চড়িয়ে খান। মানুষের গলার স্বর, কথার ভঙ্গিমা তাকে চিনতে হয়। ওই কথাটুকুর ভেতর কিসের এক পূর্বাভাস যেন ছিল। কিন্তু পারুল টাকার কথা বলতেই আব্দুল ফকির যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি বললেন, 'তোমার কিছু লাগব মা?'

পারুল স্বাভাবিক গলায় বলল, 'জ্বে আব্বা'।

আব্দুল ফকির বলল, 'কত টাকা লাগব মা?'

পারুল বলল, 'টাকার পরিমাণটা একটু বেশি। তয় এহন এইরমই লাগব। পরে আরো লাগলে তহন দেহা যাইব'।

আব্দুল ফকির বললেন 'কত টাকা?'

পারুল আগের মতোই নির্বিকার স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এহন হাজার পনেরো টাকা দিলেই হইব আব্বা। বাকিটা পরে লাগব।'

আব্দুল ফকির বুঝতে পারছেন না তিনি কি বলবেন! হাজার পনেরো টাকা দিয়ে পারুল কি করবে! তিনি যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বললেন, 'এতটাকা দিয়া তুমি কি করবা মা?'

পারুল বলল, 'মায়ের চিকিৎসা করাব। আপনে তো বহুবছর ধইর‍্যা মায়ের উপর থেইক্যা জ্বীনের আছড় ছাড়াইতে পারলেন না। আপনের মতো এত বড় ওঝা যদি এত বছরেও না ছাড়াইতে পারে, তাইলে আর কোন ওঝায় পারব? কেউ পারব না। এই জন্য আমি চিন্তা করছি, মায়রে ঢাকা নিয়া বড় ডাক্তার দেহামু। লতার কলেজ পনেরো-কুড়ি দিন বন্ধ। ও অর মামার লগে ঢাকা যাইব। তার লগে আমার কথা হইছে। সে কইছে আমি যদি আমার মায়রে

লইয়া যাই, কোনো সমস্যা হইব না। লতার মামার পরিচিত বড় ডাক্তার আছে, সেইহানেই দেহানোর ব্যবস্থা করান যাইব।'

আব্দুল ফকির মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। পারুলের কথা শুনে তিনি বুঝতে পারছেন না তার কি প্রতিক্রিয়া দেখানো দরকার। কিন্তু পারুল যে এই কথাটি বলার জন্যই গত ক'টা দিন তার সাথে এমন অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল, তা তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি। শুধু তাই-ই না, বরং তা দেখে তিনি প্রবলভাবে আবেগতাড়িতও হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই কথা ভেবে আব্দুল ফকিরের নিজেকে হঠাৎ কেমন অসহায় আর অপাংক্তেয় লাগছিল। কেমন সব হারানো নিঃস্ব একজন মানুষ মনে হচ্ছিল নিজেকে।

পারুল বলল, 'আব্বা, মায়ের লগে মনে হয় কোনো জ্বিন-টিন নাই। থাকলেও এইজন্য মায়র মাথা খারাপ হয় নাই। মায়র মাথায় বড় বড় আঘাতের দাগ। মায়ের বড় চুলের জন্য এতদিন খেয়াল করি নাই। শুনছি মাথায় খারাপভাবে আঘাত লাগলে নাকি মাইনষের মাথা খারাপ হইয়া যাইতে পারে। মায়র শরীলেও অনেক আঘাত। হইতে পারে এইগুলান মায় নিজে একলা একলাই করছে। সারাদিনই তো নিজের মাথাটা ঘরের বেড়ার লগে ঠোকে। সেই থেইক্যাও মাথায় অত বড় বড় আঘাতের দাগ হইতে পারে। আপনে যদি বেরাজি না হন, তাইলে মায়রে লইয়া আমি একটু ঢাকায় ডাক্তারের ধারে যাইতে চাই আব্বা!'

পারুল ধীরে-সুস্থে একনাগাড়ে কথাগুলো বলে থামল। এই কথাগুলো বলার জন্য সে দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েছিল। সেদিন নুরুন্নাহারকে দেখার পর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল পারুল। মায়ের লম্বা, ঘন চুলের ভেতর মাথাটা দেখে সে আঁৎকে উঠেছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় ভেবেও বের করতে পারেনি কি করবে সে! প্রথমে ভেবেছিল, বাবার মুখোমুখি দাঁড়াবে সে। কিন্তু পরে তার হঠাৎ মনে হলো, তাতে মায়ের কি লাভ হবে! মায়ের কাছ থেকে বাবার কিছু কিছু গল্প সে শুনলেও, সে সকল এতদিন বিশ্বাস করতে চায়নি পারুল। কিন্তু সেইদিন তার মনে হলো, মায়ের কাছ থেকে আরো অনেক অনেক গল্প শোনা তার বাকি আছে! কিন্তু তার আগে মাকে নিয়ে একটা শেষ চেষ্টা সে করে দেখতে চায়। কিন্তু বাবাকে ছাড়া সেটি সম্ভব নয়। পারুল জানত, বাবা কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজি হবেন না। শুধু তাই-ই নয়, তিনি হয়তো ভয়ঙ্করভাবে খেপে যাবেন। খুব বাজেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন। কিন্তু আব্দুল ফকির তার কিছুই করলেন না। পারুল আব্দুল ফকিরকে যতটা চমকে দিয়েছে, আব্দুল ফকির তার চেয়ে বহু বহুগুণ বেশি চমকে দিলেন পারুল কে। তিনি উঠে গিয়ে কোথাও থেকে একটা চটের ব্যাগ নিয়ে আসলেন। তারপর ব্যাগ থেকে অনেকগুলো নগদ টাকা বের করলেন।

পারুলের সামনে বসেই তিনি ধীর-স্থির ভঙ্গিতে সেই টাকাগুলো গুনতে লাগলেন। তারপর মুখে একটা সৌম্য স্নিগ্ধ ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'এই নেও মা। এইহানে কুড়ি হাজার টাকা আছে। বিদেশের বাড়িতে গেলে গোনা টাকা লইয়া যাওন যায় না। লইয়া যাইতে হয় আগোনা টাকা। কহন কোনহানে কোন খরচ লাইগ্যা যায়, আগেরতন তো কওন যায় না। হাতে কয়টা বেশি টাকা থাকলে ভরসা থাহে।'

পারুল হাত বাড়িয়ে বাবার হাত থেকে টাকাগুলো নিলো। কিন্তু তার হতভম্ব ভাব এখনো কাটছে না। আব্দুল ফকির বললেন, 'আমারই তোমাগো লগে যাওন লাগত। কিন্তু জরুরি কিছু কাজে আটকাই গেছি। তারপরও কও দেহি মা, তোমরা কবে যাইবা? আমিও যদি যাইতে পারি। নিজের ঘরে নিজের স্ত্রী বছরের পর বছর এমনে পইরা থাকলে কার ভালো লাগে কও মা! এই বুদ্ধিটা এতদিনেও আমার মাথায় আহে নাই। এই জইন্যই তো আল্লায় তোমারে আমার ঘরে দিছে। আমার মারে আবার আল্লায় আমার ঘরে তোমার রূপ ধইর‍্যা পাঠাইছে।'

কথা বলতে বলতে আব্দুল ফকিরের গলা ভারি হয়ে এলো। চোখ ভিজে এলো। তিনি কোনোমতে তার কান্না সংবরণ করলেন। পারুল বিস্ময়াভিভূত চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। সে জানে না সে কি বলবে! এই মানুষটাকে নিয়ে তার মা যা বলেছে, সে যা ভেবেছে, তার সবটাই সত্যি! আসলেই সত্যি? পারুল আর ভাবতে পারছে না। কোথাও বড় ধরনের কোনো সমস্যা আছে! কিন্তু সমস্যাটা কি তা সে জানে না। পারুল বলল, 'আমি আপনেরে তারিখটা জানাই দিব আব্বা।'

সে আব্দুল ফকিরকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ দিলো না। ঘুরে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব অস্বস্তি লাগছিল পারুলের। খুব অপরাধী লাগছিল। নিজের ঘরে ফিরেও পারুলের কিছুতেই ভালো লাগছিল না। কিছুতেই নিজেকে স্বস্তি দিতে পরছিল না। সেই রাতে ঘুমও হলো না পারুলের। বিছানার তলায় কুড়ি হাজার টাকা রেখেও, এতকাল পরে মায়ের চিকিৎসার নিশ্চিত ব্যবস্থা করেও, সেই সারাটি রাত পারুলের কেটে গেল বীভৎস বিভ্রান্তিতে, বিপুল ছটফটানিতে।

www.boighar.com

আজকাল বেশ ঘুমের সমস্যা হচ্ছে রেণুর। সামান্য শব্দ কিংবা আলোর আভাস পেলেই ঘুম ভেঙে যায়। মাঝরাতে তাই বিছানা থেকে উঠে দেয়াল ঘড়ির ব্যাটারি খুলে রাখতে হয় তার, জানালার পর্দার উপর বিছানার চাদর মেলে দিতে হয়। না হলে দেয়াল ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দ, জানালার পর্দা গলে আসা রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের সামান্য আলোতেও তার ঘুম ভেঙে যায়। আজও ঘুম ভেঙে গেল রেণুর। তিনি অভ্যাসমতো মাথার কাছের টেবিলে হাত বাড়াতে গিয়েও সরিয়ে নিলেন। গত ক'দিন ধরে এই ভুলটা তিনি বারবার করছেন। রাতে ঘুমানোর আগে তার পানি খাবার অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠেও দাঁত ব্রাশ করার আগে খালি পেটে ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে নেন তিনি।

আগে আসলাম সাহেব রোজ ঘুমানোর আগে পিরিচে ঢেকে একখানা ঝকঝকে কাঁচের গ্লাস আর একটা জগ রেখে যেতেন রেণুর মাথার কাছে। রেণু মনে করতে পারেন না, গত পঁচিশ বছরে এই ঘটনার অন্যথা কখনো হয়েছে কিনা। তিনি অবচেতনেই জানতেন, তার মাথার কাছে হাত বাড়ালেই তিনি গ্লাসটা পাবেন। জগটা পাবেন। এ এক অভ্যাস। দিনকয় আগে প্রথম যেদিন তিনি মাথার কাছে হাত বাড়িয়ে জগ আর গ্লাসটা পেলেন না, বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠল! সেই কেমন করাটা রেণুকে ভারি অস্বস্তি দিয়েছে। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এই কেমন করে ওঠাটা কার জন্য? নাকি কিসের জন্য?

তার কি কোনো মানুষের জন্য কেমন করে উঠেছে? নাকি গ্লাস আর জগের যে অভ্যস্ততাটা ছিল, সেই অভ্যস্ততার জন্য? তিনি অনেকক্ষণ ভেবেছেন। ভেবে ভেবে কোনো উত্তর তিনি খুঁজে পাননি। তবে একটা বিষয়ে তিনি নিশ্চিত, মানুষটার কথা তার একবারও মনে পড়েনি। মানুষটার অভাবও না। তার যা হয়েছে তা হলো, কিছু অভ্যাস হুট করে বদলে গেছে। দীর্ঘদিন একটা অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে মানুষ গেলে, হুট করে যদি সেই অভ্যাসের কিছু বদলে যায়, তবে বিষয়টা নিয়ে খানিক অস্বস্তি তো তৈরি হয়ই। রেণু জানেন, এর চেয়ে বেশি

কিছু তার হচ্ছে না। তিনি বাসাটা ছেড়ে দিবেন। তার কিছু জমানো টাকা আছে ব্যাংকে। এতদিন খুব একটা দরকার পড়েনি বলে খোঁজ নেয়া হয়নি। আজ তিনি খোঁজ নিয়েছেন। টাকার অঙ্ক শুনে তিনি অবাক হয়েছেন। অবশ্য অবাক হবারও কিছু নেই। চাকরি তো আর তিনি কম দিন ধরে করছেন না! দিনের পর দিন বেতনের টাকা, বোনাসের টাকা, বিভিন্ন সেমিনার এলাউন্স, পরীক্ষা আরো কত কী যে আছে! এই সব টাকাই তো জমেছে। আপাতত একটা ফ্ল্যাট খুঁজছেন তিনি। সমস্যা হচ্ছে এই বয়সে এসেও একা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া ভারী মুশকিল। বিষয়টা দেখে রেণু অবাক হয়েছেন। দিন দুই ক্লাস শেষ করে একা একা বাসা খুঁজেও এসেছেন তিনি। কিন্তু পাননি। রেণুকে বয়সের তুলনায় দেখতে একটু ভারি লাগে। কিন্তু তারপরও চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের একজন কলেজের শিক্ষিকারও ঢাকা শহরে একা একটা বাসা ভাড়া নিতে এত ঝক্কি পোহাতে হতে পারে, এটা রেণু ভাবেননি।

এই বাসার কিছু ফার্নিচার তার কেনা। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এসবের কিছুই তিনি নিবেন না। ডিভোর্সের সময় নানান ঝামেলার কথা তিনি শুনেছেন। আইন-কানুনের নানান ব্যাপার-স্যাপারও রয়েছে। তিনি এই বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চান। তার কোনো কিছু চাই না। তিনি একা একাই চলে যেতে যান। তার কিচ্ছু দরকার নেই।

এই পর্যন্ত এসে তার মনে হলো, তিনি হেমার কথা ভুলে যাচ্ছেন। অবশ্য জীবন জুড়েই কী অস্বাভাবিকভাবেই না তিনি হেমার কথা ভুলেই ছিলেন। হেমাকে কি তিনি কখনো মাতৃস্নেহ দিয়েছেন? রেণু আলাদা করে কিছু মনে করতে পারলেন না। অবশ্য এর কারণ এই না যে হেমার প্রতি তার স্নেহ, ভালোবাসা নেই। এর কারণ বলতে যা, সেটি তার আর আসলাম সাহেবের এই সম্পর্কহীন সম্পর্কের সকলক্ষেত্রেই একমাত্র কারণ। তিনি কোনো কিছুতেই আসলাম সাহেবের কাছাকাছি যেতে চাইতেন না।

হেমা জন্মের পর থেকেই হেমাকে যেন চোখের মণি করে ফেলেছিলেন আসলাম সাহেব। খাওয়ানো থেকে ঘুম পাড়ানো, বাথরুম করানো থেকে গোসল, এমন কিছু নেই যে তিনি করতেন না। ফলে ইচ্ছে হলেও আসলাম সাহেবের সাথে অযথা অতিরিক্ত কথা বলতে হবে বলে, তার সাথে একটা আলাদা যোগাযোগ তৈরি হবে বলে, তিনি যতটা সম্ভব নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তবে এই দূরে বসেও যে তিনি হেমাকে খেয়াল করেননি, তা নয়। বরং হয়তো কোনো না কোনোভাবে আসলাম সাহেবের চেয়ে বেশিই খেয়াল রেখেছিলেন। কিন্তু ওই যে, মানুষ কেবল চোখে যা দেখা যায় তাই দেখে, মনে যা দেখা যায় তা দেখে না। রেণু ভেবে দেখেছেন, তার জীবনটাই এমন। এক অদ্ভুত অস্পৃশ্যতায় পরিপূর্ণ জীবন।

www.boighar.com

তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে বাতি জ্বালালেন। একটা টিকটিকি কোথাও শব্দ করছে। বা ফ্যানের বাতাসে কোথাও একটা কাগজ নড়ছে। সেই সামান্য শব্দেও তার ঘুম হচ্ছে না। তিনি উঠে কোনো টিকটিকি খুঁজে পেলেন না। তবে কাগজ পেলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই কাগজটাও আসলাম সাহেবের লেখা! বিভিন্ন সময় এমন বহু চিরকুট তিনি এখানে-সেখানে রেখে যেতেন। তাতে প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কখনোই কোনো অযথা কথা লেখা থাকত না। রেণু অবশ্য সেসব খুব একটা পড়ে দেখেছে বলে মনে করতে পারেন না। কাগজগুলো বেশিরভাগই ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিতেন তিনি। কিন্তু আজকের এই কাগজটা কোত্থেকে এলো! সম্ভবত হেমা সেদিন যখন ওষুধ খুঁজেছিল, তখন কোথাও থেকে বের করেছিল। তারপর রয়ে গিয়েছিল। কাগজটা তুলে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন কাগজটার নিচের দিকে একটা ছোট্ট কথা লেখা আছে। কাগজটা ফেলে দিতে দিতেও তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর দেখলেন কাগজে লেখা–

'আমি চট্টগ্রাম যাচ্ছি। ফিরতে সপ্তাহখানেক লাগবে। এ সপ্তাহের বাজার করে রেখে গেলাম। মাছ কুটিয়ে আনা হয়েছে। তোমার ওষুধগুলো টেবিলের নিচের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। আর গতকাল দেখলাম, তোমার চশমার কাঁচে অসংখ্য স্ক্র্যাচ। ডান চোখেরটার নিচের দিকে সামান্য ভাঙাও। একটা নতুন চশমা বানাতে দিয়ে এসেছি। ওরা কাল দিয়ে যাবে। তোমার চোখের পাওয়ার তো আগেরটাই, নাকি? আমি খুঁজে বহু পুরনো একটা প্রেসক্রিপশন পেয়েছিলাম। সেটা দেখেই বানাতে দিয়ে এসেছি। প্রেসক্রিপশনটাও নিচের ড্রয়ারে রাখা আছে। একটু দেখে নিও। ওটা না হলে ওদের ফোন নম্বরে জাস্ট ফোন করে এখনকার পাওয়ারটা বলে দিও। ওদের কার্ডটাও ড্রয়ারে রাখা আছে। ওখানেই নম্বরটা পাবে। তোমার মাথার দিকে বিছানার নিচে কিছু টাকা রাখা আছে। দু'দিন ধরে খেয়াল করছি তুমি ঠান্ডা পানিতে গোসল করছ। ডাক্তার কিন্তু একদম নিষেধ করে দিয়েছিল। বারকয়েক বলতে গিয়েও সাহস হয়নি। একটু মনে রেখো। তোমার বাথরুমের গিজারটা তো দেখলাম ঠিকই আছে!

বিঃদ্রঃ একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো? এই এত বছরেও আমি জানি না, আমার নম্বরটা তুমি জানো কিনা! তোমার ফোনে আমার নাম, নম্বর সেভ নেই, সেটা জানি, কিন্তু মুখস্ত আছে কিনা, সেটা জানি না। শুধুই যে জানি না, তাই না। আমার তোমাকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। আমি জানি তুমি ফোন দিবে না। তারপরও আমার নম্বরটা এখানে লিখে দিলাম'।

নিচের এই অংশটুকু সবুজ কালিতে লেখা। তার নিচে বড় বড় করে ফোন নম্বরটা দেয়া। মূলত এই লেখাটুকু দেখেই রেণু থমকে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটুকু পড়তে গিয়েই পুরো চিরকুটটাও পড়ে ফেলতে হলো তাকে। চিরকুটটার কোথাও তারিখ দেয়া নেই। ফলে তিনি বুঝতেও পারলেন না চিরকুটটা কতদিন আগের। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, চিরকুটটা ফেলতে গিয়েও রেণু শেষ অবধি ফেললেন না। তার পড়ার টেবিলের উপরের দিকের ড্রয়ারে অবহেলা ভরে রেখে দিলেন। আর তখুনি একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এলো রেণুর। আচ্ছা, আসলেই কী মানুষটার ফোন নম্বরটা তার মুখস্ত নেই? তিনি অবশ্য কখনো কোনোদিন আলাদা করে নম্বরটা মনে রাখার চেষ্টাও করেননি। খেয়ালও করেননি। কিন্তু এত এত মেসেজ মানুষটা পাঠিয়েছেন! ফোনও যে একদমই করেননি, তাও না। ফলে আপনাআপনিই নম্বরটা মুখস্ত হয়ে যাওয়ার কথা! রেণু তার ফোন বের করে মনে থাকা নম্বরগুলো ডায়াল করে মেসেজ বক্সে গিয়ে দেখলেন নম্বরটা তার মনে আছে! মনে না থাকার অবশ্য কারণও নেই।

তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মেসেজও পড়ে ফেললেন। সমস্যা হচ্ছে এই মেসেজ পড়তে গিয়েই তার আচমকা মনে হলো, এই এত এত দিন পর এই পুরনো অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়া মেসেজগুলো তিনি কেন পড়ছেন? বিষয়টা তার কাছে ভালো ঠেকল না। তিনি ফোনটা রেখে বাতি নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। দীর্ঘ সময় চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন রেণু। কিন্তু তার ঘুম এলো না। বহুদিন মানুষটার সাথে এক বিছানায় থাকা হয় না তার। শুধু এক বিছানায়ই না, এক ঘরেও থাকেন না তারা। রেণুর পাশের ঘরটাতেই থাকতেন আসলাম সাহেব। দুটি ঘর একদম লাগোয়া। দুই ঘর মিলিয়ে একটা অবিচ্ছেদ্য টানা বারান্দাও রয়েছে। দুই ঘরের দরজা খুলেই বারান্দাটায় যাওয়া যায়। রেণুর ঘুম আসছে না। তিনি নানান চেষ্টা করলেন ঘুমাবার, কিন্তু পারলেন না। তিনি হঠাৎ নাকে সিগারেটের তীব্র গন্ধ পেতে লাগলেন। এই গন্ধটা পাওয়ার পর থেকে তিনি আরো ঘুমাতে পারলেন না। এমন গন্ধ নিয়ে ঘুমানো সম্ভব না। কিন্তু এতরাতে এই ঘরে সিগারেটের গন্ধ কোথা থেকে আসবে! হেমা কি সিগারেট টিগারেট খায় নাকি! আজকালকার ছেলে-মেয়েদের দিয়ে বিশ্বাস নেই! কলেজে, রাস্তাঘাটে এমন কত কত উদ্ভট জিনিস যে তিনি দেখেন!

রেণু প্রবল অস্বস্তি নিয়ে আবার উঠলেন। উঠে বাতি জ্বালিয়ে পা টিপে টিপে হেমার ঘরের দিকে গেলেন। হেমার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা। তিনি দরজায় কান পেতে খানিক বোঝার চেষ্টা করলেন, হেমা জেগে আছে কিনা! কারো সাথে ফোনে কথা বলছে কিনা! কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পেলেন না। আবার নিজের ঘরে এসে বিছানায় বসলেন রেণু। সাথে সাথেই যেন সিগারেটের গন্ধটা আবার টের পেলেন তিনি। ভারি বিদঘুটে লাগছে ব্যাপারটা।

www.boighar.com

রেণু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। তার ধারণা সিগারেটের গন্ধটা আসছে বারান্দা থেকে। তিনি উঠে বারান্দায় গেলেন। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই তার বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। তার ডান দিকে বারান্দার শেষ প্রান্তে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে! রেণুর পুরো শরীর যেন অবশ হয়ে গেল! এই রাতে মানুষটা এইখানে! এইখানে দাঁড়িয়ে তিনি সিগারেট খাচ্ছেন! এই ঘটনা অবশ্য নতুন কিছু না। আগেও বহুবার এমন হয়েছে। রেণু গভীর রাতে সিগারেটের গন্ধ পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। তারপর বারান্দায় এসে উঁকি দিয়ে দেখেছেন মানুষটা অবিকল ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। কিন্তু আজ, এখানে কীভাবে? তবে কি দিনের বেলা রেণু যখন কলেজে ছিলেন, তখন এসেছিলেন! রেণু কি করবেন এখন! তার ভয় হচ্ছে, আবার কেমন অবাকও লাগছে! রেণু কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বুঝতে পারছেন নাকি করা উচিত! তিনি বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আর তারপরই রেণুর হঠাৎ মনে হলো, ওখানে কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে নেই। বারান্দায় টানানো দড়িতে হ্যাঙ্গার ঝোলানো। সেই হ্যাঙ্গারে একখানা পাঞ্জাবি ঝুলছে। পাঞ্জাবিটা কবে শুকাতে দেয়া হয়েছিল, কে জানে! কেউ আর সরায়নি। বুয়াটাও আজকাল যা ফাঁকিবাজ হয়েছে! বলে না দিলে নিজ থেকে কোনো কাজই করে না। রেণু প্রচণ্ড বিরক্তবোধ করছেন নিজের উপর। একই সাথে প্রচণ্ড দ্বিধান্বিতও। আসলেই কি সিগারেটের গন্ধ-টন্ধ কিছু পেয়েছিলেন তিনি? নাকি পুরোটাই তার অস্থির মস্তিষ্কের কল্পনা?

রেণু ঘুমাতে গেলেন ফজরের নামাজ পড়ে। ঘুম ভেঙে দেখেন একটা ক্লাস এর মধ্যেই মিস করে ফেলেছেন তিনি। বিষয়টা ভাবতেই নিজের উপর নিজের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। খুবই অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছে তার। এসবের কোনো মানে হয়! তিনি তড়িঘড়ি করে কলেজে এলেন। কলেজে এসে শোনেন কিসের জন্য যেন ছাত্র ধর্মঘট চলছে, আজ কোনো ক্লাস হবে না। বিষয়টা জানার পর আরো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। খবরটা আগেভাগে জানতে পারলে আজ আর বাসা থেকেই বের হতেন না তিনি। রাতে ভালো ঘুম হয়নি বলে শরীরটাও কেমন লাগছে! রাজ্যের বিরক্তি আর মেজাজ খারাপ নিয়ে রেণু তার রুমে একা একা বসে রইলেন। এই মুহূর্তে জানালার গ্রিলে সেই চড়ুইটাকে দেখতে পেলেন তিনি। কিন্তু চড়ুইটা আজ একা। রেণু কৌতূহলি চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। চড়ুইটার জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু চড়ুইটা আর এলোই না। কিছু কিছু দিন থাকে এমন। এই দিনে যা-ই করা হয়, সবকিছুই হয় প্রত্যাশার চেয়ে উল্টো। অস্বাভাবিক রকম বাজে। রেণুর আজ তেমনই বাজে একটা দিন।

প্রিন্সিপাল ম্যাডামের রুম থেকে তার ডাক এসেছে। তিনি প্রিন্সিপাল ম্যাডামের রুমে ঢুকতেই রুমের আর সকলে বের হয়ে গেল। বিষয়টার কিছুই বুঝলেন না রেণু। প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সাথে তার আলাদা করে কোনো যোগাযোগ বা গুরুতর কোনো মিটিংও নেই। তিনি ক্লাস নেয়ার বাইরে কলেজের আর কোনো কিছুর সাথেই যুক্ত নন। তাহলে হঠাৎ প্রিন্সিপাল ম্যাডামের এমন জরুরি ডাক কেন? বিষয়টায় খানিক অবাকই হয়েছেন রেণু। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম অনেকক্ষণ রেণুর খোঁজ-খবর নিলেন। হেমার খবর নিলেন। মেয়ের প্রেম ট্রেম আছে কিনা জানতে চাইলেন। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে রেণু কি ভাবছেন জানতে চাইলেন। তার হাতে কানাডা প্রবাসী ভালো পাত্র আছে, সে কথাও বললেন। কিন্তু রেণু বুঝতে পারছিলেন, এ সকলই আসলে আসল কথা বলার আগের ভূমিকা। অবশেষে আসল কথাটা বললেন তিনি। এদিক-সেদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'শুনলাম, আপনার হাজবেন্ড নাকি আবার বিয়ে করেছে? তা আপনাকে কি ঘটনা জানিয়েছে? না, না জানিয়েই?'

রেণু এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন! তিনি মৃদু গলায় বললেন, 'না তেমন কিছু না'।

প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম বললেন, 'একদম লুকাবেন না! স্বামী যদি স্ত্রীকে না জানিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে, তাহলে লজ্জাটা কার? স্ত্রীর? না স্বামীর? লজ্জাটা স্বামীরই হওয়া উচিত। আমাদের দেশের মহিলাদের এই এক সমস্যা। তারা ভাবে, হাজবেন্ড পরকীয়া করলে, আরেকটা বিয়ে করলে এটা তাদের কারণে করেছে। এটা তাদের সমস্যা। লজ্জায় বিষয়টা ধামাচাপা দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এই যদি হয় দেশের নারী সমাজের অবস্থা, তবে সেই দেশে নারীমুক্তি কি করে হবে বলেন তো! হবে? হবে না। নারীকে শক্ত হতে হবে। আপনি মামলা করবেন। নারী নির্যাতন মামলা। সাথে থাকবে শারীরিক নির্যাতন। কত ধানে কত চাল, এইটা তার বোঝা দরকার। ঘরে বউ রেখে পরকীয়া না! একদম টলারেট করবেন না। পুরুষ জাতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতিতে চলবেন। একটু টলারেট করবেন কি দেখবেন, মাঝরাতে কাজের বুয়ার সাথে শোবে। সুযোগ যখন পেয়েছেন, পুরোপুরি উসুল করে নেন। আর দেনা-পাওনার বিষয়টাও দেইখেন। টাকা-পয়সা একটা ভাইটাল ইস্যু। আপনার নামে কোনো প্রোপার্টি করে নাই? ফ্ল্যাট বা জমি?'

রেণু কথা বললেন না। তিনি প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডামের দিকে তাকাতে পারছেন না। প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম বললেন, 'একদম লজ্জা পাবেন না। নেভার বি শাই। ওই লজ্জা নারীর ভূষণ, এই কথা পুরুষতন্ত্রের তৈরি। এইটা বলে বলে নারীদের অবলা বানিয়ে রেখেছে। যাতে নারী লজ্জায় ঘর থেকে বের না হয়, কথা না বলে, বুঝেছেন? এই করে করেই তো প্যাট্রিয়ার্কির উত্থান। একদম লজ্জা

www.boighar.com

পাবেন না। আর কিই বা আপনার বয়স বলুন? দেখতে শুনতে ভালো। আজকাল এমন অহরহ হচ্ছে। আমার এক বান্ধবীই তো পঞ্চাশে এসে পয়ত্রিশ বছরের হাঁটুর বয়সি এক ছেলেকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে গেল। আরে, ভালো লেগেছে করেছে, তাতে কার কি! জোর করে তো আর করেনি। কিন্তু দেখেন তাদের কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিকা চলে যেতে হয়েছে। কারণ দেশে থাকলে মানুষকে মুখ দেখাতে পারবে না! বুড়ো হাবড়া পুরুষগুলা রাস্তাঘাটে বাচ্চাবাচ্চা মেয়েদের সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট করে দাঁত বের করে হাসবে, তাতে দোষ হয় না। আর নিজের বয়সের কম এক ছেলেকে বিয়ে করেছে বলে একদম জাত গেল জাত গেল রব উঠে গেল। দিস ইজ হোয়াট প্যাট্রিয়ার্কি মেড। একদম আপোস করবেন না।'

রেণু বলল, 'আমি আজ উঠি?'

প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম বললেন, 'উঠবেন মানে? আপনাকে তো চা দেয়া হয়নি। অন্তত চা খেয়ে যান। আরেকটা কথা, নো কম্প্রোমাইজ। সারাজীবন শুধু আমরাই কম্প্রোমাইজ করে যাব? নো, নেভার।'

রেণু কথা বলল না। তিনি তার জীবনের সবচেয়ে বিস্বাদ চা-টা খেয়ে চেয়ার থেকে উঠলেন। প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম এই মুহূর্তে আবার বললেন, 'আরেকটা কথা'।

রেণু বললেন ,'জ্বি?'

প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম বললেন, 'শুনলাম, ইকনোমিক্সের মাস্টার্সের একটা ছেলের সাথে আপনার বেশ একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। ঘটনা নাকি অনেক দূর এগিয়েছেও? আর এইজন্যই নাকি আপনার হাজবেন্ড ডিভোর্স চাইছে। ঘটনা খুলে বলেন তো? নো ওরিজ। আমি আছি। যে কারো যে কাউকে যে কোনো সময় ভালো লাগতে পারে! বয়সটা ফ্যাক্ট না, ফ্যাক্ট হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হলে বয়স ধুয়ে কি পানি খাবেন!'

রেণু আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। তিনি প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডামের ঘর থেকে বের হয়ে সোজা বাসায় চলে এলেন। বাসায় এসে তিনি হড়বড় করে বমি করলেন। এত বছরে এই প্রথম তার মনে হলো এই সমাজে একটা মেয়ের জন্য স্বামী কত প্রয়োজনীয়! এখনো কিছুই হয়নি, তাতেই এই অবস্থা! দিন কয় গেলে আর কী কী অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে ভাবতেই রেণুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

গত কিছু দিন থেকে নয়ন সবচেয়ে বেশি যাকে নিয়ে ভেবেছে, তার নাম আব্দুল ফকির। মানুষটার প্রতি তার ঘৃণা যতটা রয়েছে, ততটা ঘৃণা বোধহয় এই জগতে কারো প্রতি কারো থাকে না। তবে সেই ঘৃণার সাথে একটা সমীহ মিশ্রিত ভয়ও রয়েছে। এটি খুবই দ্বান্দ্বিক একটা অনুভূতি। অমন সাদাসিধে চেহারার, গ্রামীণ বয়স্ক একজন মানুষ কি করে এমন বিকৃত মানসিকতার হতে পারে নয়ন তা ভেবে পায় না! তাকে দেখে ঘুণাক্ষরেও বোঝার উপায় নেই যে এই মানুষটার ভেতর লুকিয়ে আছে এমন ভয়াবহ যৌন বিকৃতি লালন করা একটা মানুষ।

নিজে ডাক্তার হবার সুবাধে এমন নানান অস্বাভাবিক ঘটনার সাথে অল্প-বিস্তর জানাশোনা নয়নের হয়েছে। কিন্তু একটা মানুষ জীবনভর একের পর এক এই জঘন্য কাজগুলো করে যাচ্ছে, কেউ তাকে ধরতেও পারছে না, কোনো অভিযোগও নেই, ভাবতেই কেমন গা গুলিয়ে ওঠে নয়নের। মানুষটার বয়স এখন কত হবে? ষাট বা কাছাকাছি? কিন্তু এই বয়সে এসেও তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বরং দিন দিন আরো যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন তিনি।

নয়ন সাধারণত পেপার-পত্রিকা খুব একটা পড়ে না। কিন্তু সেদিন ভোরে কি মনে করে সে পত্রিকাটা ধরল। এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করল একদিনেই পত্রিকার পাতাভর্তি অনেকগুলো ধর্ষণের সংবাদ। এই ধরনের সংবাদ পড়লে কেমন একটা গা ঘিনঘিনে ভাব হয় নয়নের। বিষয়টা সে নিতে পারে না। কিন্তু আজ সংবাদগুলো সে খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে ধর্ষণের এই সংবাদগুলোর বেশিরভাগই ঘটেছে স্কুলগামী বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েদের ক্ষেত্রে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্ষকের বয়স অনেক অনেক বেশি। বিষয়টা নয়নের মাথা থেকে গেল না। হঠাৎ করেই এই বিষয়ে জানার আগ্রহ হতে লাগল নয়নের। কিন্তু পুরনো পত্রিকা ঘেটে এই ধরনের সংবাদ বের করা ঝামেলাপূর্ণ কাজ। তারপরও বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করল সে। প্রতিদিনই কিছু না কিছু সংবাদ

www.boighar.com

আছেই। সমস্যা হচ্ছে বাসায় একটামাত্র পত্রিকা রাখা হয়। তার আরো খবর চাই। আরো কিছু খবর। রাতে ঘুমাতে গিয়ে নয়নের মনে হলো, আজকাল সব পত্রিকারই ইন্টারনেট ভার্সন রয়েছে। সে চাইলে এ ধরনের সংবাদগুলো খুব সহজেই ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করতে পারে।

সেই সারাটা রাত ইন্টারনেটেই কাটল নয়নের। নয়ন অবাক হয়ে আবিষ্কার করল এইসব সংবাদে সয়লাব ইন্টারনেট দুনিয়া। শুধু তা-ই নয়। নয়ন পেয়ে গেল বীভৎস, অবিশ্বাস্য সব ঘটনাও। একবছর বা তার চেয়েও কম বয়সের শিশু থেকে শুরু করে পঞ্চাশোর্ধ নারী অবধিও রয়েছেন ধর্ষণ বা যৌন নিগ্রহের তালিকায়। তবে এত কিছুর পরও একটা সংবাদে চোখ আটকে গেল নয়নের। সংবাদের ওপরে বড় করে লেখা, *'ছাত্রীকে ধর্ষণ করল ওঝা'*। বরিশালের ঝালকাঠিতে সপ্তম শ্রেণির এক মেয়েকে সাপের বিষ নামানোর কথা বলে ধর্ষণ করেছে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের এক ওঝা। এরপর এই সংক্রান্ত একের পর এক সংবাদ দেখতে লাগল সে। জ্বিন, ভূতের আছড় ছাড়ানো থেকে শুরু করে সাপের বিষ নামানোসহ এমন অসংখ্য ঘটনায় এইধরনের সংবাদের ছড়াছড়ি।

তবে সেই সকল সংবাদেও আলাদা করে নয়নের দৃষ্টি কাড়ল চাঁদপুরের রসু খাঁ নামের এক ব্যক্তির খবর। সংবাদে বলা হয়েছে ষাট বছর বয়সের এই ব্যক্তি শেষ আড়াই বছরেই এগারোজন নারীকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। শুধু তা-ই নয়, গ্রেপ্তারের পর সে আদালতে দাঁড়িয়ে নির্বিকার গলায় বলে, 'তার ইচ্ছে ছিল একশ একজন নারীকে ধর্ষণ করে হত্যা করার। কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ায় মাত্র এগারোতেই থেমে যেতে হলো তাকে। এবং এই এতগুলো ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড করার পরও তার মধ্যে কোনো অপরাধবোধই নেই।

সংবাদটা পড়ে নয়নের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই রসু খাঁও বাংলাদেশের কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামেরই মানুষ। সে নিজে আত্মস্বীকৃত ধর্ষক এবং সিরিয়াল কিলার! আব্দুল ফকিরের সাথে রসু খাঁর পার্থক্য আসলে কোথায়? আব্দুল ফকির বেশিরভাগ সময়ই ধর্ষণ করেন মেয়েগুলোকে চিকিৎসার নামে অচেতন বা নেশাগ্রস্ত করে। তিনি খুন করেন না। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর দুই মানুষের মধ্যে আদতে পার্থক্য কতটুকু?

সেদিন রাতে আব্দুল ফকিরের সাথে ঘটা ঘটনার কথা মনে পড়তেই গা শিউড়ে উঠল নয়নের। সেই হাসি, সেই কথা বলার ভঙ্গি, সেই কণ্ঠ, মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা ভয়ে হিম হয়ে আসে। অথচ বিলকুড়ানির হাটের সেই অত অত মানুষের ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা আব্দুল ফকির যেন অন্য এক অতি সাধারণ মানুষ। সহজ সরল জীবনের পরোপকারী এক বৃদ্ধ। যিনি সকলের বিপদে আপদে নিঃসঙ্কোচে ছুটে আসেন। পাশে দাঁড়ান। যাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।

এতদিন এমন অনেক বিকৃত খুনী ও ধর্ষকের ঘটনা নয়ন বিদেশি পত্রিকায় পড়েছে, সিনেমায় দেখেছে। 'সাইলেন্স অফ দ্য ল্যাম্ব' উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি করা একটি সিনেমায় এন্থনি হপকিন্সের কথাও মনে পড়েছে তার। বিশ্বখ্যাত পত্রিকা রিডার্স ডাইজেস্টেও এমন কত ঘটনা যে সে পড়েছে! কলম্বিয়ার লুইস। গারাভি তো, চারশর বেশি মানুষকে খুন করেছে সে ইতিহাসের এই জঘন্যতম সিরিয়াল কিলার এবং এর মধ্যে বেশিরভাগ নারীকেই খুন করার আগে ধর্ষণ করেছে সে। ইংল্যান্ডে জ্যাক দ্যা রিপার নামে পরিচিত ভয়ঙ্কর এক খুনীর কথাও এই রিডার্স ডাইজেস্টেই পড়েছে নয়ন। এই খুনি নারীদের সাথে যৌন সম্পর্কের সময় তাদের গলা টিপে হত্যা করত সে। নয়ন আরো কিছুক্ষণ ইন্টারনেট-এ খুঁজল। এর পরের তথ্যগুলো সে হজম করতে পারল না। একে এক বেরিয়ে আসতে থাকল অবিশ্বাস্য, গা শিউড়ে ওঠা সব বিকৃত ধর্ষক ও খুনীদের নাম। জন ওয়েসি গেসি, জেফরি ডেহম, গ্যারি রিজওয়ে, রিচার্ড ট্রেন্টন, হেনরি লি লুকাসসহ এমন কত কত ভয়ঙ্কর খুনীর কথা যে রয়েছে! হেনরি লি লুকাস আদালতে স্বীকারোক্তি অবধি দিয়েছিল যে সে ছয়শ'র বেশি তরুণী নারীকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করেছিল। এই খুনিকে নিয়ে হলিউডে পোর্ট্রেট অফ আ সিলিয়ার কিলার নামে সিনেমাও হয়েছিল।

নয়ন চুপচাপ দীর্ঘ সময় বসে রইল। আচ্ছা, এই মানুষগুলোর মনস্তত্ত্বে কী কাজ করে? একটা মানুষকে যখন তারা ধর্ষণ করে, নৃশংস উপায়ে ঠান্ডা মাথায়, হাসিমুখে খুন করে তখন তাদের ভাবনার জগতে কী চলে! নয়ন জানে না। তবে একটা বিষয় তার কাছে পরিষ্কার, এরা সকলেই ভয়াবহ রকমের যৌন বিকৃতিসম্পন্ন মানুষ। এরা প্রত্যেকেই নারীদের খুন করার আগে ধর্ষণ করত। কিন্তু আব্দুল ফকির হয়তো খুন করেন না, কিন্তু এই বিকৃতিতে তিনি এদের কারো চেয়েই কম কিছু নন। বরং আপাদমস্তক সহজ, সরল, সাধারণ গ্রাম্য বয়স্ক এক মানুষের বেশ ধরে এই এতটা বছর নিজেকে আড়াল করে রেখে যেভাবে তিনি একের পর এক তার বিকৃত লালসা মিটিয়ে গেছেন, অথচ তার বিরুদ্ধে কেউ প্রকাশ্যে কোনো অভিযোগ করেনি। কোনো পত্রিকায় তার এই খবর প্রকাশ হয়নি। কোনো থানায় তার নামে কোনো মামলা হয়নি। দিব্যি ভালো মানুষটি সেজে বছরের পর বছর তিনি প্রবল প্রতাপের সাথে কাটিয়ে দিয়েছেন। নয়নকে বরং উপরের ওই মানুষগুলোর তুলনায় আব্দুল ফকিরকে ঢের বেশি কৌশলী, ঢের বেশি চতুর, ঢের বেশি ভয়ঙ্করই মনে হচ্ছে!

নয়নের গা গোলাতে লাগল। এখন তার মনে হচ্ছে, কি এক অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর মানুষের সাথে সেই রাতের সেই অন্ধকারে অমন এক নৌকায় সে ঘন্টার পর ঘণ্টা তর্ক করে কটিয়েছে! তারপর কয়েকদিন প্রচুর পড়াশোনা করল নয়ন। এই ভয়ানক যৌন বিকৃতি নিয়ে মেডিকেল সায়েন্স কি বলে? বইপত্র কি বলে?

www.boighar.com

এগুলো আসলে হাইপার সেক্সুয়ালিটি (Hypersexuality)। বিষয়টাকে হাইপার সেক্সুয়াল ডিজঅর্ডারও বলা হয়। এই ধরনের মানসিকতার মানুষ প্রায় সব সময়ই তীব্র যৌন চাহিদা অনুভব করে, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে হঠাৎ করে যৌন চাহিদা খুব বেশি বেড়ে যায়। নারীদের ক্ষেত্রে এই সিন্ড্রোম বা লক্ষণকে বলা হয় নিম্ফোম্যানিয়া (Nymphomania)। যাতে বলা হয় এই ধরনের নারীরা অস্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষায় কাতর থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যা তাদের নানান ধরনের যৌন বিকৃতির দিকে নিয়ে যায়।

আর পুরুষের ক্ষেত্রে এই অবস্থাকে বলা হয় স্যাটিরিয়াসিস (Satyriasis)। যাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'Uncontrollable or excessive sexual desire in a man। ম্যারিয়াম ওয়েবস্টার ডিকশনারিতে এর অর্থ বলা হয়েছে, Excessive or abnormal sexual craving in the male. অর্থাৎ পুরুষের অতিরিক্ত, নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য বা অস্বাভাবিক যৌন কাতরতা। এই ধরনের পুরুষরাই যুক্ত হয়ে পড়ে ভয়ঙ্কর সব যৌন অপরাধের সাথে।

নয়ন পরপর বেশ কয়েক রাত এই নিয়েই কাটাল। কিন্তু তাতে তার অস্থিরতা কিছু দূর হলো না। বরং বাড়ল। সে প্রতিরাতেই ঘুমের ঘোরে বীভৎস সব স্বপ্ন দেখতে লাগল। সেইসব স্বপ্নের বেশিরভাগই আব্দুল ফকিরকে নিয়ে। আব্দুল ফকির তার স্বপ্নে বিচিত্র বিচিত্র সব বেশ ধরে আসেন। নয়নের জানাশোনা ওই সকল ভয়ঙ্কর অপরাধীদের বেশেও তাকে দেখা যায়। দেখা যায় বিকৃত, বীভৎস সব কর্মকাণ্ড করতেও। প্রায় রাতেই এইসব স্বপ্ন দেখে নয়নের ঘুম ভেঙে যায়। আজ রাতে একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। নয়ন স্বপ্নে দেখল, সে শুয়ে আছে তার বিছানায়। কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়েও সে আব্দুল ফকিরকে দেখতে পাচ্ছে। আব্দুল ফকির একটা খোলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দূর থেকে যতক্ষণ দেখা গেছে, ততক্ষণ নয়ন স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু সে অস্বাভাবিক হয়ে গেল তখন, যখন সে দেখল আব্দুল ফকিরের মুখখানা ক্রমশই তার কাছাকাছি চলে আসছে! তখন প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল নয়ন। সমস্যা হচ্ছে সে জানে যে সে শুয়ে আছে তার ঘরে তার বিছানায়, কিন্তু তারপরও ওই অত দূরে গ্রামে থাকা আব্দুল ফকিরের ভয়ে সে দৌড়ে পালাচ্ছে কেন! সে স্বপ্নের মধ্যেই নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল এবং একট সময় সে নিজেকে বোঝাতে সক্ষমও হলো। সে এবার তার বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইল। তার রুমে একটা বড় টেলিভিশন। সে শুয়ে শুয়ে সেই টেলিভিশনে কিছু একটা দেখছিল। আচমকা নয়ন আবিষ্কার করল, সেই টেলিভিশনের ভেতরেও আব্দুল ফকির। তার থুঁতনিতে সামান্য দাঁড়ি। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে কোনো চোখ এবং নাক নেই। শ্রেফ সমতল মাংসপিণ্ড। তবে মুখের জায়গায় সামান্য একটা ছিদ্র

রয়েছে! আব্দুল ফকিরের সেই চেহারা দেখে আতঙ্কে নয়নের হাত-পা অবশ হয়ে এলো। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, হঠাৎ করেই সে দেখল আব্দুল ফকিরের সেই ছোট্ট ছিদ্রের মুখ থেকে একটা লকলকে সরু জিভ বের হয়ে আসছে। সেই জিভ থেকে ঘন আঠালো তরল ঝরে পড়ছে।

আতঙ্কে জমে যেতে যেতে নয়ন হঠাৎ দেখল, আব্দুল ফকিরের সেই জিভখানা সাপের মতো ভঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে সরে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। তার মনে হচ্ছে তীব্র আতঙ্কে বুকের ভেতর থেকে তার কলিজাটা বের হয়ে আসবে। সে বারবার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে দৃশ্যটা সে টেলিভিশনের পর্দায় দেখছে। কিন্তু আব্দুল ফকিরের সাপের মতো লকলকে জিভখানা টেলিভিশনের পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এলো। নয়নের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। সে নড়তে পারছে না। আব্দুল ফকিরের জিভটা আরো এগিয়ে এলো। আরো। একদম নয়নের মুখের কাছে। আর একটু হলেই ওই আঠালো তরল ঝরানো জিভটা নয়নের গাল ছুঁয়ে দেবে। নয়ন প্রচণ্ড আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল। কিন্তু জিভটা তারপরও এগিয়েই আসছে। বন্ধ চোখের ভেতর দিয়েই জিভটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নয়ন। সাপের মতো জিভটা আরো এগুলো। তারপর নয়নের গালে ছোবল বসানোর ঠিক আগ মুহূর্তে আচমকা থেমে গেল জিভটা। কিন্তু নয়নের আতঙ্ক তাতে এতটুকু কমল না। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সরে যেতে, কিন্তু পারছে না।

জিভের ডগা বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় তরল ঝরে পড়ছে তার গালে। সেই সাথে জিভের আগাটা কেমন সুরসুর করে স্পর্শ করছে তার গাল। ঘুমের মধ্যেও গালের সাথে জিভের ডগার স্পর্শটা টের পাচ্ছে নয়ন। সে হাত বাড়িয়ে পাগলের মতো সেই সুরসুরির অনুভূতিটা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। প্রথমবার পারল না, তবে দ্বিতীয়বার পারল। জিভটা যেন সরে গেল মুহূর্তের জন্য। সুরসুরির অনুভূতিটাও। নয়ন তীব্র চিৎকারে ঘুম থেকে জেগে উঠল। তার হাত পা তখন থরথর করে কাঁপছে। এত জীবন্ত, এত বীভৎস কোনো স্বপ্ন হয়! নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার বুক হাপড়ের মতো ওঠানামা করছে। সে কিছুটা সময় নিয়ে নিজেকে ধাতস্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, তার গাল বেয়ে, তার ঠোঁটের কোল বেয়ে তখনও গড়িয়ে পড়ছে ঘন আঠালো তরল। নয়ন বাঁ হাতে তার গাল ছুঁলো। সেখানে তখনও লেগে আছে ঠান্ডা, আঠালো, হিমশীতল তরল!

সেই রাতে নয়নের আর ঘুম হলো না। সে ঘরের সবকটা বাতি জ্বালিয়ে বসে রইল। একটা বিষয় নয়ন স্পষ্ট টের পাচ্ছে, সে তার চিন্তাভাবনা যতই সে গুছিয়ে আনতে চাইছে, ততই সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সে একজন শিক্ষিত, তরুণ ডাক্তার, কুসংস্কার বা অতিপ্রাকৃত ব্যাপরটা তার ভাবনার সাথে

www.boighar.com

যায় না। আর গেলেও সেই ঘটনাগুলো হতে হবে কোনো ধরনের যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন। কিন্তু খানিক আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার কি ব্যাখ্যা সে দেবে? নয়ন তার গালে হাত দিয়ে বসে রইল। এখনো তার গালটা ভেজা। ঘন তরলে আঠালো হয়ে আছে গালের ত্বক। এর কোনো ব্যাখ্যাই সে খুঁজে পেল না। এই প্রথম নয়নের মনে হলো, সেদিনের সেই নৌকায় আব্দুল ফকির তার কথায়, তার আচরণে, তার ভঙ্গিতে নয়নের অবচেতন মনে একটা তীব্র আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। যা নয়ন এই এতদিনেও স্পষ্ট বুঝতে পারেনি। তবে মাঝে-মধ্যেই সে তার প্রতি একটা সমীহ টের পেত। গত কয়েকদিন স্বপ্নের ভেতর সেটি আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আজ কি হলো! আব্দুল ফকিরের কি আসলেই কোনো অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা রয়েছে? সে কি টের পাচ্ছিল যে নয়ন তাকে নিয়ে এত কিছু ভাবছে? এত কিছু করছে! আসমার কাছে আব্দুল ফকির সম্পর্কে এমন অনেক গল্পই শুনেছে নয়ন। তার শত্রু হতে যাওয়া মানুষকে তিনি নানান উপায়ে ভয় দেখান। তাহলে নয়নকেও কি তিনি তেমন করেই ভয় দেখালেন! আসলেই কি তার অতিপ্রাকৃত কোনো ক্ষমতা আছে? নয়ন কিছুতেই এটি বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু এই যে স্বপ্ন, আর স্বপ্নের পর তার গালে লেগে থাকা এই যে ভেজা আঠালো তরল, এর কোনো ব্যাখ্যা নয়ন খুঁজে পেল না।

নয়নের মনে হলো, সে পুরোপুরি পাগল হয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় কাজ করছে না। সে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। আসমার কাছেই শুনেছে, আব্দুল ফকির তার স্ত্রীকেও নাকি পাগল করে রেখেছেন। সেও কি তাহলে তেমন কোনো উপায়েই পাগল হয়ে যাচ্ছে? এইজন্যই এই তীব্র ভয়? নয়ন ভেবে দেখল, শুধু তা-ই কেন, তার নানা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মতো অমন ডাকসাইটে লোকও ভেতরে ভেতরে আব্দুল ফকিরকে ভয় পান। ভয় পায় আরো অসংখ্য মানুষ! এ সকলই কি এমনি এমনি! নিশ্চয়ই না। নয়নের হঠাৎ মনে হলো, সে তার মাকে সব খুলে বলবে। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, একমাত্র তার মা-ই পারেন, তাকে এই ভয় থেকে, এই তীব্র মানসিক চাপ থেকে, এই ভয়ানক অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে! নয়ন ঘুমাল ভোরের আলো ফোটার পর। লম্বা ঘুম। তার ঘুম ভাঙল
www.boighar.com
বিকেলে। ঘুম থেকে উঠেই তার মনে হলো তার সারা শরীর জুড়ে অস্বস্তি। তার মুখ গাল ঘাড়ে অস্বস্তিকর ব্যাথা। সে বিছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর তখুনি তার শরীর বেয়ে এক তীব্র ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল। সে আয়নায় তাকিয়ে দেখল, তার গালের মাঝ বরাবর লাল একটা দাগ। পরদিন সকাল নাগাদ সেই লাল দাগ আরো লাল হলো, তারপর ছেয়ে গেল দগদগে কাঁচা ঘায়ে!

রেণুর সাথে হেমার সম্পর্কটা কি বদলাচ্ছে? এতদিনকার অদৃশ্য আঁড় ভেঙে সম্পর্কটা যেন একটু একটু করে স্বাভাবিক মা-মেয়ের সম্পর্ক হয়ে উঠছে। রেণুর ধারণা, এই স্বাভাবিক হয়ে ওঠাটা হয়তো আরো আগেই হতো, যদি মাঝখানে মেয়েকে অমন নিজের একান্ত সম্পদ বানিয়ে না রাখতেন আসলাম সাহেব। সেদিন হেমা এসে মা'র পাশে বসল। কলেজের ঘটনাটা নিয়ে রেণুর প্রচণ্ড মন খারাপ ছিল। হেমা এসে বলল, 'মা ছাদে যাবে?'

রেণু না বলতে গিয়েও কি মনে করে মত পাল্টালেন। বললেন, 'আমার কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। কিন্তু চাদর-টাদর যে কোথায় রেখেছি! সেই গত বছর শীতের পর তো আর চাদর লাগেনি।'

হেমা মায়ের কপালে হাত দিলো। একটু জ্বর জ্বর ভাব। সে বলল, 'কই আর রাখবে তুমি? নিশ্চয়ই বাবা কোথাও রেখেছে।'

রেণু এই কথার জবাব দিলেন না। হেমা খানিক তরল গলায় বলল, 'বাবার অমন চিরকুট আর নেই? যেখানে চাদরের কথা, কম্বলের কথা লেখা আছে?'

রেণু বললেন, 'তোর বাবার ঘরের আলমারি বা ওয়ার্ড্রোবে খুঁজে দেখ তো।'

হেমা বাবার রুমে খুঁজল। কিন্তু পেল না। সে মার সামনে বসেই বাবাকে ফোন দিলো। আসলাম সাহেবের ফোন খোলা। প্রথমবার রিং হতেই তিনি ফোন ধরলেন। হেমা বলল, 'বাবা কেমন আছ?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো। তবে অফিসে খুব চাপ যাচ্ছে।'

হেমা বলল, 'তুমি কি আলাদা বাসা ভাড়া নিয়েছ, নাকি কারো বাসায় থাকছ?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তোর মলি ফুপুর বাসায়।'

www.boighar.com

আসলাম সাহেবের আপন কোনো ভাই-বোন নেই। মলি তার খালাত বোন। হেমা বলল, 'তোমাকে একটা প্রয়োজনে ফোন করেছি। মার শীতের কাপড়গুলো কই? চাদরটা খুব লাগত। তোমার আলমারি আর ওয়ার্ড্রোবেও খুঁজলাম। কোথাও নেই। আর শীত পড়ে যাচ্ছে তো। কম্বলগুলোও তো লাগবে।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'ওহ্। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। গতবছর শীত শেষ হবার পর সেই যে লন্ড্রিতে দেয়া হয়েছিল, আর তো নেয়া হয়নি রে।'

হেমা বলল, 'এতদিনেও আনা হয়নি? ওকে, নো প্রবলেম। আমি আনিয়ে নেবো। তুমি কাজ করো। পরে কথা হবে।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'আচ্ছা'।

রেণু একটা ভারি দেখে ওড়না পড়ে ছাদে এলেন। ছাদে একটা মৃদু হাওয়া। সেই হাওয়ায় যেন ঠান্ডাটা খানিক বেশিই লাগছে রেণুর। হেমা বলল, 'তোমাদের ডিভোর্সের পর আমি কার সাথে থাকব মা?'

রেণু বললেন, 'তোর যার সাথে থাকতে ভালো লাগবে'।

হেমা হেসে বলল, 'আমার তো দুজনের সাথেই থাকতে ভালো লাগে'।

রেণু কথা বললেন না। হেমা আবার বলল, 'আচ্ছা, ধরো এমন হলো, তোমার বাসায় আমার একটা ঘর থাকল, আর বাবার বাসায়ও আমার একটা ঘর থাকল। আমি যখন যেখানে ইচ্ছে এসে থাকলাম।'

রেণু এবারও কোনো জবাব দিলো না। হেমা মার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার রুমটা ছেড়ে কোথাও যেতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না মা। ওই বারান্দা আর সজনে গাছটা রেখে।'

রেণু এবার কথা বললেন। তিনি বললেন, 'সব মেয়েকেই যেতে হয়। বিয়ে হয়ে গেলে তো চলে যেতেই হবে!'

হেমা বলল, 'কেন? যেতে হবে কেন? ধরো তোমাদের তো আর কোনো ছেলেপুলে নেই। আমার যার সাথে বিয়ে হবে, তাকে না হয় ছেলে বানিয়ে বাসায়ই রেখে দিলে। আর আজকালকার যুগে ঘরজামাই পাবার সৌভাগ্য কজনেরই হয় বলো।'

রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন দূরে। হেমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এই দেখো, আবার তোমাদের কথা বলছি! তোমরাই তো আর নেই। তোমরা না থাকলে, তোমাদের ঘর থাকল কই? আর ঘরজামাইর জন্যও তো ঘর লাগে। তাই না?'

এই মুহূর্তে হেমার ফোন বাজল। আসলাম সাহেব ফোন করেছেন। হেমা ফোন ধরে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, বলো'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'আমি লন্ড্রিতে ফোন করে দিয়েছি। ওরা আজ রাতেই কাপড়গুলো বাসায় দিয়ে আসবে।'

হেমা বলল, 'আচ্ছা'।

আসলাম সাহেব খানিক কি ভেবে মৃদু গলায় বললেন, 'তখন বললি, তোর মা'র চাদর লাগবে। হঠাৎ চাদর কেন? এখনও তো তেমন ঠান্ডা পড়েনি? জ্বর-টর নয় তো?'

হেমা বলল, 'না বাবা। তেমন কিছু না। সামান্য ঠান্ডা লেগেছে বোধহয়'।

তারপর বাপ-মেয়েতে আরও কী কথাবার্তা হলো, রেণু তার পুরোটা শুনলেন না। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল করে তিনি অবাক হয়েছেন। হেমা তার বাবার সাথে কি নিয়ে কথা বলছে, তা শোনা বা বোঝার জন্য তিনি উৎকর্ণ হয়েছিলেন। বিষয়টা তার জন্য অবাক করার মতোই বটে!

বাবার সাথে কথা বলার পর মা-মেয়েতে আরো কিছুক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে রইল। রাতে খাবার টেবিলে বহুকাল পরে দুজন একসাথে খেতে বসেছেন। রেণু আর হেমা। রেণু হঠাৎ বললেন, 'আমি যত শিঘ্রী বাসাটা ছেড়ে দিতে চাই'।

হেমা বলল, 'কেন মা? বাবা কি ছেড়ে দিতে বলেছে?'

রেণু বললেন, 'কারো ছেড়ে দিতে বলার অপেক্ষায় তো আমি থাকব না।'

হেমা বলল, 'কিন্তু আমি শুনেছি এই ডিভোর্স-টিভোর্সে প্রচুর আইনি ঝামেলা আছে। দেনা-পাওনার ব্যাপার আছে। টাকা-পয়সার বিষয়ও আছে। তুমি দেখো বড়লোক হয়ে যাবে।'

হেমার মুখে মৃদু হাসি। হাসিতে দুষ্টুমি। কিন্তু রেণু যেন খানিকটা কঠিন হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমি কিচ্ছু চাই না'।

হেমা বলল, 'কেন মা? দিস ইজ ইওর রাইট?'

রেণু বললেন, 'কিসের রাইট?'

হেমা বলল, 'রাইটস বাই ল। এটা তোমার আইনি অধিকার। সম্পর্কের অধিকার।'

রেণু বললেন, 'আমার তো মনে হয় না আইন সকল ধরনের অধিকার দেয়ার ক্ষমতা রাখে!'

এইটুকু বলেই রেণু থেমে গেলেন। হেমাও চুপ করে গেল। এই কথাটার ওজন সে বোঝে। বোঝে অর্থও। আসলেই তো, আইন কি কখনো মানুষের মনের ওপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে? পারে না। এই এত এত বছরের বিয়ের সম্পর্কটা তো সেই আইনের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। পারলে এতদিনে সেই আইনের বিয়েটাই তো পরস্পরের মনের ওপর পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে পারত! কিন্তু কই? পারেনি তো! দুজনের শরীর

নিঃসৃত সম্পর্ক থেকে একটা রক্ত মাংসের সন্তান অবধি রয়েছে! কিন্তু তারপরও তো কারো মনের উপর এতটুকু অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি!

পরদিন মায়ের সাথে বাসা দেখতে বের হলো হেমা। তারা ঝিগাতলা, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডিতে বাসা খুঁজে বেড়ালো। এবং কয়েকটা বাসা পেয়েও গেল। সম্ভবত হেমা বিশেষ কোনো কায়দায় কথা বলার কারণেই বাড়িওয়ালারা খুব একটা ঝামেলা করল না। কিন্তু রেণু যেন বাসাগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। পরে জানাবেন বলে বাসায় ফিরে এলেন তারা। রেণু কলেজ থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছেন। ফলে তার হাতে বেশ সময় আছে! শরীরটা একটু কেমন লাগছে বলে সন্ধ্যার পরপরই শুয়ে পড়েছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে তার ফোন বাজল। স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নম্বরটা দেখেই কেমন একটা অনুভূতি হলো রেণুর! বাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এই প্রথম ফোন দিয়েছেন আসলাম সাহেব।

রেণু ধরবে না ধরবে না করেও ফোনটা ধরলেন। আসলাম সাহেব বললেন, 'তোমার শরীর এখন কেমন?'

রেণু বললেন, 'আমার শরীর তো খারাপ ছিল না'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'হেমা যে কাল বলল, ঠান্ডা লেগেছে!'

রেণু বললেন, 'আপনি যেটা বলার জন্য ফোন দিয়েছেন, বলুন'।

আসলাম সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুমি নাকি বাসা খুঁজছ?'

রেণু বললেন, 'হুঁ'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'কেন?'

রেণু বললেন, 'বাসাটা আপনার। তাছাড়া আমি যত তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারব, আপনি তত তাড়াতাড়ি আপনার বাসায় ফিরে আসতে পারবেন।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'বাসাটা যাতে তোমার থাকে, সেই ব্যবস্থা আমি করছি।'

রেণু বললেন, 'আপনাকে কোনো ব্যবস্থা করতে হবে না। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসা ছেড়ে দিচ্ছি। আরেকটা কথা, আপনি কি কোনো লিগ্যাল প্রসিডিওর শুরু করেছেন? আমি এখনও কোনো নোটিশ পাইনি। আমার কিছু করার থাকলে জানাবেন। আই উইল ডু ইট।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তুমি এত তাড়াহুড়া কেন করছ?'

রেণু বললেন, 'চারপাশে মানুষ নানান কথা বলছে। এটা সেটা ছড়াচ্ছে। নানান নোংরামি। এটা এভাবে ঝুলে থাকলে সেগুলো আরো বাড়তেই থাকবে। নোংরামি সব সময় গন্ধ ছড়ায়। আমি চাই না এগুলো আরো ছড়াক। যতদ্রুত সম্ভব বিষয়টা ক্লোজ করা উচিত।'

আসলাম সাহেব কথা বললেন না। রেণুও খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি একটা কলেজে পড়াই। প্রচুর মানুষের সাথে আমাকে মিশতে হয়। একটা মেয়ের জন্য বিষয়টা কতটা বাজে সেটা পুরুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব না।'

আসলাম সাহেব ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা'।

রেণু বললেন, 'এভাবে আচ্ছা বলে থমকে থাকবেন না। যেটা করতেই হবে, সেটা যত দ্রুত করা যায়, তত ভালো।'

আসলাম সাহেবকে আর কিছু বলতে না দিয়েই ফোনটা কেটে দিলো রেণু। তারপর অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে রইল একা। তিনি জানেন না কেন, আসলাম সাহেবের প্রতি প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল তার! কিন্তু এই রাগের কারণটা রেণু জানেন না। আসলাম সাহেব তো নতুন করে কিছু করেননি। বা করলেও তার সাথে কখনোই রাগের সম্পর্ক রেণুর ছিল না। এই রাগ মানেই তো অধিকার। অনুভূতির অধিকার। সেই অনুভূতিটাই তো কখনো ছিল না।

রেণু বাসা ছেড়ে দিলেন পরের মাসেই। দু'রুমের ছোট্ট ছিমছাম ফ্ল্যাট। আগের বাসার কাজের বুয়াটাও চলে এসেছে। সাথে এসেছে হেমাও। আপাতত সে কিছুদিন মায়ের সাথেই থাকবে। খবর শুনে আসলাম সাহেব কিছু বলেননি। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হেমা জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবা, এখন কি করবে?'

আসলাম সাহেব বলেছিলেন, 'কিছু একটা তো করতেই হবে'।

হেমা বলেছিল, 'তুমি কি প্রসিডিওর শুরু করেছ?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'প্রসিডিওরের তো কিছু নেই। সিম্পল ব্যাপার। কিন্তু আমি জানি না কেন, আমি যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম!'

হেমা বলেছিল, 'তুমিই তো চট করে বাসা থেকে চলে গিয়েছিলে!'

আসলাম সাহেব বলেছিলেন, 'তা ঠিক। আমিই চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কে জানে, সেই যাওয়ার পেছনেও অন্য কোনো ভাবনা কাজ করেছিল কিনা!'

হেমা বলেছিল, 'বাবা! তুমি অন্য একজনকে ভালোবাসো। তার সাথে কমিটেড! কি বলছ এইসব?'

আসলাম সাহেব বলেছিলেন, 'মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে কম চেনে। একটা জীবনের প্রায় পুরোটাই সে খরচ করে ফেলে, অন্যকে চিনতে চিনতেই। এই জন্যই বোধহয় শেষ পর্যন্ত সে নিজের কাছেই নিজে রয়ে যায় সবচেয়ে বেশি অচেনা।'

হেমা আর কথা বলেনি। কথা বলেননি আসলাম সাহেবও।

www.boighar.com

সব শুনে নিজেকে বোকা বোকা লাগছে নয়নের। শুধু বোকা বোকই না, নিজেকে গাধা টাইপ প্রাণী মনে হচ্ছে। এই সহজ জিনিসটা তার মাথায় ঢোকে নি! অথচ সে কিনা কতকিছু ভেবে বসেছিল! আসলে আতঙ্ক মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে। এই জন্যই বোধহয় বলা হয়, 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'। ভয়ে দড়িকেও মানুষ সাপ ভেবে ভুল করে। পরদিন সন্ধ্যাবেলা নয়ন একটা ভীত সন্ত্রস্ত শিশুর মতো মায়ের ঘরে গিয়েছিল। মায়ের ঘর অন্ধকার। কোহিনূর তখন কেবল মাগরিবের নামাজ পড়ে অন্ধকারে জানালার পাশে বসেছিলেন। নয়ন চুপচাপ গিয়ে মায়ের পাশে বসে রইল। কোহিনূর হঠাৎ আলতো করে নয়নের মাথার চুলে হাত রেখে বললেন, 'কি হয়েছে?'

নয়ন সাথে সাথে জবাব দিতে পারল না। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে। কিন্তু সে নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই কান্নার প্রবণতাটা তাকে ছাড়তে হবে। আজকাল কোনোকিছু হলেই তার কেবল কান্না পায়। সে মানুষ হিসেবে যথেষ্টই শক্ত। বয়সও কম হয়নি তার। এই বয়সে এমনটা মানায় না। তাছাড়া, আগে আর কখনোই এমন ছিঁচকাদুনে স্বভাবের ছিলও না সে। কিন্তু আজকাল কি জানি কী একটা তার হয়েছে! যা তাকে ভেতরে ভেতরে ক্রমশই দুর্বল করে দিচ্ছে। হয়তো এমন কোনো একটা কিছু সে বুকের ভেতর পুষে বেড়াচ্ছে, যার ভার বহন করবার ক্ষমতা তার একার নেই। কিন্তু সেটি সে কাউকে বহন করতে দিতেও পারছে না। ফলে প্রতিমুহূর্তে একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। ভেঙে পড়ছে। এটা দুর্বল মানুষের লক্ষণ। সে মোটেই দুর্বল মানুষ হতে চায় না। কিন্তু তার চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতি, ঘটনা তাকে ক্রমশই দুর্বল করে ফেলছে!

কোহিনূর স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'রাতে ঘুমের মধ্যে খুব দুঃস্বপ্ন দেখিস আজকাল?'

নয়ন অন্ধকারেই ঝট করে মায়ের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'তুমি কি করে জানলে?'

কোহিনূর বললেন, 'প্রায় প্রতিরাতেই ঘুমের ঘোরে তোর চিৎকার শুনি। কয়েকদিন বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েও থেকেছি।'

নয়ন কোনো কথা বলল না। কোহিনূর বললেন, 'স্বপ্নে কি দেখিস তুই?'

নয়ন বলল, 'একটা বৃদ্ধ লোক'।

কোহিনূর বললেন, 'আর?'

নয়ন বলল, 'মানুষটার থুঁতনিতে দাঁড়ি আছে। কিন্তু চোখ আর নাক নেই। শুধু মুখ আছে।'

কোহিনূর বললেন, 'মানুষটা কি করে?'

নয়ন বলল,'তার মুখ থেকে সরু লম্বা একটা জিভ বের হয়ে আসে। লকলকে সাপের মতো। আমি মানুষটার থেকে বহুদূরে কিন্তু তার সেই জিভ বড় হতে হতে অনেক বড় হয়ে যায়। তারপর সে তার সেই সাপের মতো জিভটা দিয়ে আমার গালে ছোবল দিতে আসে। আমি তার জিভের স্পর্শ স্পষ্ট টের পেয়েছি। গালের উপর একটা শিরশিরে অনুভূতিও।'

নয়নের শরীর কাঁপছে। কোহিনূর তার এতদিনের চেনা ছেলেকে দেখে ভারি অবাক হয়েছেন। তিনি আলতো করে নয়নের কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'এর চেয়েও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন মানুষ দেখে। আমিও দেখি। স্বপ্ন নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কি আছে?'

নয়ন বলল, 'মা তুমি জানো না, এরপর কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে?'

কোহিনূর বললেন, 'কি ভয়ঙ্কর ঘটনা?'

নয়ন বলল, 'আমি ঘুম থেকে জেগে দেখি আমার গাল ভেজা। গালে সেই জিভ থেকে ঝরে পড়া ঠান্ডা আঠালো ভেজা জিনিসটা'।

কোহিনূর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুই কাঁত হয়ে ঘুমিয়েছিলি?'

নয়ন বলল, 'সেটা তো মনে নেই। তবে আমি তো কাঁত হয়ে ঘুমাতে পারি না।'

কোহিনূর বললেন, 'কেন কাঁত হয়ে ঘুমাতে পারিস না জানিস?'

নয়ন বলল, 'ছোটবেলা থেকে অভ্যাস'।

কোহিনূর বললেন, 'আরো একটা ব্যাপার আছে। তুই কাঁত হয়ে ঘুমাতে পারতি না ছোটবেলা থেকেই। কারণ কাঁত হয়ে ঘুমালেই তোর মুখ থেকে ঠোঁট বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ত। এমন অনেক বাচ্চাদেরই ছোটবেলা হয়। বড় হয়ে গেলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। কারো কারো হয় না। তোর ঠোঁটের কোণা, গাল, বালিশ ভিজে যেত। যেদিন দুঃস্বপ্ন দেখলি, সেদিন সম্ভবত প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিলি, আর কাত হয়ে শুয়ে পড়েছিলি। তারপর ঠোঁটের কোল বেয়ে লালা ঝড়ে পড়েছে তোর গালে, বালিশে। আর স্বপ্নে এমন তো হয়ই। ধর তুই দেখলি যে

www.boighar.com

বৃষ্টি হচ্ছে, সেই বৃষ্টির পানির ফোঁটা পড়ছে তোর গালে। তুই ঘুম ভেঙে চোখ মেলে দেখবি কেউ একজন তোর ঘুম ভাঙানোর জন্য তোর গায়ে পানি ছেটাচ্ছে। এমন হয় না? ওইদিন তুই কোনো কারণে কাত হয়ে শুয়ে পড়েছিলি, আর অমনি তোর ঠোঁট গড়িয়ে লালা ঝড়ছিল, আর সেটা তুই স্বপ্নে দেখেছিস ওইভাবে। তাপর ঘুম ভেঙেই দেখলি তোর গাল ভেজা। দুইয়ে দুইয়ে চার হয়ে গেল। কোনো কারণে মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছিলি। সাথে বাজে একটা স্বপ্ন, আর ঘুম ভাঙতেই দেখলি গাল ভেজা। সব একদম মিলে গেল। এই মুহূর্তগুলা আর কিছু ভাবার সুযোগই দেয় না। আপনাআপনিই সব ধরে নেয়। মিলিয়ে নেয়।'

নয়নের বিশ্বাস হচ্ছে না, তার দেখা সেই গা শিউড়ে ওঠা স্বপ্নের ব্যাখ্যা এত সহজ, এত সাধারণ! কিন্তু সে তার মায়ের কথা শুনে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে। মায়ের ব্যাখ্যাটা অতি সহজ সাধারণ হলেও এই ব্যাখ্যা সে ফেলেও দিতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, মায়ের কথায় যুক্তি আছে এবং আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, তার এখন মনে হচ্ছে, আসলেই সে সেদিন কাঁত হয়ে শুয়েছিল। আর সেই ঠান্ডা তরলটা তার মুখের লালাই ছিল। কিন্তু গালের ঘায়ের ব্যাপারটা?

www.boighar.com

নয়ন উঠে গিয়ে আলো জ্বাললো। তারপর মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'এই দেখো। সকাল থেকেই সেই গালটাই এমন লাল হয়ে ঘা হতে শুরু করল।'

কোহিনূর অনেক সময় নিয়ে নয়নের গাল দেখলেন। তারপর বললেন, 'তুই না ডাক্তার? ওষুধ লাগাসনি কেন?'

নয়ন বলল, 'আমি জানি না মা। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। প্রচণ্ড ভয়। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কিছু কাজ করছে না। তুমিই বলো, তাহলে গালে এই দাগটা কীভাবে এলো?'

কোহিনূর খানিক চুপ করে থেকে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'বুঝেছি। পরশু সকালে বুয়া তোর ঘর ঝাড়ু দিতে গিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে শেষ!'

নয়ন অবাক গলায় বলল, 'কেন?'

কোহিনূর তার হাতের মধ্যম আঙুলখানা দেখিয়ে বললেন, 'এই সাইজের একটা বিছা পেয়েছে তোর ঘরে। আমাদের গ্রামে এই বিছাকে বলে ছ্যাঙ্গা। দেখতে বীভৎস! তুই তো জানিসই, এগুলো বিষাক্ত। যেখানে ছোঁয়, ঘা হয়ে যায়। ওটা সম্ভবত তোর গালে লেগেছিল। বললি না, স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছিল গালে সুরসুরানি হচ্ছে! এইজন্যই ঘা হয়েছে।'

মায়ের কথা শুনে নয়নের নিজের উপর এত বিরক্ত লাগতে লাগল। পুরো বিষয়টাকেই এখন হাস্যকর লাগছে তার কাছে! সাথে নিজেকেও। এই সামান্য বিষয়টাকে ভয়ের মাথায় সে কি-ই নাকি ভেবেছিল! তবে মায়ের দিকে তাকিয়ে

মায়ের এমন নির্বিকার স্বাভাবিক মুখ দেখে নয়নের এই প্রথম মনে হতো লাগল, ফতেহপুর নামের সেই অজপাড়াগাঁয়ে জন্ম নেয়া এই মেয়েটি সাধারণ কোনো মেয়ে নয়। সে আসলেই সেই গাঁয়ের আর সকলের চেয়ে আলাদা ছিল। আর জন্যই অন্যদের কাছে সে ক্রমশই হয়ে উঠেছিল অস্বাভাবিক এক মানুষ। কিন্তু ভুল সময়ে, ভুল জায়গায়, ভুল পরিস্থিতিতে জন্মেছিলেন এই মানুষটা। মায়ের প্রতি এক অন্যরকম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় যেন সে নতুন দৃষ্টি মেলে তাকাল। এই মাকে যেন সে এতদিন দেখেনি। দেখেছে অন্য কোনো মাকে। বা এই মাকে পেতে হলে যে আবিষ্কার করতে হয়, তা যেন সে জানতোই না। আজ মায়ের সামনে তার নিজেকে মনে হচ্ছে ছোট্ট এক শিশু। এই অনুভূতিটা মা তাকে দিয়েছেন, হঠাৎ করেই আবিষ্কার হওয়া তার বিশালত্বে। মা তাকে আজ পুরোপুরি চমকে দিয়েছেন। কিন্তু তখনও আরো চমকে যাওয়া বাকি ছিল নয়নের।

কোহিনূর নয়নের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'এই পৃথিবীতে মানুষের কাজ কি জানিস?'

নয়ন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে আজ আর কিছু বলতে চায় না। আজ সে শুধু শুনতে চায়, দেখতে চায়। তার সামনে এই এত এত বছর ধরে অনাবিষ্কৃত হয়ে থাকা অপার রহস্যের আঁধার এই মানুষটাকে আজ সে যতটা সম্ভব আবিষ্কার করতে চায়।

কোহিনূর বললেন, 'এই পৃথিবীতে মানুষের কাজ তার প্রিয় মানুষকে খুশি করা। ভালো রাখা। ধর বাবা-মার কাছে সন্তান যতটা প্রিয়, সন্তানের কাছে কিন্তু বাবা আবার ঠিক ততটুকু প্রিয় না। একটু কমবেশি আছে। সন্তানদের হয়তো বয়স কম হবার কারণে মনোযোগ দেয়ার আরো অনেক কিছু থাকে। কিন্তু বাবা-মায়ের মনোযোগের পুরোটাই কিন্তু সন্তান। তো বাবা-মা কি করেন? তারা তাদের সবটা সাধ্য দিয়ে সন্তানদের খুশি করার চেষ্টা করেন। ভালো জামা, খাবার, শখ পূরণ করা। যে যেভাবে পারেন। আবার সন্তান হয়তো তার স্ত্রী বা প্রেমিকার জন্য করে। বা তারপর তার সন্তানদের জন্য। এইটাই জগতের নিয়ম। এইটাই এই পৃথিবীতে মানুষের কাজ।'

কোহিনূর থামলেন। নয়ন কোনো কথা বলল না। সে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বোঝার চেষ্টা করছে, এসব মা কেন বলছেন!

কোহিনূর বললেন, 'পৃথিবীতে এই সাধারণ জিনিসটার বাইরে আর বেশিকিছু ভাবার দরকার নেই। তাহলে সবকিছু জটিল হয়ে যায়।'

কোহিনূর থামলেও নয়ন কথা বলল না। কোহিনূরই বললেন, 'তুই আসমার বিষয়টা নিয়ে খুব মানসিক যন্ত্রণায় আছিস তাই না?'

নয়নের মনে হলো, সে এই মুহূর্তেই মাকে তার বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখা সকল কথা বলে দিবে। কথাগুলো মায়ের জানা দরকার এবং এই কথা বলার এর চেয়ে ভালো সময় সুযোগ আর হবে না। সে বলল, 'মা, আসমার বিষয়ে একটা কথা তোমাকে আমি লুকিয়েছিলাম।'

কোহিনূর সেই একই নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, 'জানি'।

নয়ন আবারো চমকে উঠল। সে বলল, 'কি জানো তুমি!'

কোহিনূর বললেন, 'জানি মানে আন্দাজ করতে পারি। ওর পেটে কি বাচ্চা টাচ্চা কিছু ছিল?'

নয়ন এবার ভয় পেয়ে গেল। খানিক আগের মাকে আচমকা তার আবার কেমন অদ্ভুত লাগছে! আবার সেই আসমার মুখে শোনা ফতেহপুর গ্রামের রহস্যময় বালিকা কোহিনূর মনে হচ্ছে! নয়ন কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি কীভাবে জানো মা?'

কোহিনূর সেই আগের মতোই নির্বিকারভাবে বললেন,'আমার বাড়ি ফতেহপুর বলে জানি। আমার নাম কোহিনূর বলে জানি। আমার জায়গায় আর যে কেউ হলে সেও জানত।'

কোহিনূর সামান্য থেমে হাত বাড়িয়ে জানালার পাল্লাটা টেনে দিলেন। তারপর বললেন, 'আসমা এখান থেকে বাড়ি গেল। যাওয়ার পরপরই তাকে সাপে কাটল। তার বিষ নামাতে আসল আব্দুল ফকির নামে এক ওঝা। আমি আসমার বাবার সাথে কথা বলছি, আব্দুল ফকির তিন-দিন তিন-রাত ধরে নাকি তার বিষ নামিয়েছে। তার দুই-তিন মাস পর সে গ্রামে থেকে আসল। তখন থেকেই আসমার কিছু কিছু আচরণে আমার একটা সন্দেহ হয়েছিল। ভাবছিলাম, একদিন আসমাকে নিয়ে বসব। নিশ্চিত হওয়ার একটা বিষয় ছিল। কিন্তু সেটা নিশ্চিত হলাম সে আত্মহত্যা করার পর। আব্দুল ফকিরকে যারা খুব কাছ থেকে চেনে। তার আসল রূপ যারা জানে, তাদের জন্য এটা বোঝা এমন কোনো কঠিন ব্যাপার না।'

নয়ন চুপ করে রইল অনেকটা সময়। কোহিনূরও। মাকে আরো একটা কথা বলার আছে নয়নের। তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন এবং বীভৎসতম কথাটা। কথাটা মা জানে। কিন্তু কথাটা যে নয়ন নিজেও জানে, সেটা মাকে জানানো দরকার। কিন্তু এই প্রায় চার-পাঁচ মাসেও কথাটা বলার শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি নয়ন। কাউকেই না। সে প্রতিটি মুহূর্তে নিজের সাথে যুদ্ধ করে গেছে। প্রতিটি মুহূর্তে হেরে গেছে। বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এক প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধিমান, স্বপ্নবাজ তরুণ থেকে রোজ একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্রমশই একটা জীবন্ত মমি হয়ে গেছে! কথাটা তার বুকের ভেতর থেকে থেকে ঘুণ পোকার মতো তাকে খেয়ে চলেছে। সে জানে, এই জনমে এর থেকে মৃত্যুর

আগ অবধি তার আর নিস্তার নেই। কিন্তু এই সত্যটা নিয়েও সে কারো সামনে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। সেই শক্তি অর্জন করতে গত পাঁচটা মাস সে নিজের সাথে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু পারেনি।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সে অবশেষ যেন সেই সাহসটুকু করতে পারল। সেই বীভৎস সত্যটা নিয়ে তার মায়ের সামনে দাঁড়ানোর সাহস! সে ঠান্ডা কিন্তু স্থির গলায় মাকে বলল, 'আমি তোমাকে আরেকটা কথা বলতে চাই মা!'

কোহিনূর সাথে সাথে জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ঠিক আগের সেই নির্বিকার গলায়ই বললেন, 'তুই কি বলবি সেটা সম্ভবত আমি জানি নয়ন।'

এই কথাটুকু বলতে নিজেকে প্রাণপণে শান্ত রাখতে গিয়েও কি শেষ অবধি গলাটা সামান্য কেঁপে উঠল কোহিনূরের?

নয়ন বলল, 'তুমি কি করে সব জানো মা? তুমি কি করে জানো যে আমি কি বলব?'

কোহিনূর চান না তার ভেতরে কি চলছে, তা নয়ন দেখুক। তিনি যতটা সম্ভব তার গলা স্বাভাবিক রেখে বললেন, 'আমি প্রত্যেকটা দিন তোর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। তুই যে কষ্ট পাচ্ছিস, তা আমি দেখেছি। আমি প্রত্যেকটা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর কান্না শুনি। তুই দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠিস, সব আমি তোর জানালার পাশে বসে শুনি। আমার কি যে কষ্ট হয়, কি যে কষ্ট! কিন্তু আমি কষ্টটা পেতে চাইতাম। কষ্ট তুই একা কেন পাবি! যেভাবেই হোক, তোর এই অসহ্য কষ্টের পেছনে কোনো না কোনোভাবে আমিও তো দায়ী। কিন্তু কি করব আমি! এতটা বছর এই ভয়াবহ মিথ্যেটা চেপে রেখে আমি তোর সামনে কীভাবে যাব? পৃথিবীর আর সব কাজ করার সাহস আমার আছে, শুধু এই একটা কাজ করার সাহস আমার নেই।'

নয়ন হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মায়ের হাতটা তার হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলো। কোহিনূরের হাতখানা কাঁপছে। কোহিনূর বললেন, 'তুই যে আমার লেখা খাতাগুলো পেয়েছিস তা আমি জানতে পেরেছি অনেক পরে। ওই খাতাগুলার কথা আমি ভুলেই গেছিলাম। তারপর যখন বুঝলাম তুই সব জেনে গেছিস...'

কোহিনূর আর কথা বলতে পারলেন না। প্রবল কান্নায় তার গলা বুজে এলো। কিন্তু তিনি কাঁদলেন না। যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রেখে তিনি বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে বললাম না, পৃথিবীতে মানুষ বাঁচে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলোরে খুশি করার জন্য? আমার প্রিয় মানুষ কিন্তু খুব বেশি একটা ছিল না। কিন্তু পুরাপুরি চেষ্টা করেও আমি তাদের কাউরেই এতটুকু খুশিও করতে পারি নাই। আর আমার একটা প্রিয় জিনিস ছিল, খুব প্রিয়, সেইটাও আমি আমার প্রিয় মানুষদের জন্য ছাড়ছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হয় নাই। কিচ্ছু না'।

নয়ন কি বলবে? কার কাছে থেকে সে এতদিন পালিয়ে বেরিয়েছিলে! এই মানুষটার থেকে পালিয়ে বেরানোর ক্ষমতা কি কারো আছে? যদি না তিনি নিজে কারো থেকে পালিয়ে বেড়ান। হয়তো এই জন্যই তিনি দীর্ঘ জীবন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ফতেহপুর থেকে। তার প্রিয় বাবার কাছ থেকে। মার কাছ থেকে। শৈশবের স্মৃতি থেকে।

নয়ন ডাকল, 'মা!'

কোহিনূর শান্ত গলায় বললেন, 'আমাকে মা ডাকতে খারাপ লাগে তোর?'

নয়ন আবার ডাকল, 'মা। মা। মা'।

কোহিনূর নয়নের দিকে তাকালেন না। তবে নয়নের মাথাটা টেনে তার কাঁধের উপর নিলেন। তারপর চেপে ধরে রাখলেন তার গলার সাথে। নয়ন হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে তোমার ঘৃণা হয় মা? তোমার কখনো মনে হয় যে আমি একটা মানুষের লালসার ফসল? তুমি আমাকে চাওনি? তোমার আমাকে দেখলে ঘিনঘিন হয় মা?'

নয়ন কাঁদছে না। কিন্তু তার গলার প্রতিটি শব্দ যেন অদৃশ্য কান্না ফোঁটা ফোঁট জলে লেখা। কোহিনূর কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন। নয়ন বলল, 'আমাকে এই একটা মাত্র সত্যি কথা বলো মা। এই একটা মাত্র সত্যি কথা। তোমার কি আমাকে দেখে ঘিনা লাগত? মনে হতো, আমি একটা নোংরা সৃষ্টি। আমি একটা পাপ। একটা ঘিনঘিনে জীব?'

নয়ন তার কথা আর রাখতে পারল না। সে কাঁদল। ঝরঝর করে কাঁদল। কান্নায় তার গলার শব্দ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মিশে যাচ্ছে কান্নার শব্দের সাথে। কোহিনূর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে স্থির গলায় বললেন, 'প্রথম যেদিন তোর মুখটা দেখি, তার আগ পর্যন্ত আমি নিতে পারতাম না। নিতে পারার কথাও না। আমার কত কিছু মনে হতো! এটা একটা মেয়ে ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। কেউ না। কিন্তু তোর মুখটা দেখার সাথে সাথে আমার মনে হলো আমি এই একটামাত্র কারণে বেঁচে থাকতে পারি।'

নয়ন বলল, 'কিন্তু আমি যখন তোমার পেটে ছিলাম, তখন আমাকে তোমার খুব ঘেন্না হতো তাই না মা? মনে হতো আমাকে যদি কোনোভাবে তুমি শেষ করে দিতে পারতে! বা আমার জন্যই তোমার নিজেকেই তুমি শেষ করে দিতে পারতে! এমন মনে হতো তাই না মা?'

কোহিনূর কোনো কথা বললেন না। মূর্তির মতো স্থির বসে রইলেন। নয়ন আচমকা মায়ের পাশ থেকে সরে গেল। তারপর পাগলের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তারপর চিৎকার করেই বলতে লাগল, 'আই ওয়ান্ট টু ডাই মা। আই ওয়ান্ট টু ডাই। আই কান্ট টেক দিস পেইন এনিমোর। আল্লাহ, আল্লাহ। ও আল্লাহ। ও আল্লাহ...'।

কোহিনূর কোনো কথা বললেন না। একবার নয়নের দিকে চোখ তুলে তাকালেন না অবধি। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে নয়নকে বুকের সাথে চেপে ধরে কাঁদতে। কিন্তু তিনি পারলেন না। কোহিনূরকে কেউ কখনো কাঁদতে দেখেনি। আজও দেখল না। কোহিনূর কাঁদে না।

কিন্তু কেউ কি জানে, এই জগতে কেউ কেউ অকারণে কেঁদে বুক ভাসায়। পান থেকে চুন খসলেই অশ্রুর বন্যা বইয়ে দেয়। আবার কারো কারো সারাটা জীবন কেটে যায় অশ্রুবিহীন। জীবন জুড়ে এক ফোঁটা চোখের জলও সে ফেলতে পারে না। অথচ তার বুকের ভেতর জমে থাকে সহস্রবছরের কান্না। সহস্র জনমের অশ্রু। এই সত্য কোহিনূরের চেয়ে বেশি আর কে জানে!

www.boighar.com

সুকুমার স্বর্ণকার খুন হয়েছে। তার লাশ পাওয়া গেছে বিলকুড়ানির নদীতে। খবর শোনার পর থেকে ফজু অস্থির হয়ে আছে। সে জানে এই খুন কে করছে! নিজেরে বোকামির জন্য নিজেকেই এখন তার শাস্তি দিতে ইচ্ছে করছে। আশেপাশের কোনো দোকানে গয়না বেচতে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে তার। কিন্তু একটা বিষয় সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে না। সুকুমার কর্মকারকে খুন করতে হলো কেন? তাকে নিশ্চিত করেই খুন করা হয়েছে ফজুর বিক্রি করা গয়নার কারণে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি কেউ জেনেই থাকে যে তার কাছে গয়না রয়েছে, তাহলে তো সেই গয়না কে বিক্রি করেছে, তা তো সহজেই বোঝার কথা!

তার চেয়েও বড় চিন্তার কথা, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তাকে ডেকেছেন। তিনি আছরের আজানের পর ফজুর সাথে খাঁ-বাড়ির দহলিজ ঘরে বসবেন। ফজু জানে না, আজ সেখানে কি হবে! তবে এই মুহূর্তে আব্দুল ফকিরের সাথে দেখা হলে খুব ভালো হতো! কিছু বুদ্ধি পরামর্শ তিনি দিতে পারতেন। অবশ্য বড়সড় একটা সমস্যাও আছে। সুকুমার স্বর্ণকারের মৃত্যুর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই খবর আব্দুল ফকিরের কানে না যাওয়ার কথা না। কে জানে, ঘটনা শোনার পর তার প্রতিক্রিয়া কি হয়!

আছরের নামাজের পর খাঁ-বাড়ির দহলিজ ঘরে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে দেখা হলো ফজুর। তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে দেখে সে কিছুটা অবাক হয়েছে। এই ক'দিনেই মানুষটা যেন সত্যি সত্যি আশি বছরের বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মানুষটা অসুস্থ। তিনি থেকে থেকে কাশছিলেনও। ফজু বলল, 'দাদাজানের শইলডা কি খারাপ নাকি?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ গম্ভীর গলায় বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি আমি মরব না ফজু। সেই আশা কইরা লাভ নাই।'

ফজু তোঁতলানো গলায় বলল, 'কি যে কন দাদাজান! আপনেরে দেইখ্যা মনে হইল আপনের শইলডা খারাপ।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এই বিষয়ে আর কথা বললেন না। তিনি মনিরকে ডাকলেন। তারপর সরাসরি কথায় চলে গেলেন। তিনি এতটা সরাসরি কথা বলবেন, এটা কেউই ভাবেনি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে সোনার গয়না দু'খানা বের করলেন। তারপর বললেন, 'তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তো এহনও বাইচ্যা আছে ফজু। তুই তো হেইদিনের দুধের ছাও। তুই যদি আমার লগে দোতারি কাটানোর খেলা খেলস, তাইলে সেইটা আমার জন্য লজ্জা না?'

ফজু কোনো কথা বলল না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমি তো জানিই এই গয়না তুই পাইছস। তা সেইটা যদি আমি জানি, আমি কি করব? অনেক কিছু করব। তার মইধ্যে একটা হইছে, এই গয়না তুই যাতে আশেপাশে কোনোহানে ব্যাচতে নিলেই ঘটনা আমার কানে আসে, সেই ব্যবস্থা করন। কি? কথা কি ঠিক কইছি?'

ফজু এবারও চুপ করে রইল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য ফজুর জবাব আশাও করেননি। তিনি বললেন, 'সুকুমার কর্মকাররে খুন করনের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু খুনডা হইয়া গেছে মাথা গরম করনের কারণে। আশেপাশের সকল অঞ্চলের স্বর্ণকারের দোকানে মনির কইলা দিছিল যে, এইরম পুরোনো গয়না কেউ বেচতে আনলে যেন আমাগো জানায়। সবার মতো সেও কথা দিছিল যে জানাইব, কিন্তু সে জানায় নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মনিরের হাত ধরে তাকে সামনে নিয়ে এলেন। তারপর ফজুকে বললেন, 'সুকুমার স্বর্ণকাররে খুন করছে মনির। এইটাই মনিরের প্রথম খুন। যদিও আমি চাই নাই, খুনটা মনির করুক। সুকুমার কর্মকার আমাগো জানায় নাই, লুকাইছে, এইটা অপরাধ। কিন্তু এইটা খুন করনের মতো অপরাধ না। কোনহানে মাথা ঠান্ডা রাখন লাগব আর কোনহানে মাথা গরম করতে হইব, এইটা সব্বার আগে শিখতে হইব। তারপরও আমি ব্যাজার না। আমি খুশিই। কারণ শাসন করতে হইলে সকলের আগে সাহস লাগে। মানুষ সাহসরে ভয় পায়। মনিরের সাহস আছে। তার বাপের সেইটা আছিল না। এইজইন্য খাঁ বংশের ভবিষ্যত নিয়া আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছিলাম। আইজ সেই দুশ্চিন্তা আমার কাটল।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মনিরকে ঠেলে আবার পাশে সরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'তুই যে আব্দুল ফইররে দিয়া কি সব চাইল-বাইল শুরু করছস। তোর কি ধারণা, তোর ব্যাপারী বংশ আব্দুল ফইর চালাইব? আব্দুল ফইররে তুই চেনস না? আর তোর এই বুদ্ধি লইয়া কি বংশের হাল ধরন যায়?'

ফজু একদম চুপ। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আজ যেন কেবল কথা শোনানোর জন্যই ফজুকে ডেকেছেন। তিনি বললেন, 'শোন, একখান কথা বলি। আব্দুল ফইরের পাছা ছাড়। আব্দুল ফইর যদি কারো বন্ধু হয়, তাইলে তার আর শত্রু

www.boighar.com

লাগে না। তার উপর তুই আবার খাঁয়-গোও শত্রু বানাইতেছস। এট্টুক এক পুঁটি মাছ হইয়া যদি তুই সব আইড় বোয়ালের লগে খেলাধুলা করতে আহস। তাইলে খেলা কি জমব? জমব না। তার উপর শুনলাম, এইহানে সেইহানে যত আত্মীয়-স্বজন আছে, সব খবর দিয়া আনাইতেছস? কী? চর দখলের লাহান, জমিন দখল করবি? না গ্রাম?'

ফজু মিনমিনে গলায় বলল, 'এতবড় দুঃসাহস আমার নাই দাদাজান। আপনে কিছু ভুল হুনছেন।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হাত উঁচু করে ফজুকে থামালেন। তারপর এস্কান্দারকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। এস্কান্দারের হাতে সেই দু'নলা বন্দুক। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আমার চালাকি পছন্দ না ফজু। আমার বুদ্ধিমান মানুষ পছন্দ, চালাক মানুষ না। চালাক মানুষ হইলে আমি দুইখান কাজ করি। এক. পারলে তারে আর আমার চৌক্ষের সামনে রাখি না। সরাইয়া দেই। আর দুই. আমি তার চৌক্ষের সামনে যাই না। আব্দুল ফইর হইল দ্বিতীয় দলের লোক। এইজইন্য তার চৌক্ষের সামনে আমি যাই না। সে ধুরন্ধর লোক। কিন্তু তুই ধুরন্ধর না। তোরে কিন্তু আমি চৌক্ষের সামনে থেইক্যা সরাই দিব।'

ফজুর ধারণা ছিল তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আজ তাকে ভয় টয় দেখাবেন। এই নিয়ে তার একটা মানসিক প্রস্তুতিও ছিল। কিন্তু চোখের সামনে বন্দুক আর তৈয়ব উদ্দিন খাঁর এই রাখঢাকহীন সরাসরি চেহারা দেখে সে আতঙ্কিত হয়ে গেল। সে বলল, 'দাদাজান, আপনে আমার কথা হুনেন আগে। একখান কথা।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কোনো কথা নাই ফজু। যা বলনের আমি বলি। তুই শোন। তোর বাপেরে আমি খুন করছি। বুইঝা করি আর না করি। করছি তো। এহন আবার এই বুড়া বয়সে তোরেও খুন করতে আমার হাত একটু কাঁপব। তুই একখান কাম কর। গয়নার কলসখান মনিরের ধারে দিয়া দে। তোরে কুড়ি বিঘার জমি লেইখ্যা দেওনের ব্যবস্থা করতেছি। তোর বাড়িতে একখান ঘরও তুইল্যা দিব। নগদ কিছু টাকাও দিব। একটা ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু কর। কথা পরিষ্কার?'

ফজু কথা বলল না এবারো। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য ফজুর কথার অপেক্ষাও করলেন না। তিনি বললেন, 'আরেকখান কথা ফজু। তুই হয়তো ভাবতেছেস, গয়নার খবর তুই না দিলে, আমি কি করব? তোরে মাইরা ফেললে তো আর গয়নার কথা আমি জানতে পারব না। গয়নার সংবাদ জানতে হইলে তো তোরে আমার বাচাইয়াই রাখতে হইব। তাই না? একখান কথা বলি শোন। আমার হাতে সময় বেশি নাই। এহন দরকার পরলে সবকিছু পাওনের চিন্তা আমারে বাদ দিতে হইব। আমি গয়নার চিন্তা না হয় বাদই দিলাম। তুই গয়নার খোঁজ না দিলে তোর খোঁজও আর রাখব না আমি ফজু। ভালো একখান প্রস্তাবও

থাকল, আর খারাপটাও। এহন সিদ্ধান্ত তোর। আর সবকিছু গুছানোর সময়ও আমার নাই। আমার হাতে সময় বেশি নাই। যা করনের তাড়াতাড়ি করতে হইব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হয়তো আরো কিছু কথা বলতেন। কিন্তু তার আগেই ফজু হঠাৎ তৈয়ব উদ্দিন খাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। তারপর তার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল,'দাদাজান, একখান ভুল হইয়া গেছে। বড় একখান ভুল হইয়া গেছে দাদাজান।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কপাল কুঁচকে ফজুর দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ফজুই বলল, 'আপনের কথাই ঠিক দাদাজান, আব্দুল ফইর যার বন্ধু হয়, তার আর শত্রুর দরকার হয় না। তার কাছে দিছিলাম গয়না রাখতে। সে এহন অস্বীকার করতেছে কাকু। সে এহন স্বীকার করতেছে না কাকু। নিজেই নিজের সর্বনাশটা করছি কাকু। এই দুইন্যায় আমার আর কিচ্ছু থাকল না কাকু। কিচ্ছু না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ স্থির, নিষ্কম্প চোখে ফজুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফ্যাসফ্যেসে কঠিন গলায় বললেন, 'মনে হইতেছে না তুই সত্য কথা বলতেছস। তয় তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সন্দেহের শ্যাষ রাখে না। আরেকটা কথা, আব্দুল ফইরের লগে এমনিতেই আমার একটা শ্যাষ দেখা হওন দরকার আছিল। তো সেইটা তো হইতোই। তুইই না হয় সেইটার উছিলা হইলি।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ উঠে ঘরে গেলেন। সেইদিন তিনি আর কারো সাথে কথা বললেন না। তার শরীরটা খুব দুর্বল লাগছিল। মাঝরাতে তিনি এস্কান্দারকে ডেকে বললেন বাথরুমে যাবেন। সেইরাতে আরো দুইবার তিনি বাথরুমে গেলেন। শেষরাতের দিকে বমিও করলেন। পরদিন দুপুর নাগাদ তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু তিনি ডাক্তার কবিরাজ কিছুই ডাকতে দিলেন না। সন্ধ্যাবেলা খবির খাঁকে ডেকে পাঠালেন তিনি। তারপর বিছানায় হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'জীবন যতই বড় হোক। তার শ্যাষ আছে। এইটা মানতে কষ্ট হয়, কিন্তু উপায় নাই। আমি কেউরেই এতদিন কিছু জানাই নাই। জানাইতে চাই নাই। আমার শরীলডা বহুদিন থেইক্যাই খারাপ। নিজেরে নিজেই একটু বুঝতে চাইছি। কিছু দিক গুছানোর বিষয় আছিল। সব পারি নাই। কিছু পারছি। মনিররে কিছু জিনিস বুঝাই দিয়া যাইতে চাইছি। আমার ধারণা সে সবকিছু দেইখ্যা শুইন্যা রাখতে পারব। তয় মনিরের মাথাডা বেশি গরম। তোর মাথাডা আবার বেশি ঠান্ডা। এইজইন্যাই তোরে ডাকলাম। কহন কি হইয়া যায়, বলন তো আর যায় না। মনিরের দিকে খেয়াল রাহিস। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অর বিয়ার ব্যবস্থা করিস।'

www.boighar.com

খবির খাঁ অনেকক্ষণ চুপচাপ বাবার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আগামী কিছুদিন আমি খুব একটা বাড়ির বাইর হব না। আমি অসুস্থ এই জিনিস কাউরে জানানোর দরকার নাই। এহন যা, তোর ছোট মায়রে গিয়া বল যে আমি ডাকি।'

কিন্তু খবির খাঁ গেলেন না। তিনি বাবার পাশে দাঁড়িয়েই রইলেন। সম্ভবত তার এই ষাট বছরের জীবনে এই প্রথম তিনি ইচ্ছে করে তার বাবার অবাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেই অবাধ্যতার ভাষা যে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বোঝেননি, তা নয়। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এই মুহূর্তটাকে বুঝলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে খবির খাঁকে কাছে ডাকলেন। খবির খাঁ ধীরে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হাত বাড়িয়ে পুত্রের হাতখানা ধরলেন। তারপর আস্তে করে টেনে পাশে বসিয়ে বললেন, 'আমার উপর তোর অনেক রাগ না?'

খবির খাঁ কোনো কথা বললেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমার উপর রাগ রাখিস না। আমি মানুষ হিসাবে ভালো না হইতে পারি। বাপ হিসাবে আমি খারাপ না।'

খবির খাঁ তার মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'আমারে নিয়া আপনের অনেক আফসুস না বাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ একটা হাত ছেলের পিঠের উপর দিয়ে কাঁধে নিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, 'এই কথা কেন বলতেছস?'

খবির খাঁ বললেন, 'আমরা দুই ভাই, আপনের সন্তান। কিন্তু কোনোদিন আপনের মতো হইতে পারি নাই। আপনে সব সময়ই সাহস, বুদ্ধি এইগুলান পছন্দ করতেন। কিন্তু আমাগো দুই ভাইর মইধ্যে তার কিছুই আছিল না। এই জইন্য সারাটা জীবন আপনের আফসুস আছিল বাজান। দবির তো ছোটবেলা থেইকা কেমন পাগল পাগল। আপনের আশা আছিল আমার উপর। কিন্তু সেই আশাও আমি জীবনে কোনোদিন পূরণ করতে পারি নাই বাজান। চেষ্টা যে করি নাই, তা না বাজান। সারা জীবন খালি এই একখান জিনিসই চাইছি, আপনেরে যাতে খুশি করতে পারি। আপনের মন জোগাইতে পারি। কিন্তু পারি নাই বাজান। আল্লাহর ধারে নামাজ পইড়্যা যে কত কানছি। একটা দিনের লইগ্যাও যাতে আপনেরে সন্তুষ্ট করতে পারি। কিন্তু কোনোদিন পারি নাই। এর চাইতে বড় আফসুস আর কি আছে বাজান? কিচ্ছু নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ছেলের মাথাটা টেনে নিজের বুকের উপর রাখলেন। খবির উদ্দিন খাঁর কি যে হলো! এই ষাট বছরের এক বৃদ্ধ তিনি। কিন্তু তিনি মনে করতে পারছেন না এমন করে আর কখনো পিতার আদর তিনি পেয়েছিলেন কিনা! তিনি হঠাৎ যেন হয়ে গেলেন বাবার বুকে মাথা রেখে ঘুমানো ছোট্ট এক

শিশু। তার বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেখানে কত কত দুঃখ, অভিমান, কান্না। কিন্তু তিনি সেসব আগলে রাখলেন বুকের ভেতর।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোগো মা যহন মারা যায়। তহন তোরা কতটুকু? এইটুক গ্যাদা গ্যাদা দুইখান ছাও। আমি সেই ছাও দুইখানরে পক্ষীর ছাওয়ের লাহান পালছি। ঠোঁটে তুইল্যা খাওয়াই দিছি। কোলে কইর‍্যা নাওয়াইছি। কাউরে কোনোদিন ধরতে দেই না। তোগো জানি কোনোদিন মায়ের দুঃখ বোঝন না লাগে, সেইরম মানুষ করছি। সৎ মা আইলে, কিনা কি করে, এই জইন্য কুড়ি বছর পর বিয়া করছি। কেন জানস? কারণ তোরা আমার রক্ত। দুনিয়ায় মাইনষের সবচাইতে বড় মায়া কিসের মায়া জানস? রক্তের মায়া। রক্তের মায়ারতন বড় মায়া আর নাই। এই যে তুই আমার লগে লাইগ্যা রইছস। আমি রক্তের ঘ্রাণ পাইতেছি। আমার রক্তের ঘ্রাণ। আমার ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণ ছাইড়্যা যাওনের খুব কষ্টরে বাজান। খুব কষ্ট। এইজইন্যই তো মানুষ মরণরে এত ডরায়। নিজের ঘ্রাণ ছাইড়্যা যাওনের ডর।'

খবির উদ্দিন খাঁ হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। অশীতিপর এক বৃদ্ধ পিতার বুকে মাথা রেখে কাঁদছেন তার ষাট বছর বয়সের পুত্র। পুত্রের স্খলিত কণ্ঠের কান্নায় বাবার বুকে ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে ধবধবে সাদা বুকের পশম। শিথিল হয়ে যাওয়া চামড়া। কে জানে, হয়তো সেই চামড়ার আড়ালে ভেসে যাচ্ছে লৌহকঠিন এক মানবের বুকের ভেতর সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা কোমলতম এক পিতৃহৃদয়ও।

www.boighar.com

নুরুন্নাহারকে নিয়ে পারুলের ঢাকা যাওয়ার তারিখ ঠিক হয়েছে। লতার মামা সপ্তাহখানেক আগেই লঞ্চে বড়োসড়ো দেখে দু'খানা কেবিনও বুক করে রেখেছেন। সেই থেকে পারুলের কী যে একটা আনন্দ হচ্ছে বুকের ভেতর। সারাক্ষণ শুধু মনে হচ্ছে সে ফুড়ফুড়ে হাওয়ার মতো উড়ে উড়ে যাচ্ছে। তুলোর মতো পলকা হয়ে আছে তার শরীর মন। পারুল নিজেকেই নিজে আজও বুঝতে পারে না। এই তার মনে হয় সে চড়ুই পাখির মতো। এখানে-সেখানে কোথাও দু'দণ্ড ভালো লাগে না। কাউকে সহ্য হয় না। কারো জন্য মায়া হয় না। কেবল কী এক অচিনপুরের ভাবনা মাথার ভেতর, বুকের ভেতর ভেসে বেড়ায়। কী এক অজানা সুবাসে বুঁদ হয়ে থাকে সে। এই সময়গুলোতে সে হুটহাট প্রেমে পড়ে যায়। এমন কতজনের প্রেমে যে সে এই অবধি পড়েছে, তা কেবল সেই জানে! কত পাগলামিও যে করেছে! অবশ্য সেই সব পাগলামি খুব একটা থাকেওনি তার। দুম করে যেমন আসে, তেমনি দুম করেই চলে যায়। কিন্তু সেই ডাক্তার ছেলেটার জন্য তার বুকের ভেতরটা কি এখনও একটু কেমন কেমন করে!

পারুল ঠিকঠাক বোঝে না। কেমন একটা ভুলভাল ব্যাপার আছে কোথাও। সে টের পায় না, বা পায়। এই যে সে মাকে নিয়ে ঢাকায় যাওয়ার এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। আচ্ছা, এই সিদ্ধান্তের কোথাও কি সেই ডাক্তার ছেলেটার সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার ভাবনাটা অতি সামান্য হলেও আছে! যদি দেখা হয়ে যায়? এমন হয় না? নিশ্চয়ই হয়। লতার মোবাইলে বহু সিনেমায় এমনটা হতে পারুল দেখেছে। সিনেমায় হয় বলে বাস্তবে হতে পারে না, এমন তো কোনো কথা নেই। একদম নেই। দেখা গেল সে মাকে নিয়ে যেই হাসপাতালে গেল, ঠিক সেই হাসপাতালেরই ডাক্তার সে। এমনও তো হতে পারে, সে-ই মাকে দেখেছে! তাহলে? তখন কি করবে পারুল? এই অবধি ভেবে পারুলের কেমন দম আটকে আসে। আর ভাবতে পারে না সে। বড্ড ছটফট লাগে তার। আরো

সাতদিন! সাত সাতটা দিন। কি করে কাটাবে সে? দিন যে আর কাটেই না তার।

ঢাকা যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে কত কিছু যে করেছে পারুল! নতুন জামা বানাতে দিয়েছে। ব্যাগ কিনেছে। ভেবেছিল এই প্রথম রায়গঞ্জের বিউটিপার্লার থেকে সে চুল কাটাবে। সিনেমার নায়িকাদের মতো ভ্রু ছাটবে। কিন্তু লতা বলল, ওসব ঢাকা গিয়েই করতে। সেখানে কত ভালো ভালো পার্লার আছে! কিন্তু পারুলের আর তর সইছে না। সদরঘাট লঞ্চঘাট নামতেই ঢাকা! রায়গঞ্জ থেকে বিকেলে লঞ্চে ওঠার পর রাতখানাই যা দেরী। তারপরই ঢাকা! ভাবতেই কেমন গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কত স্বপ্নের শহর তার। এই এতগুলো বছর হয়ে গেল, সে কখনো ঢাকার শহর যায়নি। কী লজ্জার কথা! কী লজ্জার কথা!

শহরটা দিনরাত লাল, হলুদ, নীল আলোয় ঝলমল করে। তারাবাতি জ্বলে। কত কত গাড়ি। কত কত রং। আহা! অথচ এই ইলেকট্রিসিটি বিহীন নোংরা কাদা পানির গা ঘিনঘিনে গ্রামেই সে পড়ে রয়েছে। কত কী যে দেখার বাকি রয়ে গেল তার। ঢাকা গেলে সে মুহূর্তের জন্য চোখের পলকও ফেলবে না। যত দেখে নেয়া যায়। যত বেশি। পারুল গত কিছুদিন ধরে রোজ লতার সাথে বসে বসে শুদ্ধ করে কথা বলার চেষ্টা করে। তা একটু-আধটু শুদ্ধ হচ্ছেও বটে। কিন্তু তাতে পারুলের মন ভরে না। তার ধারণা ঢাকা গিয়ে দিন দশেক থাকতে পারলে, এর চেয়ে ঢের বেশি শিখে ফেলতে পারবে সে।

এসব ভাবতে ভাবতে যে পারুল মায়ের কথা ভুলে যায়, মোটেও তা না। সে বরং রোজ মায়ের সাথে গল্প করে। কত কত কথা যে সে বলে! মা আজকাল খুব ভয় পান। আগে এমনটা হতো না। সে গেলেই কেমন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে তাকায়। পারুল কত বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয় না। তবে, যেদিন থেকে সে জেনেছে, ঢাকায় নিয়ে তার চিকিৎসা হবে, সেদিন থেকে তার ভয় যেন কমছে। এই বাড়ি থেকে সে বের হতে পারবে, এই আনন্দটা তার চোখ মুখ দেখে বোঝা যায়। তার মধ্যেও কেমন একটা ছটফটানি ভাব। পারুলের আজকাল মায়ের জন্য কী যে মায়া হয়। মায়া হয় বাবার জন্যও। সে মাঝে-মধ্যে ভাবে, বাবাকে নিয়ে সবাই যা ফিসফিস করে, তার কোথাও না কোথাও একটা ভুল তো আছেই। মস্তবড় ভুল। এমন একটা মানুষ, অথচ সবাই কী সব ভাবে তাকে নিয়ে। হ্যাঁ, মানুষ বলে দোষ-ত্রুটি তারও আছে। হতে পারে অন্যদের চেয়ে কিছু বেশিই। তা কম-বেশি সকলেরই থাকে। লোকের ভাবখানা এমন যে তার বাবা ছাড়া আর সকলে ধোয়া তুলসি পাতা।

www.boighar.com

সেদিন বাবা তাকে একদম চমকে দিয়েছেন। শুধু সেদিনই কেন? পরদিন রাতে বাবা এসে বললেন, 'মা রে, চেষ্টা করছিলাম আরো কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে। পারি নাই। তাও হাজার পাঁচেক টাকার ব্যবস্থা করছি। কওন তো যায় না, বিদেশের বাড়ি। কহন কি লাইগ্যা বসে। তহন কার কাছে হাত পাতবা? আর তোমারে তো মা ভালো কিছু, শখের কিছু কোনোদিন কিন্যা দিতে পারি নাই। তা কেমনে পারব? এই গাঁওগ্রামে কিছু পাওন যায়? যায় না। তুমি পারলে ঢাকারতন নিজের লইগা কিছু কিন্যা আইনো।'

পারুল বাবার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছু বলতে পারেনি। আব্দুল ফকির যেতে গিয়েও আবার ফিরে এসে বললেন, 'সেইবার বিলকুড়ানির হাটেরতন তুমি আমারে কি জানি এক স্নো আনতে বলছিলা মা। কাগজে লেইখ্যাও দিছিলা। সেই কাগজ তো আমি হারাই ফেলছিলাম। নিয়াইছিলাম অন্য স্নো। এইবার তুমি ঢাকারতন সেই স্নো বেশি কইর‍্যা নিয়াইসো।'

পারুলের এত মায়া হচ্ছিল মানুষটা জন্য! তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, মানুষটাকে সে অনেকক্ষণ আব্বা আব্বা বলে ডাকে। ডাকতেই থাকে। তারপর তিনি যদি বলেন, 'কি? এত আব্বা আব্বা করো ক্যান মা?'

সে তখন ফিক করে হেসে দিয়ে বলবে, 'আপনে আমার আব্বা। আপনেরে আব্বা আব্বা বইলা ডাকব না তো কারে ডাকব? আপনেরে আব্বা আব্বা বইলা ডাকতে আমার ভালো লাগে। আব্বা আব্বা আব্বা।'

আব্দুল ফকির আরো একটা বিষয়ে পারুলকে চমকে দিয়েছেন। গতকাল রাতে একটু আগে ভাগে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ফিরেই পারুলকে ডাকলেন। তার চেহারা অন্যদিনের চেয়ে ঝলমলে। তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, 'মা রে। একটা ভালো সংবাদ।'

পারুল বলল, 'কি সংবাদ আব্বা?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'কইছিলাম না, তোমাগো লগে আমিও ঢাকায় যাইতে পারি কিনা দেহি! নানান কাজ কামের জইন্য নিশ্চিত দিয়া কইতে পারতেছিলাম না। আইজ খবর আইছে মাদারীপুর কোর্টের দুইটা কাম আরো মাস খানেক পিছাইব। আমি তাইলে মা, তোমাগো লগে যাইতে পারব। তোমাগো দুইজনরে এমনে ছাইড়্যা দিতে ভরসা হইতেছিল না মা। নানান দুশ্চিন্তা মনের মইধ্যে।'

পারুল যে কি খুশি হয়েছে! সে চায় বাবা তাদের সাথে যাক। পেছনে কি হয়েছে, সে আর মনে করতে চায় না পারুল। মা যদি আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ হয়ে যান, তাহলে আর কী! এই সুযোগে বাবা-মায়ের যদি কোনো সমস্যা থেকেও থাকে, পারুল তাও মিটিয়ে ফেলতে চায়। অসম্ভব বলে কিছু নেই। সে চায়

তাদের সংসারটাও আর সবার মতো হোক। এই জীবন তার আর ভালো লাগে না।

এইসব ভেবে ভেবেই পারুলের দিন রাতগুলো যায় কচ্ছপের গতিতে। খুব কষ্টে। টগবগে ঘোড়ার গতি আর উত্তেজনা বুকে চেপে কচ্ছপের গতিতে হাঁটার চেয়ে কষ্ট আর কিছুতে নেই।

আজ দুপুরে লতা এলো। পারুল বলল, 'আব্বাও যদি আমাগো লগে যায়, কোনো সমস্যা হইবো না তো লতা?'

লতা বলল, 'কী সমস্যা?'

পারুল বলল, 'লঞ্চে কেবিন তো দুইটা?'

লতা বলল, 'কোনো সমস্যা নাই। আমি, তোর মা, আর তুই থাকব এক কেবিনে। আর আরেকটায় তারা দুইজন।'

পারুল বলল, 'আরেকখান কথা।'

লতা বলল, 'কী কথা?'

পারুল বলল, 'তোর মামার বাসায় যদি জায়গা কম হয়? শুনছি, ঢাকার শহরে মাইনষে দশ বেলা খাইতে দিতে চায়। কিন্তু একবেলা থাকতে দিতে চায় না।'

লতা খিলখিলিয়ে হেসে বলেছিল, 'কি আর করা? তোর আব্বারে বলবি একখান বালিশ আর একখান কাঁথা লইয়া লইতে। ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটে আমাগো গ্রামের মতো কাঁদা পানি নাই। শুকনা খটখটা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সে চাইলে কাঁথাখান বিছাইয়া রাস্তায়ই ঘুমাই পড়তে পারব। তয় মশারিও লাগব। ঢাকা শহরে মশার বড় সমস্যা।'

লতার কথায় পারুলও হাসল। তারপর বলল, 'ঢাকার শহর কোনোদিন যাই নাই বইল্যা টিটকারি মারস? দাঁড়া, এইবার ঢাকার শহর গিয়া একদম বিয়া-শাদিই কইরা আসব।'

লতা বলল, 'ঢাকা শহর বিয়া-শাদি কইরা আবার এই গ্রামে আসবি ক্যান?'

পারুল বলল, 'তোরে দেখতে আসব। তুই এই কাদা পানির জঙ্গলে কেমন আছস সেইটা দেখন লাগব না?'

লতা আর পারুল হাসাহাসি করেই দিনটা কাটাল। তার পরের দুটো দিন নানান কাজেকর্মে কেটে গেল পারুলের। আব্দুল ফকিরও যেহেতু চলে যাবেন তাদের সাথে, সেহেতু বাড়ি-ঘর একটু গুছিয়ে রেখে যাওয়া দরকার। জুলফিকার আর রতনকে এটা-সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিলো পারুল। তাবারনের সাথে বসেও নানান বিষয় ঠিক করল। তাবারনের আবারও যেন কি সমস্যা হয়েছে! আজকাল আর সে আগের মতো কান্নাকাটি করে না। তার চেয়েও বড় কথা, কান্নাকাটির সাথে সাথে তার কথাবার্তাও থেমে গেছে। সে সারাক্ষণ

www.boighar.com

চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কিছু করতে বললে করে। না বললে করে না। এক মনে উঠানের প্যাশে বসে থাকে। পারুল তাকেও নানান কিছু বোঝাল।

কিন্তু তার এই বোঝানো শেষ অবধি খুব একটা কাজে লাগল না। কারণ আব্দুল ফকির তাদের সাথে যেতে পারলেন না। অতি জরুরি প্রয়োজনে যাত্রার দুই দিন আগে গভীর রাতে তাকে বাড়ি ছাড়তে হলো। তাকে যেতে হলো ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার এক ইউপি চেয়ারম্যানের বাড়িতে। চেয়ারম্যানের মেয়েকে সাপে কেটেছে। চেয়ারম্যান নদী পথে স্পিডবোট ভাড়া করে লোক পাঠিয়েছেন আব্দুল ফকিরকে নিয়ে যেতে। মেয়ের জীবন মরণ সমস্যা। এমন সমস্যা এড়ানো যায় না। আব্দুল ফকির তারপরও সেই রাতে পারুলকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। তারপর পারুলের কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, 'মা রে, আল্লায় এ কী কঠিন পরীক্ষার মইধ্যে ফালাইলো আমারে!'

পারুল বলল, 'আব্বা, কোনো সমস্যা নাই। আপনে যান। আমি এইদিক দেখতেছি। আপনে কোনো চিন্তা কইরেন না। আমি মায়রে ঠিক ঠিক ডাক্তার দেখাইয়া নিয়া আসব।'

আব্দুল ফকির তারপরও যেন নিশ্চিত হতে পারলেন না। তিনি পারুলকে নানান বুদ্ধি পরামর্শ দিলেন। পারুলের মাথায় দোয়া পড়ে ফুঁ দিলেন। তারপর সেই গভীর রাতে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেলেন। কাপড়-চোপড় খুঁজে সময় নষ্ট করবার মতো সময় তার হাতে নেই।

পরের দিনটা পারুল শেষ প্রস্তুতিটুক নিলো। ব্যাগগুলো গোছগাছ করল। প্রয়োজনীয় কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা, তা বারবার পরীক্ষা করল। নুরুন্নাহারের জন্য কিছু কাপড়-চোপড় কিনেছিল, সেগুলো গোছাল। রাতে সে মায়ের ঘরে এলো। পরদিন ভোরে তারা রায়গঞ্জ যাবে। সেখানে লতার নানা বাড়িতে বিকেল অবধি থেকে সন্ধ্যায় লঞ্চে উঠবে।

প্যারুলকে দেখেই নুরুন্নাহার উঠে বসলেন। বিছানার ওপরই তার রাতের খাবার ঢাকা দিয়ে রাখা। সম্ভবত রতন বা তাবারন দিয়ে গেছে। কিন্তু নুরুন্নাহার তখনও খাননি। পারুলকে দেখে নুরুন্নাহার সুস্থ মানুষের মতো বলে উঠলেন, 'সারাদিন কই থাহোস? ঘর থেইক্যাও বাইর হইতে দেস না। আবার তুইও আসোস না। তোরে দ্যাখতে মন চায় না আমার?'

www.boighar.com

পারুল বলল, 'এহন রাইত কত হইছে? তুমি এহনও ভাত খাও নাই ক্যান মা?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'সইন্ধ্যা বেলা নাইকোলের নাড়ু দিছিল। এহন খিদা পায় নাই, আরেকটু রাইত হোক তহন খামু।'

পারুল আর কথা বলল না। সে বিছানার উপর থেকে খাবারের প্লেট গ্লাস সরিয়ে রেখে মায়ের পাশে বসল। পারুল বসতেই নুরুন্নাহার বললেন, 'তুই না আমার জইন্য নতুন সোন্দর কাপড় কিনছস? একখান কাপড় দে। একটু পিন্দি। কতদিন হয় নতুন কাপড়ের বাস পাই না!'

পারুল বলল, 'কাইল বেয়ানে পিন্দো মা'।

নুরুন্নাহার বললেন, 'আমার কি মাথার ঠিক আছে? কাইল বেয়ান হইতে দেখা গেল আমার মাথা খারাপ। তহন নতুন কাপড় পিন্দা কি করব?'

পারুল বলল, 'এহন কাপড় পিনলে কাপড়ের ভাঁজ ভাইঙা যাইব মা।'

নুরুন্নাহার বললেন, 'ভাঙব না। তুই আমার প্যাটে হইছস, না আমি তোর প্যাটে হইছি? ভাঁজ না ভাইঙা ক্যামনে কাপড় পরতে হয়, সেইটা আমি জানি।'

পারুল বলল, 'এত রাইতে ত্যাক্ত কইরো না তো মা। তুমি কহন পাগল থাহো, আর কহন ভালো থাহো, সেইটা এহন আর বুঝি না। এহন এই এত রাইতে পাগলামি বন্ধ করো। কাইল বেয়ানে তোমারে ভালো কইরা নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া কাপড় পরাব। নতুন কাপড়। কয়দিন নাওয়া-ধোওয়া করো না? তোমার শইলের যা অবস্থা!'

নুরুন্নাহার তারপরও অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু পারুল তাতে পাত্তা দিলো না। নুরুন্নাহার তখন বললেন, 'তাইলে আমারে একটু দেখতে দে, কি রঙের কাপড় আনছস? আমার গায়ে কিন্তু লাল রঙ ভালো ফোটে। এহন তো গায়ে রঙ নাই। আগে আমার গায়ের রঙ আছিল দুধের লাহান। বাজান সব সময় আমার জইন্য লাল রঙের জামা আনত। আর কোলে লইয়া কইত এইটা আমার রাঙা মা।'

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, পারুলও নুরুন্নাহারের জন্য রঙিন একখানা শাড়িই কিনেছে। দু'খানা সাদাসিধে কাপড়ের সাথে একখানা খুব সুন্দর রঙিন শাড়ি। কেনার সময় অবশ্য লতা খুব করে নিষেধ করেছিল। এই ধরনের রঙের কাপড় নাকি এখন আর নুরুন্নাহারের পরনে মানায় না। কিন্তু পারুল লতার কথা শোনেনি। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মার জন্য একখানা রঙিন শাড়ি কিনতে। কিন্তু এখন এই এতরাতে সে সেই কাপড়খানা নষ্ট করতে চায় না।

নুরুন্নাহার বললেন, 'কই? কাপড়গুলান দেহা?'

পারুল বলল, 'মা, এহন না বেয়ান বেলা দেইখো'।

নুরুন্নাহার ভারি মন খারাপ করলেন। তিনি তার পরনের শাড়ির ছেঁড়া আঁচলখানা আঙুলে টেনে দেখাতে দেখাতে বললেন, 'শ্যাষ কবে আমারে একখান কাপড় কিন্যা দিছস? এই দ্যাখ, আমার কাপড়, ছায়া, ব্লাউজ এই দ্যাখ। কামের মাইনষেরেও তো মানুষ এরতন ভালো কাপড় পিন্দায়। আমি পাগল মানুষ বইল্যা কি আমারে ছেঁড়া কাপড় পিন্দাইয়া রাখবি?'

www.boighar.com

এই বলে নুরুন্নাহার তার পরনের কাপড়খানা টেনে ছিড়তে শুরু করলেন। পারুলের মন খারাপ হয়ে গেল। একই সাথে আবার বিরক্তও লাগতে লাগল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নুরুন্নাহারের জন্য কেনা রঙিন কাপড়খানা সে রেখেছে ব্যাগের একদম নিচের দিকে। ভেবেছিল ঢাকায় গিয়ে সে এইখানা পরাবে নুরুন্নাহারকে। কিন্তু এখন আবার সব জিনিসপত্র অগোছালো করে সবার নিচ থেকে তাকে কাপড়খানা বের করতে হবে! কিন্তু মায়ের মন খারাপ দেখে তার ভালোও লাগছে না। সে রাজ্যের বিরক্তি নিয়েই কাপড়খানা বের করে নুরুন্নাহারের ঘরে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখে নুরুন্নাহার ভেতর থেকে দরজা আটকে দিয়েছেন। পারুল দরজায় আওয়াজ করে মাকে ডাকল। নুরুন্নাহার ভেতর থেকে অভিমানী গলায় বললেন, 'লাগব না তোর কাপুড়। তোর ওই কাপুড় আমি পিনমু না। জীবনেও পিনমু না।'

পারুলের এবার রাগ লাগছে। সে বলল, 'না পিনলে কাইল বেয়ানে ঢাকা যাবা কি পিন্দা?'

নুরুন্নাহার বললেন, 'আমার পিন্দনের এই ছিড়া কাপুড় পিন্দাই যাব। আমি পাগল-ছাগল মানুষ, আমার আর ছেড়া-ভালো কি! একটা পিনলেই হইল। লেংটা না গেলেই হইল।'

পারুল মাকে আরো কিছুক্ষণ ডাকল। কিন্তু নুরুন্নাহার পারুলের ডাকে আর সাড়া দিলেন না। পারুলের কী যে রাগ হতে লাগল মায়ের উপর! সব সময় এমন ছেলেমানুষি, পাগলামি তার আর ভালো লাগে না। সে নিজেও তো একটা মানুষ নাকি! তারও তো ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

সে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। তার বিছানার উপর ছড়ানো-ছিটানো সব জিনিসপত্রের মাঝখানে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই সে কালকের পরিকল্পনা আবার ঝালাই করে নিতে লাগল। সারাদিনের উত্তেজনাটা আবার ফিরে আসছে। রাতে লঞ্চে নিশ্চিত করেই সে একফোঁটাও ঘুমাবে না। সে শুনেছে, লঞ্চ পদ্মা-মেঘনার মতো বড় নদীতে পড়তেই রাতের অন্ধকারে চারপাশে শত শত লঞ্চের আলো দেখা যায়। মনে হয় অন্ধকারের বিশাল সমুদ্রে বড় বড় জোনাক পোকা আলো জ্বেলে যাচ্ছে। পারুলের খুব অস্থির লাগতে লাগল। সে সেই অস্থিরতা নিয়েই কখন ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পেল না।

পারুলের ঘুম ভাঙল ফজরের আজানের শব্দে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল যে তারা লঞ্চে। তাদের লঞ্চ সদরঘাট পৌঁছে গেছে। ভোঁ শব্দে ভেঁপু বাজাচ্ছে লঞ্চগুলো। আশেপাশের সকলেই লঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছে। কেবল তারাই নামছে না। পারুল বার কয় তাড়া দিলো সবাইকে। কিন্তু কেউই তেমন গা করছে না। এই মুহূর্তে বিকট শব্দে আবার ভেঁপু বাজাল লঞ্চ। আর সাথে সাথেই ঘুম ভেঙে গেল পারুলের।

সে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর গেল নুরুন্নাহারের ঘরে। নুরুন্নাহারকে সবার আগে গোসল-টোসল করিয়ে গুছিয়ে রেখে তারপর সে নিজে যাবে নিজের গোছগাছ করতে। কিন্তু বারকয়েক ডাকার পরও নুরুন্নাহার দরজা খুললেন না। এবার ভারি রাগ হতে লাগল পারুলের। কিন্তু নিজেকে সামলালো সে। ঘর থেকে গিয়ে রঙিন শাড়িখানা নিয়ে এলো। তারপর মাকে ডাকল, 'মা, এহন আর পাগলামি কইরো না। দুয়ার খোলো। সময় বেশি নাই।'

নুরুন্নাহার কোনো সাড়া দিলেন না। পারুল দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, 'তোমার লাল কাপুড় আনছি মা। কত্ত সোন্দর শাড়ি, তুমি খালি একবার দেহো। দুয়ার খোলো। শাড়ি দেহনের পর দেখব তোমার রাগ কই থাহে! খোলো, দুয়ার খোলো।'

নুরুন্নাহার দরজা খুললেন না। পারুল অপেক্ষা করতে লাগল। নানা অনুনয়-বিনয় করল। রাগ করল। কিন্তু কোনোকিছুতেই কিছু হলো না। নুরুন্নহার দরজা খুললেন না। সাড়াও দিলেন না কোনো।

নুরুন্নাহারকে বের করতে হলো দরজা ভেঙে। কিন্তু সেই ভাঙা দরজার ঘর থেকে নুরুন্নাহার বের হলেন না। বের হলো নুরুন্নাহারের লাশ। পারুল মায়ের লাশের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কাঁদল না। চিৎকার-চেঁচামেচি করল না। শান্ত, স্থির দৃষ্টিতে সে মায়ের লাশের দিকে তাকিয়ে রইল। দুপুর নাগাদ সে তেমনই মায়ের পাশে বসে রইল। কারো সাথে কোনো কথা বলল না। একটা শব্দও না। তার হাতে মায়ের জন্য কেনা রঙিন শাড়িখানা। দুপুরের পর পারুল সেই শাড়ি হাতে উঠে দাঁড়াল। তারপর জুলফিকারকে ডেকে সে শান্ত স্বাভাবিক গলায় বলল, 'জুলফিকার ভাই, মায়রে গোসলের ব্যবস্থা করান। আমি রাইতে মায়রে কইছিলাম তারে বেয়ান বেলা গোসল করাইয়া নতুন শাড়ি পিন্দামু। মায়রে গোসলের ব্যবস্থা করান। আমি আমার মায়রে গোসলের পর শাড়ি পিন্দামু।'

লাশ গোসল করানোর জন্য তিনজন মহিলা এসেছেন। তারা নুরুন্নাহারের লাশ গোসল করালেন। গোসল করানো শেষে তাকে কাফনের কাপড় পরানো হবে। কিন্তু বাধ সাধল পারুল। সে শান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাদের কাছে গেল। গিয়ে তার হাতের কাপড়খানা তাদের একজনের হাতে দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'আমার মায় কাফনের সাদা কাপড় পরব না। সে পরব এই রঙিন কাপুড়। তারে এই কাপুড়খান পরান।'

মহিলা তিনজন ভয় এবং বিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টিতে পারুলের দিকে তাকিয়ে রইল। পারুল বলল, 'কি? আমার কথা আপনেগো কানে যায় না? বোঝেন না আমার কথা? আমার মায়রে এই কাপুড় পরান। এক্ষণ পরান। এক্ষণ।'

পারুলের পাগলামি শুরু হলো এর পর। সে তার মাকে এই কাপড় না পরিয়ে কবর দিতে দেবে না। কিছুতেই দিবে না। চারপাশে লোক জমে গেল।

কিন্তু পারুলকে সামলানো গেল না। সে পাগলের মতো হাত-পা ছুড়তে শুরু করল। তার তীব্র চিৎকারে যেন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হতে লাগল। পারুলকে জোর করে তার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে আটকে রাখা হলো। কিন্তু তার চিৎকার তাতে থামল না। তার বাবা আব্দুল ফকিরের খোঁজ করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু আব্দুল ফকিরকে কোথাও পাওয়া গেল না। আব্দুল ফকির কোথায় আছেন, কবে ফিরবেন, কেউ জানে না। ফলে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদও তিনি পেলেন না। তাকে না জানিয়েই কবর দিয়ে দেয়া হলো নুরুন্নাহারকে।

পারুল তখন রঙিন একখানা শাড়ি হাতে নিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে।

নয়ন সোফায় বসে আছে। তার সামনে একদম মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে হেমা। নয়নের বসার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। সে বসে থাকলেও সামনের দিকে ঝুঁকে উবু হয়ে তার মাথাটা গুঁজে রাখা আছে হেমার কোলে। হেমা দু'হাতে শক্ত করে নয়নের মাথা চেপে ধরে বসে আছে। কিন্তু তাতেও নয়নের কম্পন থামছে না। তার ভাঁজ হয়ে থাকা পিঠ, গুঁজে রাখা মাথা, আর সেই মাথা চেপে ধরে রাখা হেমার হাত সকলই কাঁপছে। হেমা যে নয়নের দিকে তাকিয়ে আছে, তা নয়। দু'হাতে নিজের কোলের ভেতর নয়নের মাথা চেপে ধরে রাখলেও সে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। সেখানে ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে। হেমা সেই ফ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে, হেমা গভীর আগ্রহ নিয়ে ফ্যানের ঘুরন্ত পাখাগুলো দেখছে। কিন্তু ফ্যানের পাখা ঘোরার মধ্যে দেখার কিছু নেই। সে অবশ্য তা দেখছেও না। সে আসলে কিছুই দেখছে না। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। ডিসেম্বরের শেষ দিকের এইসময়ে ঢাকায় ভালোই শীত পড়ে। অথচ সেই শীতে ফুল স্পিডের ফ্যানের নিচে বসেও দরদর করে ঘামছে হেমা।

নয়ন পাগলের মতো দেখা করতে চাইছিল হেমার সাথে। সে দেখা করতে চেয়েছে নির্জন একা কোথাও। সবচেয়ে ভালো হয় বাসা হলে। হেমা শুনে প্রথম খানিক অবাক হয়েছিল। খানিক কৌতূহলীও। দুষ্টুমি করে নয়নকে ইঙ্গিতপূর্ণ টিপ্পনিও কেটেছিল। কিন্তু সেসবে কান দেয়নি নয়ন। সে বলেছিল, 'আমি শুধু তোমার সাথে একটু দেখা করতে চাই। একটু কথা বলতে চাই। একা। তারপর আর কোনোদিন তোমার সাথে দেখা করতে চাইব না আমি। কথা বলতেও চাইব না।'

নয়নের গলায় কিছু একটা ছিল। হেমা আর দুষ্টুমি করেনি। নয়নকে সে তার আগের বাসায় নিয়ে এসেছে। বাসাটা এখন একদম ফাঁকা। কেউ নেই। সকালে বাসায় ঢোকার পর তার নিজেরই কেমন গা ছমছম করছিল। নয়ন আসার আগ অবধি হেমা একা একা বসেছিল বারান্দায়। গত কয়েকদিন ধরে

www.boighar.com

হেমার মনটাও তেমন ভালো নেই। নতুন বাসায় মায়ের সাথে থাকতে গিয়ে বেশ কিছুদিন খুব ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। রেণু যেহেতু এই বাসা থেকে কিছুই নেননি, সেহেতু ফার্নিচার থেকে শুরু করে নানান জিনিসপত্র কিনতেই গেল প্রথম ক'দিন। তারপর ঘর গোছানো। বাজার করা। ডিসের লাইন, ইন্টারনেট, আরো হাজারটা জিনিস। ভয়াবহ অবস্থা।

হেমা আসার ঘণ্টাখানেক পরে এসেছে নয়ন। নয়নকে দেখে হেমা থমকে গেছে। নয়নের গালে কিসের এক দাগ, তার চেহারা এলোমেলো। দেখে মনে হচ্ছে ভয়াবহ কোনো ঝড়ের মধ্য দিয়ে এসেছে সে। নয়নের এই অবস্থা অবশ্য আজকাল নতুন নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই এমন বিধ্বস্ত অবস্থা তার। কিন্তু আজ যেন সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে। সে দরজা খুলতেই নয়ন তার সামনে কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কেমন আবোল-তাবোল বকতে লাগল। হেমা বলল, 'কি হয়েছে নয়ন?'

নয়ন খানিক্ষণ এটা-সেটা নানান কিছু বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই তার মুখ দিয়ে বের হলো না। হেমা নয়নের হাত ধরে টেনে তার বেডরুমে নিয়ে এলো। সেখানে ছোট্ট একটা সোফা, নয়ন সেই সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ল। তারপর ঝুঁকে নিজের দুই উরুর উপর মাথা দিয়ে বসে রইল। হেমা বুঝতে পারছিল খারাপ কিছু ঘটেছে! কিন্তু সে তো গত কয়েক মাস ধরে ঘটেই চলেছে। আর কি খারাপ ঘটবে? বরং হেমা মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, নয়ন যদি আজ তাকে আবারো কোনো খারাপ ঘটনার কথা বলে, তাহলে সেও তার বাবা-মায়ের ডিভোর্সের ঘটনা তাকে শোনাবে। নয়নের বোঝা উচিত সবার জীবনেই খারাপ ঘটনা ঘটে। কিন্তু তা নিয়ে এভাবে ভেঙে পড়লে চলে না। তার আরো শক্ত হওয়া উচিত। সে দিন দিন দুর্বল মানসিকতার মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু নয়নের কথা শোনার পর থেকে আর হেমার মাথা কাজ করছে না। তার মনে হচ্ছে তার নাক দিয়ে, কান দিয়ে গরম ভাঁপ বের হচ্ছে! সে দরদর করে ঘামতে লাগল। নয়নকে কি শান্তনা দিবে হেমা? কি বোঝাবে সে? সে তো তার নিজেকেই আর বোঝাতে পারছে না।

সোফায় বসে ঝুঁকে থাকা নয়নের পিঠ কাঁপছিল। হেমা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'কি হয়েছে আমাকে বলো নয়ন?'

নয়ন চোখ তুলে তাকাল। সেই না ঘুমানো টকটকে লাল চোখ। হেমা বলল, 'বলো'।

নয়ন বলল, 'আই এম আ বাস্টার্ড'!

হেমা নয়নের কথাটা ঠিকঠাক বুঝল না। সে নয়নের সামনে মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর বলল, 'হোয়াটস রং উইথ ইয়ু নয়ন?'

নয়ন বরফের মতো শীতল গলায় বলল, 'আই এম আ বাস্টার্ড। আমি একটা জারজ হেমা। আমি একটা শতভাগ জারজ সন্তান। দ্য ম্যান হুম আই নোন অ্যাজ মাই ফাদার ইজ নট মাই ফাদার। ফখরুল আলম ইজ নট মাই ফাদার। আই এম নট হিজ সান। আই এম আ বাস্টার্ড চাইল্ড।'

হেমা বুঝতে পারছিল গুরুতর কিছু ঘটেছে। কিন্তু কি ঘটেছে সেটি নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিল সে। তার ধারণা ছিল, কোনো বিষয় নিয়ে নয়ন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, আহত হয়েছে, এইজন্য রাগের মাথায় সে এসব বলছে। হেমা নরম গলায় বলল, 'ছিঃ নয়ন। এসব বলতে হয় না। কি হয়েছে তোমার বলো তো? কোনো কারণে রেগে আছে কারো উপর? বাবা কিছু করেছেন? মা?'

নয়ন জবাব দিলো না। সে নিস্পৃহ চোখে হেমার দিকে তাকিয়ে আছে। হেমা বলল, 'রেগে গেলেই এই নোংরা কথাগুলো বলতে হবে?'

নয়ন হঠাৎ কেঁদে ফেলল। শিশুর মতো শব্দ করে, ভাঙা কাঁচের মতো ঝরঝর করে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে যাওয়া কান্না। সে দু'হাতে হেমার হাত চেপে ধরে বলল, 'আমি নোংরা হেমা। আই এম দ্যাট শিট। আই এম দ্যাট বাস্টার্ড শিট'।

হেমা কিছুই বুঝতে পারছে না। সে হাতের মুঠোয় নয়নের দুই হাত চেপে ধরে রেখেই বলল, 'কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো'।

নয়ন কাঁদছে। কাঁদছেই। কিন্তু এই কান্না শব্দহীন জলের কান্না। তার দু'গাল গড়িয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রু। হেমা আচমকা নয়নের হাত ছেড়ে দুই হাতে শক্ত করে তার গাল চেপে ধরল। তারপর বলল, 'নয়ন!'

নয়ন জড়ানো গলায় বলল, 'এই কথাটাই আমি গত পাঁচ-ছটা মাস ধরে বলতে চেয়েছি হেমা। এই কথাটাই গত পাঁচ-ছটা মাস ধরে আমি নিজের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। গত পাঁচ-ছটা মাস ধরে এই কথাটাই আমি জানি। কিন্তু আমি কাউকে বলতে পারি নাই। সেই সাহস আমি করতে পারি নাই। নিজের সাথে প্রত্যেকটা সেকেন্ড আমি যুদ্ধ করেছি। ভেঙে না পড়তে চেষ্টা করেছি। নিজে নিজে ফেস করার চেষ্টা করেছি। ফতেহপুর চলে গিয়েছি। ঢাকায় ফিরে এসেছি। রাতের পর রাত ঘুমাইনি। দুঃস্বপ্ন দেখে একা একা বাচ্চাদের মতো কেঁদেছি। কিন্তু আমি পারিনি হেমা। আমি কাউকে বলতে পারিনি। প্রত্যেকটা দিন আমি ভেতরে ভেতরে ধ্বংস হয়েছি। দুর্বল, ভিতু, হিনমন্য হয়ে গেছি।'

নয়ন হাউমাউ করে কাঁদছে। হেমা উঠে একটা চেয়ার এনে নয়নের সামনে একদম মুখোমুখি বসল। নয়ন কান্নাজড়ানো গলায় ফিসফিস করে বলল, 'ডু ইউ নো, হু ইজ মাই ফাদার? ডু ইউ নো? আমার সত্যিকারের বাবা কে তুমি জানো? তুমি জানো আমার আসল বাবা কে? জানো না।'

হেমা কি বলবে! সে বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। এখুনি তার ঘুম ভেঙে যাবে, আর সাথে সাথে সে

www.boighar.com

দেখতে পাবে তার সামনে নয়ন বলে কেউ নেই। এই ধরনের কোনো ঘটনাও কখনো ঘটেনি।

নয়ন বলল, 'আব্দুল ফকির। হি ইজ মাই ট্রু ফাদার। হি ইজ! যেই মানুষটার কারণে আসমা সুইসাইড করেছে। আজ থেকে বহুবছর আগে ঠিক একই কারণে আমার মা যদি সুইসাইড করতেন। তাহলে আমার জন্ম হতো না। সে ঠিক একইভাবে আমার মায়ের পেটে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি একটা নোংরা, জঘন্য মানুষের তীব্র লালসার ফল। এই সত্যিটা জানতে আমাকে এতগুলা বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে হেমা। এতগুলা বছর। এখন আমি কি করব হেমা? আমার নিজেকে ঘিনঘিন লাগে। নিজের জন্য নিজের বমি পায়। মনে হয়, আমি একটা মরা পচা গলা ইঁদুর। আমাকে দেখে সবাই ঘেন্নায় নাক চেপে ধরে।'

হেমার মনে হচ্ছে তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। সে কিছু বলতেও পারছে না নয়নকে। সে জানে না, এমন মুহূর্তে কাউকে কি বলতে হয়! সে কেবল নয়নের যন্ত্রণাটা বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই যন্ত্রণা কি অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব? সম্ভব না। এই মাত্র কদিন আগেই বাবা যখন মায়ের সাথে তার বিয়ের ঘটনাটা খুলে বললেন। আর সেই ঘটনা বলতে গিয়ে তিনি যখন বলেছিলেন যে হেমার জন্মটা আসলে হয়েছিল রেণুর সাথে তার সম্পর্কটা স্বাভাবিক করার জন্য। তখন হেমার নিজেকে কী যে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছিল! কি যে অনভিপ্রেত মনে হচ্ছিল! ভেতরে ভেতরে কষ্ট-অভিমানে তার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। আর নয়নের কেমন লাগছে? এই এত এত বছর পর যে সত্য সে আবিষ্কার করেছে? যে সত্য আবিষ্কার করার পর থেকে গত পাঁচ-ছ'টা মাস সে যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তাকে অন্য কেউ কি করে বুঝবে?

নয়ন যেন খানিকটা স্থির হলো। সে বলল, 'আমি চেষ্টা করেছি হেমা। অসংখ্যবার তোমাকে বলতে চেষ্টা করেছি। সাহস হয়নি। মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি। সাহস করতে পারিনি। আমার কেবল মনে হতো কি করব আমি? কি যে যন্ত্রণা হেমা। কি যে যন্ত্রণা!'

হেমা তারপরও নয়নের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নরম করে বলল, 'আমাকে একটু খুলে বলবে নয়ন? কি হয়েছিল আমাকে একটু বলবে? প্লিজ?'

নয়ন চোখ বন্ধ করে, হাত মুঠো করে ফেলল। তারপর অনেক সময় নিয়ে চোখ খুলে হেমার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'মা'র তখন কত হবে বয়স? পনের বা ষোল। এক রাতে আসমার মতোই সাপে কেটেছিল মাকে। নানাজান তখন বাড়িতে ছিলেন না। আর তখন আব্দুল ফকির নামের লোকটা ঠিক একইভাবে বিষ নামাতে এসেছিল।'

হেমা যেন সাথে সাথেই বুঝে ফেলল ঘটনা কি ঘটেছিল। সে আঁৎকে ওঠা গলায় বলল, 'আর তখন ঠিক একইভাবে সে...!'

নয়ন স্থির গলায় বলল, 'হ্যাঁ। আব্দুল ফকির চলে যাওয়ার পরও পুরো একটা দিন চেতনা ছিল না মায়ের। ঘুমিয়েই ছিল সে।'

হেমা রুদ্ধশ্বাস গলায় বলল, 'তারপর?'

নয়ন বলল, 'নানাজান বাড়ি ফিরলেন কুড়ি দিন পর। নানীজান ঘটনা বুঝতে পারলেন তারও মাসখানের পর। নানাজানকে ভয়ে ভয়ে ঘটনা জানালেন তিনি। নানাজান বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি রাগলেন না। কিছু বললেন না। মানুষে জানাজানির ভয় ছিল। তিনি একটা ভালো সমাধান খুঁজছিলেন। আর ঠিক তখুনি বাবা গিয়েছিলেন ফতেহপুর তার ফুপুর বাড়িতে বেড়াতে। একদিনের নোটিশে বাবার সাথে বিয়ে হয়ে গেল মার। সেইদিনই বাবার সাথে মাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন নানাজান। পঁচিশ বছর। মা আর কখনোই ফতেহপুর যাননি।'

হেমা বলল, 'কিন্তু তোমার নানাজান তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিলেন? উনি তো এমন মানুষ না!'

নয়ন বলল, 'না। নানাজান এমনি এমনি ছেড়ে দেয়ার মানুষ না। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন সবার আগে মায়ের একটা ব্যবস্থা করতে। নানাজান চাননি, এই ঘটনা জানাজানি হোক।'

নয়ন থামল। হেমা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে নয়নের দিকে।

নয়ন বলল, 'মা'র ব্যবস্থা করে নানাজান চেষ্টা করেছিলেন আব্দুল ফকিরকে শাস্তি দিতে। সবাই জানে, নানাজান কী ভয়ঙ্কর এক মানুষ। নিজের বংশ মর্যাদা, মান-সম্মান নিয়ে তিনি কি রকম সতর্ক, তাও সবাই জানে। মাকে ঢাকা পাঠিয়ে দিয়েই নানাজান যেন উন্মাদ হয়ে গেলেন। তিনি আব্দুল ফকিরকে খুন করতে চাইলেন। কিন্তু সরাসরি নিজের মেয়ের অজুহাত তুলে তো এত বড় ঘটনা ঘটানো যায় না। লোকে জানাজানির ভয় থাকে। এইজন্য নানাজান একটা যুতসই অজুহাত খুঁজছিলেন।'

হেমা বলল, 'তারপর? লোকটা তো এখনও বেঁচেই আছে!'

নয়ন বলল, 'হু। আছে। কিছুদিন পরেই নানাজান অজুহাত পেয়ে গেলেন অন্য এক ঘটনায়। ঠিক একইভাবে অন্য একটা মেয়ের বিষ নামাতে ওঝা হয়ে গিয়েছিলেন আব্দুল ফকির। আর সেখানেও একই ঘটনা। মেয়ের পরিবার দরিদ্র। নানাজান ঘটনা জনালেন মেয়ের পরিবারের কাছে। সেই মেয়ের অজুহাতে নানাজান আব্দুল ফকিরকে খুন করতে গেলেন। রাতের অন্ধকারে তাকে খুন করে নিয়ে এলেন। কিন্তু...'

হেমা বলল, 'কিন্তু কি?'

নয়ন পরের ঘটনা যতটা সম্ভব খুলে বলল। সে বলল, 'দুই দুই বার, এভাবে দুই দুইবার নানাজান তাকে খুন করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নাই। প্রতিবারই আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গেছে সে। লোকে এমনিতেই বিশ্বাস করে আব্দুল ফকিরের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে।'

হেমা বলল, 'হু। আসমাও এমন অনেক কিছুই বলেছিল।'

নয়ন বলল, 'হ্যাঁ। নিজের চারপাশে সব সময় একটা রহস্য, একটা ধোঁয়াশা তৈরি করে রাখে সে। তুমি জানো না, কি অসম্ভব ভয় পেতে শুরু করেছিলাম তাকে আমি। সবাই তাকে ভয় পায়। তীব্র ভয় পায়। দুই দুইবার চেষ্টা করেও নানাজান তার কিছু করতে পারলেন না। দুবারই বলতে গেলে অস্বাভাবিকভাবেই বেঁচে গিয়েছিল সে। তারপর থেকে নানাজানের ভেতরেও একটা ভয় দেখা দিলো। তারও মনে হতে লাগল, আব্দুল ফকিরের কোনো একটা ব্যাপার আছে।'

হেমা বলল, 'উনিও এসব বিশ্বাস করেন?'

নয়ন বলল, 'সবাই করে। এই যে আমি, এই আমিও করতে শুরু করেছিলাম। এখনও করি কিনা জানি না। আর নানাজান ছোটবেলা থেকেই এমন পরিবেশে বড় হয়েছেন, এমন অসংখ্য বিশ্বাস নিয়ে যে বিষয়গুলো ভাবনায় ঢুকে যায়। তা সে যত সাহসিও হোন না কেন! এই অতিপ্রাকৃত ব্যাপারটা উনাদের মাথায় থেকেই যায়। তাছাড়া আব্দুল ফকির নানাভাবে এই ভয়টা তৈরি করেছিলেন। হি হ্যাজ দ্যাট পাওয়ার টু কনভিন্স পিপল।'

হেমা বলল, 'তারপর?'

নয়ন বলল, 'নানাজান আব্দুল ফকিরের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। সবাই তাই করেছে। কেউ তাকে ঘাটায়নি। কেউ এড়িয়ে চলে, কেউ ভয় পায়। কিন্তু ওই জঘন্য, ভয়ঙ্কর মানুষটা এখনও তেমনই আছে। একদম তেমন। হি ইজ সিক। হি ইজ আ পারভার্ট। হি ইজ আ প্যাশেন্ট অফ হাইপার সেক্সুয়াল ডিজঅর্ডার।'

নয়ন আবার মাথা চেপে ধরল দু'হাতে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ভেতরে ভেতরে সে আর মানুষ নাই। একটা পশু হয়ে গেছে। সমস্যা আছে পশু হলে তুমি তাকে বাইরে থেকে দেখলেই চিনতে পারবে যে এ পশু। এর ধারালো দাঁত, নখ, গর্জন আছে। চোখে-মুখে হিংস্রতা আছে। একটা ব্রুটাল ব্যাপার আছে। তুমি দেখেই সতর্ক হতে পারবে। কিন্তু এই মানুষটাকে দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। তাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে অতি সাধারণ চেহারার একজন সাদাসিধে, সহজ সরল মানুষ।'

নয়ন চুপ করে গেল। সে এখন দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে। হেমাও চুপ করে রইল খানিক। তারপর বলল, 'তুমি এই এত এত জিনিস জানলে কীভাবে? এই এতকিছু, এতবছর পর?'

নয়ন বলল, 'তুমি জানো মার একটা লেখালেখির অভ্যাস ছিল। তার লেখা অনেকগুলো খাতা আমি পেয়েছি। ওই সময়টা ভয়াবহ ডিপ্রেশন যাচ্ছিল মার। অনেকবার সুইসাইড করার কথাও ভেবেছিল। সারাদিন ঘর থেকে বের হতো না। কারো সাথে কথা বলত না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুধু ঘুমাত আর লিখত। সবকিছু লিখে রাখত সে। মা কিছুটা অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল। এমনিতেই কারো সাথে খুব একটা কথাবার্তা বলত না। মিশত না। একা একা থাকত। এই সময়টায় এসে আরো গুটিয়ে ফেলল নিজেকে। সেই সময় আসলে সে কথা বলত একা একা। আর তার সঙ্গী ওই খাতাগুলো। দিনের পর দিন, পাতার পর পাতা সে শুধু লিখেই গেছে। শুধুই লিখে গেছে। যখন যা মন চেয়েছে সব লিখেছে। এই কথাগুলো, এই কষ্টগুলো বলার তো আর কেউ ছিল না তার। কি কষ্ট একটা মানুষ যে পেয়েছে। তুমি জানো না হেমা, আমি যতটা দিন মার পেটে ছিলাম, মার শুধু মনে হতো তার পেটভর্তি বমির মতো নোংরা ঘিনঘিনে কিছু। তার আমাকে বমি করে উগড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হতো হেমা। হেমা, ও সময়টা জুড়ে মা কেবল তার এইসব অনুভূতির কথাই লিখেছে। মার তো দোষ নেই। কিন্তু হেমা, আমার নিজেকেই নিজের ঘিনঘিন লাগে। বমি বমি লাগে। আমি নিজেকে আর সহ্য করতে পারি না। মনে হয় আমার ভেতরে বাইরে সবটাই একটা নোংরা, সবটাই একটা ল্যাদল্যাদে বিশ্রি ঘেন্নারে জিনিস। আমার ভাবতেই বমি পায় হেমা।'

নয়নের শরীর দুমড়ে মুচড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যেন বমি উঠে আসছে। নয়ন দু'হাতে তার পেট চেপে ধরে বীভৎস শব্দ করল। কিন্তু বমি হলো না তার। হেমা নয়নের মাথা টেনে নিলো। তারপর দু'হাতে চেপে ধরে রাখল তার কোলের উপর। তারপর তাকিয়ে রইল মাথার উপরে ঘুরতে থাকা ফ্যানের দিকে। নয়ন চুপ করে গেল। থেকে থেকে ঝাকুনি খাচ্ছে তার শরীর। নয়নের কষ্টটা হেমা বুঝতে পারছে। পুরোটা না হলেও বুঝতে পারছে। কিন্তু নয়নকে কি বলবে সে!

দীর্ঘ সময় কেটে গেল অসহনীয় নৈঃশব্দ্যে। নয়নের শরীরটাও শান্ত হয়ে এসেছে। হেমা আস্তে আস্তে দু'হাতে নয়নের মাথা তুলল। নয়ন বলল, 'একটা কথা বলি হেমা?'

হেমা বলল, 'বলো?'

নয়ন বলল, 'আমি এখন কি করব?'

হেমা বলল, 'কিছুই করবে না। ঠিকঠাক পড়াশোনা করবে। যেমন ছিলে তেমন থাকবে। এই ঘটনায় তোমার কোনো দায় নেই।'

নয়ন বলল, 'কিন্তু ওই মানুষটা? ওই মানুষটার কিচ্ছু হবে না?'

হেমা বলল, 'কিচ্ছু হবে কিনা জানি না। তবে একটা কথা বিশ্বাস করি। মানুষ তার পাপের শাস্তি পায়ই।'

নয়ন বলল, 'ও তো মৃত্যুর পরের কথা। কিন্তু বেঁচে থাকতে?'

হেমা বলল, 'আমার বিশ্বাস, সে পাবে। নাথিং ইজ আনপেইড, ইউ নো।'

নয়ন বলল, 'কিন্তু কীভাবে? শুড আই কিল হিম? আমার কি মনে হয় জানো, আমি ওকে খুন করে ফেলি। তারপর নিজেকে!'

হেমা আবারো নয়নের মাথায় হাত রাখল। তারপর বলল, 'এটা সিনেমা না নয়ন। মাথা ঠান্ডা রাখো। একটা কথা বলি? মাথা ঠান্ডা রেখে শুনবে?'

নয়ন কোনো জবাব দিলো না। তবে তাকিয়ে রইল। হেমা বলল, 'সবার আগে নিজেকে নোংরা ভাবাটা বাদ দিতে হবে। তোমার জন্মের উপর তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারো জন্মেই তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাহলে? যেখানে কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে সে দোষী কেন হবে? আর পৃথিবীর কোনো জন্মই কিন্তু নোংরা না। একটা জিনিস ভাবো তো, তোমার জন্মের আগে তোমার মা কত কিছু ভেবেছিলেন! কিন্তু তোমাকে দেখার পর মুহূর্তের মধ্যে সেই ভাবনাটা তার বদলে গেল। তোমার এই অসম্ভব ক্ষমতাটা তুমি দেখবে না?'

নয়ন বলল, 'কিন্তু ওই মানুষটা? ওর কিচ্ছু হবে না?'

হেমা বলল, 'হবে। নিশ্চয়ই হবে।'

নয়ন বলল, 'কি হবে? কিচ্ছু হবে না। এই এত এত দিনেও ওর কিচ্ছু হয়নি। ওর সবচেয়ে বড় শাস্তি হবে আমি যদি কিছু করি। তার পাপের হাতে তার মৃত্যু।'

হেমা বলল, 'শান্ত হও। একটু স্থির হও।'

নয়ন হঠাৎ বলল, 'তুমি কি জানো, আমি আর কক্ষণো তোমার কাছে আসব না। কোনোদিন না!'

হেমা বলল, 'কেন?'

নয়ন বলল, 'আমাকে তোমার ঘেন্না হবে। তুমি হয়তো ঘেন্নাটা করতে চাইবে না, কিন্তু তোমার অবচেতন মন এই ঘেন্নাটা করবে। আমাকে ভালোবাসতে গেলে মুহূর্তের জন্য হলেও সে তোমাকে এই ফিলিংটা দেবে যে আই এম আ বাস্টার্ড। আমাকে স্পর্শ করতে গেলে তোমার মধ্যে সামান্যতম সময়ের জন্য হলেও দ্বিধা তৈরি হবে। আমার সন্তানের মা হতে গেলে তোমার অবচেতন মন তোমাকে ভাবাবে, তুমি কি ঠিক করছ? কী অসহ্য! কী যন্ত্রণাময়

এক জীবন। হেমা, হেমা! আমি আর পারি না। আমার মাথার ভেতর অসংখ্য পোকা সারাক্ষণ যেন খুটে খুটে খাচ্ছে।'

হেমা বলল, 'আমার কিচ্ছু হবে না নয়ন। কিচ্ছু হবে না। মুহূর্তের জন্যও না।'

নয়ন বলল, 'হবে হেমা। হবে। আমি জানি হবে। তুমিও আমার মতো, আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই একটা মানুষ। এই অনুভূতি থেকে তুমি ভেতর থেকে বের হতে পারবে না। প্রিটেন্ড করতে পারবে। চেষ্টা করতে পারবে। কিন্তু বীভৎস একটা অনুভূতি সময়ে-অসময়ে এসে অদৃশ্য কিন্তু তিক্ষ্ণ এক কাঁটা হয়ে থাকবে। তোমার সাথে আমার সম্পর্ক কখনো খারাপ হলে, ঝগড়া হলে, তুমি সবার আগে আমাকে আমার এই দুর্বল জায়গাটাতে আঘাত করবে। এমন হয় হেমা। তখন প্রচণ্ড রাগ হয়। আর রাগের মাথায় আমরা আর কোনো সঙ্কোচ রাখি না। সব সত্যি কথাগুলো বলে ফেলি। কিন্তু আমি সেটা নিতে পারব না হেমা।'

হেমা ডাকল, 'নয়ন!'

নয়ন বলল, 'আমাকে কিছু বুঝিও না হেমা। আর কিচ্ছু না। আমি সব বুঝি, সব। আমি কাউকে আমার সত্যিকারের পরিচয় দিতে পারব না। কারো কাছেই না। তোমার বাবা মার কাছেও না।'

হেমা বলল, 'তোমার সত্যিকারের পরিচয় কি?'

নয়ন কথা বলল না। কী বলবে সে! আব্দুল ফকিরকে সে বাবা বলে উচ্চারণ অবধি করতে চায় না।

হেমা বলল, 'বাবা-মা কেন হয় জানো? মমতা আর ভালোবাসায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মমতা আর ভালোবাসা যাদের সৃষ্টি করে, তাদের নাম বাবা আর মা। যেই মানুষটাকে এতদিন বাবা বলে জেনে এসেছ, কোনো একদিন কি ঘুণাক্ষরেও মনে হয়েছে যে এই মানুষটা তোমার বাবা নন?'

নয়ন কথা বলল না। হেমা বলল, 'বাবার কত কত গল্প তুমি করেছ! কত কত গল্প। মনে আছে? তুমি সেন্টমার্টিন ট্যুরে গেলে। হঠাৎ করেই কি এক ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস। চার নম্বর বিপদ সঙ্কেত। একটা গোটা দিন ধরে তোমার কোনো খবর নেই। তোমার বাবা পাগলের মতো হয়ে গেলেন। তিনি গিয়ে আবহাওয়া অফিসের সামনে বসে রইলেন। আবহাওয়া অফিস থেকে যাকেই বের হতে দেখছেন, তার কাছে গিয়েই হাউমাউ করে কেঁদে হাতজোড় করে বলছেন, আমার ছেলে সেন্টমার্টিন গেছে, আপনারা বিপদ সঙ্কেতটা কমায়ে দেন। আপনারা বিপদ সঙ্কেতটা কমায়ে ঝড়টা নামায়ে দেন। একবার ভাবো তো! বিপদে ঘণ্টাকয়েক মাত্র ছেলের খবর নেই বলে একজন বাবা কেমন হয়ে যেতে পারেন! একবার ভাবো তো!'

www.boighar.com

নয়ন বলল, 'আমি জানি হেমা। আমি সব জানি। তার সাথে আমি ঠিক মতো কথা বলি না। তাকে এতটুক সময় দেই না। কিন্তু তিনি যেন সব সময় একটা ছায়া হয়ে আমার আশেপাশে থাকেন।'

হেমা বলল, 'এই ছায়াটাকেই আমরা চিনতে পারি না। কারণ ছায়াটা আমাদের সকল কিছু থেকে আগলে রাখে, ঢেকে রাখে। এইজন্য এদের আমরা দেখতে পাই না। ছায়ার ভেতর থাকি বলেই এই ছায়ামানবদের আমরা দেখতে পাই না, সবচেয়ে বেশি উপেক্ষা করি।'

নয়ন বলল, 'কিন্তু এই সত্যটা কি উনার কাছে লুকানো আমার ঠিক হচ্ছে? আমি কি করব? আমার কি উনার কাছে গিয়ে বলা উচিত না যে, তুমি আমার বাবা নও। আই এম নট ইওর সান। বাট আমি বিশ্বাস করি তুমিই আমার বাবা। আমি তোমাকে বাবা ছাড়া আর কিছু কখনোই ভাবিনি। আমার কি উনাকে এটা খুলে বলা উচিত না? যেই মানুষটা আমাকে এত ভালোবাসেন তার কাছে এই ভয়ঙ্কর সত্যটা কি আমার লুকিয়ে রাখা উচিত হেমা?'

হেমা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। এই প্রশ্নের জবাব হেমার কাছে নেইও। সে চুপ করে রইল। নয়ন ঝট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আমাকে একটা পলাতক মানুষের জীবন কাটাতে হবে হেমা। আই উইল হ্যাভ টু লিড মাই হোল লাইফ অ্যাজ অ্যান এসকেপিস্ট। হোল থ্রু মাই লাইফ। আমি যখন কারো কাছে আমার বাবার নাম বলব, লিখব, প্রতিটি মুহূর্তে এই ঘটনা আমার মনে পড়বে। আমার মধ্যে দ্বিধা কাজ করবে। ঘেন্না কাজ করবে। মনে হবে আমি একটা সত্যকে লুকাচ্ছি। মনে হবে সেই সত্যটা প্রকাশ করার সাহস, ক্ষমতা আমার নেই। কারণ আমি একটা কুৎসিত সত্য। তুমি ভাবতে পারছ হেমা? আমি জানি না, কখনো হবো কিনা, কিন্তু আমি যদি কখনো সন্তানের বাবা হই, আমি আমার সন্তানদের অবধি তাদের গ্র্যান্ডফাদারের নাম বলতে পারব না। বলতে গেলে আমার গলা কাঁপবে। আমার বিশ্বাস কাঁপবে। আমার আবার নিজেক অচ্ছ্যুৎ, অপবিত্র মনে হবে। কী ভয়ঙ্কর অসহনীয় যন্ত্রণার ব্যাপার তুমি জানো হেমা?'

হেমা জানে, বোঝেও। কিন্তু কি করবে সে? নয়ন হঠাৎ ছুটে বের হয়ে গেল ঘর থেকে। হেমা ডাকল, 'নয়ন?'

নয়ন শুনল না। পেছন ফিরে তাকাল না অবধি। হেমাও নয়নের পেছন পেছন দরজা অবধি ছুটে এলো। নয়ন বলল, 'আমি যাই হেমা'।

হেমা বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

নয়ন বলল, 'জানি না'।

হেমা বলল, 'বাসায় যাচ্ছ না?'

নয়ন বলল, 'আমি সত্যি জানি না'।

হেমা বলল, 'এমন করো না'।

নয়ন হঠাৎ বলল, 'একটা কথা বলি হেমা?'

হেমা বলল, 'বলো'।

নয়ন বলল, 'জানি, বললে তুমি মেনে নিতে চাইবে না। তোমার চোখে আমায় নিয়ে একটা স্পষ্ট দ্বিধা। একটা স্পষ্ট সঙ্কোচ।'

হেমা বলল, 'কি বলছ!'

নয়ন বলল, 'আমি ঠিক বলছি হেমা। মাকে গতরাতে আমি বলেছি যে এই ঘটনাগুলো আমি জেনে গিয়েছি। তারপর এসেছি তোমার কাছে। কেন এসেছি জানো? আমার জীবনে আমি তোমার মতো এত স্থির আর গভীর কাউকে দেখিনি। তুমি বয়সের তুলনায় অনেক বড়, অনেক গভীর একটা মানুষ। তুমি আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসো। তোমার চোখে আমার এই নতুন পরিচয়টা দেখা আমার জন্য তাই সবচেয়ে বেশি জরুরি ছিল। তাহলে পৃথিবীর আর সকল মানুষের ভাবনা বোঝাটা আমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে।'

হেমার হঠাৎ কেমন রাগ লাগতে লাগল। সে বলল, 'তারপর? আমাকে দেখে তুমি কি বুঝলে নয়ন?'

নয়ন ম্লান হাসল। তারপর বলল, 'তুমি এইটুকু সময়েই নিজের সাথে যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছ। এটা আমার চোখ এড়ায়নি হেমা। গত কিছুদিন থেকে আমিও তো নিজের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ করছি! বিষয়টা আমার জন্য বোঝা খুব কঠিন কিছু নয়।'

হেমার কী সব বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু সে তার কিছুই গুছিয়ে আনতে পারল না। তার শরীর আর মস্তিষ্ক জুড়ে কেমন একটা অস্থিরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু নয়ন তাকে এভাবে ভুল বুঝে চলে যেতে পারে না। সে নয়নকে ভালোবাসে। আগের মতোই ভালোবাসে।

নয়ন খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'শোনো। তুমি চাইলেও আমি আর কখনো আসতাম না হেমা! আমি নিজেই নিজেকে মেনে নিতে পারি না। সেখানে অন্যরা কেন নেবে? এই যে যতটুকু মুহূর্ত আমি তোমার কাছে ছিলাম। এই প্রতিটি মুহূর্তে আমি তোমার স্পর্শ বোঝার চেষ্টা করেছি। এই স্পর্শের ভাষাটা আমি এখন বুঝি হেমা। এইটুকু সময়েই তোমার স্পর্শগুলো একটু একটু করে দ্বিধান্বিত হয়েছে। আমাকে ছুঁতে গিয়ে আগের প্রতিবারের তুলনায় পরের প্রতিবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। শিথিল হয়েছে। আমি আজকাল এসব টের পাই হেমা।'

হেমার এত মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এত কান্না পাচ্ছে। নয়ন এসব কী বলছে তাকে! সে কী করবে? সে কি নয়নকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলবে, তুমি যা ভাবছ, সব ভুল নয়ন। সব ভুল। আমি সেই হেমা। সব সময়ই একই

আছি! সে কী বলবে এখন? নাকি আরো গভীর কোনো স্পর্শে সে নয়নকে বুঝিয়ে দেবে যে নয়ন যা ভাবছে তা ভুল।

নয়ন খুব সঙ্কোচ মাখা গলায় বল্ল, 'আরেকটা কথা বলি?'

হেমা বলল, 'হুম'।

নয়ন বলল, 'এই জগতে তুমি ছাড়া আমার নিজের বলতে কিছু কখনোই ছিল না। আর কখনো হয়তো থাকবেও না। কিন্তু সেই নিজের বলতে মানুষটার কাছে আমি আর কখনোই হয়তো আসব না। তোমার জন্য না। আমার জন্যই আমি আর আসব না। তোমাকে পাবার জন্য যে সাহসটা দরকার, যে শক্তিটা দরকার, সেটা আমার নেই। কেবল ভালোবাসা সব পারে না। পারলে, আমি এভাবে চলে যেতাম না। তুমিও না।'

হেমা বলল, 'আমি কোথাও চলে যাইনি নয়ন।'

নয়ন কান্নার মতো করে মৃদু হেসে বলল, 'আচ্ছা, মেনে নিলাম, তুমি কোথাও চলে যাওনি। কিন্তু আমিই যাচ্ছি।'

নয়ন ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। হেমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল নয়নকে ডেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত আলিঙ্গনে নয়নকে পিষে ফেলতে। তার খুব ইচ্ছে করছিল, নয়নের ঠোঁটের ভেতর ঠোঁট ডুবিয়ে দিতে। তারপর তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, দেখেছ? তুমি ভুল। তুমি মস্ত বড় ভুল। তোমাকে স্পর্শ করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সঙ্কোচ নেই। কিচ্ছু নেই।

কিন্তু হেমা কেন যেন তার কিছুই করল না। সে যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। নয়ন বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে। হেমা দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়েই রইল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তার হঠাৎ মনে হলো, নয়নকে সে অমন করে জড়িয়ে ধরতে পারল না কেন? অমন তীব্র ইচ্ছে হবার পরও কেন সে নয়নকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটের ভেতর ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলতে পারল না 'ভালোবাসি'। কেন? কোনো ভয়, সঙ্কোচ, বাঁধা তো কোথাও ছিল না। তাহলে? তাহলে কেন পারল না সে?

আর ঠিক তখুনি হেমার মনে হলো, তার ভেতরে কোথাও যেন তার অবচেতনেই কি একটা ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। তার অজান্তেই তার বুকের ভেতর কোথাও যেন ঘনিয়ে আসছে তীব্র এক ঝড়।

সেই ঝড়ের নামই 'দ্বিধা' কিনা কে জানে!

নুরুন্নাহারের মৃত্যুর মাস পেরিয়েছে। দিন পনেরো কুড়ি যেন থমকে ছিল বাড়িখানা। তারপর সবকিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আসলে মৃত্যুকে মানুষ যত বড় ক্ষত বা শূন্যতা হিসেবে দেখে, জগতে আর কোনো ক্ষত বা শূন্যতাকেই মানুষ তত বড় করে দেখে না। কিন্তু একমাত্র সময় জানে তার কাছে ছোট-বড় কিছু নেই। সকলই সমান। সে আর সকল ক্ষত বা শূন্যতার চেয়ে মৃত্যুকে আলাদা করে দেখে না। জগতের আর সকল ক্ষতর মতোই সে একসময় ভুলিয়ে দেয় মৃত্যুর ক্ষতকেও।

ক্ষতের যন্ত্রণা যত তাড়াতাড়ি যায়, স্মৃতি তত তাড়াতাড়ি যায় না। স্মৃতি থেকে যায় দীর্ঘ সময়। কিন্তু সেই স্মৃতিতে একসময় আর যন্ত্রণা থাকে না। হয়তো কাছের মানুষদের কিছু দীর্ঘশ্বাস থাকে। নুরুন্নাহার এই বাড়িতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ ছিলেন না যে তার মৃত্যুর ক্ষত শুকিয়ে গেলেও কেউ তার স্মৃতি পুষে রাখবে। ফলে তিনি হারিয়ে গেলেন অতি দ্রুত। তার মৃত্যুর ক্ষত যত দ্রুত শুকিয়ে গেল, তার স্মৃতি মুছে গেল তার চেয়েও দ্রুত। প্রথম দেড়-দুই সপ্তাহ পারুল যেন হয়েছিল পাথরের মূর্তি। সারাক্ষণ নিসাড় হয়ে বসে থাকত। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, ঘুম নেই। কারো সাথে কথা নেই। দিন চারেক বাদে আব্দুল ফকির যখন এলেন। তখন এই বাড়িতে আবার নতুন করে শোকের মাতম উঠেছিল। স্ত্রীর জন্য আব্দুল ফকিরের কান্নায় চারপাশ ভারি হয়ে উঠেছিল। স্বজন-প্রতিবেশীরা ছুটে এসেছিল আবার। কিন্তু তাতেও যেন সামান্যতম বিকার হয়নি পারুলের। সে ছিল তার মতো একা। বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মতো। তারপর ধীরে ধীরে সব যেন স্বাভাবিক হয়ে যেতে লাগল। এমনিতেও বেশিরভাগ সময়ই নিজের ঘরে একপ্রকার বন্দি হয়েই থাকতেন নুরুন্নাহার। ফলে আলাদা করে তার অনুপস্থিতি আর কাউকেই স্পর্শ করল না।

নুরুন্নাহারের মৃত্যুর সংবাদে সবচেয়ে বেশি হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন আব্দুল ফকির। সকলেই ভেবেছিল দীর্ঘ সময় ধরে অপ্রকৃতস্থ হয়ে থাকা স্ত্রীর

www.boighar.com

প্রতি আর সকল স্বামীর মতো আব্দুল ফকিরেরও প্রবল অনাসক্তি রয়েছে। তাছাড়া আব্দুল ফকিরের সামনে না হোক, তার অগোচরে হলেও তাকে নিয়ে একটা ফিসফিসানি তো ছিলই। সবকিছু মিলিয়ে 'অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের বৌ', এই তত্ত্বে আব্দুল ফকির খুশি হবেন বলেই সকলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে হলো উল্টো। আব্দুল ফকির যেন হয়ে গেলেন অন্য এক মানুষ। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকেন। কোনো কাজে-কর্মে যান না। মাঝে-মধ্যে পারুলের সাথে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করলেও পারুল সাড়া না দেয়ায় সেই চেষ্টাও খুব একটা ফলপ্রসূ হলো না। তবে মাসখানেকের মধ্যে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠলে একদিন পারুলের সাথে কথা বলতে বসলেন আব্দুল ফকির। তিনি বললেন, 'মারে, তোমার জইন্য একখান বিয়ার সম্বন্ধ আসছে। ছেলে ভালো। রায়গঞ্জে চাউলের বড় আড়ত আছে।'

পারুল বলল, 'আব্বা, আপনের কি ধারণা আমি ভাত বেশি খাই?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'এইটা কি কথা বললা গো মা? এইটা আমি কেন ভাবব?'

পারুল বলল, 'ভাত বেশি না খাইলে চাউলের আড়তদারের লগে বিয়া ঠিক করতেছেন কেন?'

আব্দুল ফকির থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'ছেলে ভালো মা। পুরা পাঁচ হাত লম্বা। দেখতে শুনতে ভালো। গায়ের রং উজ্জ্বল ফর্সা।'

পারুল বলল, 'টাউনে বাড়ি এমন ছেলে দেহেন আব্বা। আমি টাউনের ছেলে ছাড়া বিয়া করব না।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'টাউনের ছেলে আমি কই পাব মা? আর চিনি না, জানি না এমন ছেলের সাথে তোমার আমি বিয়া দিব না মা।'

পারুল বলল, 'চেনন-জানন লাগব না। টাউনের ছেলে দেখেন। বিয়ার পর আমি চিইন্যা-জাইন্যা নিব।'

আব্দুল ফকির কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই পারুল বলল, 'মায় মরতে না মরতেই আমার বিয়ার লইগ্যা এমন পাগল হইয়া গেলেন ক্যান আব্বা? মায়র কবরের মাটি একটু শুকাক।'

আব্দুল ফকির নরম গলায় বললেন, 'মারে, তোমার বিয়ার বয়স হইছে আরো অনেক আগেই। তোমার মায়ের কথা চিন্তা কইরাই আমি এতদিন বিবেচনা করি নাই। তুমি চইল্যা গেলে তোমারে মায়রে দেখব কে! এহন বয়স যদি আরো বাড়ে, মাইনষে পাঁচ কথা ছড়াইব। সম্বন্ধ আসব না। তোমারে বিয়া দিয়া এই বাড়িতে আমি একলা কেমনে থাকব মা? সেই কথা ভাবলেই তো পরান খাঁ খাঁ করে।'

পারুল বলল, 'তাইলে যেইটা করছি, সেইটা করেন। টাউনের ছেলে দেখেন।'

আব্দুল ফকির আর কোনো কথা বললেন না। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে এই একটা পরিবর্তন পারুলের হয়েছে। সে কথা বলার সময় খুব মেজাজ দেখায়। মাকে নিয়ে তার কোনো কান্না নেই। কোনো বিষাদ নেই। কিছুদিন সে ছিল পাথরের মূর্তি হয়ে। আর তারপর সে যেন হয়ে উঠেছে মেজাজী এক মানুষ।

লতার ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। সে আবার ব্যস্ত হয়ে গেছে তার জীবনে। সেদিন লতার মা আর বাবা যাচ্ছিলেন লতার নানাবাড়ি রায়গঞ্জে। পারুল হঠাৎ তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। তারপর বলল লতাকে দেখতে তার মনটা কেমন ছটফট করছে। সেও তাদের সাথে রায়গঞ্জ যেতে চায়। তারা আপত্তি করলেন না। আপত্তি করলেন না আব্দুল ফকিরও। পারুল সেজেগুজে রায়গঞ্জ গেল। মাত্র দিন পঁচিশেক পরে আবার লতার সাথে দেখা হলো তার। কিন্তু লতাকে দেখে কী যে ভালো লাগল পারুলের! মনে হলো বহুকাল পর সে লতাকে দেখেছে। তেষ্টায় শুকিয়ে থাকা তার বুকের ভেতরটা যেন ঠান্ডা জল পেয়ে জুড়ালো।

সেই রাতে লতার সাথে রাজ্যের কথা হলো পারুলের। লতার চোখে-মুখে কি একটা আনন্দের ঝিলিক! পারুল বলল, 'কী হয়েছে তোর? এত আনন্দে ঝলমল করতেছিস কেন?'

লতা বলল, 'প্রায় তিন মাসেরও বেশি সময় পর আশিক আসতেছে!'

আশিকের কথা শুনলেই পারুলের কেমন মন খারাপ হয়ে যায়। সে বলল, 'তুই বিয়ে করে ফালাস না কেন লতা?'

লতা বলল, 'আমি তো পারলে আজই করি। কিন্তু আশিকই তো এখন বিয়ে করতে চাচ্ছে না। ওর যে কত কথা, তা যদি শুনতি! বলে, আগে প্রেম করে নেই। পরে বিয়ে। বিয়ের পর সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা, আত্মীয়-স্বজন কতকিছু যে সামলাতে হয়। তখন আর প্রেম থাকে না।'

বাচ্চা-কাচ্চার কথা বলতে গিয়ে লতার মুখখানা যেন আরক্ত হয়ে উঠল। পারুল কোনো কথা বলল না। তার মন আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। লতা বলল, 'আর তোরে না বললাম, আশিক চায় আমি ইন্টার পরীক্ষায় আগে পাশ করি, তারপর বিয়ে। তার আগে না।'www.boighar.com

পারুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বিয়ার পরে ঢাকার শহর গিয়া কি আমারে মনে পড়বে লতা? আমার তো আর এই জনমে ঢাকা যাওয়া হলো না।'

লতা এবার পারুলের মাথায় আলতো হাতে চাটি মেরে রহস্যময় গলায় বলল, 'ভাবছিলাম তোরে এহনই বলব না। সামনাসামনি স্যারপ্রাইজ দিব। কিন্তু

www.boighar.com

তোর মুখখান যেমন আষাঢ় মাসের আকাশ করে ফালাইছিস, এখন আর না বলে পারছি না।'

পারুল কৌতূহলি গলায় বলল, 'কী?'

লতা বলল, 'আশিকের সাথে তো তোরে নিয়া অনেক কথাই হয়। সে আইজ থেইক্যা না। একদম প্রথম থেকইয়াই। তোর কত গল্প যে তারে আমি বলি! তুই শুনলে আসমান থেইক্যা পড়বি।'

পারুল বলল, 'কী কথা বলিস? ভালো কিছু তো আর জীবনেও বলবি না।'

লতা বলল, 'তোর তো আমারে খালি শত্রুই মনে হয় পারুল। এতদিনেও আমি তোর বন্ধু হইতে পারলাম না।'

লতা এবার সত্যি সত্যিই মন খারাপ করল। পারুল অবশ্য বুঝতে পারেনি যে সে এত সহজে মন খারাপ করে ফেলবে। পারুল দু'হাতে লতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বান্ধবী। আমি তো মজা কইরা বলছি। বল না কী বলছস আমার কথা!'

লতা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'এই তোর দুঃখের কথা, কষ্টের কথা। তোর মা থাইকাও নাই সেই সব কথা। তোর স্বপ্নের কথা। তোর পছন্দ, অপছন্দ, ইচ্ছা। তোর মা মারা যাওনের পুরা ঘটনা বলছি। আশিক তো ঘটনা শুইন্যা প্রায় কাইন্দা দেয় দেয় অবস্থা। এত নরম ওর মনডা জানস। কি যে ভালো একটা ছেলে।'

পারুল বলল, 'এইসব কথা তারে বলতে গেলি ক্যান? সে কি মনে করল বল তো?'

লতা বলল, 'উদ্দেশ্য তো একটা আছিলই পারুল। তোর কোনো ক্ষতির জন্য কিছু বলি নাই। ভালোর জন্যই বলছি।'

পারুল তখন থেকে শুনে যাচ্ছে যে লতা তার ভালোর জন্য বলেছে, ভালোর জন্য বলেছে। কিন্তু কি ভালোর জন্য বলেছে, তা সে বলছে না। পারুল খানিকটা অস্থির গলায়ই বলল, 'সেই ভালোটাই তো শুনতে চাইতেছি লতা'।

লতা কিছুক্ষণ সময় নিলো। তারপর বলল, 'আশিকরে বলছিলাম, যে আমরা দুই বান্ধবী সেই একদম ছোট্টবেলা থেইকাই একসাথে থাকি। এহন আমার যদি বিয়া-শাদি হইয়া যায়, আর আমি যদি ঢাকার শহর চইল্যা যাই। তাইলে তুই এই গাঁও গ্রামে একলা পইড়্যা থাকলে আমার যেমন তোর জইন্য মন কানবো, তোরও আমার জইন্য মন কানবো। আর তোর গ্রামে বিয়া করনের মতও নাই। আশিকের যদি কোনো ভালো বন্ধু-বান্ধব থাহে, বিয়ার উপযুক্ত, ভালো চাকরি-বাকরি করে। ভালো ফ্যামিলি, তাইলে একবার কথা বলতে তো দোষ নাই। কথা বলনের পর দুইজনের যদি পছন্দ হয়, তাইলে ফ্যামিলিতে কথাবার্তা হইতে পারে।'

লতা একটু থামল। সে থেমে পারুলের অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করল। পারুলের মুখে কেমন অদ্ভুত একটা লজ্জা লজ্জা ভাব। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যেন তার চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ না পায়। কিন্তু পারছে না। তার মুখ দেখে লতা তাকে খোলা বইয়ের মতো পড়ে ফেলল। পারুল উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে ঘটনার বাকি অংশ শুনতে।

পারুল বলল, 'আশিক তো আমার কাছে শুইনা শুইনা তোর সম্পর্কে একটা ধারণা আগেই পাইছে। তোরে আশিকের খুব পছন্দ। সে তখন বলছিল তার একটা বন্ধু আছে, খুবই নাকি ভালো ছেলে। দেখতে শুনতেও ভালো। তার নাকি বিয়ার কথা চলতেছে। মাইয়াও দেখছে অনেক। কিন্তু কাউরেই পছন্দ হয় নাই। তার নাকি শহরের মেকাপ সুন্দরী, প্লাস্টিক মাইয়াগো পছন্দ না। তার নাকি গাঁয়ের লাজুক লতা বালিকা বধূ পছন্দ। হা হা হা।'

লতা কথা পুরো শেষ না করেই পারুলের গাল টিপে দিয়ে হেসে ফেলল। পারুল তাতেই লজ্জায় যেন গলে গেল। লতা বলল, 'আমি আশিকরে বলছিলাম যে বললেই তো আর হইয়া যায় না। বিয়া-শাদির ব্যাপার। তুমি একদিন তারে নিয়া আসো। আগে ছেলে-মেয়েরা নিজেরা নিজেগো দেখুক। কথা বলুক। তারপর পছন্দ হইলে না হয় ফ্যামিলি পর্যন্ত আগান যাইব। আশিক বলছিল, সে তার বন্ধুর লগে কথা বইলা জানাইব।'

লতা থামল। কিন্তু পারুল সাথে সাথে বলল, 'তারপর?'

বলেই সে বুঝল ভুল করে ফেলেছে। লতা এবার তাকে নিয়ে ইচ্ছেমতো হাসাহাসি করবে। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো লতা কিছুই করল না। সে বলল, 'আমাগো যহন ঢাকায় যাওনের কথা হইছিল, তহনই প্লান আছিল, ঢাকায় তোর সাথে ওর সেই বন্ধুর দেখার ব্যবস্থা করা হইব। তারপর যদি দুইজনের দুইজনরে পছন্দ হয়, তাইলে আর কি! তোর বাপ-মা তো লগেই থাকব। সবাই রাজি থাকলে, তহনই একটা কিছু হইয়া যাইব।'

পারুলের মুখখানা কেমন বিষাদে ছেয়ে গেল। লতারও। লতা একহাতে পারুলকে তার কাঁধের সাথে চেপে ধরে বলল, 'মন খারাপ করিস না। হায়াত, মউত, বিয়া– এই তিন আল্লাহর হাতে। আল্লায় যেইহানে চাইব, সেইহানেই হইব। আল্লাহ যার হায়াত যতদূর রাখছে, সে ততদূরই বাঁচব। যার বিয়া যেইহানে রাখছে, তার বিয়াও সেইহানেই হইব। আশিকের লগে আমার আবার কথা হইছে। তোর মায়র ঘটনা শুইন্যা তো সে খুব কষ্ট পাইছে। খুব। এহন সে বলছে, আগামী মাসের কোনো একদিন সে তার বন্ধুরে নিয়া আইব। মানে তোর যদি কোনো আপত্তি না থাহে। আমি কিন্তু বইলা দিছি যে আমার বান্ধবীরে দেখলে এক পলকেই কাইত হইয়া যাইব। তহনই জানি আবার বিয়া কইরা লইয়া যাওনের জইন্য টানাটানি লাগে না। বিয়া হইব বড় অনুষ্ঠান কইরা। তারা

www.boighar.com

তো কি কম্যুনিটি সেন্টারে বিয়া করে। গ্রামের বিয়ার মজা তারা বুঝব কি! তাইলে বান্ধবী, ভালো কইরা নিজের যত্ন-টত্ন করো। ছেলে জানি দেইখ্যা ফিট খায়। দরকারে আমরা না বইলা দিব। তারা জানি না বলতে না পারে। আগামী মাসেই কিন্তু। বেশিদিন বাকি নাই। রেডি হও বান্ধবী। বিয়া তোমারে আমি টাউনেই দিব।'

ঘটনা শুনে প্রবল কৌতূহল হচ্ছিল পারুলের। আনন্দও হচ্ছিল। আনন্দে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে জানে না, কেন যেন সেই আনন্দটা তার আর থাকল না। লতার কথা শুনে তার আনন্দে প্রজাপতির মতো ওড়ার কথা। সেই যেদিন সে প্রথম এক বাজারের দোকানে দাঁড়িয়ে আঁড় চোখে একখানা সিনেমা দেখেছিল। সিনেমায় এক প্রেমিক জুটি রিকশায় যেতে যেতে গান গাইছিল। পরক্ষণেই আবার তারা রাতের ঢাকার লাল-নীল আলোতে গানের তালে তালে হেসে খেলে বেড়াচ্ছিল। তার পরপরই মেয়েটা যখন একখানা ঝা চকচকে বাসায় কোমড়ে আঁচল গুঁজে অদ্ভুত সুন্দর একটা রান্নাঘরে ছেলেটার জন্য রান্না করছিল। সেইদিনের সেই মুহূর্তে থেকে তার জীবনের একটামাত্র স্বপ্ন, সে শহরে যাবে। ঢাকার শহরে। তার অমন একটা বাসা হবে। অমন সুন্দর করে কথা বলা একজন স্বামী হবে। তারা অমন লাল-নীল আলোতে ছুটে বেড়াবে। অমন অদ্ভুত সুন্দর রান্নাঘরে সে কোমড়ে আঁচল জড়িয়ে রান্না করবে।

লতার মোবাইল ফোনের বদৌলতে পারুলের সেই ইচ্ছেরা রোজ একটু একটু করে বেড়েছেই। সে মুহূর্তের জন্যও কখনো ভাবেনি, সে সারাটাজীবন এই গ্রামে থাকবে। এখানে কোনো এক গেঁয়ো ছেলেকে সে বিয়ে করবে! কিন্তু আজ এই মুহর্তে এমন একটা অসাধারণ সম্ভাবনার কথা শুনেও শেষমেষ এসে পারুলের আনন্দটা যেন আর পালে হাওয়া পেল না। এর কারণটা পারুল স্পষ্ট বুঝতে পারল না। কিন্তু লতা তার জন্য এত কিছু ভাবে, এই ভাবনাটা পারুলকে খুব আনন্দ দিল। সে লতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বান্ধবী, তুই এত ভালো কেন?'

লতা পারুলের পেটে খোঁচা দিয়ে বলল, 'আগে সবকিছু ভালোয় ভালোয় হোক, তারপর যা বলার বলিস। আগেই সব ভাইব্যা রাহিস না। তয় ছেলেটারে আমার খুবই ভালো লাগছে পারুল। দুইদিন আমিও তার লগে ফোনে কথা বলছি। সহজ-সরল ভালো মানুষ টাইপের ছেলে। আরেকখান কথা, সে কিন্তু একদম শুদ্ধ কইরা কথা বলে। আশিকের মতো খাইছি, ঘুমাইছি, করছি, পরছি না। সে বলে খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, করেছি, পরেছি। হা হা হা। তোর শুদ্ধ কথা শেখন এহন ওয়ান টু'র ব্যাপার। বিয়ার প্রথম তিন-চাইর মাস ওইগুলান কিছু করবি না, খালি শুদ্ধ কথা শিখবি। হা হা হা।'

লতা শরীর দুলিয়ে হাসছে। পারুলের দেখতে কি যে ভালো লাগছে! এই প্রথম তার মনে হলো, লতা মেয়েটা তার সত্যিকারের বন্ধু। সে এতদিন তাকে ভুল বুঝে এসেছে বা ঈর্ষান্বিত হয়ে তার সবকিছুকে অন্যভাবে দেখেছে। কিন্তু মেয়েটা সত্যি সত্যি তার ভালো চায়। তাকে ভালোবাসে। এমন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

জীবনে এই প্রথমবারের মতো পারুলের নিজেকে অসম্ভব ভাগ্যবতী মনে হতে লাগল।

www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি বেশিরভাগ সময়ই তার ঘরে শুয়ে বসে কাটান। তার ধারণা, তার এই দীর্ঘ জীবনের সমাপ্তি রেখাটা খুব কাছে চলে এসেছে। কিন্তু এই কাছাকাছি চলে আসা সমাপ্তি রেখাটা কি মানুষ দেখতে পায়? তার যে বয়স, তাতে সমাপ্তি রেখাটা আলাদা করে দেখার কিছু নেই। সেটি তার কাছাকাছিই ছিল সব সময়। যে-কোনো সময় সেটি স্পর্শ করার অপেক্ষামাত্র। তবে একটা বিষয়, তাহলো অপ্রস্তুত অবস্থায় তিনি মরতে চান না। চান না বলেই শেষ নিঃশ্বাসের আগ অবধি যতটুকু সময় পান, সেই সময়টুকু জুড়ে তিনি যতটা সম্ভব সবকিছু গুছিয়ে রেখে যেতে চান।

সেদিন মাঝরাতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙা সেই রাতে তার মাথায় কত যে এলোমেলো চিন্তা এলো। তার হঠাৎ করেই মনে হলো, তিনি এত বৈষয়িক মানুষ কেন? এই বয়সে এসে তার উচিত মৃত্যুচিন্তায় ভীত থাকা। তিনি ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। তার এখন ধর্মকর্ম নিয়েই থাকা উচিত। কিন্তু পুরোটা সময়ই তার মাথায় থাকে ইহলৌকিক নানান চিন্তা। তার বংশ মর্যাদা, তার পরিচয়, তার উত্তর-পুরুষের ভবিষ্যৎ। এর কারণ কি? তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ভেবে দেখেছেন, এর কারণ আসলে অমরত্বের লোভ। মানুষ মরতে চায় না। সে বেঁচে থাকতে চায় অনন্তকাল। অমরত্ব চায়। কিন্তু সেটি সম্ভব নয় বলেই তারা তদের অস্তিত্ব রেখে যায়। মানুষ চায়, তার মৃত্যুর পর তার জন্য কেউ কাঁদুক। তার অনুপস্থিতি কেউ অনুভব করুক। দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী তাকে কেউ মনে রাকুক। কিন্তু সে সৌভাগ্য সকলের হয় না, কারো কারো হয়। যাদের হয়, তারা সকলেই আবার একই দৈর্ঘ্যের মরণোত্তর আয়ু পান না। পান তাদের রেখে যাওয়া কর্মের বিস্তৃতি আর প্রভাব অনুসারে।

তাহলে কি তৈয়ব উদ্দিন খাঁও তার মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে চান? তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এই প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তবে তিনি ভেবে দেখেছেন, মানুষ যখন তাকে ভয় পায়, সম্মান করে, বহু দূর-দূরান্তের মানুষও

যখন তাকে এক নামে চেনে, খাঁ-বাড়ির কথা জানে, তখন তার ভেতরে একটা আনন্দ হয়। এই আনন্দটা নেশার মতো, কেবল ভালো লেগেই শেষ হয়ে যায় না। আবারো পেতে ইচ্ছে করে। বারবার পেতে ইচ্ছে করে। না পেলে উশখুশ লাগে। সবচেয়ে বড় কথা, এই আনন্দটা কখনোই একঘেয়ে লাগে না।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ শুয়ে আছেন বিছানায়। ভালো ঠান্ডা পড়েছে এবার। এই দুপুর বেলাও তিনি হাতে-পায়ে মোজা পরে খাটে কাঁত হয়ে শুয়ে আছেন। বাইরে তেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সরু নারকেল গাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে উঠানে। শীতের দুপুরের এই ওমটা যে কী আদুরে! ওই রোদে শরীর মেলে দিলেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর খুব ইচ্ছে করছিল ওই রোদে গিয়ে শরীর মেলে দিয়ে শুয়ে থাকতে। কিন্তু তিনি গেলেন না। এই বয়সে যখন তখন করা সকল ইচ্ছেকে গ্রাহ্য করলে চলে না।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মনে হয়, জীবনে প্রবল হয়ে ওঠা ইচ্ছেগুলোকে যত অগ্রাহ্য করা যাবে, জীবন দীর্ঘ হবার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। এখন কে কি বেছে নেবে, সেটি তার ইচ্ছে। কেউ কেউ ইচ্ছে মতো জীবন কাটিয়ে টুপ করে সটকে পড়ে, কেউ কেউ ইচ্ছে অগ্রাহ্য করে জীবন পেলে-পুষে রাখে দীর্ঘ সময়।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন না তিনি আসলে কোন দলে? তার বেশিরভাগ ইচ্ছেকেই তিনি যেমন অগ্রাহ্য করেছেন, আবার তেমনি তার হাতে গোনা দু'চারটি ইচ্ছেকে তিনি অগ্রাহ্যও করতে পারেননি। বরং আর সকল কিছুর চেয়ে এই ইচ্ছেগুলোকে তিনি সবচেয়ে বেশি শক্ত হাতে ধরেও রেখেছেন।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মনিরকে ডাকলেন। আজকাল আর তার সামনে এলে মনির সেই আগের মতো নেতিয়ে থাকে না। সে আজকাল মুখে মুখে কথা বলে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কোনো একটা পরিকল্পনার কথা শুনে সে আর আগের মতো জ্বে দাদাজান, জ্বে দাদাজান বলে মাথাও নোয়ায় না। বরং সেই পরিকল্পানার নানান খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সে তার মতামত দেয়। কখনো কখনো সেই পরিকল্পনা তার পছন্দ না হলে তাও জানায়। বিষয়টা যে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর খারাপ লাগে তা নয়, বরং তিনি মনে মনে আনন্দিত হন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর নাতির গলার স্বরে বুলন্দ আওয়াজ হবে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর রক্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। এই স্বপ্নটা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সব সময় ছিল। কিন্তু সন্তানদের নিয়ে সেই স্বপ্ন দেখার ন্যুনতম সাহস তিনি পাননি। মনিরকে নিয়েও যে সেই স্বপ্ন দেখার কোনো সুস্পষ্ট কারণ ছিল তা নয়। তবে মনিরের সহজ-সরল হাবভাবেই কী যেন কী একটা ছিল, আর তৈয়ব উদ্দিন খাঁর পাকা জহুরি চোখ তা দেখে নিতে ভুল করেনি।

মনির এসে বলল, 'দাদাজান, শরীল এহন কেমন?'

www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'শরীল ভালো। তয় শরীলের চাইতেও মন ভালো থাহন বেশি দরকার। মনডা ভালো না।'

মনির বলল, 'কি হইছে দাদাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ফজুর আর কোনো খবর তো আমারে দিলি না। এহনই যদি আমারে পাশ কাটাস, তাইলে কেমনে হইব? আগে তো মরি, তারপর...'

মনির বলল, 'দেওনের মতো কোনো খবর তো এহনো পাই নাই দাদাজান।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আব্দুল ফইরের লগে আমার একবার দেহা হওন দরকার।'

মনির বলল, 'ফইর সাবের স্ত্রী মারা গেছে। এইজইন্য আর তারে খবর পাঠাই নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তার স্ত্রী মারা যাওনের লগে খবর না পাঠানোর সম্পর্ক কি?'

মনির বলল, 'সে তার স্ত্রীর মরনে খুব ভাইঙা পড়ছে দাদাজান। সব কাজ-কাম ছাইড়্যা দিছে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ঘটনা তো সুবিধার মনে হইতেছে না মনির'।

মনির অবাক গলায় বলল, 'এইহানে ঘটনা সুবিধা-অসুবিধার কী আছে দাদাজান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আছে। এই জইন্যই চৌখ খোলা রাখতে হইব। শীতকালে বিষ্টি হইলে বুঝতে হইব আবহাওয়ায় গণ্ডগোল আছে।'

মনির কথা বলল না। সে এই মানুষটাকে নানানভাবে বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'স্ত্রী মারা যাওনের শোকে আব্দুল ফইরের দুই চাইরদিন ঝিম মারা থাকন ঠিক আছে। কিন্তু সেই জইন্য সে কাজ-কাম ছাইড়্যা দিব, এইটা ঠিক নাই। যাই হোক, ওইটা আমাগো দেহনের বিষয় না। তারে খবর পাঠা। আমি তারে ডাকছি।'

মনির বলল, 'জ্বে দাদাজান'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আর কোনো কথা বললেন না। তবে মনিরই আবার বলল, 'দাদাজান, আরেকখান কথা। আপনের অনুমতি না নিয়াই পুরা ফতেহপুর তন্নতন্ন কইরা ফালাইছি। কিন্তু ফজু কাকুর গয়নার কলসির খবর কোনোহানে পাই নাই। আপনে কইছিলেন ওই গয়নার কলসি নাকি সে গ্রামের বাইরে নেয় নাই। কারণ ওই জিনিস সে নিজের ছাড়া অন্য কারো ধারে রাখতে পারব না। তায় বাইরে না নিলে, গয়নার কলসি গেল কই?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সে তো বলল, আব্দুল ফইরের ধারে।'

মনির বলল, 'এই কথা আপনে বিশ্বাস করেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'বিশ্বাসও করি না। আবার অবিশ্বাসও করি না'।

মনির বলল, 'আরো একখান কথা দাদাজান। আপনে কেমনে নিবেন জানি না। তয় কথাখান বলন জরুরি।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মুখ তুলে মনিরের দিকে তাকালেন। তবে কথা বললেন না। মনির বলল, 'কথাখান দাদীজানের বিষয়। এইজইন্যই বলতে সাহস পাইতেছিলাম না। দাদীজানের লগে ফজু কাকু গো একটা কোনো আলাদা বিষয় আছে। ফজু কাকুরে আপনে যেইদিন ডাকলেন, সেইদিন দেখছি ফজু কাকুর লগে তার বৌও আইছিল। ফজু কাকু যহন বাইরের ঘরে আমাগো লগে আছিল, তহন তার বৌ আইছিল ভিতর বাড়িতে। দাদীজানের লগে কি কথাবার্তা হইল! আমি দাদীজানরে জিগাইলাম, দাদীজান বলল তারা ফরাজিগো বাড়ির ডিপ টিউবয়েলের পানি খাইত, সেইটা নকি নষ্ট হইয়া গেছে, এইজন্য সে আমাগো কলের পানি নিতে আইছিল।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এতে সন্দেহের কি আছে? তোর দাদীজান আমাগো শত্রু নাকি?'

মনির এই কথার কোনো জবাব দিতে পারল না। তবে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মনিরকে বিদায় দিয়ে আমোদি বেগমকে ডাকলেন। আমোদি বেগমের মুখে কেমন একটা আনন্দ ঝলমল ভাব। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমি যে অসুস্থ। একবার তো খোঁজও নাও না আমোদি বেগম।'

আমোদি বেগম বললেন, 'যেই মানুষ সারাক্ষণ থাকছে রাজার লাহান, তারে প্রজার লাহান দেখতে তার শত্রুরও ভাল্লাগে না। আপনের লগে ওই বিছনায় শুইয়া মরার মতো পইড়্যা থাকন মানায় না। এইজইন্য আসি না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হাসলেন। বললেন, 'এইটাই জীবন। শুরু আর শেষ এক জায়গায়। একখান চক্করের মতো ব্যাপার। গোল চক্কর। ঘুইর‍্যা ফিইর‍্যা সেই এক জায়গা।'

আমোদি বেগম বললেন, 'আপনে আমারে ডাকছেন কেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কহন না কহন মইর‍্যা যাই, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। এইজইন্য ডাকছি। তোমার লগে আমার কিছু কথা আছে।'

আমোদি বেগম বললেন, 'কোহিনূরের বিষয়? কি মাফ চাইবেন? শেষ বিদায়ের আগে শেষ মাফ?'

আমোদি বেগমের কথায় তৈয়ব উদ্দিন খাঁর রাগ লাগার কথা। কিন্তু তার কেন যেন রাগ লাগছে না। তিনি বললেন, 'আমার জীবনের একটা বড় ভুল কি জানো?'

আমোদি বেগম বললেন,'আমারে বিবাহ করা?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'না। তোমারে আরো আগে বিবাহ না করা। আমার উচিত আছিল তোমারে আরো আগে বিবাহ করন। তাইলে তোমার

www.boighar.com

মইধ্যে এই যে এহন যেই আগুন আমি দেখতেছি, সেই আগুন আরো আগে দেখতে পাইতাম। সারাকালই আমার ম্যাদমেইদ্যা জিনিস ভাল্লাগে নাই। কিন্তু তুমি আছিলা ঠান্ডা পোতাই যাওয়া মুড়ির লাহান। মেদমেইদ্যা। গত কিছুদিন ধইর‍্যা তোমারে দেইখ্যা আমার মনে হইতেছে, তোমার পেটে আর কয়টা পোলাপান হওনের দরকার আছিল। তাইলে খাঁ বংশ রক্ষা নিয়া আমার চিন্তা করন লাগত না। কিন্তু তহন আমার সব সময় মনে হইত পোলাপান যদি আরো হয়, আর সেইগুলান যদি তোমার লাহান মেদমেইদ্যা আর বলদ হয়, তাইলে বিপদ। এই ভুলটা আমার হইছে। দুনিয়ার সব মানুষ চিনতে পারলাম, ঘরের মানুষ চিনতে পারি নাই।'

আমোদি বেগম বললেন, 'আমি আপনের ঘরের মানুষ আছিলাম?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এই কথার জবাব দিলেন না। তিনি বললেন, 'এতবছরেও কয়েকটা বিষয় আমি তোমারে বলি নাই। আজ খোলাশা করতে চাই। এক. তোমার মতো বংশের কোনো মাইয়ারে আমার বিয়া করনের কথা না। কারণ বংশের বিষয়ে সব সময়ই একটা নাক উঁচা স্বভাব আমার। তাও আমি তোমারে বিয়া করছি। এইটার একমাত্র কারণ তোমার চেহারা আর গায়ের রং। খবির আর দবিরের মায়রে বিয়া করছিলাম তার বংশ দেইখ্যা। বড় বংশ তারা। কিন্তু তার চেহারা আছিল অতি জঘন্য। আমার চেহারা সুরত, গায়ের রংও সুবিধার না। খবির দবিরের চেহারা সুরতও তেমনই হইছে। এই লইয়া আমার মনে খুব দুঃখ আছিল। আমি চাইছিলাম তোমার ঘরে আমার পোলা মাইয়া যাই হোক, চেহারা সুরত দেইখ্যাই জানি মাইনষে বলতে পারে, খাঁ-বাড়ির পোলা মাইয়া দেখতে যেন চান্দের লাহান। আমার এই কথা কেউ শুনলে হাসব। কিন্তু এইসব জিনিস আমার মইধ্যে আছে। কিন্তু তোমার চলন-বলন, হাব-ভাব আমার পছন্দ আছিল না। আমার সব সময় ডর আছিল পোলাপান হইলে না আবার তোমার হাবভাব পায়। কিন্তু কোহিনূররে দেইখ্যা আমার পরানডা জুড়াই গেল। তার হাবভাব নিয়া নানানজনে নানান কথা বলছে। কিন্তু সে আছিল আমার মনের মতো। তয় আমার ডর আছিল, তোমার আশেপাশে বেশি থাকলে সে না আবার তোমার ওইসব হাবভাব পায়। তোমার হাবভাব বদলানোর জন্য আমি নানান চেষ্টা করছি, তোমারে মাইর-ধইরও করছি। কোহিনূর ছোট আছিল, ওর সামনে বইসাও তোমারে আমি মারছি। এইটারও একটা কারণ আছিল, আমি চাইছিলাম, ও বুঝুক, তোমার ওই হাবভাব আমার কত অপছন্দ। এই কারণেই হোক, আর যেই কারণেই হোক, ও হইল একদম অন্যরকম। কারো সাথে কথা বলত না। হাসত না। অনেক উল্টাপাল্টা করত। সবাই ডরাইতো। কিন্তু আমার তার সবকিছুই ভালো লাগত।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ একটু থামলেন। একটানা কথা বলতে গিয়ে সামান্য হাঁপিয়ে উঠেছেন তিনি। তারপর বললেন, 'কিন্তু একখান বড় সমস্যা হইয়া গেল

তহন। তার তোমার প্রতি একটা মায়া জন্মাই গেল। সেই মায়া আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। কিন্তু জিনিসটা সে কাউরে ধরতে দেয় নাই। কোহিনূরের বুদ্ধি আছিল খুব। সে বুইঝা ফালাইছিল যে আমি চাই না, সে আমার চাইতে তোমারে বেশি পছন্দ করুক। সে জানত, এতে তোমার উপর আ্যর রাগ আরো বাড়ব। এইজইন্য সে তোমার ধারেই যাইত না। কোনোসময় বুঝতেই দিত না যে তোমার উপরে তার এত মায়া। সে সব সময় আমার পাশে ঘুরঘুর করত। কথা যেইটুক বলত, খালি আমার লগেই। আসলে তার উদ্দেশ্য থাকত, আমি যেন তোমার গায়ে হাত না তুলি। এই জিনিস আমি বুঝতে পারছি অনেক পরে। এই দুনিয়ায় কোহিনূরের চাইতে দামী আর কিছু আমার কাছে আছিল না। এহনও নাই। জিনিসটা আমি মাইন্যা নিতে পারি নাই আমোদি বেগম। আমার পরানডা ছারখার হইয়া গেছে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর চোহারায় একটা অস্থিরতা, একটা অসহায়ত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। এই এতবছর পরেও যে কোহিনূরের প্রতি তার সেই অনুভূতির সামান্যতমও বদল হয়নি তা যেন স্পষ্ট পাঠ করা যাচ্ছে তার মুখ দেখেই।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আর কোহিনূররে একদিনের মইধ্যে আমি বিয়া দিয়া ঢাকা পাঠাই দিছি। এই কাজ আমি কেন করছি, তা তুমি জানো। তহন কোহিনূররে অমনে পাঠাই দেওন ছাড়া আর কোনো পথ আমার সামনে খোলা আছিল না। এইদিকে কোহিনূরের সেই মাস্টার একসিডেন করছে। সে চাইছে শেষ দেহা করতে। তোমার উপর আমার যেই জইন্য রাগ, সেই মাস্টারের উপরও আমার একই কারণে রাগ। সমস্যা হইল, কোহিনূর বলল, এই বিয়া সে বসব না, সে ঢাকাও যাবে না। সে যাবে তার ছাররে দেখতে। তুমি তারে চেনো, সে যদি একবার কিছু বলে, সেইটা পাল্টানোর সাইধ্য কারো নাই। তহন জীবনে প্রথম আমি তার সাথে রাগছি। তারে বলছি, সে যদি বিয়ায় আতঙ্ক না হয়, আর সেই মুহূর্তে ঢাকায় না যায়, তাইলে এর ফল ভোগ করবা তুমি। শাস্তি পাবা তুমি। কারণ যে সর্বনাশটা ঘটছে, তার পুরা দায়ভার তোমার। তুমিই আব্দুল ফইররে খবর দিয়া আনাইছিলা। রাগে তহন আমার হাত-পা কাঁপতেছিল। কোহিনূর কিছুক্ষণ একটা কথাও বলে নাই। তারপর বলছে, আব্বা, আপনে মায়ের গায়ে আর কোনোদিন হাত দিবেন না। আমি অমল ছাররে ছাড়ছি, লেখা ছাড়ছি, এহন মায়রেও ছাড়লাম। এইসব কিছুই ছাড়ছি আপনের জইন্য। তয় এইজইন্য আপনেরেও একটা জিনিস ছাড়তে হইব। সেইটা হইছে আমি। এই জীবনে আপনে আর আমারে দেখবেন না। এইটা আপনের শাস্তি। আপনে সেই ছোড থেইক্যা মায়রতন আমারে দূরে রাখছেন, আমারতনও অনেক কিছু দূরে রাখছেন। আমি জানি, আপনে আমারে কত পছন্দ করেন। এইজন্যই এই শাস্তিটা আপনেরে আমি দিব। প্রিয় জিনিস দূরে

www.boighar.com

সরাই রাখনের শাস্তি। এই শাস্তির চেয়ে বড় শাস্তি আর দুনিয়ায় নাই। সেই শাস্তিটা আপনেরে আমি দিব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ থামলেন। যেন বুকের ভেতর বয়ে চলা তুমুল জলোচ্ছ্বাসের বিশাল ভাঙন থেকে তিনি নিজেকে সামলালেন। তারপর বললেন, সে আছিল আমার কইলজার টুকরা। আমরা কইলজাডা পুইড়্যা ছারখার হইয়া গেছে আমোদি বেগম। তোমরা দেহো পঁচিশটা বছর কাটছে, আমি দেহি, আমি কাটাইছি পঁচিশ হাজার বছর।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ শেষের দিকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাতে আমোদি বেগম বিচলিত হলেন বলে মনে হলো না। তিনি বললেন, 'আপনে যে সারাজীবন খামখেয়ালি কইরা গেছেন, এইটা আপনে বোঝেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বলেন, 'বুঝি আমোদি বেগম। বুঝি। আমি অনেক কিছুই বুঝি। কিন্তু তোমরা বোঝো না। এই দুনিয়ায় সবচাইতে বড় কষ্ট কি জানো? ভালোবাসা না পাওনের কষ্ট। আমারে মাইনষে সম্মান করে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে, মাইন্য গইন্য করে। কিন্তু ভালোবাসে না। এইসব করে ডরে। আমারে মানুষ ডরায়। সামনে বইস্যা সালাম দেয়। কিন্তু পিছে গিয়া মনে মনে গালি দেয়। তারা ভাবে সেই গালি আমি শুনি না। কিন্তু আমি শুনি আমোদি বেগম। তাগো চেহারা দেখলেই আমি বুঝি। কেউ আমারে ভালোবাসে নাই আমোদি বেগম। পছন্দ করে নাই। এইটার যে কি কষ্ট!'

আমোদি বেগম বললেন, 'মানুষ যে আপনেরে ভালোবাসব, পছন্দ করব, সেইটার জইন্য যা করন লাগে, তাকি আপনে কোনো দিন করছেন? আপনে আপনের উদ্দেশ্য হাসিলের জইন্য সব সময় গায়ের জোর খাটাইছেন। ডর দেহাইছেন। তো মানুষ তারপরও আপনেরে ভালোবাসব? কোনোদিন কোনো মাইনষের লগে উদ্দেশ্য ছাড়াই দুইডা ভালো কথা বলছেন? দুইডা নরম কথা বলছেন?'

www.boighar.com

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হঠাৎ অসহায়ের মতো বলে উঠলেন, 'আমি চেষ্টা করছি আমোদি বেগম। খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু পারি নাই। এইডা আমার দোষ না আমোদি বেগম। আল্লায় আমারে এইরম কইর‍্যা বানাইছে।'

আমোদি বেগম বললেন, 'আল্লায় কাউরে খারাপ মানুষ কইরা দুনিয়াতে পাঠায় না। মানুষ নিজে নিজে খারাপ হয়। একটা সময় আর বোঝে না, কেমনে হইল। সেইটা থেইক্যা আর বাইরও হইতে পারে না। অভ্যাস হইয়া যায়। আরেকখান কথা কি জানেন, কেউ যদি সব সময় খালি মনে করে যে সে যেইটা চাইব, সেইটা যেমনেই হোক তার পাইতেই হইব। তাতে অন্য একজনের ক্ষতি হইলেও, অন্য কেউ ঠকলেও, কষ্ট পাইলেও, তাইলে আপনেই বলেন, তহন আর মানুষ তারে কেমনে পছন্দ করব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই আমোদি বেগম বললেন, 'এই যে ফজুর বাপ বজু, বজলু ব্যাপারী। তারে আপনে খুন করলেন। ভুলে করছেন, বা যেই কারণেই করছেন, খুনডা তো আপনে করছেন। তারপর আপনের দায়িত্ব আছিল কি? তার পোলাপানগুলানের দায়িত্ব নেওন। তাগো সাহায্য করন। তাগো কাছে মাফ চাওন। যেই ক্ষতি আপনে করছেন, তার কোনো পূরণ আছে? নাই। কিন্তু আপনে কি করলেন? উল্টা তাগো জমিজমা দখল করলেন। একদম পথের ভিখারি কইরা ছাড়লেন। এহন তারা আপনের নামে পূজা দিব? নাকি অভিশাপ দিব? গালি দিব? সামনে পারে না আপনের ডরে, কিন্তু পিছনে তো ঘেন্না করতে পারে, মনে মনে দুইডা গালি দিয়া ঝাল মিটাইতে পারে। কি, পারে না?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হঠাৎ করেই যেন আবার শক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ও। তুমি তাইলে এই জইন্যই তলে তলে তাগো লগে আছ? তাগো জমিন ফিরাইয়া দেওনের তালে আছ?'

আমোদি বেগম বললেন, 'সেই ক্ষমতা থাকলে বহু আগেই দিতাম। কিন্তু আল্লাহয় সেই ক্ষমতা আমারে দেয় নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'শোনো আমোদি বেগম। দুনিয়া হইল যুদ্ধের ময়দান। এইহানে যে যুদ্ধ কইরা টিক্যা থাকতে পারব, সে বাঁচব। যে পারব না। সে বাঁচব না, এইটাই দুনিয়ার নিয়ম। এইহানে কেউ কাউরে মাথায় তুইল্যা বাঁচাইব না।'

আমোদি বেগম বললেন, 'আপনে আর কিছু বলবেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'শুনলাম, তোমার লগে নাকি আইজকাইল সালেহার লগে খুব মাখামাখি? ঘটনা কি? সে নাকি নিয়মিত আমাগো বাড়ি আসে?'

আমোদি বেগম বললেন, 'নিয়মিত আসে না। ফরাজিগো চাপকল নষ্ট হইছিল, তহন দুইদিন পানি নিতে আইছিল। ঠিক হইয়া যাওনের পর আর আসে নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তুমি কি জানো যে আমি জীবনে কহনো হারি নাই? এই শেষ মুহূর্তে আইস্যা তুমি আমারে হারাইতে চাও?'

আমোদি বেগম বললেন, 'কোনটা হারন আর কোনটা জেতন সেইটা আপনে জানেন? আমি কি বলি শোনেন, আপনে জীবনে কোনোদিন কোনোকিছু জেততেই পারেন নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হেসে বললেন, 'কি জিতি নাই আমি? এই খাঁ বংশ যে আইজকের খাঁ বংশ এইটা দুনিয়ার লোক জানে, এইটা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর বংশ। সে এইটা নিজের হাতে গড়ছে।'

www.boighar.com

আমোদি বগেম বললেন, 'এই খাঁ বংশ একদিন থাকব না। আইজ হোক আর কাইল। এইহানে অন্য কোনো বংশ আসব। দফাদাররা যেমন এককালে আছিল, ব্যাপারীরা আছিল, এহন খাঁয় রা। এরপর অন্য কেউ। কিন্তু আসবই। কেউ চিরকাল থাহে না বড় খাঁ সাব। থাহে মাইনষের কাম আর নাম। যে যেমন কাম করছে, তার তেমন নাম থাহে। এই নাম থাহে মাইনষের মনে মনে। সেই মনটাই তো আপনে জিততে পারেন নাই। ধরেন আইজ কোনোবাড়িতে একটা সন্তান হইছে। যেদিন থেইক্যা ওই সন্তান ঘর থেইক্যা বাইর হইব, বুঝতে শিখব, সেইদিন থেইক্যাই তার বাপ-মা আপনেরে দেখাইয়া বলব, ওইটা হইল তৈয়ব উদ্দিন খাঁ, এর চাইতে খারাপ মানুষ আর এই দুনিয়ায় নাই। তারপর তার সাথে আপনে কি করছেন, অন্য একজনের লগে কি করছেন, কার উপর কত অন্যায় করছেন, সেইসব সে তার মনে ঢুকাইয়া দিব। বলব, ওই যে বড় খাঁ-বাড়িটা দেখেতেছ, ওইটা হইল আমাগো সবাইরে জুলুম কইরা, ঠকাইয়া বানাইন্যা। এই গল্প সেই ছেলে বড় হইয়া তার ছেলেরে বলব। এইভাবে চলতেই থাকব। এইহানেই তো আপনে হাইরা গেছেন। এর চাইতে বড় হার আর কিছু আছে কন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমোদি বেগমের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি কি বলবেন বুঝতে পারছেন না। তিনি কি সত্যি সত্যিই হেরে গিয়েছেন? তিনি তো বেঁচেই থাকতে চেয়েছিলেন। খাঁ-বাড়ির প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে মৃত্যুর পরও দীর্ঘ সময় তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তার সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে, তিনি হয়তো তার মৃত্যুর পরও দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকবেন। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা হবে পরাজিতের বেঁচে থাকা। হেরে গিয়ে বেঁচে থাকা।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, তার হেরে যাওয়া তো শুরু হয়ে গেছে! আর তা শুরু হয়ে গেছে একদম তার ঘর থেকেই। এই যে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমোদি বেগম, যাকে তিনি কখনো কোনোদিন সামান্যতম মূল্যও দেননি, বিন্দুমাত্র গুরুত্বও দেননি। সব সময় ভেবেছেন ছোটবংশের অভব্য আচরণের এক নিকৃষ্টতম প্রাণী, সেই আমোদি বেগমও যেন আজ এসে নতুন রূপে ধরা দিয়েছেন তার কাছে। এই নতুন আমোদি বেগম যেন সবদিক থেকেই তার চেয়ে ঢের বেশি উৎকৃষ্ট এক মানুষ।

এই নতুন আমোদি বেগমকে দেখে তার মধ্যে একধরনের হীনমন্যতাবোধ তৈরি হয়েছে। মনুষ্যত্ববোধহীনতার হীনমন্যতা। এই হীনমন্যতার চেয়ে বড় হার আর কি আছে!

রাহাতের সাথে হেমার বহুদিন দেখা নেই, কথা নেই। হেমার ধারণা ছিল রাহাত তাকে কখনো ফোন দিলো কি দিলো না, খবর নিলো কি নিলো না, এই নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু কদিন থেকেই তার মনে হচ্ছে, বিষয়টা আসলে তেমন না। বরং রাহাত তার কাছে একটা অভ্যাসের মতো হয়ে গিয়েছিল, আর সম্ভবত সেজন্যই রাহাতকে সে কখনোই আলাদা করে অনুভব করেনি। কিন্তু রাহাতের এমন হুট করেই অনভ্যাস হয়ে যাওয়াটাকে মেনে নিতেও যেন কিছু কষ্ট হচ্ছিল তার।

গত কয়েকটা দিন খুব অস্থিরতায় কাটছে হেমার। নিজের ভেতর নানান দ্বিধা, নানান প্রশ্ন, নানান সঙ্কট। হেমার ধারণা ছিল নিজের উপর বেশ ভালো নিয়ন্ত্রণ আছে তার। কিন্তু এবার যেন নিজেকে কিছুতেই বশে আনতে পারছে না। শুধু তা-ই না। মাথার ভেতর এলোমেলা হয়ে জট পাকিয়ে থাকা অসংখ্য ভাবনাগুলো আলাদাও করতে পারছে না। আজ সকালে ঘুম ভেঙেই হেমার মনে হলো, রাহাতের সাথে কথা বলতে পারলে হয়তো কিছুটা হলেও ভালো লাগবে তার। আচ্ছা রাহাতকে একটা ফোন দিলে কেমন হয়? খানিক দ্বিধা নিয়েই রাহাতকে ফোন দিলো সে। কিন্তু রাহাত ফোন ধরল না। সম্ভবত ঘুমুচ্ছে সে। ঘুম থেকে উঠে নিশ্চয়ই রাহাত ফোন ব্যাক করবে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে শীতের বিকেল নেমে এলো। রাহাতের ফোন তবু এলো না। বিকেলে আরেকবার ফোন করল হেমা। কিন্তু ধরল না রাহাত। ধরল না সন্ধ্যায়ও। হেমার কেমন অস্থির লাগতে লাগল। বিষয়টাকে পাত্তা না দেয়ার চেষ্টা করল হেমা, কিন্তু পারল না। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা বাড়তেই লাগল। সন্ধ্যার পর আরো বেশ কয়েকবার ফোন দিলো সে। কিন্তু রাহাতের খবর নেই। হেমার এবার মন খারাপ হয়ে গেল।

রাহাত তাকে ফোন দিলো রাত বারোটার পর। হেমার কেমন একটা অভিমান জমেছিল বুকে। সে ধরবে না ধরবে না করেও শেষে ধরে ফেলল

ফোনটা। রাহাত ঝলমলে গলায় বলল, 'কিরে, কাজী অফিসে পালিয়ে বিয়ে করছিস নাকি। সাক্ষী দিতে হবে?'

হেমা অবাক হলো। সে বলল, 'বুঝলাম না'।

রাহাত বলল, 'না। আমাকে তুই এই প্রথম এতবার ফোন করেছিস! দেখে মনে হলো ওরকম কোনো জরুরি কিছু।'

হেমা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ধ্যাৎ। অনেকদিন তোর কোনো খবর নেই এইজন্য। কই ছিলি?'

রাহাত বলল, 'নতুন অ্যালবাম করছি। সারারাত-সারাদিন একটানা স্টুডিওতে।'

হেমা বলল, 'বাহ্! তুই তো বেশ আছিস। এনিওয়ে, কনগ্র্যাটস।'

রাহাত বলল, 'তোর কি হয়েছে বল তো? গলাটা এমন লাগছে কেন?'

হেমা বলল, 'কই কিছু না তো!'

রাহাত বলল, 'আমাকে লুকাস? পারবি? চাইলে হেমার মনস্তত্ত্ব নামে আস্ত একটা বই লিখে ফেলতে পারি। তোর ব্যাড লাক, আমাকে রিফিউজ করে ফেললি। রাহাতের চেয়ে ভালো আর কেউ তোকে বুঝবে না রে। হা হা হা।'

www.boighar.com

রাহাত হাসছে। প্রাণবন্ত হাসি। সেই হাসি শুনে হেমার যে খারাপ লাগছে তা নয়, তবে কোথায় যেন সামান্য হলেও একটা শূন্যতা রিনরিন করে বেজে গেল। হেমা বলল, 'তুই আমাকে বুঝতে পারিস?'

রাহাত কবিতার মতো করে বলল, 'তার ভাষা লেখা নাই বলে, শেখা হলো পর-লিপি পাঠ, বহুপথ ঘুরে এসে দেখি, সে আমার স্বরলিপি মাঠ'।

হেমা বলল, 'বুঝলাম না'।

রাহাত বলল, 'তোর বুঝতে হবে না। যত কম বোঝা যায়, তত ভালো। বেশি বুঝলেই বিপদ। কী হয়েছে বল। নয়ন ভাইকে নিয়ে কোনো ঝামেলা?'

হেমা বলল, 'না'।

রাহাত বলল, 'তাহলে?'

হেমা বলল, 'তোকে ওইদিন বলেছিলাম, খেয়াল করিসনি বোধহয়। বাবা-মায়ের ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে।'

রাহাত বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো! আমি এত ব্যস্ত ছিলাম ক'টা দিন। ভুলেই গেছিলাম। আচ্ছা কি হয়েছে বল তো?'

হেমা ঘটনা যতটা সম্ভব খুলে বলল। শুনে রাহাত তরল গলায় বলল, 'তা তোর বাবার বিয়েতে আমাকে একটু গান গাওয়ার ব্যবস্থা করে দে না প্লিজ? হাজার কুড়ি টাকা দিলেই হবে। অ্যালবামটা বের করতে গিয়ে ফতুর হবার মতো অবস্থা। এখন তো কেউ আর আমায় স্পন্সর করবে না।'

হেমা বলল, 'এ কদিনেই দেখি সিরিয়াস বিষয় নিয়েও ফান করার একটা বদ অভ্যাস তোর হয়ে গেছে।'

রাহাত বলল, 'তা না। নিজেকে বুঝিয়েছি, যা হবার তা এমনিই হবে। আর যা না হবার, তা কখনোই হবে না। শত চেষ্টাতেও না। এইজন্য টেনশন করা ছেড়ে দিয়েছি।'

হেমা বলল, 'এখন ভালো আছিস?'

রাহাত বলল, 'বেশ ভালো। এই তোর জন্য মাঝে-মধ্যে বুকের ভেতর একটা চিনচিনে ব্যথা হয়। মনে হয় ফোন দিয়ে বলি, তোর যে অফ হোয়াইট শাড়িটা আছে না, ওটা পরে একটু বের হ। রিকশায় ঢাকা শহরটা একটু চক্কর মেরে আসি। অবশ্য সাথে সাথেই নিজের মাথার পিছে চাটি মেরে নিজেকে বলি, আরে ব্যাটা বদের বদ, অন্যের বউয়ের সাথে লটরপটরের ইচ্ছে যে করছ, এই দিন কিন্তু দিন নয় বাবা। একদিন তোমারও বউ হবে। অন্য কারো কিন্তু তখন তাকে নিয়েও রিকশায় হুড নামিয়ে চক্কর দিতে ইচ্ছে করবে।'

রাহাত আবারো হাসছে। হেমা বলল, 'তুই যে ভালো আছিস এটা খুব বোঝা যাচ্ছে। ভালো থাকার একটা সুবিধা কি জানিস, অন্যের কষ্টও স্পর্শ করে না।'

রাহাত বলল, 'এটা তো তোর মতো কথা হলো না হেমা। তোকে তো আমার সব সময় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মনে হতো রে। যে যুদ্ধের মধ্যেও নিজের কথা ভুলে হাসিমুখে অন্যের সেবা করে যাবে।'

হেমা বলল, 'কষ্ট হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার, যা সবার থাকে। কিন্তু সবারটা দেখা যায় না। আর আনন্দ হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার, যা সবার নেই, কিন্তু তারপরও সবারটাই দেখা যায়।'

রাহাত বলল, 'ব্বাপস! কি কথারে বাবা। মাথার উপর দিয়ে গেল। বুঝিয়ে বল তো।'

হেমা বলল, 'বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। সিম্পল। ধর কোনো কারণে আমার অনেক মন খারাপ। কিন্তু সেটি নানা কারণে আমি প্রকাশ করতে পারব না। যেখানে-সেখানে বসে কাঁদতে পারব না। মন খারাপ করে থাকতে পারব না। সেটার জন্য আমাকে আমার ঘরে আসতে হবে। নির্জন কোথাও যেতে হবে। কিন্তু আমার সেই প্রচণ্ড মন খারাপ নিয়েও কোনো কারণে আমার মুখটা হাসি হাসি হলো, বা হেসে ফেললাম, ওই হাসিটা কিন্তু কোনোভাবেই আমার আনন্দ প্রকাশের হাসি নয়। কিন্তু যারা দেখবে তারা ভাববে, বাহ্, মানুষটা কত ভালো আছে। আনন্দে আছে। অথচ আনন্দটা কিন্তু আমার নেই।'

রাহাত বলল, 'ওয়েল। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। আঙ্কেল আন্টির এখন কী অবস্থা?'

হেমা বলল, 'মা আলাদা বাসা নিয়েছে। আমিও আপাতত সেখানে থাকছি। যদিও গতকাল আবার আগের বাসায় এসেছিলাম। তারপর আর ফিরতে ইচ্ছে করল না। রাতটা তাই এখানেই থেকে গেছি। এখনও এখানেই আছি। মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য মনে হচ্ছিল ডিভোর্সটা বোধহয় ঠেকিয়ে দিতে পারব। কিন্তু বাবার সাথে গতকাল আবার কথা হলো, মার রিসেন্ট কিছু আচরণে প্রচণ্ড ক্ষেপে গেছেন বাবা।'

রাহাত বলল, 'কি বলেছেন আঙ্কেল?'

হেমা বলল, 'বাবা বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাকে নোটিশ পাঠাবেন তিনি।'

রাহাত বলল, 'কোনোভাবেই ঠেকানো যায় না?'

হেমা বলল, 'এখন আর মনে হচ্ছে না'।

রাহাত বলল, 'এক কাজ কর। তুই উনাদের বল, তুই নয়ন ভাইকে শীঘ্রই বিয়ে করবি। যেহেতু তোর বিয়ে। সুতরাং তোর বিয়ের আগে উনাদের ডিভোর্স হলে এটার একটা বাজে ইমপ্যাক্ট পড়বে তোর বিয়ের উপর। তাই তাদের উচিত ঘটনাটা বিয়ের পরে ঘটানো। তারপর দেখবি আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর বিয়ে তো এখনই হচ্ছে না। ধর বছরখানেক কাটিয়ে দিলি। এরমধ্যে চেষ্টা করবি দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা গ্রো করানোর। ধর বিয়ের শপিং করার জন্য বাবা-মাকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে যেতে পারিস। এই সময়টা দেখবি দুজন একসাথে সময় কাটানোর একটা সুযোগ পাবে। তারপর ধর মেয়ের বিয়ের আয়োজন, নানান প্রিপারেশন, কেনাকাটা, আরো হাজারটা কাজ। দুজন না চাইলেও মিলে-মিশে করতে হবে। তারপর বিয়েটা হয়ে গেলেও তোর নতুন সংসার। খুব স্বাভাবিক, তখন চাইলেই হুট করে তারা ডিভোর্সটা নিবেন না। কারণ তোর নতুন সংসারে এর একটা ইমপ্যাক্ট পড়তে পারে, তাই না? সো, আই থিঙ্ক, ইট উইল বি আ গুড প্ল্যান। এফিসিয়েন্ট অ্যাজ ওয়েল।'

রাহাত কথা শেষ করলেও হেমা কিছু বলল না। সে চুপ করে রইল দীর্ঘ সময়। রাহাতের কথাগুলো শোনার সময় তার কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। অনুভূতিটা বিয়ে সংক্রান্ত। হেমা কখনোই তার বিয়ে নিয়ে এভাবে ভাবেনি। আজ প্রথম এক ঝলকের মতো সেই ভাবনাটা উঁকি দিয়ে গেল। মুহূর্তের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য হলেও রাহাতের কথাগুলো শুনতে গিয়ে হেমার কেমন একটা অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি হচ্ছিল। তার অবচেতন কল্পনায় কিছুক্ষণের জন্য কিছু ছবি ভেসে উঠেও আবার মিলিয়ে গেল।

হেমার এখন মনে হচ্ছে রাহাতের বুদ্ধিটা ভালো। সে যদি এখন বাবা-মাকে তার বিয়ের কথা বলে, তাহলে নিশ্চিত করেই তারা তাদের ডিভোর্সটা নিয়ে এই মুহূর্তে আর কোনো কথা বলবেন না। কিন্তু হেমা এটি কখনোই করবে

না। সে চায় না কোনো কৌশল করে তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছেটাকে আটকে রাখতে। তারা থাকলে কেবল পরস্পরকে অনুভব করে, ভালোবেসেই যেন থাকে।

রাহাতের শেষ কথাটায় তার বিয়ের কথা আছে বলেই কিনা কে জানে, হেমার একটা অস্বস্তিও হতে লাগল। অস্বস্তিটা নয়নকে নিয়ে। সেদিন চলে যাবার পর নয়নের সাথে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি হেমার। সে জানে না কেন, তার আর ফোন দিতেও ইচ্ছে হয়নি নয়নকে। বিষয়টা ঠিক তার বোঝাপড়ার সাথে যায় না। কিন্তু সেদিন নয়ন যাওয়ার পর পরই হেমা একা বসেছিল তার ঘরে। সারাটা দিন যেন স্তব্ধ হয়েছিল। তার তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না যে খানিক আগে যে কথাগুলো নয়ন তাকে বলেছিল, সেই কথাগুলো আসলেই সত্যি। তার বারবার কেবল মনে হচ্ছিল এটি বাস্তবের কোনো ঘটনা নয়। বরং সে নানান বিষয় নিয়ে এলোমেলো বলে এগুলো তার বিধ্বস্ত ও উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কষ্টপ্রসূত কল্পনা।

হেমার আর কথা বলতে ভালো লাগছিল না। সে ফোনটা রেখে দিলো। কিন্তু ফোন রাখার পরপরই আবার সেই চিন্তা, এখন কি করবে সে? এই প্রশ্নটা হেমা নিজেকে অসংখ্যবার করেছে। হেমা যে জানে না এখন তার কি করা উচিত, তা নয়। তার এখন নয়নের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। শক্ত করে নয়নের হাতখানা ধরা উচিত। এ সবই হেমা জানে। কিন্তু কি যেন একটা তার সকল ভাবনাকে আটকে দিচ্ছে, এলোমেলো করে দিচ্ছে। নিজেকে প্রচণ্ড সংকীর্ণমনা মনে হচ্ছে তার। এতদিন নিজেকে নিয়ে একটা চাপা গর্ব তার ছিল যে সে যুক্তি দিয়ে ভাবতে জানে। সে মানুষ হিসেবে অনুদার নয়। তার চিন্তার দরজা জানালাগুলো বন্ধ নয়। কিন্তু এই প্রথম তার নিজেকে প্রচণ্ডরকম সংকীর্ণ এবং অনুদার মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবকিছু জেনে বুঝেও সে একটা নির্দিষ্ট সংস্কার থেকে বের হতে পারছে না।

এই সংস্কারটা অনেকটা গলায় আটকে থাকা মাছের চোরা কাঁটার মতো। এমনিতে যার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ঢোক গিলতে গেলেই একদম সূঁচ হয়ে ফোটে। অনুভূতিটার জন্য হেমার মধ্যে একটা প্রবল অপরাধবোধও কাজ করছিল। সেই অরাধবোধ থেকেই কিনা, সেদিন সন্ধ্যায় সে শেষ অবধি নয়নকে ফোনও দিয়েছিল। কিন্তু নয়নের ফোন অফ। এই ফোন অফ নিয়েও হেমা তার নিজের ভেতর একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করল। সে মনে মনে খুব করে চাইছিল, নয়ন যেন ফোনটা না ধরে। কিংবা নয়নের ফোনটা যেন অফ থাকে। তাহলে? তাহলে সে ফোন কেন দিলো? দায় সারবার জন্য? নিজের কাছে নিজেকে পরিষ্কার প্রমাণ করবার জন্য?

www.boighar.com

হেমা সেইরাতে ঘুমায়নি। ঘুমায়নি পরের দু'রাতও। তবে এর মধ্যে নয়নকে আরো বারকয় সে ফোন দিয়েছিল। কিন্তু নয়নের ফোন আর খোলেনি। নয়নকে নিয়ে কোনো অস্থিরতা যে তার মধ্যে কাজ করছে না, তা নয়। কিন্তু সেটি এতটাও প্রবল নয় যে যতটা প্রবল হলে সে নয়নের খবর নেয়ার জন্য নয়নের বাসা অবধি ছুটে যেতে পারত। আজ যে সে রাহাতকে ফোন দিয়েছিল, তাও ওই নয়নের জন্য লাগা তার অস্থিরতাটার জন্যই। কিন্তু ঘটনাটা সে কোনোমতেই রাহাতকে বলতে পারছিল না। এই বিষয়টিই আসল। এই ঘটনাটি সত্যিকার অর্থেই জনে জনে বলে বেড়ানোর ব্যপার নয়। www.boighar.com

কতক্ষণ একা বসেছিল হেমা জানে না। রাহাতের ফোনে ঘোর কাটল তার। ফোন ধরতেই রাহাত বলল, 'খুব মন খারাপ তোর?'

হেমা কথা বলল না। রাহাত বলল, 'মন খারাপের কারণটা বলবি?'

হেমা বলল, 'বলেছি তো!'

রাহাত বলল, 'আসল কারণটা বলিসনি। এতদিনে তোকে আমি এইটুকু চিনি না বলতে চাস? আচ্ছা না বলতে চাইলেও ক্ষতি নেই। কেবল মান খারাপ করে থাকিস না।'

হেমা হাসল, 'যদি চাইলেই মন খারাপ না করে থাকা যেত, তাহলে কত সহজ হতো সবকিছু তাই না?'

রাহাত বলল, 'সহজ না, আরো কঠিন হয়ে যেত। ধর তোর খুব কাছের, খুব প্রিয় কোনো মানুষ খুব খারাপ একটা সময় কাটাচ্ছে। তার সেই খারাপ সময়টা নিয়ে তোর কষ্ট হচ্ছে, মন খারাপ হচ্ছে। এখন যদি এমন হতো যে তুই দুম করে সেই মন খারাপটা খেদিয়ে দিতে পারলি। তখন কি হবে বল তো? তখন তুই তার কষ্টটা আর বুঝতে পারবি না। ফলে তোকে যখন তার সবচেয়ে বেশি দরকার, তখন তোর তাকে মনে হবে সবচেয়ে বেশি অদরকারি। কোনো সম্পর্কের জন্য এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?'

রাহাতের কথায় থমকে গেল হেমা। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আচ্ছা, রাহাত কি তার ভেতরটা দেখতে পায়? এমন সহজ করে, এমন স্পষ্টতায় সে তাকে পড়ে ফেলে কীভাবে?

রাহাত বলল, 'আমি জানি না কি হয়েছে। তবে নিশ্চিত করেই নয়ন ভাই সম্পর্কিত কিছু। একটা কথা বলি, শেষ কিছুদিন তাকে যেভাবে দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে মানুষটা অসম্ভব খারাপ একটা সময় পার করছে। এ সময় কোনো কিছু নিয়ে তার উপর অভিমান, কষ্ট-ক্ষোভ হলেও তা দেখাস না। তার সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা কর। তুই ছাড়া সে যে কতটা অসহায় বুঝিস?'

হেমা কথা বলল না। কিন্তু তার বুকের ভেতর কি এক তোলপাড় শুরু হয়েছে। রাহাত বলল, 'তোকে কখনো একটা কথা বলা হয়নি। আজ বলছি।

পৃথিবীর সকল মেয়েই মা হতে জন্মায়। এইজন্যই আল্লাহ তাদের এমন অসাধারণ কিছু বিষয় দিয়েছেন, যা পুরুষকে দেননি। ধর, তুই অসুস্থ হলি, তোর সবার আগে মনে পড়বে তোর মায়ের কথা। মায়ের শরীরের ঘ্রাণের কথা, আঁচলের স্পর্শের কথা, কিন্তু বাবার কথা না। এমন নয় যে তোর বাবা তোকে তোর মায়ের চেয়ে কম ভালোবাসেন। কিন্তু মায়েদের কি যেন একটা আছে। একটু স্পর্শ, একটু ঘ্রাণ, একটু মমতা, সবকিছু নিমেষেই ঠিক করে দেয়। তোকে যেটা কখনো বলা হয়নি সেটা হলো বেশিরভাগ মেয়েরাই তাদের সন্তান হবার পরে তারা মা হয়ে ওঠে। কিন্তু খুব কম কিছু মেয়ে আছে যারা তার নিজের জন্মের পরপরই মা হয়ে যায়। সেই এতটুকুন বয়সেই তাদের কথায়, স্পর্শে, ঘ্রাণে একদম ওই মা মা ব্যাপারটা থাকে। তারা যেখানে যায়, সেখানটা একটা অদ্ভুত ভালোলাগায় ভরে যায়। তুই সেই খুব অল্প কিছু মেয়েদের একজন। তোর মধ্যে একটা প্রবল মা মা ব্যাপার আছে। তুই যখন আমার কাছে থাকিস, আমার এত শান্তি লাগে। এত নির্ভার লাগে। মনে হয় কোনো চিন্তা নেই, কোনো ভয় নেই, কোনো অশান্তি নেই। এটা কেবল আর তখন হয়, যখন মার গায়ের সাথে লেপ্টে থাকি। আর কখনোই না। অদ্ভুত না?'

হেমা কথা বলতে পারল না। তার গলার ভেতর কি জানি দলা পাকিয়ে উঠছে। সে সেটিকে আটকে রাখতে চেষ্টা করছে। শেষ অবধি পারবে কিনা কে জানে! রাহাত বলল, 'নয়ন ভাইয়ের কাছে তুই ঠিক এরকম একটা মানুষ। কিংবা কে জানে, হয়তো এর চেয়েও বড় কিছু। উনি অন্তর্মুখি স্বভাবের বলে হয়তো তোকে কখনো আমার মতো করে বলেননি। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় আশ্রয়ের জায়গাটা তুই। সবচেয়ে বড় ছায়া। তুই না থাকলে তিনি পুরোপুরি অসহায় একজন মানুষ তিনি।'

হেমা কি বলবে! সে বলার জন্য কত কত শব্দ, কত কত বাক্য যে পাগলের মতো আতিপাতি করে খুঁজে বেড়ালো। কিন্তু পেল না।

রাহাত বলল, 'উনার সাথে কিছু হলেও, এটলিস্ট এই মুহূর্তে উনার থেকে দূরে সরে থাকিস না। কিছু মুহূর্ত থাকে নিজের কষ্ট, অভিমান, দুঃখগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে হলেও প্রিয় মানুষটার পাশে থাকতে হয়। শক্ত করে তার হাত ধরতে হয়।'

হেমা হঠাৎ ভেঙে পড়ল। এমন করে ভেঙে পড়ার মানুষ সে নয়। কিন্তু এই এতদিনে কত কত ক্ষত, কত কত কষ্ট, কত কত ভাবনা যে সে তার বুকের ভেতর সযতনে আড়াল করে রেখেছিল, তা কেবল সে নিজে জানে। সেগুলো জমে জমে বুকের ভেতর যেন আস্ত এক হিমালয় হয়েছিল। রাহাত যেন তার কথার ওমে সেই হিমালয় গলিয়ে দিলো।

www.boighar.com

রাহাত ফোন কানে চেপে ধরে চুপ করে রইল। হেমা দীর্ঘ সময় পর বলল, 'আমি ভালো মানুষ নই রাহাত। মানুষ কখনোই নিজেকে পুরোপুরি চিনতে পারে না। কোনো একটা বিশেষ ঘটনায়, কোনো একটা বিশেষ মুহূর্তে তার আজন্ম চেনা নিজটাও হয়ে যেতে পারে অচেনা। এতদিন ধরে সে তার নিজের সম্পর্কে যা ভেবেছে, তা এক নিমেষেই ভুল প্রমাণিত হতে পারে। আমি আমার নিজেকে এতদিন চিনতে পারিনি রাহাত। আমি একটা ভুল মানুষ। তোরা আমার আসল ভেতরটা দেখতে পাস না বলে আমাকে এত ভালো ভাবিস। কিন্তু আমি অত ভালো কেউ নই। আমি প্রচণ্ড স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক আর সংকীর্ণমনা একজন মানুষ!'

রাহাত বলল, 'একটা ঘটনা দিয়েই তো একজন মানুষকে পুরোপুরি বিচার করা যায় না। তবে ভুল করা অপরাধ না হেমা, অপরাধ সেই ভুলের জন্য অনুশোচনা না হওয়া। অপরাধবোধ না হওয়া।'

হেমা বলল, 'অপরাধবোধে কি কিছু বদলায় রাহাত?'

রাহাত বলল, 'বদলায়'।

হেমা বলল, 'কি বদলায়?'

রাহাত বলল, 'মানুষটা সেই একই ভুল আর করবে না।'

হেমা বলল, 'কিন্তু সেই ভুলটা করবার সুযোগ যদি ওই একবারই থাকে?'

রাহাত বলল, 'তাহলে অন্য কোনো ভুল করবার আগে সেই ভুলটার কথা তার মনে পড়বে। সে চেষ্টা করবে যতটা সম্ভব ওটার অপরাধবোধটা মনে রাখতে।'

হেমা আবার চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কোনো একটা কিছু যদি মেনে নিতে চেয়েও, মেনে নেয়ার চেষ্টা করেও মেনে নিতে না পারি, সেটা কি দোষ রাহাত?'

রাহাত বলল, 'আমরা কি সব সময় কেবল মনের কথাই শুনি? না শোনা উচিত? আমাদের কিছু বোধের জায়গা, কিছু দায়বদ্ধতার জায়গা থাকে না? না হলে কি এই এত এত সম্পর্ক টিকত? কেউ কাউকে মেনে নিতে না পেরেই যদি হুট করে সরে যেত, তাহলে যে তার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার পতন কে রোধ করত?'

হেমা বলল, 'কিন্তু যদি দ্বিধা থেকেই যায়? যদি মন খচখচ করে? তাহলে কি সেই দ্বিধা নিয়ে একটা দীর্ঘ জীবন শুরু করা উচিত?'

রাহাত বলল, 'নিশ্চয়ই না। তবে দ্বিধার কারণটা কতটা যৌক্তিক সেটা ভেবে দেখা উচিত। একটা সম্পর্ক যেমন এমনি এমনি করে হয় না। তার শেষটাও না। সময় দরকার। আমি জানি না, নয়ন ভাইয়ের সাথে তোর এমন কি হয়েছে? তবে এইটুকু জানিস, সিদ্ধান্ত যাই হোক, সেটা এখনই নিস না।

উনাকে উনার এই খারাপ সময়টা থেকে বের হতে দে। খারাপ সময়ে কাউকে ফেলে চলে যাওয়ার মতো জঘন্য কিছু আর নেই।'

হেমা আবার চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎই বলল, 'তোকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে রাহাত। আমার খুব খারাপ সময় যাচ্ছে, খুব। আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। একজন দুর্বল মানুষ অন্য একজন দুর্বল মানুষকে ধরে রাখতে পারে না। সবল করতে পারে না। আমাকে শক্ত হতে হবে। অনেক শক্ত। তুই আমাকে একটু সময় দিবি? আমি তোর সাথে কিছুটা সময় কাটাতে চাই। আমার কিছু শক্তি দরকার।'

রাহাত বলল, ' দেব না কেন? অবশ্যই দেব।'

হেমা বলল, কিন্তু এখনো তো ফজরের আজানই হয়নি। সকাল হতে তো সেই কত দেরী! ফজরের আজানের আগে তো বাসার গেটই খুলবে না। আচ্ছা, আমি আলো ফোঁটার সাথে সাথেই বের হবো। তুই বল কোথায় আসতে হবে আমাকে?'

রাহাত বলল, 'বারান্দায়'।

হেমা বলল, 'মানে?'

রাহাত বলল, 'আমার সাথে দেখা করতে হলে বারান্দায় আসতে হবে'।

মুহূর্তেই হেমার কি যেন মনে হলো! সে ফোন কানেই লাফ দিয়ে খাট থেকে দৌড়ে বারান্দায় এলো। বারান্দার নিচের সরু রাস্তাটায় একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রাহাত। সে হেমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। হেমা হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছে। তার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারছে না। রাহাতের পাশে একটা বাইক। রাহাত সেই বাইক দেখিয়ে ফোনেই বলল, 'এটা আমার নতুন গার্লফ্রেন্ড। গত সপ্তায় কিনেছি। তোর সাথে দেখা করাতে নিয়ে এলাম।'

হেমাও ফোন কানে চেপে ধরেই বলল, 'তুই কখন এসেছিস'?

রাহাত বলল, 'তুই প্রথমবার ফোন কেটে দেয়ার পরই। এখানে এসে তারপর তোকে ফোন দিয়েছি।'

হেমা বলল, 'এই এতক্ষণ তুই ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার সাথে কথা বলেছিস?'

রাহাত বলল, 'কি করব বল? এতরাতে তোর বাসায় ঢুকতে গেলে দারোয়ান নির্ঘাত আমাকে গুলি করত।'

হেমা বলল, 'এখন তাহলে কি করবি?'

রাহাত বলল, 'গেট খোলা অবধি দাঁড়িয়ে থাকব।'

হেমা বলল, 'তারপর?'

www.boighar.com

রাহাত বলল, 'তোকে একটা ভোর দেখাবো। তুই সেদিন রাতে আমাকে একটা অদ্ভুত ভোর দেখিয়েছিলি। তেমন একটা ভোর।'

হেমা বলল, 'কেমন ভোর?'

রাহাত বলল, 'নতুন ভোর। এই ভোরের আলোটা দেখলেই তোর মনে হবে কি তোর বুকের দরজা-জানালাগুলো সব একটা একটা করে খুলে গেল। সেই খোলা দরজা-জানালায় হু হু করে ঢুকে পড়ল ভোরের হাওয়া। তোর হঠাৎ করে কি মনে হবে জানিস?'

হেমা বলল, 'কী?'

রাহাত বলল, 'তোর হঠাৎ করেই মনে হবে তুই একটা নতুন মানুষ। এই মানুষটার ভেতরে পুরোনো কোনো দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। আর ভুল কিছু থাকলেও তা নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে খুব। সেগুলো তখন ঝেড়ে ফেলতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা হবে না।'

হেমা চুপ করে রইল। এইটুকু দূরত্বে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তারা কথা বলছে ফোনে। কী অদ্ভুত! কিন্তু হেমার কাছে কেন যেন বিষয়টা অদ্ভুত লাগছে না। বরং তার কাছে মনে হচ্ছে বিষয়টা খুবই স্বাভাবিক। ভোরের আলো ফোঁটা অবধি হেমা আর রাহাত সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তারা ভোরের অপেক্ষায় আছে। একটা নতুন ভোরের। ভোর আসছে।

নয়ন বলল, 'বাবা, আমি মরে গেলে তোমার তো অনেক কষ্ট হবে তাই না?'

ফখরুল আলম কিছুক্ষণ নয়নের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এটা কেমন কথা বাবা?'

নয়ন বলল, 'তুমি এত আপসেট হচ্ছ কেন বাবা? মানুষ তো যে কোনো সময় মরে যেতে পারে তাই না? শুধু আমি কেন? তুমিও তো মরে যেতে পারো।'

ফখরুল আলম বললেন, 'তা ঠিক'।

নয়ন বলল, 'তোমার অনেক কষ্ট হবে তাই না?'

ফখরুল আলম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি মরে গেলে তোর কষ্ট হবে না?'

নয়ন বললে, 'হু হবে। কিন্তু কেন কষ্ট হবে বাবা?'

ফখরুল আলম বললেন, 'তোর বাবা মরে গেলে তোর কষ্ট হবে, এটাই তো স্বাভাবিক তাই না?'

নয়ন বলল, 'কেন স্বাভাবিক? বাবা আর সন্তানের মধ্যে এমন কি আছে যে বাবা মারা গেলে সন্তানকে কষ্ট পেতে হবে?'

ফখরুল আলম বললেন, 'সম্পর্ক, মায়া'।

নয়ন বলল, 'সম্পর্ক আর মায়া তো বাবা ছেলে না হয়েও হওয়া যায়। যায় না?'

ফখরুল আলম বললেন, 'তা যায়। তারপরও একজন বাবা জন্মের পর থেকে তার সন্তানকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেন। তাকে প্রথম চোখ মেলে তাকাতে দেখেন। প্রথম হাসতে দেখেন, বাবা বলে ডাকতে দেখেন। হামাগুড়ি দেয়া থেকে দৌড়াতে দেখেন। আরো কত কি!'

নয়ন বলল, 'এ কারণেই মায়াটা জন্মায়, তাই না বাবা? কাছে থাকার কারণে? দীর্ঘ একটা জীবন কাছে থাকার কারণে?'

www.boighar.com

ফখরুল আলম বললেন, 'হ্যাঁ। তা-ই হয়তো। তবে রক্তের একটা ব্যাপার তো থাকেই। বাবা-সন্তানের মধ্যে যে রক্তের সম্পর্কটা থাকে। এটার কি কোনো তুলনা হয়? ব্যাখ্যা হয়?'

নয়ন বলল, 'ধরো হাসপাতালে কোনো একটা বাচ্চা অন্য একটা বাচ্চার সাথে বদলে গেল। বাবা-মা জানেন না যে তাদের কাছে যেই সন্তানটি রয়েছে, সেই সন্তানটি আসলে তাদের সন্তান না। সেই সন্তানটি অন্য কারো। কিন্তু তারা সেই সন্তানটিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করলেন। এখন এই সন্তানটি কিন্তু তাদের রক্তের কেউ না। তাহলে তার প্রতি কি তাদের মায়া কম হবে বাবা? তারা কি বুঝতে পারবেন যে এই সন্তান তাদের রক্তের না?'

ফখরুল আলম খানিক থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, 'না। তা না। সেটা তো বোঝার কথা না।'

নয়ন বলল, 'তাহলে? রক্ত তো আলাদা করে চেনার কিছু নেই বাবা। আসল ব্যাপার হচ্ছে মায়া। আসল ব্যাপার হচ্ছে সৃষ্টি। সবাই তার সৃষ্টিকে ভালোবাসে। ধরো কেউ একটা কাগজের নৌকা বানালো, অন্য একজনের বানানো নৌকার চেয়ে হয়তো তার নৌকাটা বানানো খারাপ হয়েছে। দেখতে খারাপ হয়েছে। তারপরও কিন্তু সে তার নৌকাটাকেই বেশি ভালোবাসবে, তাই না? ধরো স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। বাবা-মা'র মাধ্যমে তিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠান। কিন্তু অবচেতনেই বাবা-মায়ের মধ্যে এই ভাবনাটা কাজ করে যে এই সন্তানটা তাদের দুইজনের সংমিশ্রণে সৃষ্টি, ভালোবাসায় সৃষ্টি। এই সন্তানটার মধ্যে তারা রয়েছেন। এটা সেই সন্তানের প্রতি তাদের প্রথম অ্যাফেকশন। তারপর তারা সেই সন্তানকে প্রতিদিন একটু একটু করে তৈরি করেন। নানাভাবে। সাথে তৈরি হয় মায়া। এখন তারা যদি সেই সন্তানের রক্তের বাবা নাও হয়ে থাকেন, তাদের মায়াটা, ভালোবাসাটা কিন্তু কিছু কমবে না বাবা। বাবা-মায়ের প্রতি সেই সন্তানের ভালোবাসাটাও কিন্তু সত্যিকারের কোনো বাবা-মায়ের চেয়ে কম হবে না। সেও তাদের আর সকল সন্তানের মতোই ভালোবাসবে। বাসবে না বাবা?'

ফখরুল আলম বললেন, 'হ্যাঁ বাড়বে'।

নয়ন বলল, 'তাহলে ওসব রক্তটক্ত কিচ্ছু না। তাই না বাবা? আসল ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ভাবনা, এই সন্তানটা আমার। তারপর হচ্ছে তাকে তার জন্মের প্রথম দিন থেকেই একটু একটু করে বড় করা। তার প্রতিটি মুহূর্ত নিজের চোখের সামনে দেখা। তাই না?'

ফখরুল আলম বললেন, 'তুই এত কিছু কেন বলছিস?'

নয়ন বলল, 'কারণটা বলব?'

ফখরুল আলম বললেন, 'হ্যাঁ। বল'।

নয়ন বলল, 'কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি বাবা। অসম্ভব ভালোবাসি। এই কথাটা কখনো বলতে পারিনি। আজ বলে ফেললাম।'

ফখরুল আলমে বুকের ভেতর একটা ঢেউ খেলে গেল। তিনি অতি কষ্টে সেই ঢেউ থামালেন। এতবড় ছেলের সামনে বাচ্চাদের মতো কেঁদে ফেলা কোনো কাজের কথা নয়। তিনি বললেন, 'বাবাকে তো ছেলে ভালোবাসবেই'।

নয়ন বলল, 'তুমি আমার বাবা না হলেও আমি তোমাকে ভালোবাসতাম বাবা।'

ফখরুল আলম বললেন, 'চল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে'।

নয়ন বলল, 'চলো।

মোহাম্মদপুরের এই পেছন দিকটায় বসিলা ব্রিজ পার হয়ে গেলে একটা খোলা মাঠের মতো বিস্তৃত জায়গা। বালি ফেলে ভরাট করা হয়েছে বলে অনেকেই বিকেলের দিকে ঘুরতে আসেন। নয়ন আজ ফখরুল ইসলামকে নিয়ে এসেছিল। নয়ন বলল, 'আচ্ছা বাবা, ধরো আমি যদি কাউকে খুন করি, তারপর আমার যদি ফাঁসি হয়ে যায়, তখন তোমার কি মনে হবে? মানে তোমার কি মনে হবে, খুন করার পরও আমার যেন শাস্তি না হয়? নাকি তুমি চাইবে আমার ফাঁসি হোক? আমি জানি তুমি একজন সৎ ও ভালো মানুষ। তুমি সত্যি কথাটি বলবে।'

ফখরুল আলম বললেন, 'তোর আজ কি হয়েছে বল তো বাবা? আমি প্রায়ই দেখি তুই রাতে ঘুমাস না। পড়াশোনাও ছেড়ে দিয়েছিস। তারপর আজ কী সব উদ্ভট কথাবার্তা বলছিস! আমাকে বল তো তোর সমস্যাটা কি হচ্ছে? ওই মেয়েটাকে নিয়ে?'

নয়ন বলল, 'কোন মেয়েটাকে নিয়ে?'

ফখরুল আলম বলে, 'হেমা নাকি যেন নাম। সমস্যাটা কী আমাকে বল তো? এখন বিয়ে করার সময়। তুই চাইলে আমি আর তোর মা গিয়ে ওদের বাসায় প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারি। দেখবি বিয়েটা করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

নয়ন হাসল। বলল, 'দেখলে বাবা, আমাদের মাথায় কিছু ভাবনা বছরের পর বছর ধরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এই যে সম্পর্কের ভাবনা, রক্তের ভাবনা, আরো কত কি! এই যে তুমি বললে বিয়ে করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, আসলেই কি বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যায় বাবা? তোমার জীবনটা কি বিয়ে কোনোভাবে বদলে দিয়েছে? আই মিন ভালো কোনোভাবে?'

ফখরুল আলম এবার আর জবাব দিলেন না। নয়ন বাবার হাত ধরল। তারপর বলল, 'সরি বাবা। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি'।

ফখরুল আলম মলিন হাসলেন। তারা যখন বাসার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। সেই ডুবে যেতে থাকা সূর্যের আলোয় নয়ন দেখল

www.boighar.com

হেমা আর রাহাত দাঁড়িয়ে আছে তাদের গেটের সামনের খোলা মাঠের মতো জায়গাটায়। হেমা তাকে দেখে এগিয়ে আসল। নয়ন হেমার দিকে তাকিয়ে হাসল। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের হাসি। রাহাতের সাথে ইশারায় শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। ফখরুল আলম কি বুঝলেন কে জানে, তিনি টুপ করে বাড়ির গেটের ভেতর ঢুকে গেলেন। নয়ন হেমাকে দেখে সহজ গলায় বলল, 'আরে, তুমি এখানে? অনেকক্ষণ?'

হেমা বলল, 'হ্যাঁ অনেকক্ষণ। রাহাত খবর নিয়ে জানল যে তুমি বাসায় নেই। কখন ফিরবে কেউ জানে না।'

নয়ন বলল, 'তারপরও এতক্ষণ অপেক্ষা করলে যে!'

হেমা বলল, 'তুমি একটা কথা বলতে মনে আছে?'

নয়ন বলল, 'কী কথা?'

হেমা বলল, 'অপেক্ষার নামই মানবজনম'।

নয়ন স্মিত হাসল। বলল, 'কি জানি! আজকাল সব ভুলে যাচ্ছি। বয়স হয়ে গেছে।'

হেমা বলল, 'তোমার বয়স কত?'

নয়ন বলল, 'বুড়োরা বয়সের হিসেব রাখে না। বয়সের হিসাব রাখে তরুণরা। কারণ তাদের বয়স খরচ হয়ে যাচ্ছে। বুড়োদের তো বয়স খরচ হবার ভয় নেই। তাদের বয়সের পুঁজির থলে শূন্য।'

হেমা বলল, 'নাহ্। তুমি সত্যিই বড় হয়ে গেছ।'

নয়ন বলল, 'পরিস্থিতি মানুষকে হঠাৎ করে বড় করে ফেলে।'

হেমা বলল, 'হু, জানি'।

তারপর দুজনেই খানিক চুপ করে রইল। তারপর হেমা বলল, 'আমি তোমার সাথে খানিক সময় চাই। কোথায় বসব বলো তো?'

নয়ন বলল, 'ছাদে যেতে পারি'।

হেমা বলল, 'চলো'।

তখন অন্ধকার নেমে আসছে। ভালো শীত পড়েছে। ছাদের ডান দিকটায় নির্জন করে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছে নয়ন আর হেমা। হেমা বলল, 'আমি কি তোমার হাতটা ধরব?'

নয়ন হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলো। হেমা প্রথমে আলতো করে নয়নের হাতের আঙুলগুলো ছুঁয়ে দিলো। তারপর শক্ত করে মুঠো করে ধরল। ধরে রাখল অনেকক্ষণ। নয়ন দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চুপ। হেমা বলল, 'তুমি কি আমার একটু কাছে আসবে?' www.boighar.com

নয়ন বলল, 'আমি তো তোমার কাছেই আছি'।

হেমা ফিসফিস করে বলল, 'আরো কাছে'।

নয়ন কোনো কথা বলল না। হেমা বলল, 'আমার খুব শীত লাগছে নয়ন। খুব। তুমি কি আমাকে একটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরবে?'

নয়ন কোনো কথা বলল না। নড়ল না অবধি। হেমাই নয়নের কাছে এগিয়ে এলো। তারপর দু'হাতে নয়নকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। নয়ন যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকিয়ে আছে শূন্য আকাশে। হেমা হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, 'আমার কষ্ট হচ্ছে নয়ন। খুব কষ্ট হচ্ছে খুব। আমি কষ্টে মরে যাচ্ছি নয়ন। আই নিড আ টাইট হাগ। উইল ইউ প্লিজ গিভ মি আ হাগ?'

নয়ন বলল, 'তুমি কোনো অপরাধবোধে ভুগছ হেমা?'

হেমা নয়নের কথার জবাব দিলো না। সে আচমকা দুইহাতে নয়নের গাল চেপে ধরল। পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল নয়নকে। তারপর নয়নের মুখটা তার আরো কাছে টেনে আনল। আরো কাছে। তারপর তার ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো নয়নের ঠোঁটে। যেন আকণ্ঠ তেষ্টায় শুষে নিতে থাকল নয়নের সকল কষ্ট, সকল আক্ষেপ, সকল বিষাদ। যেন বহু বছরের প্রার্থিত সকল ভালোবাসা সে নিংড়ে নিতে থাকল। তীব্র, গভীর, গাঢ়, সুদীর্ঘ চুম্বনে সে যেন পান করে নিতে থাকল জীবন। কিন্তু নয়ন নিরুত্তাপ, নির্বিকার, নিস্পৃহ। সে দাঁড়িয়ে আছে অনুভূতিহীন নিথর পাথরের মতো। হেমা নয়নের চুল খামচে ধরে বলল, 'আমার স্পর্শ কি বলে নয়ন? আমার এই স্পর্শ তোমাকে কী বলে? সে কি তোমাকে এখনো দ্বিধার কথা বলে? সে কি তোমাকে এখনো সঙ্কোচের কথা বলে? সে কি তোমাকে বলে না যে তোমাকে নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, সঙ্কোচ নেই?'

নয়ন তাও কোনো কথা বলল না। হেমা এবার কেঁদে ফেলল। সে বলল, 'নয়ন। তুমি কি জানো এই জীবনে তোমাকে যতটা তীব্র করে আমি চেয়েছি, তার চেয়ে বেশি তীব্রতায় আর কখনোই কিছু চাইনি!'

নয়ন এবার কথা বলল। সে বলল, 'তুমি কি একটু শান্ত হবে হেমা?'

হেমা বলল, 'না। আমি শান্ত হবো না। আমি আরো অশান্ত হবো। আমি তোমাকে আরো এলোমেলো করে দেবো। আমি তোমাকে আরো বিধ্বস্ত করে দেবো। আমি তোমাকে ভেঙে চুরমার করে দেব। তারপর আমি তোমাকে আবার নতুন করে গড়ব। একদম নতুন করে।'

নয়ন বলল, 'একটু শান্ত হও। আমরা একটু কথা বলি?'

হেমা এবার আর কিছু বলল না। সে কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অকস্মাৎ ছেড়ে দিলো নয়নকে। তারপর নয়নের কাছ থেকে সামান্য দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'বলো নয়ন'।

নয়ন বলল, 'তুমি মন খারাপ কেন করছ হেমা? তুমি মন খারাপ করার মতো কিচ্ছু করোনি। একটা সত্যি কথা বলি, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনার একটি হলো তোমার সাথে আমার দেখা হওয়া। তুমি জানো নাকি অসাধারণ

একজন মানুষ তুমি। মানুষ। আমি আবারো বলছি, মানুষ। সাধারণ নও, অসাধারণ মানুষ। কিন্তু হেমা মানুষ তো। আমরা সবাই মানুষের ভেতর মহামানুষ খুঁজি। কিন্তু আমরা জানি না, মহামানুষ হলে আমাদের মধ্যে আর মানবিক অনুভূতিগুলো থাকবে না। আমাদের মধ্যে যেমন ঘৃণা, হিংসা, দ্বিধা থাকবে না। তেমনি দুঃখ, কষ্ট, বিষাদও থাকবে না। আমরা মানুষ বলেই এই সাধারণ বিষয়গুলো আমাদের আছে। এগুলো না থাকলে বরং আমাদের মৃত্যু হতো। মানবিক মানুষের মৃত্যু। ধরো, আমি মহামানব হলে হয়তো আমার জীবনের এই ঘটনা নিয়ে আমি নির্বিকার থাকতাম। তুমি মহামানব হলে হয়তো এই আমাকে নিয়ে তোমার কোনো দ্বিধা থাকত না। সব শুনে তুমি টুপ করে বলে ফেলতে, এটা কোনো ব্যাপারই না নয়ন। কিন্তু দিন শেষে আমরা মানুষ হেমা। এবং আমাদের তাই থাকা উচিত। তোমার প্রতি আমার সামান্যতম রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, অভিমান নেই। যদি কিছু থেকেও থাকে, তবে স্রষ্টার প্রতি। তুমি একটুও অপরাধবোধে ভুগো না হেমা।'

হেমা চুপ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। নয়নের কথা সে শুনছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। নয়ন বলল, 'আমি তোমাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি হেমা। ভালোবাসাটা সেই শ্রদ্ধার একটা অংশমাত্র। এইজন্যই এই ভালোবাসাটা এত তীব্র। যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা থেকে আসে, সেই ভালোবাসার মতো পরিপূর্ণ ভালোবাসা আর নেই। আমার নিজের ভেতর নিজেকে নিয়ে একটা বড় দ্বিধা তৈরি হয়েছে হেমা। একটা প্রচণ্ড হীনমন্যতাবোধ। এই হীনমন্যতাবোধ, এই দ্বিধা নিয়ে আমি এই অসাধারণ ভালোবাসাটার ভেতর যেতে পারব না হেমা। সারাটা জীবন আমার মনে হবে আমি কাউকে ঠকাচ্ছি। আমার জন্য তার স্বাভাবিক জীবনটাকে আমি অস্বাভাবিক করে তুলছি। আমার পরিচয় নিয়ে তার সব সময় সতর্ক থাকতে হচ্ছে। আমি তার কোনো কথায়, কোনো আচরণে আমার পরিচয়ের জন্য কোনোভাবে কষ্ট পাচ্ছি কিনা, এটা নিয়ে তাকে সব সময় সজাগ থাকতে হচ্ছে। তার সন্তানদের কোনো আচরণ নিয়ে তার মুহূর্তের জন্য মনে হতে পারে এটি কি তাহলে বংশগত সমস্যা? রক্তের সমস্যা? এটা হয় হেমা। এই রক্তের ভাবনাটা যে কী শক্ত! কী প্রবল! আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না হেমা।'

হেমা বলল, 'এই সিদ্ধান্তটা তুমি কবে নিয়েছ? সেদিনের পর?'

নয়ন বলল, 'হয়তো। আমি ঠিক জানি না। ঘটনাটা আমি যখন প্রথম জানি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, আমার তোমার কাছে যাওয়া দরকার, তোমাকে বলা দরকার। হয়তো তাহলে আমি একটু শান্তি পাব। কিন্তু তারপরই আমার একটু একটু ভয় হতে থাকে। তুমি যদি বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে না নিতে পার! তারপর একটা সময় মনে হলো, না নিতে পারাটাই তো স্বাভাবিক। তারপর তোমাকে হারানোর ভয়ে আর বলতে পারিনি হেমা। তারপর

নিজেকে বুঝিয়েছি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। হ্যাঁ সেদিনের ঘটনাটা হয়তো আমাকে সিদ্ধান্তটি নিতে সাহায্য করেছে। আমি তার আগ অবধি স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের কথাই ভাবছিলাম।'

হেমা হাসল। বলল, 'এখন আমার কথাও ভাবছ? তাই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

নয়ন কথা বলল না। চুপ করে রইল। হেমা বলল, 'যদি এমন হয়, তোমার এই ভাবনার জন্য আমার জীবনটা এখানেই থমকে যায়? যেই মানুষটাকে তুমি এত শ্রদ্ধা করো, ভালোবাসো, সেই মানুষটাই যদি তোমার কারণে শেষ হয়ে যায়?'

নয়ন খানিক ধাক্কার মতো খেলো। হেমা বলল, 'কখনো কখনো এমন হয় না নয়ন, প্রিয়তম মানুষটার জন্য আমরা কত বড় কিছু অবলীলায় ছেড়ে দেই? ভালোবাসার মানুষটার একটু ভালো থাকার জন্য আমরা কত কিছু মেনে নেই? এমন হয় না? সব ঠিক আছে, আমি বুঝি। কিন্তু তারপরও আমার জন্য তুমি আমার সাথে থাকতে পার না নয়ন? ধরো একটা জীবনের সবগুলো দিন, সবগুলো রাত আমাদের খারাপ কাটবে, খুব খারাপ কাটবে। কিন্তু একটামাত্র দিন হয়তো এতটাই ভালো কাটবে যে সেই দিনটার জন্যই বাকি জীবনের সকল কষ্টগুলো আমরা মেনে নিতে পারব। ওই একটামাত্র দিনের জন্য? এমন হতে পারে না নয়ন?'

নয়ন কথা বলল না। হেমা নয়নের হাতটা আবার মুঠো করে ধরল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব নয়ন। ইট ক্যান বি আ হোল লাইফ। বাট আই উইল বি ওয়েটিং টিল মাই লাস্ট ব্রেথ। আই উইল।'

নয়ন এবারো কোনো কথা বলল না। হেমা বলল, 'আমি অপেক্ষা করব বলেই যে তোমাকে আসতেই হবে, এমন নয় নয়ন। তুমি না আসলেও ক্ষতি নেই। আমি জানব, অপেক্ষার নামই মানবজনম। অপেক্ষা মানেই বেঁচে থাকা। মানুষের একটা জনম কেটে যায় কেবল অপেক্ষায় আর অপেক্ষায়। এটা সত্যি নয়ন, অপেক্ষা ছাড়া মানবজনম বৃথা।'

নয়ন তেমন চুপ করেই রইল। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হেমা আর সেই চেষ্টাও করল না। সে আস্তে করে তার হাতের মুঠো থেকে নয়নের হাতটা ছেড়ে দিলো। তারপর ধীর পায়ে নেমে গেল ছাদের সিঁড়ি বেয়ে।

অন্ধকার না থাকলে সে হয়তো নয়নের চোখ দেখতে পেত। সেই চোখে তখন একই সাথে কান্না আর ক্রোধ, শূন্যতা ও শোধ।

www.boighar.com

পারুল বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে আছে। সে সকালে ঘুম থেকে উঠে কেবল দরজা খুলেছে। উঠানের মাঝখানে তাকিয়ে সে যেন মুহূর্তের মধ্যে জমে গেল। উঠানের মাঝখানে ফেলে রাখা একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে আছে নয়ন। নয়নকে চিনতে মুহূর্তকাল সময় লেগেছিল পারুলের। মানুষটার সাথে তার যখন শেষ দেখা হয়েছিল তখন কেমন একটা গোছানো উজ্জ্বল মানুষ ছিল। কিন্তু এই মানুষটা যেন ঝড়ে ডানাভাঙা পাখি। যেন মেঘলা দিনের মতো ম্লান। মানুষটাকে দেখে সে তার নামও ভুলে গেল। দরজার পাল্লা ধরে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে পারুল নয়নের নামটা মনে করতে পারল। কিন্তু তারপর সে কি করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল স্বপ্ন। সে তার অবচেতন মনে সব সময় চেয়েছে এমন কোনো একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটুক। কিন্তু সে এটাও জানে, জীবন রূপকথার গল্প নয় যে সে কোনো একটা অসম্ভব কিছু চেয়ে বসল, আর তা ঘটে গেল। কিন্তু এখন তার চোখের সামনে একটা জ্বলজ্যান্ত রূপকথার গল্প। একে সে অস্বীকার করবে কি করে? এই সাত-সকালে তার বাড়ির উঠানে সেই মানুষটা? নাকি স্বপ্ন দেখছে সে?

পারুলের বিশ্বাস হচ্ছে না। সে দরজার আংটায় বার দুই হাত ঘসে পরখও করে নিলো, সে জেগে আছে কিনা! কাল রাতে তার ভালো ঘুম হয়েছে। সেদিন রায়গঞ্জে লতার নানাবাড়িতে বসে শোনা লতার কথাগুলো নিয়ে পারুল অনেক ভেবেছে। লতার কথাগুলো শুনে তার খুশি হবার কথা ছিল। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো, সে তো খুশি হতে পারেনি, অধিকন্তু সারারাত কেমন মন খারাপ হয়ে রইল তার। পরদিন ভোরেও সেই মন খারাপ ভাবটা গেল না। বাড়ি ফেরার পর সেই মন খারাপ ভাবটা আরো বাড়ল। তার পরদিন সন্ধ্যায় সে বসেছিল পুকুর ঘাটে। আর ঠিক তখুনি সে তার মন খারাপের কারণটা ধরতে পারল। লতা তার জন্য যতটুক ভেবেছে, যা করেছে, তাতে সে খুবই খুশি হয়েছে। আশিকের বন্ধুর কথা শুনেও প্রথমে একটা আনন্দময় উত্তেজনাই বোধ

করছিল পারুল, কিন্তু তার পরপরই কি এক অজানা মেঘ এসে ধীরে ধীরে তার সেই ভালো লাগাটা ঢেকে ফেলেছিল।

সেই সন্ধ্যায় পুকুর ঘাটে বসে পারুল যেন অজানা সেই মেঘটাকে চিনতে পারল। মেঘটার নাম নয়ন। তারপর থেকেই একটা ভয়াবহ চাপা ছটফটানিতে দিন কাটল তার। একটা শ্বাসকষ্টের মতো ব্যাপার। কিন্তু এই মুহূর্তে দরজা খুলেই চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে পারুল তাতে তার আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পারুল ভীরু পায়ে উঠানে নামল। নয়নই কথা বলল প্রথম, সে বলল, 'ঘরে খাবার কিছু আছে পারুল? থাকলে দাও। আমি সারারাত কিছু খাইনি। মাঝরাতের আগে তোমাদের বাড়িতে এসেছি। কিন্তু সকলেই ঘুমিয়ে গেছে দেখে আর জাগাইনি।'

পারুল বলল, 'আপনে সারারাত এইখানে বইস্যা আছিলেন?'

নয়ন বলল, 'হ্যাঁ। গ্রামে এত ঠান্ডা পড়বে বুঝিনি। আমার সাথে তেমন কোনো শীতের কাপড়ও নেই। আমার সম্ভবত জ্বর চলে আসবে। তুমি কি আমাকে একটু গরম পানি আর লেবু দিতে পারবে?'

পারুল বলল, 'পারব না কেন? অবশ্যই পারব। আপনে একটু বারান্দায় আইস্যা বসেন। আমি পাটি লাইছ্যা দিতেছি।'

পারুল ঘরের খোলা বারান্দায় একটা পাটি বিছিয়ে দিলো। নয়ন সেই পাটিতে গিয়ে ঘরের বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে বসল। পারুল কী করবে না করবে ঠিক করতে পারছে না। মানুষটাকে দেখেই মনে হচ্ছে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। সবার আগে তাকে খাবার দেওয়া দরকার। কিন্তু ঘরে তো তেমন কিছু নেই। আব্দুল ফকির দিন দুই হলো বাড়িতে নেই। তিনি বলে গেছেন ফিরতে সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। দূরে কোথাও কাজে গিয়েছেন তিনি। তার সাথে গিয়েছে জুলফিকারও। বাড়িতে পারুল, তাবারুন আর রতন। রতন ঘুমিয়ে আছে বাইরের ঘরে। পারুল রতনকে ডেকে তুলে কিছু টাকা হাতে দিয়ে বলল নদীর ঘাট থেকে মাছ কিনে আনতে। রতন ফেরার আগেই সে চুলায় ভাত বসাল। ডিম সেদ্ধ দিলো। পুকুরের পাশে ছোট্ট বাগান, সেখানে আব্দুল ফকির প্রতিবছরই নানান রকমের শীতের সজি চাষ করেন। এবারও করেছেন। পারুল সেখান থেকে কিছু সজিও নিয়ে এলো। তার বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছে। নয়ন যে গরম পানি আর লেবু দিতে বলেছিল, পারুল তা ভুলেই গেল। তার খুব ইচ্ছা করছিল কারণে-অকারণে মানুষটার সামনে যেতে। কি হয়েছে তা জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু কেমন একটা লজ্জা লজ্জা আর আড়ষ্টভাবও কাজ করছে। রান্না শেষ হতে পারুলের মনে পড়ল গরম পানি আর লেবুর কথা। সে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করল ব্যাপারটাতে। কিন্তু লেবু, গরম পানি আর খাবার নিয়ে এসে সে

www.boighar.com

দেখল নয়ন পাটিতে শুয়ে হা করে ঘুমাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে কতকাল ঘুমায়নি।

নয়নের ঘুম ভাঙল দুপুরের পর। সে ভাত খেতে বসে এক গামলা ভাত খেয়ে ফেলল। তারপর পারুলকে বলল, 'পারুল তোমার রান্নার হাত চমৎকার। আমি আমার জীবনে এত সুস্বাদু খাবার খাইনি।'

পারুলের যে কি হলো! তার মনে হলো তার হাতে ধরা তরকারির চামচটা এখন পড়ে যাবে। কারণ তার হাত কাঁপছে। তার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। নয়ন বলল, 'তোমার বাবা কই?'

পারুল বলল, 'আব্বায় তো বাড়িতে নাই। আপনের কপাল খারাপ, আপনে যহনই আসেন, আব্বায় বাড়িতে থাকে না'।

নয়ন বলল, 'অসুবিধা নাই। সে যেদিন আসবে সেইদিন পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।'

পারুল বলল, 'আব্বার সাথে আপনের এত জরুরি কী কাজ?'

নয়ন বলল, 'এই কাজের কথা আমি তোমাকে বলতে পারব না। এই কাজের কথা আমি তাকেই বলব।'

পারুলের বুকের ভেতরটায় কেমন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। নয়ন কি এমন বলবে তার বাবাকে, যা সে পারুলকে বলতে পারবে না? পারুলের একটা রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল হতে লাগল। খানিক লজ্জাও। সে বলল, 'আপনারে বাহির ঘরে একখান বিছান কইরা দেই?'

নয়ন বলল, 'দাও। না দিলেও অসুবিধা নাই। আমি এই বারান্দায় বা উঠানেও থাকতে পারব।'

পারুল বলল, 'না না। এইটা কেমন কথা?'

নয়ন বলল, 'আমি যেই কয়দিন থাকব, তুমি চাইলে সেই কয়দিন আমার থাকা আর খাবারের খরচ নিতে পারো। অবশ্য এই বাড়িতে থাকা-খাওয়ার একটা অধিকার আমার আছে।'

কি অধিকার নয়নের এই বাড়িতে? পারুলের বুক এবার ধকধক করে কাঁপছে। তাহলে সে যা ভাবছে তাই-ই? নয়ন বলল, 'আমাকে কি তোমার পাগল পাগল মনে হচ্ছে? আমার কথাবার্তা খাপছাড়া মনে হচ্ছে?'

তা পারুলের যে একটু অমন মনে হচ্ছে না, তাও না। আগেরবার মানুষটা এমন ছিল না। এবার কি যেন হয়েছে মানুষটার। কিন্তু সে সেসব কিছুই বলল না। কেবল মিনমিন করে বলল, 'আপনে এত জরুরি কি কাজে আসছেন আব্বার কাছে?'

নয়ন বলল, 'আমি যখন এখান থেকে যাব, তখন দেখতে পাবে। তুমি কি জানো যে চাইলে আমি তোমার আব্বাকেও আব্বা বলে ডাকতে পারি?'

পারুলের এবার আর কিছুই বোঝার বাকি রইল না। তার মনে হলো তার বুকের ভেতর হাজার হাজার ঝলমলে রঙিন প্রজাপতি ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। বসন্ত বিকেলের একটা ফুড়ফুড়ে মন উতল করা হাওয়া যেন শিরশির করে তার বুকের ভেতর ছুঁয়ে যাচ্ছে। সে এবার যেন একটু সাহসীই হয়ে উঠল। কিংবা বোকা। সে নিজেকে আর সামলাতে পারল না। বোকার মতো প্রশ্ন করে বসল, 'আপনে কি যাওনের সময় আমারেও সাথে নিয়া যাইবেন?'

নয়ন একটা ধাক্কার মতো খেলো। সে প্রথমে পারুলের কথাটা বুঝতে পারল না। আগেরবার পারুল তার জন্য কি করেছে না করেছে তা যেন তার মাথায়ই ছিল না। কিন্তু এই এতক্ষণে সেসব যেন ক্রমশই ফিরে এলো। নয়ন মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল। সে বলল, 'তোমাকে আমি কই নিয়ে যাব পারুল? আমি যখন এখান থেকে যাব, তখন তো আর আমি একা যাব না। আমাকে নিতে আসবে পুলিশ। পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যেতে আসবে। তখন তুমি আমার সাথে কই যাবে?'

পারুল বলল, 'কেন? পুলিশ আপনেরে কেন ধইর‍্যা নিয়া যাইব? আপনে কি অপরাধ করছেন?'

নয়ন এই কথার জবাব দিলো না। পারুলের চোখ ছলছল করছে। সে যেন কেঁদেই দিবে। সেই ছলছলে চোখেই পারুল বলল, 'আপনে কি ঢাকায় কোনো অপরাধ কইরা এইখানে লুকাইতে আসছেন?'

নয়ন পারুলের এই কথারও জবাব দিলো না। সে ভাবছে পারুলকে সে ঘটনাটা কি করে খুলে বলবে! সে চায়নি পারুলকে ঘটনাটা এখনই খুলে বলতে। ঘটনা খুলে বলার পর কি ঝামেলা হয় কে জানে! কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে না বললেও সমস্যা।

পারুল আবার বলল, 'অপরাধ করলে করছেন। আপনেরে কেউ এইখান থেইক্যা নিয়া যাইতে পারব না। আপনেরে আমি এমন জায়গায় লুকাই রাখব www.boighar.com যে কেউ সারাজীবন খুঁইজাও পাইব না। কেউ পাইব না।'

পারুলের গলায় যেন বৃষ্টির আভাস। নয়ন হঠাৎ পারুলের দিকে হাত ইশারা করে বলল, 'তুমি কি একটু আমার কাছে এসে বসবে পারুল?'

পারুল আজ কিছুই বুঝতে পারছে না। তার সব স্বপ্ন কি আজ একদিনেই পূরণ হয়ে যাবে? কীভাবে সম্ভব? কীভাবে? সে কম্পিত পায়ে উঠে এসে নয়নের পাশে বসল। নয়ন হঠাৎ তার হাতখানা পারুলের মাথায় রাখল। তারপর গভীর মায়া জড়ানো গলায় বলল, 'পারুল। আমার কোনো বোন নাই। আমি যদি তোমাকে আমার বোন হতে বলি, তুমি কি অখুশি হবে?'

www.boighar.com

পারুল যেন ইলেক্ট্রিকের শক খাওয়ার মতো কেঁপে উঠল। সে ঝট করে তার মাথার উপর থেকে নয়নের হাতটা সরিয়ে দিলো। তারপর বলল, 'আপনে এইটা কি বলতেছেন? আস্তাগফিরুল্লাহ!'

নয়ন ম্লান হাসল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে পারুল। অনেক কথা। আমি জানি না, সেই সব কথা বলার সুযোগ আমি কখনোই পাব কিনা। তবে একটা কথা এখুনি তোমাকে বলে ফেলি। তোমার মতো এমন একটা অসাধারণ বোন আমার আছে, এটা আমার অনেক অনেক কষ্টের মধ্যেও একটা আনন্দ। একটা মজার বিষয় কি জানো, সেই ছোটবেলা থেকেই একটা ভাই বা বোনের জন্য যে কী হাহাকার আমার ছিল! একা একা বড় হয়েছি তো! কিন্তু দেখো, কখনো জানতামই না, তোমার মতো এমন একটা বোন আমার রয়েছে!'

পারুলের লজ্জায়- অপমানে যেন মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। মানুষটা কি বলছে সে জানে না। কেন বলছে তাও জানে না। তারপরও সে কাঁপা গলায় বলল, 'আপনের ঢাকার শহর কেউ একজন আছে, সেইটা বললেই তো হয়। এইসব আমি জানি, যারে পছন্দ হয় না, মাইয়ারাও তারে ভাই বানাই ফালায়।'

নয়ন করুণ ভঙ্গিতে হাসল। তারপর বলল, 'পৃথিবীর অনেক সম্পর্কে মিথ্যা থাকে পারুল, কিন্তু তুমি যে আমার বোন, এতে কোনো মিথ্যা নেই। তুমি আমার সত্যিকারের বোন পারুল।'

নয়ন থামলেও পারুল কোনো কথা বলল না। সে নয়নের কথার কিছুই বুঝতে পারছে না। নয়ন বলল, 'পারুল, আমার শরীরটা ভালো নেই। প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে। তুমি কি আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দেবে? যেখানে আমি কটা দিন একটু থাকব? আর একটা অনুরোধ করব তোমাকে, আমার কথা কাউকে বলো না প্লিজ।'

নয়নের বলার ধরনে কি যেন কি ছিল, পারুল আর কথা বাড়াল না। সে রতনকে ডেকে নয়নকে তার ঘর দেখিয়ে দিতে বলল। তারপর সারাটা দিন নিজের ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল পারুল। কী লজ্জা! কী অপমান! নিজেকে আর কোনোদিন এত ছোট মনে হয়নি পারুলের। লজ্জায় তার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে আর কখনো নয়নের সামনেই যেতে পারবে না। কিন্তু নয়নের কথার অর্থও পরিষ্কার বুঝতে পারছে না পারুল। তার কেমন ভয় ভয় লাগতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, মানুষটা কোনো বড় অপরাধ করে আসেনি তো! কিন্তু নয়নকে দেখে তেমন কিছু মনেও হচ্ছে না। সন্ধ্যার দিকে রতন এসে বলল যে নয়ন বমি করে ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঘটনা শুনে নিজেকে আর সামলাতে পারল না পারুল। সে দৌড়ে ছুটে গেল নয়নের ঘরে। নয়নের অর্ধেকটা শরীর তখন

চৌকির বাইরে। পারুলকে দেখে নয়ন সেই অবস্থায়ই হাসল। বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, ঠিক হয়ে যাব। তুমি কি রতনকে দিয়ে একটু আমার মাথায় পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে পারুল?'

পারুল আঁৎকে ওঠা গলায় বলল, 'আপনের কি জ্বরও আসছে?'

নয়ন বলল, 'সারারাত ঠান্ডায় বাইরে বসেছিলাম তো! ঠান্ডা থেকে জ্বর। ঠিক হয়ে যাবে।'

নয়নের জ্বর ঠিক হলো না। সেই সারাটা রাত, পরের গোটাটা দিন সে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে রইল। এমনিতেই টানা না ঘুমানো, না-খাওয়া, অনিয়ম করা শরীর। তার ওপর ঢাকা থেকে এই হোসনাবাদের দীর্ঘ কষ্টকর যাত্রা, রাতজাগা ঠান্ডার ধকল, সবকিছু মিলিয়ে শরীরটা আর নিতে পারেনি। পরদিন সন্ধ্যার পরপর একটু সুস্থবোধ করল নয়ন। চোখ মেলে তাকাতেই সে দেখল, তারপাশে উদ্বিগ্ন চোখে বসে আছে পারুল। পারুল অবশ্য নয়নকে চোখ মেলতে দেখেও কোনো কথা বলল না। নয়ন সময় নিয়ে একটু ধাতস্থ হলো। উঠে সামান্য খাবার খেলো। পারুল বলল, 'আপনের বাসা বাড়িতে খবর পাঠানো দরকার। আমি তো কাউরে চিনি না।'

নয়ন বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত পারুল যে, আমাকে নিয়ে তোমার এত ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তবে তোমার কাউকে খবর দিতে হবে না। আমিই চলে যাব। তোমার বাবা আসলেই চলে যাব।'

পারুল বলল, 'আমার আব্বার সাথে আপনের কি কাজ?'

নয়ন বলল, 'সেটা তোমাকে বলা যাবে না পারুল। বলা গেলে আগেই বলতাম।'

পারুল বলল, 'না। আপনের বলতেই হইব। আমার খুব ভয় করতেছে। আপনে আমার আব্বার কোনো ক্ষতি করবেন না তো?'

পারুলের এই কথার কোনো জবাব দিলো না নয়ন। সে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার শরীরটা ক্লান্ত লাগছে খুব। আরো খানিক বিশ্রাম দরকার। পারুলের সাথে নয়নের আবার দেখা হলো রাতে। তাবারনকে সাথে নিয়ে নয়নকে খাবার দিতে এসেছে পারুল। নয়ন ইশারায় তাবারনকে চলে যেতে বলল। পারুল কিছুটা অবাক হলেও কিছু বলল না। নয়ন বলল, 'তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালোবাসো, তাই না পারুল?'

পারুল চুপ করে রইল। নয়ন বলল, 'তোমার বাবার যদি কোনো ক্ষতি হয়, তুমি কি খুব কান্নাকাটি করবে?'

পারুল বলল, 'এইটা কি ধরনের প্রশ্ন? আপনের আব্বার কোনো ক্ষতি হইলে আপনে কানবেন না?'

নয়ন বলল, 'না'।

www.boighar.com

পারুল আঁৎকে ওঠা গলায় বলল, 'কি বলেন আপনে এইসব! নিজের বাপের কোনো ক্ষতি হইলে কাঁনব না এমন কেউ আছে?'

নয়ন বলল, 'এই যে আমি আছি।'

পারুল বলল, 'কেন? কানবেন না কেন?'

নয়ন বলল, 'কারণ এই পৃথিবীতে আমি তার চাইতে খারাপ মানুষ আর দেখি নাই পারুল! পৃথিবীতে তার চেয়ে বেশি ঘৃণা আমি কাউকে করি না।'

পারুল বলল, 'নিজের বাপরে কেউ ঘেন্না করে!'

নয়ন বলল, 'তোমার বাবা যদি একজন জঘন্য রকমের খারাপ মানুষ হয়, তুমি তাকে ঘৃণা করবে না?'

পারুল বলল, 'আমার আব্বারে আপনে চেনেন? চেনেন না। সে ওইরম মানুষ না।'

নয়ন বলল, 'সে কী রকম মানুষ?'

পারুল বলল, 'ভালো মানুষ। সে আমারে যত আদর করে, আর কোনো বাপ তার মাইয়ারে এত আদর করে না।'

নয়ন বলল, 'তোমাকে অনেক আদর করে, ভালোবাসে বলে সে খারাপ মানুষ হতে পারে না?'

পারুল বলল, 'না'।

নয়ন বলল, 'ধরো কেউ একটা খুন করেছে। বা একটা মেয়েকে কোনো পুরুষ ধর্ষণ করেছে। তো সেই পুরুষটা কি কারো বাবা হতে পারে না? তারও তো তোমার মতো একটা মেয়ে থাকতে পারে, আমার মতো একটা ছেলে থাকতে পারে। কি পারে না? সেও কিন্তু তার ছেলে-মেয়েকে আদর করে। তারা অসুস্থ হলে কান্নাকাটি করে। কষ্ট পায়। কি পায় না?'

পারুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হু। পায়'।

নয়ন বলল, 'পৃথিবীর সকল অপরাধীই কারো না কারো সন্তান, কারো না কারো ভাই, বোন, স্ত্রী, স্বামী, বাবা, মা। কিন্তু সে তার সন্তানের কাছে মমতাময় এক পিতা, অথচ আরেকজনের সন্তানের কাছে সে নৃশংস এক মানুষ। ধরো, তোমার বাবা, সে তোমার কাছে একজন অসাধারণ ভালো বাবা। কিন্তু সুযোগ পেয়েই সে যদি তোমার খুব কাছের কোনো বান্ধবীর শরীরে হাত দেয়? ধর্ষণ করে? তখন? এমন হতে পারে না? হয় না?'

পারুলের কান গরম হয়ে গেছে। রাগে তার হাত-পা ঘামছে। সে নয়নের কথার বিপক্ষে কোনো যুৎসই যুক্তি দিতে পারছে না। কোনো উত্তর দিতে পারছে না। আবার নয়নের কথা সে মেনেও নিতে পারছে না। একের পর এক কি নোংরা আর জঘন্য সব কথা সে বলে যাচ্ছে। নয়নের প্রতি ধীরে ধীরে একটা প্রচণ্ড বিরক্তি তৈরি হচ্ছে পারুলের। নয়ন যখন বলল যে তার বাবা সুযোগ

পেলে তার বান্ধবীকেও...। পারুল আর ভাবতে পারল না। তার চোখে লতার মুখ ভেসে উঠল। ভেসে উঠল তার বাবার মুখও। আর সাথে সাথেই যেন তার পেট গুলিয়ে বমি উঠে আসতে চাইল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ এই মানুষ কি বলছে এই সব!

পারুল বলল, 'আপনে মানুষটারে যত ভালো ভাবছিলাম। আপনে তার চাইতেও খারাপ। ভালো মাইনষের মনে থাকে ভালো চিন্তা। খারাপ মাইনষের মনে থাকে খারাপ চিন্তা। আপনের মনে খালি খারাপ চিন্তা। আপনের চেহারা দেইখ্যা কিন্তু এইসব বোঝনের উপায় নাই।'

নয়ন বলল, 'একদম ঠিক বলেছ পারুল। মানুষের চেহারা দেখে কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই, ভেতরের মানুষটা কেমন! তোমার বাবার চেহারা দেখে বোঝার উপায় আছে যে তার ভেতরে কি আছে?'

পারুল এবার ফুঁসে উঠল। বলল, 'কি আছে? আপনে বলেন, স্পষ্ট কইরা বলেন, আমার আব্বার মইধ্যে কি আছে? এইসব ফিসফিসানি অনেক শুনছি। কিন্তু পারুলের সামনে আইস্যা কেউ কোনোদিন কিছু বলনের সাহস দেখায় নাই। আপনে বলেন। বলেন।'

নয়ন পারুলের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন এক উদ্যত ফণা তোলা সাপ। তার সেই উদ্যত ভঙ্গির কোথায় যেন আব্দুল ফকিরের একটা স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। একটু খেয়াল করে তাকালেই বোঝা যায়। আচ্ছা, তার নিজের কোনো ভঙ্গিতেও কি এমন করে আব্দুল ফকির লুকিয়ে আছেন? তার হাসিতে? কান্নায়? রাগের কোনো বিশেষ ভঙ্গিদে কি আব্দুল ফকির স্পষ্ট হয়ে ওঠেন?

নয়ন বলল, 'তোমাকে বললে তুমি বিশ্বাস করবে না পারুল। কোনো সন্তানই তার বাবার সম্পর্কে এমন কুৎসিত ঘটনা মেনে নিতে পারবে না পারুল।'

পারুল বলল, 'না। আপনে বলেন। আপনে বলেন আপনের আমার আব্বার কাছে কেন আসছেন?'

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ থেকে আসমার ঘটনাটা পারুলকে বলল। পারুল ঘটনা শোনার পর বলল, 'ওই মাইয়ার কথা তো আমিও শুনছি। ঢাকায় এক বাসায় থাকত। সেইখানে মারা গেছে।'

নয়ন বলল, 'ঠিক পারুল। আর সে মারা যাওয়ার সময় গর্ভবতী ছিল। আসমার সাপের বিষ নামাতে গিয়েই আব্দুল ফকির...'।

পারুল এবার যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'এইসব আপনে কি বলতেছেন! আপনের মাথা ঠিক আছে?'

নয়নকে আর কিছু বলতে না দিয়েই দরজার পাল্লায় সপাটে ধাক্কা মেরে পারুল ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সারারাত পারুল আর তার চোখের পাতা বন্ধ

www.boighar.com

করতে পারল না। বাবা সম্পর্কে নানান কথা সে নানানসময়ই একটু আধটু শুনে এসেছে। কিন্তু কখনোই কেউই তাকে সরাসরি কিছু বলেনি। একটা মানুষের মধ্যে সামান্যতম বোধ থাকলেও এই কাজটি সে করতে পারে না। পারুল এসব বিশ্বাস করে না। যেই মানুষটা তার সামান্য একটু মন খারাপ দেখলেও অস্থির হয়ে যান। নিজে না খেয়ে, না পরে হলেও তার শখ পূরণ করেন। সেই এতটুকু কাল থেকে যে বাবার অসংখ্য অসাধারণ স্মৃতি পারুলের মনে আছে। সেই বাবার অমন মমতা থৈ থৈ বুকের ভেতর এমন কদর্যতা থাকা অসম্ভব। পারুল কখনোই বিশ্বাস করে না। কখনোই না। নয়নের প্রতি এক প্রবল তিক্ততায় ক্রমশই আচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগল তার মন।

ভোরের আলো ফুটতে ঘুম পেল পারুলের। গভীর ঘুম। তার ঘুম ভাঙলে তাবারনের ডাকাডাকিতে। তাবারন জানাল নয়নের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। পারুলের আর ইচ্ছে হচ্ছিল না নয়নের কাছে যেতে। কিন্তু তারপরও সে গেল। আবারো জ্বর উঠেছে নয়নের। সে অচেতনের মতো পড়ে রয়েছে। পারুলের এবার দিশেহারা লাগছে। তার হঠাৎ করেই মনে হলো নয়নের নানাজানের নামই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। প্রথম যেদিন সে এ বাড়িতে এসেছিল, সেদিন তাকে নিয়ে এসেছিল তাদের গাঁয়েরই এক মুরুব্বি হারু মুনশি। পারুল রতনকে দিয়ে হারু মুনশীকে খবর পাঠাল। হারু মুনশী খবর দিয়ে লোক পাঠালেন ফতেহপুরে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর বাড়ি। সন্ধ্যার খানিক পর লোকজন নিয়ে মনির এলো নয়নকে নিয়ে যেতে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ঘটনা শুনে কিছু বললেন না। তবে নয়নের অসুস্থতার খবর শুনে বিলকুড়ানির হাট বা রায়গঞ্জ থেকে ডাক্তার নিয়ে আসতে বললেন তিনি। নয়নের এই অসুস্থতা সহজে ছাড়ল না। তার টাইফয়েড হয়েছে। দীর্ঘ সময় সে এই টাইফয়েড জ্বরে ভুগল।

আব্দুল ফকির বাড়ি ফিরলেন প্রায় নয় দিন বাদে। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে আব্দুল ফকিরের সাথে কথা বলতে ভালো লাগছিল না পারুলের। আব্দুল ফকির এবার গিয়েছিলেন পালরদির মেলায়। সেখানে এই সময়টায় সাতদিনব্যাপী বিশাল মেলা হয়। সেখানে সাপের খেলা দেখান আব্দুল ফকির। সাথে নানান ওষুধপথ্যও বিক্রি করেন। তিনি পালরদির মেলা থেকে পারুলের জন্য রাজ্যের জিনিসপত্র কিনে এনেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে এইসব জিনিসপত্রের মধ্যে ঝুনঝুনিও রয়েছে। সেই ঝুনঝুনি দেখে পারুলের খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল যে, 'আব্বা, আমি কি এহনো ঝুনঝুনির পারুল আছি?'

কিন্তু পারুল কিছুই জিজ্ঞেস করল না। আব্দুল ফকির যখন অতি আগ্রহ নিয়ে তাকে এইসব জিনিসপত্র দেখালেন, পারুল তখন খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বাবার সামনে বসে রইল। অন্য কোনো সময় হলে পারুল শিশুর মতো আনন্দে ফেটে পড়ত। কিন্তু এবার পারুল কিছুই করল না। আব্দুল ফকির অবাক হলেও কিছু বললেন না।

পারুল তার এই নির্লিপ্ততার কারণ জানে না। সে কি তাহলে নয়নের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে? পারুল অনেক ভেবে দেখেছে, সে নয়নের কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু কোথায় যেন কিছু একটা হয়েছে তার। সেটির অস্তিত্ব সে স্বীকার করতে চায় না, আবার পুরোপুরি অস্বীকারও করতে পারে না। তার কি তার বাবার সম্পর্কে দ্বিধা তৈরি হয়েছে?

মায়ের প্রতি বাবার আচরণ নিঃসন্দেহে আপত্তিকরই ছিল। পারুল বাবার সাথে এই নিয়ে কথাও বলেছে। তার বাবা বলেছেন, নুরুন্নাহারের শরীরে যে আঘাতের চিহ্ন, তার বেশিরভাগই নুরুন্নাহারের নিজের করা। এগুলো তার সাথে থাকা জ্বিন তাকে দিয়ে করিয়েছে। হ্যাঁ তিনিও কিছু আঘাত করেছেন। কিন্তু সেগুলো জ্বিন ছাড়ানোর জন্যই করা। তিনি যেখানেই জ্বিন ছাড়াতে যান, এই

কাজটি তাকে করতে হয়। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে, এই আঘাত মানুষটার গায়ে লাগে না, লাগে জ্বীনের গায়ে। এটি জ্বিন ছাড়াবার প্রাচীন একটি পদ্ধতি। যখন আঘাত পেয়ে রোগী চিৎকার করে কাঁদে, তখন রোগীর কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় জ্বীনের। আর কান্নাটাও আসলে রোগীর না। ওই কান্নাও জ্বীনের।

এইসব জিনিস পারুলও জানে। গাঁও-গ্রামে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা প্রচলিত পদ্ধতি এইগুলো। ছোটবেলা থেকেই এসবই দেখে এসেছে তারা। বাবাকে তাই আলাদা করে খুব একটা দোষও পারুল দিতে পারেনি। বরং মায়ের চিকিৎসার জন্য বাবা যখন এক কথায় আতঙ্ক হয়ে গেলেন। তারপর নিজের সাধ্যের চেয়েও বেশি করলেন। তখন বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পারুল নুয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নয়নের কথায় এমন লাগছে কেন পারুলের? আবার নয়নকে দেখে, তার কথা শুনে তাকে মানসিকভাবে অসুস্থই লেগেছে পারুলের। কি সব অসংলগ্ন, বিশ্রি কথাবার্তা। সবই ঠিক আছে, কিন্তু একটা বিষয়ে পারুল এখনও পরিষ্কার না, নয়ন তাদের বাড়িতে কেন আসল? কোনো গুরুতর বিষয় না থাকলে তার এভাবে আসার কথা না। কিন্তু সেই গুরুতর ব্যাপারখানা কি?

একবার ভাবল বাবার কাছে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু তারপর আর জিজ্ঞেস করা হলো না। বাবার সাথে কথা বলতে ভালো লাগছিল না পারুলের। তার কেবল মনে হচ্ছিল, এই বাড়ি ঘর, এই চেনা গ্রাম, চেনা মানুষ, চেনা ঘ্রাণ থেকে সে দূরে কোথাও চলে যেতে পারত! বহুদূরে কোথাও! তার আর এখানে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না। একমুহূর্তও না। তার মনে হচ্ছে এখানে থাকলে সে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। তার পাখির মতো ডানা থাকলে এই মুহূর্তে সে উড়ে উড়ে দূরে কোথাও চলে যেত। কিন্তু তার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। কোথাও না।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে লতার কথাগুলো মনে পড়ল পারুলের। আশিক আর তার বন্ধুটির যেন কবে আসার কথা ছিল? লতা বলেছিল মাসখানেকের মধ্যেই তারা আসবে। তা মাসখানেকের তো আর বেশি বাকিও নেই। বাকিটা দিন পারুলের গেল প্রচণ্ড অস্থিরতায়। পারুল এমনই, খানিক আগের মন খারাপের কথা সে খানিক পরের কোনো মাছরাঙা পাখির উড়ে যাওয়া দেখে ভুলে যায়। খানিক আগের কান্নার কথা সে খানিক পরের কোনো গল্পে ভুলে যায়। তার খুব লতার সাথে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু লতাকে এখন সে কই পাবে?

অদ্ভুত ব্যাপার হলো লতা এলো সন্ধ্যাবেলা। পারুল খুব অবাক হলো লতাকে দেখে। আজকাল কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। লতা বলল, 'মা'র শরীরটা নাকি ভালো না। এইজইন্য খবর পাঠাইছিল। দেখতে আইছি। ওমা, আইস্যা শুনি মিথ্যা খবর দিয়া আনাইছে।'

পারুল বলল, 'মিথ্যা খবর দিয়া আনাইছে কেন?'

লতা বলল, 'আমার বিয়া দিব। ছেলে সৌদি আরব থাহে। সেই ছেলে আইছে আমারে দেখতে।'

পারুল বলল, 'ও আল্লাহ, কি কস! কই আমি তো কিছুই জানি না!'

লতা বলল, 'আমি জানলে না তুই জানবি! আমিই তো জানি না।'

পারুল বলল, 'তারপর? এহন কি হইল? তুই আশিক ভাইর কথা বাড়িতে বলস নাই?'

লতা বলল, 'মায়রে কইসি। কিন্তু সে কয়, মোবাইলে পরিচয়, মোবাইলে প্রেম, এইগুলান নাকি ভালো না। এইরকম নাকি অনেক ছেলে থাহে, মোবাইলে প্রেম কইরা মাইয়াগো ক্ষতি করে, তারপর চইলা যায়। আর খোঁজ পাওন যায় না। এদের বাড়ি-ঘর, বাপ-মা, সঠিক পরিচয়, কিছুই জানন যায় না। এই ধরনের পোলাপানের উদ্দেশ্যই নাকি খারাপ থাহে।'

পারুল বলল, 'কথা কি সত্য নাকি লতা?'

লতা হাসল। বলল, 'তুইও তো দেহি মায়ের মতোই কথা কস পারুল। আশিকের লগে কি আমার আইজকের পরিচয়? তারে আমি চিনি আইজ বছর ঘুইর্যা আসল। তার লগে কতবার দেহা হইল। কতকিছু হইল। কই? সে কি আমারে ছাইড়্যা পালাই গেছে?'

পারুল এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, 'কী কী হইছে, ক'না লতা!'

লতা বলল, 'তুই ছোট মানুষ, আগে বড় হ। তারপর বলবনে।'

পারুল বলল, 'সবকিছুই হইছে না? আমি কিন্তু বুঝি। বুঝি না তা কিন্তু না। লঞ্চের কেবিনে, তাই না লতা?'

লতা পারুলের পিঠে মৃদু কিল মেরে বলল, 'বেশি পাইক্যা গেছস। প্রেম করস না, বিয়া হয় নাই, আগেই এত পাকলে পরে আর পাকবি কেমনে?'

পারুল বলল, 'খাড়া। আশিক ভাইয়ের বন্ধু এইবার আসুক। পছন্দ যদি হইয়াই যায়, তহন দেখা যাইবোনে কেমনে পাকি।'

পারুলের চুল মুঠি করে ধরে লতা বলল, 'ওরে, তলে তলে এত! মুখ দেইখ্যা তো কিছুই বোঝনের উপায় নাই।'

লতা আর পারুল হাসল। পারুল হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আসল কথথাখানই তো বললি না।'

লতা বলল, 'কি কথা?'

পারুল বলল, 'মানুষটার নাম কি?'

লতা বলল, 'যার নাম, তার কাছ থেইকাই জাইনা লইস। আমার এত ঠেকা নাই সব বইলা দেওনের। আর দুইজন দুইজনরে পছন্দ হইয়া যাওনের পরত আমারে আর চিনবিই না।'

www.boighar.com

আশিকের বন্ধুর নাম রাজীব। পারুল এর মধ্যে দিন কয় গিয়ে লতার সাথে তার নানাবাড়িতে থেকেও এলো। মজার বিষয় হচ্ছে এই সময়টায় লতার মোবাইল ফোনে তার সাথে রাজীবের কথা হলো। প্রথম দিন মিনিট দশেক। রাজীব খুব অর্ন্তমুখি স্বভাবের ছেলে। কেমন একটা লাজুক লাজুক ব্যাপারও তার মধ্যে আছে। কিন্তু ওইটুকু সময়েই রাজীবকে ভারি ভালো লেগে গেল পারুলের। সেই রাতেই সে লতাকে বলল রাজীবের সাথে কথা বলিয়ে দিতে। তা কথা হলোও। শুধু যে হলোই তা-ই নয়। তাদের কথা শেষ হতে হতে ভোর রাত। এই করে করেই চারটা দিন পারুল রয়ে গেল লতার সাথে। প্রতিদিনই রাজীবের সাথে কথা হলো রাতভর। যদিও সে সকল কথার বেশিরভাগই পারুলেরই বলা। কিন্তু একটা বিষয়, এই চারটে রাত, এই অচেনা, অজানা, অদেখা দুজন মানুষকে যেন কাছে নিয়ে এলো। খুব কাছে।

রাজীবের সাথে পারুলের দেখা হলো তার পরের শুক্রবার। বৃহস্পতিবার রাতেই আবার লতার নানাবাড়ি চলে গেল পারুল। রায়গঞ্জ ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে নির্জন নদী। সেখানে খানিক গাছপালার ছোট্ট পরিত্যাক্ত ভিটে বাড়ির আড়াল। সেখানেই নদী পাড়ে বসেছিল তারা। প্রথম দেখা হলেও রাজীবের সাথে সহজ হতে খুব বেশি সময় লাগেনি পারুলের। ফোনে যে দীর্ঘ সময় তাদের কথা হয়েছে, তা একটা ভূমিকা রাখলেও রাজীবের সহজতা তাদের প্রথম দেখাটাকে আরো সহজ করে দিলো।

রাজীব এমনিতেই প্রচণ্ড লাজুক ছেলে। তার ওপর ফোনে সে যাও সপ্রতিভ, বাস্তবে তার চেয়েও ঢের কম। আর পারুল তার উল্টো। তাছাড়া সুদর্শন ছেলেদের প্রতি পারুলের আসক্তি সীমাহীন। ফলে পারুল যেন ঝলমলে রোদ হয়ে গেল। আর রাজীব লাজুক ছায়া। পারুলের সাথে কথা বলতে গেলেই তার কথা জড়িয়ে যায়। এলোমেলো হয়ে যায় সবকিছু। রাজীবের এই ভয়, এই এলোমেলো ভাব, এই সঙ্কোচ, এইটুকু সময়েই পারুলের এত ভালো লেগে গেল। মজাও লাগছে খুব। রাজীবকে অপ্রস্তুত করে দিতে তার ভীষণ আনন্দ লাগছে। সে রাজীবকে বলল, 'আপনে এত ভয় পান কেন?'

রাজীব বলল, 'ভয় পাই না তো। ভয় পাব কেন?'

পারুল বলল, 'আপনার নাক ঘামতেছে। আমার সাথে কথা বলতে গেলে আপনের গলা কাঁপতেছে।'

রাজীব সাথে সাথে হাতের উল্টোপিঠে নাকের ঘাম মুছল। পারুল হায় হায় করে উঠল। সে বলল, 'আরে কি করেন! কি করেন!'

রাজীব দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, 'কেন?'

পারুল লাস্যময়ী ভঙ্গিতে হাসল। তারপর বলল, 'যেই পুরুষের নাক ঘামে, সেই পুরুষের বউভাগ্য ভালো। ঘাম যে মুইছ্যা ফালাইলেন। ঘটনা কি, ভালো বউ চান না?'

রাজীব যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল। পারুল বলল, 'আপনে হাত দেখতে জানেন?'

রাজীব মিনমিনে গলায় বলল, 'একটু-আধটু'।

পারুল টুপ করে তার হাত পেতে দিলো রাজীবের সামনে। রাজীব সসংকোচে পারুলের হাতখানা ধরল। পারুল টের পাচ্ছে, তার হাতের ভেতর রাজীবের হাত কাঁপছে। রাজীব অনেকক্ষণ সেই হাত ধরে বসে রইল। পারুল বলল, 'কি হইল? বলেন না কেন, কি দেখলেন?'

রাজীব বলল, 'একটা কথা বলি পারুল?'

পারুল বলল, 'হু বলেন'।

রাজীব বলল, 'আপনি হাসবেন না তো?'

পারুল বলল, 'না, হাসব না'।

রাজীব বলল, 'আপনার হাত ধরার পর আমার মাথা আর কাজ করছে না। আমার মনে হচ্ছে আমি যা জানতাম সব ভুলে গেছি।'

পারুল বলল, 'আপনার নাম কি?'

রাজীব অবাক গলায় জবাব দিলো, 'রাজীব'।

পারুল বলল, 'আমার নাম কি?'

রাজীব আরো অবাক হয়ে জবাব দিলো, 'পারুল'।

পারুল বলল, 'আপনে তো কিছুই ভোলেন নাই। সব মনে আছে। শুধু শুধু মিথ্যা কথা কেন বলতেছেন?'

রাজীব বলল, 'আমি মিথ্যা কথা কেন বলব পারুল?'

পারুল বলল, 'এই যে যাতে অনেকক্ষণ আমার হাত ধইরা বইসা থাকতে পারেন। মাইয়া মাইনষের হাত ধইরা বইসা থাকতে খুব ভালো লাগে না?'

রাজীব সাথে সাথে পারুলের হাত ছেড়ে দিলো। তারপর কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'বিশ্বাস করুন। আমার সেরকম কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না পারুল। আমার সত্যি সত্যি এমন হচ্ছে।'

পারুল বলল, 'আপনে পুরুষ মানুষ না?'

রাজীব কোনো কথা বলল না। পারুল বলল, 'আপনে বলবেন, পারুল তোমার হাত ধইরা বইসা থাকতে আমার ভালো লাগতেছিল। এইজইন্য আমি তোমার হাত ধইরা বইসা আছিলাম। তোমার কোনো অসুবিধা আছে? এইভাবে বলবেন। বুঝছেন?'

রাজীব বলল, 'না বুঝি নাই'।

www.boighar.com

পারুল বলল, 'থাউক, আপনার বোঝা লাগবে না। দেন, আপনের হাত দেন। আমি আপনের হাত দেইখ্যা দেই।'

রাজীব ভয়ে ভয়ে তার হাত এগিয়ে দিলো পারুলকে। পারুল তার হাতের মুঠোয় রাজীবের হাতখানা নিয়ে শক্ত করে ধরল। তারপর গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল। রাজীব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পারুলের মুখের দিকে। পারুল বলল, 'ওইরকম কইরা কি দেখেন?'

রাজীব থতমত খেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলো। বলল, 'নাহ্। কিছু না'।

পারুল বলল, 'এইটা বললে মাইয়া মানুষ কষ্ট পায়। আপনে বলবেন, তোমারে দেখি। আমি বলব, কেন? আমারে আবার দেখার কি হইল? আপনে বলবেন, তুমি সেইটা বুঝবা না পারুল। আমি বলব, কেন বুঝব না? আপনে বলবেন, কারণ...'

পারুল তার কথা শেষ করল না। রাজীব উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি কারণ?'

পারুল বলল, 'সেইটাও আমি বইলা দিব?'

রাজীব বলল, 'তাহলে...'

তাহলে বলেই রাজীব থেমে গেল। পরের অংশটুকু আর বলল না। যেন এইটুকু বলেই সে নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে। পারুল রাজীবের হাত দেখে বলল, 'আপনের চরিত্রে দেখি ভালো সমস্যা আছে!'

রাজীব পারুলের কথা বুঝল না। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। পারুল বলল, 'আপনে তো বিয়া করবেন তিনখান। এই দেখেন বিয়ার রেখায় তিন দাগ। দেখছেন?'

রাজীব খুব মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু বুঝল না কিছুই। পারুল বলল, 'আপনের আয়ু ভালো। বিদেশ যাত্রা আছে। পড়াশোনায় ব্রেন ভালো...'

পারুল আরো কী কী সব যেন বলছিল। কিন্তু রাজীব সেসব কিছুই শুনছিল না। পারুলকে দেখে তার একবার মনে হচ্ছিল একটি চঞ্চলা ফিঙে পাখি। আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল একটি উচ্ছ্বলা নদী। কখন কি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কখন কোন পাড় ভেঙে দেয়, তা যেন নিজেই জানে না।

পারুল একনাগাড়ে বলেই যাচ্ছিল। বলেই যাচ্ছিল। রাজীব আচমকা তার বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে পারুলের হাতে ধরা তার ডান হাতের তালুটা ঢেকে দিলো। পারুল অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। রাজীব হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, 'আপনি কি আর কোনো কথা না বলে শুধু আমার হাতখানা ধরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবেন?'

পারুল অবাক গলায় বলল, 'কেন?'

রাজীব গভীর গলায় বলল, 'আমি জানি না। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে আপনি আপনার হাতের মুঠোয় আমার হাতটা ধরে চুপচাপ বসে থাকুন।'

পারুল যেন রাজীবের গলার স্বরের গভীর ব্যাকুলতাটুকু টের পেল। সে তার হাতের মুঠোয় রাজীবের হাত ধরে বসে রইল। একদম চুপচাপ। শীতের মিষ্টি রোদে নদীর ফুরফুড়ে হাওয়ায় পারুলের মনে হলো এই জীবনে তার আর কিচ্ছু চাওয়ার নেই। এই মুহূর্তটুকু নিয়েই সে বেঁচে থাকতে পারবে তার বাকিটা জীবন।

আশিক আর লতা আসল আরো বেশ কিছুক্ষণ পর। এই পুরোটা সময় পারুল রাজীবের হাত ধরে বসে রইল। লতা আর আশিক কাছে চলে আসার পরও রাজীবের হাতখানা পারুলের ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু রাজীব আস্তে করে তার হাতখানা সরিয়ে নিলো। লতা বলল, 'বাব্বাহ! একদিনেই এতদূর?'

পারুলের কেন যেন আর কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। রাজীব হাতখানা ছাড়িয়ে নিতেই তার নিজেকে এত শূন্য মনে হচ্ছিল। এত রিক্ত, এত অসহায়। এই হাতখানা হাতের মুঠোয় নেই ভাবতেই এমন লাগছে কেন তার! এই একটামাত্র দিন। এই সামান্য কিছু মুহূর্ত, কিন্তু পারুলের মনে হচ্ছে, রাজীব যেন তার জনম জনমের চেনা। রাজীবের ওই হাতখানা সে সারাজীবনের জন্য তার হাতের মুঠোতে চায়। সারাজীবন।

রাজীব আর আশিক চলে গেল সন্ধ্যায়। তাদের পৌঁছে দিতে লঞ্চে গেল লতা আর পারুলও। বড় ডাবল কেবিন। পারুল আর লতা লঞ্চ ছাড়ার আগ অবধি সেই কেবিনেই বসল। লঞ্চ ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। এর মধ্যেই দুবার ভেঁপু বাজিয়েছেন সারেং। আরেকবার ভেঁপু বাজলেই লঞ্চ ছাড়বেন তিনি। লঞ্চ ছাড়ার আগে আগে আশিককে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল লতা। সম্ভবত পারুল আর রাজীবকে খানিকটা একান্ত সময় দেয়ার জন্য। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। সময় ফুরিয়ে আসছে। চলে আসছে চলে যাবার সময়। সারাদিন কলকলে নদীর মতো প্রগলভ পারুলও এসে এই মুহূর্তে যেন হয়ে গেল শান্ত শীতল জল। ঢেউ নেই, গতি নেই, স্থির, স্তব্ধ। দুজনের বুকের ভেতরই উদ্বেল হয়ে আছে অসংখ্য কথা। কিন্তু সেই কথারা যেন ভাষা পাচ্ছে না। বুক থেকে বের হয়ে পরস্পরের কানের কাছে শব্দ হতে পারছে না। লঞ্চের শেষ ভেঁপুটা বাজল। পারুল বলল, 'আমি তাইলে যাই। লঞ্চ ছাইড়া দিব। আপনে ভালো থাইকেন।'

রাজীব তাও কোনো কথা বলল না। পারুল উঠে দাঁড়াল। তার পৃথিবীটা যেন ক্রমশই শ্মশানের নিস্তব্ধতায় ডুবে যাচ্ছে। সেখানে ধেয়ে আসছে হাহাকারের শীতল হাওয়া। কেউ নেই, কেউ নেই। পারুল দরজা দিয়ে বের

www.boighar.com

হবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাজীব বলল, 'পারুল, আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে আপনার হাতটা ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকতে। আমি যদি আপনার হাতটা ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকি। আপনার কি কোনো অসুবিধা আছে?'

পারুল ঝট করে পেছন ফিরে তাকাল। তার রাজীবকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। এই জগতে এমন অনাবিষ্কৃত অনুভূতি রয়ে গিয়েছিল, তা পারুল এই এতদিন কোনোদিন বুঝতে পারেনি। কিন্তু লঞ্চ এক্ষুণি ছেড়ে দিবে। তাকে যেতে হবে। দ্রুত, খুব দ্রুত। পারুল কম্পিত পদভারে ঘুরল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলো রাজীবের দিকে। রাজীব তার হাতখানা ধরল। শক্ত করে। পারুলের চোখ বেয়ে বান নেমে আসছে। কিন্তু পারুল সেই বান সামলে নিলো। তার কেবল মনে হতে লাগল, রাজীব এমন কেন? এই কথা ক'টি আর কিছু সময় আগে বললে কি এমন ক্ষতি হতো? আর কিছুটা সময়?

লঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছে। পারুল আর লতা দৌড়ে লঞ্চ থেকে নামল। তারপরের বাকিটা সময় পারুলের হাতে লেগে রইল রাজীবের ওই স্পর্শটুকু। তার কেবল মনে হতে থাকল, এই স্পর্শটুকু নিয়েই সে তার গোটাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। একটা গোটা জীবন। এমন একটু স্পর্শের জন্যই হয়তো মানুষ বেঁচে থাকে। কাটিয়ে দেয় একেকটা মানবজনম।

ঘটনা একইসাথে ভয়াবহ এবং বিস্ময়কর। সকালে ফজুকে ভাত দিতে গিয়ে সাপে কাটল সালেহাকে। সালেহা ভাতের পাতিলে হাত দিতেই তার হাতে ছোবল মেরেছে সাপ। সালেহা প্রথমে বুঝতে পারেনি। সে পাতিলের ভেতর উঁকি দিয়েই বিকট চিৎকারে পাতিল ছুড়ে ফেলল। খোলা দরজা দিয়ে পাতিল উড়ে গিয়ে পড়ল উঠানে। তারপর কয়েকটা গড়ান খেয়ে স্থির হয়ে রইল। পাতিলের ভাত ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। সাপটা তখনই কাঁত হয়ে থাকা পাতিলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। ভয়াবহ দৃশ্য। সালেহা চিৎকার করে জ্ঞান হারাল। তার দাঁতে খিল কবাটি লেগে গেছে। ফজু ঘটনার আকস্মিকতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে হতভম্ব হয়ে বসে আছে। এর মধ্যে পাশের ঘরের আফলাতুন চাচী চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুললেন। মুহূর্তের মধ্যে বড়োসড়ো জটলা হয়ে গেল উঠানের মাঝখানে। কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল সাপটাকে মারতে। কিন্তু ভিড়ের মধ্য থেকেই কে যেন বলল, 'সাপে কামড় দেওনের পর বিষ নামানোর আগে সাপ মারলে সেই বিষ আর নামে না।'

অন্যজন বলল, 'তাইলে?'

সে বলল, 'সাপটারে জাল দিয়া আটকাইয়া রাখ। আগে বিষ নামুক, তারপর দেখন যাইবো ঘটনা।'

সাপটাকে জাল দিয়ে আটকে ফেলা হলো। ততক্ষণে আব্দুল ফকিরকে খবর দিতে লোক চলে গেছে। সালেহার জ্ঞান ফিরে আসলেও সে মৃত মানুষের মতো পড়ে আছে বিছানায়। আব্দুল ফকির আসলেন বিকেলে। তিনি প্রথমেই সাপ দেখতে চাইলেন। তারপর থম মেরে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললেন, 'আপনেরা সবাই একটু ভিড় কমান। ভয়ের কিছু নাই। সালেহার কিছু হইব না। ব্যবস্থা আমি করতেছি।'

ভিড় কমার পর আব্দুল ফকির ফজলুকে ডেকে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ফজলু, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমারে দেখা করনের লইগ্যা খবর দিছে। আমি

www.boighar.com

এহনো যাই নাই। নানান ছুঁতায় দেরি করতেছিলাম। আমার কেন জানি মনে হইতেছিল, উনি আমারে এমন কিছু বিষয়ে জিগাইব, যেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত কিছু জানি না। সেই বিষয়ে আমারে একমাত্র জানাইতে পারতি তুই। কিন্তু তুই বাইরের মাইনষেরে যেমন শত্রু মনে করস, তেমনে শত্রু মনে করস ঘরের মানুষরেও। এহন সবাইরেই যদি শত্রু মনে করস, তাইলে তোরে বন্ধু মনে করব কেডা?'

ফজু কোনো কথা বলল না। আব্দুল ফকির বললেন, 'আমি তোরে আপন মানুষ মনে করছি। আপন মানুষ মনে কইরাই তোর জইন্য জান প্রাণ দিয়া খাটতেছি। কিন্তু তুই আমারেও বিশ্বাস করতে পারলি না। বিশ্বাস হইতেছে এমন এক জিনিস ফজলু, একবার ভাঙলে আর জোরা লাগে না।'

ফজু বলল, 'কাকু, এইসব কথা এহন বলতেছেন! আগে তো সালেহার একটা ব্যবস্থা করেন।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'এইসব কথা তো এহনই কওনের কথা ফজু। আইজ তোর বাড়িতে না আসলে তো ঘটনা কিছুই আমার ধারে পরিষ্কার হইত না।'

ফজু খুবই দিশেহারা বোধ করছে। আব্দুল ফকিরের আজ এই বাড়ি আসার সাথে এই ঘটনার সম্পর্ক সে ঠিক বুঝতে পারছে না। সে বলল, 'কাকু, আমি আপনের কথার কিছুই বুঝতেছি না।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'সেইটাই ফজু। তুই বোঝনের আগেই অনেক বড় খেলায় নাইম্যা পড়ছস। শোন, সালেহার কিছু হয় নাই। সাপ সালেহার কাটতে আসে নাই। কাটতে আসছে তোরে। সাপ দেখছোস? এইটা সাধারণ কোনো সাপ নারে ফজলু। এইগুলান হইল যক্ষের সাপ। আগের দিনে মানুষ চোর ডাকাইতের ভয়ে, বা অন্য কোনো কারণে হাড়ি-পাতিলে ভইরা, কলসিতে ভইরা ধন-সম্পদ, সোনার গয়না এইগুলান মাটি চাপা দিয়া রাখত। তারপর দেহা গেল সে আচুক্কা মইরা গেছে। কিন্তু ওই সম্পদের খবর কাউরে কইলা যাইতে পারে নাই। শত শত বছর সেই সম্পদ রইছে মাটির নিচে। তারপর এক সময় ওই সম্পদ হইয়া গেছে যক্ষের ধন। এইসব কাহিনি শোনস নাই? মাটির তলের ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া গেছে আছড়া। জ্বিন পরী বা সাপ। এইগুলান বিভিন্ন ছৈল ধইরা থাকে। থাইক্যা সেই ধন-সম্পদ পাহারা দেয়। শত শত বছর সেই ধন-সম্পদ পাহারা দিতে দিতে, সেই ধন-সম্পদের উপর একটা মায়া পইর‍্যা যায় তাগো। এইজন্য কেউ জোর কইর‍্যা সেই ধন-সম্পদ নিতে আইলে, তারা তার ক্ষতি করে। আর যারে পছন্দ হয়, তারে বিভিন্ন উপায়ে সেই ধন-সম্পদের কথা জানাই দেয়। অনেকে এইরকম ঘটনাও দেখছে। মাটি কাটতে গিয়া

সোনার বিরাট কলসি পাইছে, কিন্তু সেই কলসি সে নিতে পারে নাই। কারণ কলসির গলা পেঁচাইয়া আছে আজদাহা সাপ। বুঝছস ফজু?'

আব্দুল ফকির সামান্য থামলেন। তারপর বললেন, 'এই সাপও সেইরকম একখান সাপ। সাপ আমি দেখছি, এই সাপ তো তোর ঘরে আসনের কথা না। ঘটনা এহন আর আমার বুঝতে বাকি নাই। তায় কতবড় কলস পাইছস? কলসের পুরাটাই কি সোনায় ভর্তি? এই সাপ কিন্তু বহুবছর জিনিস পাহারা দিয়া রাখছিল। এহন সে আসছে জিনিসের খোঁজে। জিনিসের খোঁজ না পাইলে কিন্তু বিপদ ফজু।'

এই ধরনের অনেক কথা ফজুও শুনেছে। দাদীজানের মুখে শুনছে, মায়ের মুখে শুনেছে। আশেপাশের মুরুব্বীদের কাছে শুনেছে। এখন আব্দুল ফকিরের মুখে এই কথা শুনে ভয়ে ফজুর শিরদাড়া অবধি ঠান্ডা হয়ে এলো। আসলেই সাপটা আর সব সাপের মতো না। ভাতের পাতিলের ভেতর থেকে সে এমনভাবে বেরুল, যেন কোনো ভয় ডর নেই। চারপাশে এত মানুষ, তাও কেমন নির্বিকার ভঙ্গিতে ফণা তুলে স্থির হয়ে ফোঁস ফোঁস করছিল সাপটা। ভাবতেই ফজুর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। আবার আব্দুল ফকির বলছেন, সালেহার কিছু হয়নি। কিন্তু ঘটনা সে চোখের সামনে দেখেছে। সালেহা ভাতের পাতিলে হাত দিলো আর কিছু একটা হলো। তারপর ভেতরে তাকিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল সে। তারপর পাতিলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ওই সাপ! কী ভয়ঙ্কর!

ফজু শুকনো গলায় বলল, 'আপনে বললেন সালেহার কিছু হয় নাই। কিন্তু সে তো দাঁত কবাটি দিয়া আছিল। এহনো অসুস্থ।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'ভয় ফজু, ভয়। কথায় আছে না, মাইনষেরে বনের বাঘে খায় না, খায় মনের বাঘে। সালেহারে মনের বাঘে খাইছে। সে ভাবছে সাপে তারে আসলেই কামড়াইছে। এইটা চিন্তা কইরাই ডরে ফিট। আর ভাতের পাতিলে হাত দিয়া সাপ দেখলেই তো ফিট খাওনের কথা। কামড় দেওন লাগে? কিন্তু এই সাপ তো এহনই কামড়াইব না। এহন সে আইছে তার কলসির খোঁজ নিতে। ডর দেহাই গেল। এই জিনিস কিন্তু মারতে যাইস না ভুলেও। মারতে তো পারবিই না। উল্টা বিপদ ডাইক্যা আনবি। মহা বিপদ।'

ফজু হঠাৎ দুই হাত বাড়িয়ে আব্দুল ফকিরের একখানা হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, বলল, 'এই বিপদ থেইক্যা আপনে আমারে বাঁচান আব্দুল কাকু। আমি আর এত চিন্তা ভাবনা নিতে পারতেছি না।'

আব্দুল ফকির গম্ভীর গলায় বললেন, 'কলসি কই রাখছস?

আব্দুল ফকিরকে যতটা ভয় ফজু পায়, ঠিক ততটা বিশ্বাস সে করে না। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেও ফজু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, আব্দুল ফকিরকে সে

www.boighar.com

সত্যি কথাটা বলে দিবে কিনা। আব্দুল ফকিরের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর তাই ফজু দিলো না। সে উত্তর দিলো ঘুরিয়ে। ফজু বলল, 'কাকু, যেইখানে কলস আছে, এই সাপ সেইখানে যাইতে পারে না?'

আব্দুল ফকির গম্ভীর গলায় বললেন, 'পারব না কেন? পারে। তয় সে চায় যে তার কাছ থেইক্যা কলসি আনছে, সে-ই ফিরাইয়া দিয়া আসুক।'

ফজু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কথাখান কইলে আমি খুন হইয়া যাব ফইর কাকু।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'কি কইলে তুই খুন হইবি ফজলু?'

ফজু বলল, 'গয়নার কলসি কার কাছে আছে, সেই কথা।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'কার আছে আছে গয়নার কলসি?'

ফজু বলল, 'কলসি আমার কাছেই আছিল কাকু। কিন্তু এহন আর কলসি আমার ধারে নাই কাকু। আল্লাহ খোদার কসম দিয়া কইতেছি, কলসি এহন আর আমার ধারে নাই। তৈয়ব খাঁর নাতি মনির, সে এই কলসির জইন্য নানান ছলছুঁতায় গ্রামের ঘরে ঘরে খোঁজ চালাইছে। কলসি আমি রাখছিলাম সলিমুদ্দি দফাদারের বাড়ির পুরান পুষ্কুনির ঘাটলার তলায়। সেইখানে গিয়া দেহি কলসি নাই। কেডা জানি কলসি উঠাইয়া নিয়া গেছে।'

ফজুর কথা শুনে আব্দুল ফকির থম মেরে বসে রইলেন। এই প্রথম তিনি নিজে বিভ্রান্ত বোধ করছেন। এই ঘটনার পরও কি ফজু তার সাথে মিথ্যা কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে? নাকি সে যা বলছে তা আসলেই সত্যি?

গত কিছুদিনে আব্দুল ফকিরের এই বিভ্রান্তভাব এই প্রথম না। তার সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি তৈয়ব উদ্দিন খাঁর নাতি নয়ন। এই ছেলে তার কাছে কি চায়, এই নিয়ে তিনি অনেক কিছুই ভেবেছেন, কিন্তু স্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। সর্বশেষ ঘটনায় তিনি যারপর নাই উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। পালরদির মেলা থেকে ফিরে ঘটনা শুনে তো তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। নয়ন নাকি ঢাকা থেকে তার বাড়িতে এসে উঠেছিল। তারপর সেখান থেকে তাকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে যেতে হয়েছে। আব্দুল ফকির নানান কিছু চিন্তা করেছেন, কিন্তু কোনো চিন্তাতেই স্থির হতে পারেন নাই। নয়নের বিষয়টি নিয়ে একটা প্রবল অস্থিরতা তার মধ্যে কাজ করছে। কিন্তু কোনো ভাবনাকেই আরেকটা ভাবনার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা যাচ্ছে না। আব্দুল ফকিরের হঠাৎ মনে হলো, তার বয়স যেন বেড়ে গেছে। বয়স বেড়ে গেলে মানুষের শরীরের মতো মস্তিষ্কও শিথিল হতে থাকে।

আব্দুল ফকিরের সাথে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর দেখা হলো শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর। খাঁ-বাড়ির দহলিজ ঘরে মুখোমুখি বসে আছেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ

আর আব্দুল ফকির। দীর্ঘ সময় দুজন মানুষ চুপচাপ বসে রইলেন। কেউ কারো সাথে কোনোপ্রকার কথা বললেন না। কিন্তু এই কথা না বলা সময় জুড়েও যেন অসংখ্য কথাবার্তা ঘুরে বেড়ালো দুজনের চারপাশে এবং দুজনই যেন সেইসব কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পেলেন। দীর্ঘ নীরবতা ভাঙলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তার শরীর যথেষ্টই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবুও যতটা সম্ভব স্থির থাকার চেষ্টা তিনি করছেন। তিনি ধীরে, একটা শব্দ থেকে আরেকটা শব্দকে আলাদা করে থেমে থেমে বললেন, 'ফইর, তোমার শরীল-স্বাস্থ্য কেমন?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'জ্বে, আল্লাহর রহমত আর আপনের দোয়া খাঁ সাব। মাশাল্লাহ ভালো।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমার কোনোদিন বড় কোনো রোগ হইছে? কোনো অসুখ, যাতে তুমি অনেক দিন বিছনায় পইড়্যা আছিলা। মনে হইছিল, এই অসুখ আর কোনোদিন ভালো হইবো না?'

আব্দুল ফকির বলল, 'না খাঁ সাব। তেমন কোনো অসুখ আমার হয় নাই। তয় পায়ের ঘটনায় বহুদিন বিছনায় আছিলাম।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তহন তোমার মৃত্যুচিন্তা হয় নাই?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'বহুবছর আগের ঘটনা, ইয়াদ নাই খাঁ সাব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'মানুষের জীবনে অসুখ-বিসুখ হওন, বিপদ আপদ আসন যে দরকার, এইটা তুমি মানো?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'আমার হিসাব আর আপনের হিসাব মেলব না খাঁ সাব। আপনে বলেন।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয় মানুষের জীবনে অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ দরকার আছে। কেন দরকার আছে বলি। ধরো তুমি সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ, কোনো বিপদ-আপদ নাই। যা করতেছ, সব ঠিকঠাক। তহন একটা সময় আইস্যা তোমার মইধ্যে একটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস চইলা আসব। তুমি তহন যা করতে ইচ্ছা করব, তাই করবা। পরিণতি নিয়া ভাববা না। কথায় বলে না, মানুষের ভালো কাজ করতে ভালো লাগে। কথা ভুল, মানুষের ভালো লাগে খারাপ কাজ করতে। অন্যায় কাজ করতে। এহন এই খারাপ কাজের মজা যদি তুমি একবার পাও। আর সেইটা করতে গিয়া যদি ব্যর্থ না হও। যদি কোনো বাঁধা-বিপত্তি না পাও। সবাইরে যদি তোমার অন্যায় তুমি মাইনা নেওয়াইতে পারো। তাইলে সবচেয়ে বড় সর্বনাশটা হয়। নিজের মইধ্যে একটা হামবড়া ভাব চইল্যা আসে। নিজেরে মনে হয় সর্বশক্তিমান। এইটা মানুষরে খারাপের চূড়ান্ত সীমানায় নিয়া যায়। যেইখান থেইকা আর ফেরনের পথ থাহে না। এইটা

হইল একমুখী রাস্তা। একটা পর্যায় পর্যন্ত চইল্যা যাওনের পর আর ফিরা্যা আসনের পথ নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সামান্য থেমে থু থু ফেললেন। তারপর আবার বললেন, 'কিন্তু ধরো, তোমার যদি অসুখ-বিসুখ হয়, বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত আহে। তহন তোমার মন হইব দুর্বল। একটা ভয় হইতে থাকব। এই দুর্বল মন, এই ভয় কিন্তু দরকার আছে। এইটা তোমারে পাপ হইতে, অন্যায় হইতে দূরে রাহে। সবাই বলে, মনে সাহস দরকার। আমিও তাই-ই মনে করতাম। কিন্তু গত কিছুদিন ধইরা আমার কি মনে হইতেছে জানো? আমার মনে হইতেছে, সাহসের চাইতে বেশি দরকার ভয়। একবার যদি তোমার মনের মইধ্যে থেকে ভয় চইলা যায়, তাইলেই সর্বনাশ।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'আপনের কি শরীল খারাপ খাঁ সাব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'একদম ঠিক ধরছ। যেইসব চিন্তা আমি আগে কহনো করি নাই। কাউরে তেঁজপাতার দাম পর্যন্ত দেই নাই। এহন আইসা সেইসব চিন্তা আমার মইধ্যে ঢোকছে। কত যে চিন্তা। শোনো মানুষ বলে না, জন্মের পর শিশুরা হইল গিয়া সব চাইতে নিষ্পাপ। তাদের জইন্য সবাইর মায়া হয়। আবার বৃদ্ধ অসহায় মানুষরেও কিন্তু দেখলে মনে হয়, আহারে! কি নিষ্পাপ দেখতে মানুষটা। তাগো জইন্যও মায়া হয়। এর কারণ কি জানো? কারণ ওই ভয়। ওই না-জানা। ধরো, একটা বাচ্চা, সে জগতের কিছুই জানে না, সে আন্ধার দেখলে ভয় পায়, অপরিচিত মুখ দেখলে ভয় পায়, জোরে শব্দ শুনলে ভয় পায়। কেন পায়? কারণ সে এইগুলান চেনে-জানে না। আবার একজন বুড়া মানুষও ভয় পায়। সে কিসের ভয় পায়? সে পায় আরেক জগতে যাওনের ভয়। সেও সেইখানে কিছু চেনে না, জানে না। আর মাঝখানের যেই সময়টা, যৌবনকাল, বা ধরো সুস্থ, শক্ত-সমর্থ থাহনের সময়টা, এই সময়টা মনে হয়, কোনোকিছুই কোনো ব্যাপার না। এই সময়টায় মানুষ এইজইন্য সবচাইতে বেশি সাহসী থাহে। সবচাইতে বেশি ভুল করে। অন্যায় করে। পাপ করে।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'জ্বে খাঁ সাব। ঠিক বলেছেন'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এইজইন্যাই মানুষের ভালো থাহনের লাইগা সবচাইতে বেশি দরকার বিপদ-আপদ। সবচাইতে বেশি দরকার অসুখ-বিসুখ। এইগুলান মানুষরে উপলব্ধি দেয়। এইটা জরুরি। ধরো, তুমি প্রত্যেকদিন আসমানের দিকে তাকাইয়া হাঁটতেছ। এহন তুমি যদি উষ্টা না খাও, তাইলে কয়দিন পর মনে ইচ্ছা হইব আসমানের দিক তাকাইয়া আরো জোরে হাঁটতে। তারপর ইচ্ছা করব দৌড়াইতে। তারপর একদিন ধরো গাড়ি চাপায় সব শেষ। কিন্তু আগে-ভাগে যদি দুয়েকটা উষ্টা খাইয়া পড়ত, তাইলে কিন্তু আর উপরে

চাইয়া দৌড়ানোর ইচ্ছা হইত না। এহন ধরো গাড়ির তলে পইড়্যা মরনের আগ মুহূর্তে যদি মনে হয়, আহারে ভুল কইর‍্যা ফালাইছি। আগেই যদি বুঝতাম। তাতে লাভ কি? সময় গেলে কি আর সাধন হয়?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'খাঁ সাব কি আইজকাল এইগুলান ভাইব্যাই সময় কাটান?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সময় কি কাটাব ফইর? সময় কি আর আছে? সময় কাটানোর কিছু নাই। সময় হইল এমন এক জিনিস, তুমি কাটাইলেও তার কিছু যায় আহে না, না কাটাইলেও কিছু যায় আহে না। সে কারো তোয়াক্কা করে না।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'আপনে কি এইসব কথা বলতেই ডাকছেন আমারে?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'একটা জিনিস খেয়াল করছ ফইর? আমি আইজকাল বাচাল হইয়া গেছি। সুযোগ পাইলেই খালি কথা কই। কোনো মানুষ বাচাল হয় জানো? যার কোনো কাজ নাই। অথর্ব লোকজন কথা বলে বেশি। কাজ করতে না পারার ব্যর্থতা ঢাকতে চায় কথা বইল্যা। আমি এহন অথর্ব মানুষের দলে।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'আপনে কিন্তু কথাগুলান খুব দামি বলতেছেন খাঁ সাব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমার কাছে এই কথা দামি মনে হইতেছে ফইর?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'জ্বে না খাঁ সাব'।

তৈয়র উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সেই জইন্যাই জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা ফইর তুমি কি পাপপূণ্যে বিশ্বাস করো?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'যে করি'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমার কি মনে হয় জীবনে তুমি কোনো পূণ্য করছ?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'জ্বে না খাঁ সাব'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'পাপ? পাপ করছ?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'জ্বে খাঁ সাব। আমার জীবন জুইড়াই পাপ'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমার ডর লাগে না?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'লাগে খাঁ সাব'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তারপরও পাপ কর্ম বন্ধ করো না কেন?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'এইটা একটা নেশার মতো খাঁ সাব। আপনে জানেন, নেশা করন খারাপ। কিন্তু এই নেশা থেইক্যা আপনে বাইর হইতে

www.boighar.com

পারবেন না। নেশা করলে তার পরিণতি খারাপ হয়, এইটা সবাই জানে। তারপরও করে। অনেক বড় বড়, জ্ঞানী-গুনী মানুষও করে। করে না? এই ধরেন সামান্য বিড়ি, সিগারেটের নেশা, প্যাকেটর গায়ে ছবি থাকে, কত কি লেখা থাকে, মানুষ তারপরও করে, করে না খাঁ সাব? করে। খারাপ কাজও ওইরকম। একটা নেশা। প্রত্যেকবার করনের পর মনে হয়, এইবারই শেষ। কিন্তু পরেরবার আবার করতে ইচ্ছা হয়। নেশা হইল এমন এক জিনিস খাঁ সাব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তুমি একটু আমার সামনে আসো ফইর। তোমার মুখটা সামনে আনো। তোমার লগে আমার জরুরি একখান কথা আছে। আব্দুল ফকির ভারি অবাক হলেন। কিন্তু তারপরও তিনি তার আসন থেকে উঠে তার মুখখানা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখের কাছে নিয়ে এলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আব্দুল ফকিরের মুখে প্রচণ্ড জোরে চড় বসালেন। আব্দুল ফকিরের দূরতম চিন্তায়ও ছিল না যে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তাকে চড় মারতে পারেন! তার চেয়েও বড় কথা এই বয়সে, এই অবস্থায় তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হাতে এই পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে, এটিও আব্দুল ফকিরের কাছে অচিন্তনীয় ছিল। আব্দুল ফকির ছিটকে পড়লেন ঘরের বেড়ার সাথে। তার মাথা ঠুকে গেল ঘরের টিনের বেড়ার সাথে। তিনি সেখান থেকে উঠলেন না। তার ঘোর এখনও কাটছে না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ফইর বসো। তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।'

আব্দুল ফকির অবাক করা চোখে উঠে তার আসনে বসলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তুমি রাইতে স্বপ্ন দেহো?'

আব্দুল ফকির হতভম্ব গলায় বললেন, 'জ্বে না খাঁ সাব'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমি দেহি। নানান স্বপ্ন দেহি আইজকাল। তোমারে থাপ্পড় মারছি দেইখ্যা মনে দুঃখ নিও না। গত রাইতে স্বপ্ন দেখছিলাম, তোমারে থাপ্পর মারছি, এইজইন্য স্বপ্নটা পূরণ করলাম। বুড়া মানুষ, আর কয়দিন বাঁচব বলো? তোমার তো খুব বেশি ক্ষতি হইল না। ব্যথাও বেশি পাও নাই, লোকজনেও দেহে নাই। আবার আমার স্বপ্নটাও পূরণ করলা। কি বলো ফইর?'

www.boighar.com

আব্দুল ফকির কথা বললেন না। তার হতভম্ব ভাব এখনো কাটেনি।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তাছাড়া নেশা কাটনের দরকার আছে, আছে না? নেশা কাটাইতে এইরম দুয়েকখান চড়-থাপ্পড় দরকার আছে। আরেকখান কথা, আইজকাল অনেক ভাবনা চিন্তা করি আমি, বুঝলা ফইর? নানান জিনিস। এর মইধ্যে একটা হইছে, মানুষের জন্ম আর মৃত্যু। চিন্তা কইরা দেখছ, জন্ম মৃত্যু কিন্তু একদম একই রকম নিয়মে হয়। এই সময়ের ঘটনাও সব এক। ধরো জন্মের সময় মানুষ অসহায় থাহে, মৃত্যুর সময়ও অসহায় থাহে, দুর্বল

থাহে। বিচার বুদ্ধি কম থাহে। অন্যের উপর নির্ভরশীল থাহে। কথা ঠিক না ভুল?'

আব্দুল ফকির কথা বললেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আরেকটা জিনিস, জন্ম হইল একধরনের মৃত্যু। ধরো সে মায়ের প্যাটে আছিল। কোনো ভাবনা-চিন্তা আছিল না। খাওনের চিন্তা নাই, পরনের চিন্তা নাই। ঘর-বাড়ির চিন্তা নাই। নিশ্চিন্তের দুনিয়া। তোমার জন্ম হইল মানে সেই নিশ্চিন্তের দুনিয়ারতন তোমার মরন। আবার মরন মানে হইল এই চিন্তার দুনিয়ারতন তোমার মরন। তুমি যাইতেছ আরেক দুনিয়ায়। এইটা একটা চক্করের মতো। পুরা জীবনটাই একটা চক্কর। একই জিনিস বারবার বারবার ঘটে। এই যে ধরো তোমারে আমি থাপ্পড় দিলাম, এইটাও একটা চক্কর। তুমিও কোনোদিন হয়তো আমারে একখান থাপ্পড় দিছিলা, থাপ্পড় মানেই যে শুধু হাত দিয়া গালে মারন, তা না। থাপ্পড় নানানভাবে দেওন যায়। যাই হোক। সেই চক্করের কারণেই ধরো থাপ্পড় তোমার কাছে ফিরা আসলো।'

আব্দুল ফকির নিজের উপর বিরক্ত। তিনি বিভ্রান্ত বোধ করছেন। এই ব্যাপারটা আগে কখনো হয়নি তার। কিন্তু গত কয়েকদিনে বার কয় এই ঘটনা ঘটল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার তৈয়ব উদ্দিন খাঁর উদ্দেশ্য তিনি ধরতে পারছেন না। তার ধারণা ছিল তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার সাথে ফজু সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলবেন। কিন্তু তিনি সে সবের কিছুই বললেন না। এমনকি গয়নার কলসির বিষয়ও না।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমার ধারণা সত্য। তোমার সম্পর্কে আমার একটা ভয় আছে। এই ভয়টা আমি কাটাইতে পারি নাই ফইর। কিন্তু শ্যাষ কিছুদিন বিছানায় শুইয়া শুইয়া খেয়াল করলাম, আমার চিন্তা-ভাবনা খোলতেছে। নানা আচানক বিষয়াদি মাথায় আসতেছে। তার মইধ্যে একটা হইছে, যেই লোক আইজ বাদে কাইল মরব, তার আর ভয় কি? মরনের চাইতে বড় আর কি আছে ফইর?'

আব্দুল ফকির চুপ।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'চিন্তা-ভাবনা কইরা আরো কি বাইর করলাম জানো? কয়দিন আগে শোনলাম, ফজুর ঘরের পাতিলের ভেতর নাকি সাপ পাওন গেছে। তুমি নাকি সাপের বিষ নামাইতে আইস্যা বলছ, ওই সাপে সালেহারে কাটে নাই। ও সাপ নাকি আলাদা কোনো সাপ। সারাদিন শুইয়া থাহি তো। ঘটনা মাথায় ঘোরে, আর চৌক্ষের সামনে পরিষ্কার হইয়া যায় ফইর। আমার ধারণা এই কাজ তুমি ঘটাইছ। ওই সাপ ফজুর ভাতের পাতিলে রাখনের ব্যবস্থাও তুমি করছ। তোমার ধারে তো বিষদাঁত ভাঙ্গা বহুত সাপ

আছে। আছে না? তো ফজুর লগে এই খেলা কেন খেললা? গয়নার কলসির খবরের জইন্য? ফজু তো বলল ওই কলসি তোমার ধারেই আছে।'

আব্দুল ফকিরের জীবনে নিজেকে কখনো এত অসহায় বা বোকা লেগেছে কিনা, তা তিনি জানেন না। এই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আগের যে-কোনো তৈয়ব উদ্দিন খাঁর চেয়ে ভয়ঙ্কর। এই তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কাছে নিজেকে দুধের শিশু মনে হচ্ছে আব্দুল ফকিরের। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ফজু তোমারে কি বলছে? গয়নার কলসি খাঁ-বাড়িতে?'

আব্দুল ফকির যেন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছেন। তৈয়র উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ফজু আমারে মিথ্যা বললেও তোমারে মিথ্যা বলে নাই। কলসি খাঁ-বাড়িতেই আছে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ থামলেও আব্দুল ফকির কথা বলার কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না। আর কখনো এমন পরাজিত, বিধ্বস্ত, অসহায় তিনি বোধ করেছেন কিনা, আব্দুল ফকির জানেন না।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমারে আমি বিশেষ কোনো কাজে ডাকি নাই ফইর। তোমার এই চেহারাখান দেখার জইন্য ডাকছিলাম। এইরম চেহারা আর কেউ তোমার কহনো দেখছে কিনা জানি না। মরনের আগে একটা বড় অশান্তি থেইক্যা মুক্তি পাইলাম আমি। তোমার এই মুখখান আমার শান্তি। আর এতক্ষণ যে বললাম না, মানুষের জীবনে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত দরকার আছে। সেই সাথে হারও দরকার আছে। খালি জেততে থাকলে সমস্যা। তুমি তোমার সারাজীবন খালি জেতছ ফইর। এইজইন্য আইজ এই ছোট্ট হারখান দিলাম। তয় যার বড় জিত আছে, তার হারও কিন্তু বড় হইব ফইর। চক্করের জীবন। ঘুইর‍্যা ফির‍্যা তোমার জিনিস তোমার ধারেই ফেরত আইব।'

বাকি সময় আব্দুল ফকির একটা কথাও বললেন না। তিনি খাঁ-বাড়ি থেকে বের হলেন সন্ধ্যার আগে আগে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মসজিদে গিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে বাড়ি ফিরে আমোদি বেগমকে ডাকলেন। তারপর একখানা পান মুখে দিয়ে বললেন, 'ফজুর গয়নার কলসি কই রাখছ আমোদি বেগম?'

আমোদি বেগম একটা ঝাঁকির মতো খেলেন। তারপর বললেন, 'কিয়ের গয়না?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নির্বিকার গলায় বললেন, 'ফজুর গয়না'।

আমোদি বেগম বললেন, 'সেই গয়না আমি পাব কই?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'গয়না সালেহা তোমারে দিয়া গেছে। ফরাজিগো কল নষ্ট হওনের কথা বইলা সে কলস লইয়া আমাগো টিউবওয়েলে আসছিল পানি নিতে। আসলে পানি টানি কিছু না। ফরাজিগো কল নষ্টও হয় নাই। সে

ওই ছুঁতা দিয়া পানি নেওনের নাম কইরা কলস নিয়া আইছে। সেই কলসে আছিল সেই সোনার গয়না। সে আসছে এক কলস লইয়া, গেছে অন্য কলস লইয়া। সোনার কলস তোমার কাছে জমা দিয়া, তোমারতন অন্য কলস লইয়া গেছে। বুদ্ধি ভালো। মনির যহন তল্লাশি চালাইল। সে পুরা গ্রাম তন্নতন্ন করল, প্রত্যেক ঘর। কিন্তু কলসি তার নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি তো আর তল্লাশি করন যায় না। এই চিন্তা তো কারো মাথায়ই আসব না। কি কথা ভুল বললাম?'

আমোদি বেগম বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে তার অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে এই লোক তার ওই সুতীক্ষ্ণ চোখে তার শরীর ভেদ করে অন্তরাত্মা অবধি দেখতে পাচ্ছেন।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'ফজু তোমারে এত বিশ্বাস করল, ওই কলসি তোমার ধারে রাখতে দিলো? তুমি যদি এহন না বলো, তাইলে তো অর আর কিছুই করনের থাকব না? শোনো আমোদি বেগম, যহন জিনিসটা আমার মাথায় ঢুকল, তারপর থেইক্যা এই একখান হিসাবই আমি মিলাইতে পারি না। এই হিসাবখান আমারে খুব যন্ত্রণা দিছে। মানুষ এত বড় বিশ্বাস মানুষরে কেমনে করে?'

আমোদি বেগম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো কথা বললেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমার এক অসুখ হইছে আমোদি বেগম। চিন্তা অসুখ। সারাক্ষণ মাথায় খালি চিন্তা। তোমার এই ঘটনা চিন্তা কইরা একখান বিষয় আবিষ্কার করলাম, এই দুনিয়ায় আমার মতো মনে হয় আর কেউরে কেউ অবিশ্বাস করে নাই। তুমি আমার স্ত্রী, আমার উপর তোমার অবিশ্বাস। একটা মাইয়া আছিল, তার অবিশ্বাস। দুইটা পোলা, তাদেরও অবিশ্বাস। তাগো বাপ তাগো কোনোদিন ভালো পায় নাই। চাইরপাশের মানুষের অবিশ্বাস। কি এক আচানক অবিশ্বাসের জীবন আমার, না?'

আমোদি বেগমের হঠাৎই মনে হলো, তার সামনের এই মানুষটা সেই এত বছরের চেনা পুরনো তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নন। এই মানুষটা নতুন একটি মানুষ। নতুন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমারে আরেকখান কথা বলি। আমি অনেকদিন ধইরাই বোঝার চেষ্টা করছি, ফজুর ঘটনা। ফজুর বড় ভাই নজু, নজরুল। ঢাকার শহর থাহে। সে নাকি প্রায়ই কোহিনূরের বাসায় যাইত। এই ঘটনা আমি এতদিন জানতাম না। হেইদিন নজুরে দেইখ্যা নয়ন বলল এই কথা। ঘটনা কি? মা-মাইয়া মিল্যা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছ? ফজুর লগে তোমাগো আঁতাত কীসের? যদিও আন্দাজ করতেছি, তারপরও বলো, তোমার মুখেরতনই শুনি।'

আমোদি বেগম এতক্ষণে কথা বললেন। তিনি ধীর পায়ে হেঁটে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'আপনেরে এতদিন এই

www.boighar.com

কথা বলনের সাহস পাই নাই। কিন্তু আইজ আপনেরে দেইখ্যা মনে হইতেছে আপনেরে বলন যায়। ফজলুর বাপ বজলু ব্যাপারীর খুনটা কোহিনূর মাইন্যা নিতে পারে নাই। তার খালি মনে হইছে, খুনটা হইছে তার কারণে। তারপর আপনে যহন এতিম পোলাপানগুলার জমিজমা দখল করলেন, ঘরবাড়ি ছাড়া করলেন। এইটাও কোহিনূর মানতে পারে নাই। তার খালি মনে হইছে, এইগুলান সব তার জইন্য হইছে। সে যদ্দুর পারত তাগো পয়সাপাতি দিয়া সাহাইয্য করত। তার বুদ্ধিতেই নজু গ্রামে আইছে। ফজু জমিজমার লাইগ্যা মামলা-মোকদ্দমা করতে গেছে। কোহিনূর আপনেরে কোনোদিন কিছু বলব না। কিন্তু সে সারাটা জীবন চাইছে...'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হঠাৎ হাত উঁচু করে আমোদি বেগমকে থামালেন। তারপর বললেন, 'তুমি কোহিনূররে জানাই দিও। আর কিচ্ছু করন লাগব না। ফজুগো সব জমিন আমি ফিরাই দিতেছি। জান ফিরাই দেওনের ক্ষমতা আল্লায় আমারে দেয় নাই। সম্পদ ফিরাই দেওনের ক্ষমতা আল্লায় আমারে দিছে। আমি ফিরাই দিব।'

আমোদি বেগম খুব ধীরে তার হাতখানা তুললেন। তারপর আলতো করে সেই হাতখানা রাখলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কাঁধে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অনেকটা সময় চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর তার ডান হাতখানা তুলে কাঁধের উপর রাখা আমোদি বেগমের হাতখানা স্পর্শ করলেন। আমোদি বেগম যেন এই স্পর্শের ভাষা বুঝলেন। পরস্পরের ভাষা বুঝল ভাঁজ পড়ে যাওয়া চামড়ার দু'জোড়া কোঁচকানো হাত। তারা পরস্পরকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। শক্ত করে। তারপর সেই ভাঁজ পড়া হাতের চামড়ারা পরস্পরের রেখায় মিশে গিয়ে যেন বলে যেতে থাকল একজনমের সকল অব্যক্ত কথা। সকল অব্যক্ত ব্যথা। সকল না বলা গল্প। সেই গল্পের নামই জনম । মানবজনম।

সকালের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে উঠানে। সেখানে একটা বড় সাদা মুরগি আর তার বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়েছে পারুল। তাদের সামনে চালের খুদ ছড়িয়ে দিয়েছে তাবারন। মুরগির বাচ্চাগুলো তা খুটে খুটে খাচ্ছে। একটা বাচ্চা খানিক দুর্বল। সে আর সব বাচ্চাদের সাথে সমানতালে লড়াই করে খেতে পারছে না। মা মুরগিটা খাওয়া বাদ দিয়ে কিছুক্ষণ সেই বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে বাচ্চাটার কাছে দাঁড়াল। মাকে দেখেই বাচ্চাটা ঠোঁট ফাঁক করে মায়ের দিকে ঠোঁটটা বাড়িয়ে দিলো। মা মুরগিটা তার ঠোঁটে একটা দুটা খুদ নিয়ে বাচ্চাটার ঠোঁটের কাছে ধরল। বাচ্চাটা টুক করে টুকরে নিলো চালের কণা। পারুল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মা আর সেই বাচ্চাটার দিকে। পারুলকে চমকে দিয়ে আর বাচ্চাগুলোও নিমিষেই তাদের খাওয়া ছেড়ে মায়ের কাছে ছুটে এলো। মায়ের মুখের কাছে ছোটখাটো একটা ভিড় লেগে গেছে। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কত খাবার, কিন্তু কারোরই যেন সেখান থেকে খুঁটে খাবার কোনো তাড়া নেই। সকলেই মায়ের ঠোঁট থেকে খাবে। পারুল দীর্ঘ সময় সেই বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ কেন যেন মন খারাপ হয়ে গেল পারুলের। সে উঠে অবিন্যস্ত পায়ে ঘরের ভেতর গেল। তারপর বহুদিন পরে নুরুন্নাহারের বন্ধ ঘরটা খুলে ভেতরে ঢুকল। ঘরটা দীর্ঘদিন থেকেই বন্ধ। ভেতরে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। কিন্তু সেই গন্ধের ভেতরই আবছা অন্ধকারে বসে রইল পারুল।

আচ্ছা, সে এমন কেন? এমন অস্থির, এমন অপরিনামদর্শী, এমন অননুমেয়? এই এতটা দিন মা নেই! কিন্তু সে কি মাকে নিয়ে সেভাবে আর কখনো ভেবেছে? মায়ের অভাব অনুভব করেছে? পারুল ভেবে দেখল, না করেনি। মা মারা গেছেন, সেই সময়টা দিন কয় বিষয়টা সে মেনে নিতে পারেনি। মায়ের জন্য কেনা শাড়িটা মা এত করে পরতে চাইলেন, কিন্তু মানুষটার সেই ইচ্ছেটাও অপূর্ণই থেকে গেল। তার কারণেই কি? এই কষ্টটা

www.boighar.com

তার মধ্যে ছিল। খুব করেই ছিল। আর সেই কষ্টেই সে ডুবে ছিল বেশ কয়েকটা দিন। কিন্তু তারপর আর তার জীবনে মা কোথায়? মায়ের অভাব কোথায়? মায়ের অভাবটা তো মুহূর্তের জন্যও আর টের পায়নি সে। কেন এমন হলো? আর দশটা সন্তানের মতো সে কেন নয়? কত মানুষের মা মারা যেতে সে দেখেছে! মায়ের জন্য সেইসব মানুষের কান্না, শোক, কষ্ট দেখে পারুল বিস্মিত হয়েছে। বারকয়েক অবচেতনে এই ভাবনা তার মনেও এসেছে যে সে কি তার মায়ের জন্যও অন্যদের মতো অমন অনুভব করে? নাকি করে না? না করলে কেন করে না?

এই ভাবনাটা মা মারা যাওয়ার পরও বেশ কিছু দিন তাকে তাড়া করেছে। আসলে মা তার কাছে একটা দরজা বন্ধ ঘরের নাম কেবল। সেই ঘরের ভেতর কেউ একজন আছে, যে তার মা। এর বাইরে আর কোনো ভাবনা হয়তো সেভাবে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়নি বলেই কি সে মায়ের ঘরটা এমন করে বন্ধ করে রেখেছে? নিজের ভেতর অজান্তেই কি তার মনে হচ্ছে, ঠিক আগের মতোই এই বন্ধ দরজার ঘর মানেই তার মা? হয়তো এইজন্যই এতদিনেও সে আর এই দরজাটা খোলেনি। যদি দরজা খুলেই দেখে মা নেই! এই ভয়টা কিসের? মা নেই বলে কষ্টের? নাকি মার জন্য তার কষ্ট বা অভাব অনুভূত না হওয়ার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর?

পারুল জানে না। তবে আজ এই ঘরটা শূন্য দেখে তার বুকের ভেতর এক পশলা হু হু করা হাওয়া কেমন মাতম তুলে গেল। পারুল মায়ের চৌকির তলায় রাখা ট্রাঙ্কটা খুলল। এই ট্রাঙ্কটা কখনোই খোলা হয়নি তার। ট্রাঙ্ক ভর্তি কত কত জিনিসপত্র যে নুরুন্নাহার সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন। দেখে পারুল ভারি অবাক হলো। বাইরে অগোছালো ওই মানুষটা ট্রাঙ্কের ভেতরটা এমন গুছিয়ে রেখেছেন, দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। ট্রাঙ্কের ভেতরে একখানা ছোট গোল আয়না। আয়নার ফ্রেমটা পেতলের। কত বছর আগের কে জানে, কিন্তু এখনো ঝকমক করছে তা। একটা কাঠের ছোট্ট বাক্স। বাক্সটা খুলল পারুল। বাক্সের ভেতর কত কত জিনিস যে মা জমিয়ে রেখেছেন! দুই গাছি রূপার চুড়ি, একটা নাকফুল, কানের দুল। একজোড়া মোটা বালাও রয়েছে। তবে পারুলের চোখ কাড়ল একটা নাকের নোলক। সে নোলকটা হাতের তালুতে নিয়ে দেখল। মাকে কখনোই এসব পরতে দেখেনি পারুল। সম্ভবত তার বিয়ের সময়কার জিনিস এগুলো। বিয়ে নিয়ে নুরুন্নাহারের কোনো সুখস্মৃতি কখনোই দেখেনি পারুল। কোনো আগ্রহও ছিল না বিয়ের কোনো জিনিসপত্র নিয়ে। বরং তার জীবনের সবচেয়ে অভিশপ্ত ঘটনাই যেন ছিল বিয়েটা। সারাজীবন তাই নিয়েই হাপিত্যেশ করতে দেখেছে সে। অথচ কি যত্ন করেই না তিনি এসব লুকিয়ে রেখেছিলেন তার গোপন কুঠুরিতে।

একখানা লাল টুকটুকে শাড়িও রয়েছে ট্রাঙ্কটায়। শাড়িখানা বলতে গেলে একদমই নতুন। ভেতরে ন্যাপথেলিনের সুবাস। পারুল সেই শাড়িখানা হাতে নিলো। এই শাড়িখানাও মাকে কখনোই পরতে দেখেনি পারুল। কিন্তু এত যত্ন করে কেন সব সাজিয়ে রেখেছিলেন মা? সেই প্রশ্নের উত্তরটিই যেন এই শাড়িখানা। পারুলের মনে পড়ে, সুস্থ থাকলে প্রায়ই নুরুন্নাহার বলতেন, 'তোর বিয়া তো দেইখ্যা মরতে পারব না। সেই কপাল লইয়া তো আর দুনিয়ায় আহি নাই। আর বাইচ্যা থাকলেই কি? মাইয়ার লাইগ্যা তো শখ-আহ্লাদ করনের কোনো ভাগ্য আল্লায় আমারে দেয় নাই। তয় তোর লইগ্যা আমার একখান জাদুর বাক্স আছে!'

এই বলে নুরুন্নাহার মন খারাপ করে ফেলতেন। কেঁদেও ফেলতেন। বলতেন, 'আমার কপালে কি কিছু আছিল যে আমার জাদুর বাক্সভর্তি বড়োসড়ো কোনো জাদু থাকব! আছিল না। তয় মায়া আছে গো মা! সেই জাদুর বাক্সভর্তি মায়া আছে!'

মা মাঝে-মধ্যে এমন এমন সব কথা বলতেন। পারুল তার আগামাথা কিছুই বুঝত না। কিন্তু আজ সেই জাদুর বাক্সখানা খুলে তার মনে হলো, সেই মায়া সে স্পর্শ করতে পারছে। মা এই ট্রাঙ্কের ভেতর কী যত্ন করেই না সেই মায়াদের থরে থরে লুকিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। আহারে মা! মাগো!

পারুল মায়ের শাড়িখানা দু'হাতে ধরে অনেক সময় বসে রইল। সেই শাড়ির সুতোর গাঁথুনিতে গাঁথুনিতে যেন মায়ের স্পর্শ লেগে আছে। পারুল হয়তো হাত বুলিয়ে সেই স্পর্শ বোঝার চেষ্টা করল। তারপর শাড়িখানায় মুখ চেপে বসে রইল পারুল। আর ঠিক তখুনি তার মনে হলো, সে মায়ের শরীরের ঘ্রাণ পাচ্ছে। মায়ের আঁচলের ঘ্রাণ। মায়ের স্পর্শের ঘ্রাণ। মায়ার ও মমতার ঘ্রাণ।

প্রায় সারাটা দিনই পারুলের কেটে গেল মায়ের ঘরে। দুপুরেরও অনেক পরে সে নুরুন্নাহারের ঘর থেকে বের হলো। তারপর গোসল সেরে সামান্য খেয়ে যখন উঠানে চুল শুকাতে বের হলো, তখন তার হাতে নুরুন্নাহারের ট্রাঙ্কে পাওয়া সেই ছোট্ট পেতলের আয়না আর নোলকখানা। দুপুর কেবল পড়ে এসেছে, তবে শীতের দিন বলে রোদের শরীর জুড়ে এত তুলতুলে আরামদায়ক ওম! সে উঠানে একটা পাটি বিছিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। তারপর তাবারনকে ডেকে বলল নোলকটা পরিয়ে দিতে।

তাবারন বলল, 'মরা মাইনষের জিনিস পরন ভালো না। তাইলে শইলে তার ছ্যাৎ লাগে।'

পারুল বলল, 'লাগুক পারুল খালা। শরীলে ছ্যাৎ লাগন ভালো।'

তাবারন বলল, 'মাইয়া মাইনষের এই শরীলখানই আসল। শরীলে ছ্যাৎ লাগলে আর তার থাকল কি? পুরুষ মাইনষের ধারে তহন আর তার এক পয়সা দামও থাহে না।'

পারুল বলল, 'তোমার শরীলে তো ছ্যাৎ লাগছে। তোমার দাম কি কমছে?'

এই প্রশ্নে তাবারন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পারুল এই কথা কেন বলল? সে কি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে কথাটা বলেছে? তাবারন মিনমিন করে বলল, 'আমার শরীলের আর দাম কি? পোলা মাইয়া হইল না। বিয়া টেকল না। এই শরীলের আর দাম কি? তোমরা আবিয়্যাইত্তা মাইয়া। চেহারা ছবি ভালো। পরিবার ভালো। তোমাগো শরীলের দাম বেশি।'

পারুল বলল, 'মাইয়া সেয়ানা হইল। যৈবতি মাইয়া। এহনও তার বিয়া-শাদির কোনো ব্যবস্থা করলেন না। দামী শরীল থাইক্যাই কি হইল খালা? যৌবন থাকতে কেউ না আইলে, শরীল দিয়া কি করব? ফুল শুকাই গেলে কি আর ভ্রমর আহে?'

তাবারন বলল, 'তওবা, তওবা। তুমি এইইগুলান কি কও পারুল? তোমার মুখে আল্লায় লাজ-শরম বলতে কিছু দেয় নাই?'

পারুল বলল, 'লাজ-শরম দিয়া কি হইব খালা? প্যাটে খিদা রাইখ্যা যদি মুখে কন প্যাট ভরা, তাইলে কি প্যাট ভরব? এই যে আপনে জুয়ান একটা মাইয়া। কতবছর ধইর‍্যা এই বাড়িতে থাকেন। পুরুষ মানুষ ছাড়া আপনের কষ্ট হয় না?'

তাবারন পারুলের মতিগতি কিছু বুঝতে পারছে না। এই মেয়েকে তার সব সময় ভয়। এ কখন কি করে ফেলে, বলে ফেলে তা সে নিজে যেমন জানে না, অন্যরাও জানে না। সবচেয়ে বড় কথা তার পিতা আব্দুল ফকির দশগ্রামের মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খান, কিন্তু মেয়ের কাছে এলেই যেন লেজ গোটানো বাঘ।

তাবারন বলল, 'তুমি এইগুলান কি কও পারুল?'

পারুলের নাকে নোলক পরানো শেষ হয়েছে। সে নোলকটা আয়নায় দেখতে দেখতে বলল, 'মাইনষে কানাঘুষা করত, আপনের লগে ন্যাকি আমার ব্যাপের কী সব সম্পর্ক আছে! কথা সত্য? এইজইন্যই নাকি আপনের বিয়া ভাঙছে। পোলামাইয়া হয় না। আমার মায়ও নাকি এইজইন্যইও আপনের বুকে ছ্যাৎ দিছিল। তা আমার বাপের ঘটনা কি সত্য? সে নাকি আগেও বাড়িতে কাজ কামে রাইখ্যা অনেক মাইয়াগো লগে এমন করছে?'

তাবারন বুকের ভেতরটা মুহূর্তেই শুকিয়ে এলো। সে তারপরও যতটা সম্ভব গলা উঁচু করে বলল, 'পারুল, তোমাগো বাড়ি দুইটা ডাইল ভাত খাইয়া বাইচ্চা আছি দেইখ্যা ভাইব না, যা মন চায় তাই বলবা! আমি পাড়ার বেশ্যা মাগি না

পারুল। আর কার কপালে কহন কি হয়, কওন যায় না। মাইনষেরে ছোট কইরা কথা বলবা না। আল্লার মাইর, আলমের বাইর।'

পারুল তাবারনের কথা গ্রাহ্য করল না। সে আয়নায় চেহারা দেখতে দেখতেই বলল, 'ঘরেরতন একখান লাল টিপ আনেন তো তাবারন খালা। দেহি টিপ দিয়া জোয়ান মর্দগো ধরনের লইগ্যা বড়শি পাতন যায় কিনা?'

তাবারন বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে উঠে গেল। সে টিপ নিয়ে এসে বসতেই পারুল বলল, 'আপনের উপর আমার মায়ের এত রাগ আছিল ক্যা খালা? ঘটনা কি কন তো?'

তাবারন বলল, 'পাগল মানুষ। কার উপর কহন রাগ হইত, কওন যাইত? তুমি তো তার নিজের মাইয়া আছিলা, তোমারেও তো ছাড়ে নাই। দাও দিয়া কোপাইছে!'

পারুল বলল, 'আমারে তো কোপাইছে আপনের লইগ্যাই। তা খালা, আইজ সারাদিন মায়ের ঘরে বইস্যা আছিলাম। বইসা থাকতে থাকতে মাথায় একখান চিন্তা আইল। দেহেন তো বিবেচনা কইরা, চিন্তাখান কেমন?'

তাবারন বলল, 'আবার কি চিন্তার কথা বলবা, কে জানে! তোমার মায়ের মতো তোমার মাথায়ও গণ্ডগোল আছে পারুল। এহন বয়স কম টের পাও না। কিন্তু যহন পাইবা, তহন আর সময় থাকব না।'www.boighar.com

পারুল বলল, 'আগে তো শোনেন। বিবেচনা কইরা বলবেন, আমার বুদ্ধি কেমন?'

তাবারন কোনো কথা বলল না। পারুল বলল, 'আমার মায় এমনে এমনে মরে নাই। তারে কেউ মারছে। যে মারছে, সে চায় নাই আমার মা সুস্থ হোক। তাতে তার অসুবিধা। যহন সে শুনছে যে আমি আমার মায়রে ঢাকা লইয়া যাব চিকিৎসা করাইতে, তহনই তার মাথাডা গেছে গরম হইয়া। এইজন্য সে আমার মায়রে খুন করছে। কি বলেন, চিন্তাটা কেমন? বিচার বুদ্ধি খাটাইয়া বলবেন।'

তাবারন নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সে বলল, 'এইসব কি কথা বলো পারুল? তোমার মায়ের লগে এমন শত্রুতা কার থাকব? আর কেডা তারে মারতে আইব? তার ঘর আছিল ভেতরতন বন্ধ।'

পারুল তাবারনকে বলল, 'আগে ঘরেরতন আমার লিপিস্টিকটা নিয়াসেন খালা। ঠোঁটে একটু রঙচঙ মাইখ্যা দেহি, আমারে দেখতে কেমন লাগে। বুড়া মর্দ ধরতে এইসব রং ঢং লাগে না, শরীল হইলেই হয়। কিন্তু জোয়ান মর্দ ধরতে নানান রং ঢং জানন লাগে। যান, আমার লিপস্টিকটা লইয়া আসেন।'

তাবারন রাজ্যের বিতৃষ্ণা নিয়ে পারুলের দিকে তাকাল। তারপর পারুলের ঘর থেকে লিপস্টিক এনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। পারুল বলল, 'ও তাবারন খালা,

আপনে এত তাড়াহুড়া করেন ক্যা? দুইটা কথা শুইন্যা যান। আপনের বিবেচনা কি বলে বইলা গেলেন না তো। আর আমার কথা তো এহনও শেষ হয় নাই।'

তাবারন দাঁড়াল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। পারুল সময় নিয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক মাখল। তারপর আয়নায় ভালো করে দেখল। তারপর কপালে সরে যাওয়া টিপখানা ঠিক করতে করতে বলল, 'আমার মায়র উপর সবচাইতে বেশি রাগ আছিল আপনের। সে আপনের শরীলে আগুনের ছ্যাৎ দিছে। পুরুষের লইগ্যা মাইয়া মাইনষের শরীলে তার বুকের মতো দামী আর সোন্দর জিনিস আর কি আছে কন! আপনের তো ওই জিনিস আরো বেশি দরকার আছিল। সেই জিনিস পুইড়্যা দাগ বানাই দিলো। রাগ তো আপনের থাকবই। এতে তো দোষের কিছু নাই। ঠিক না তাবারন খালা?'

তাবারন জবাব দিলো না। পারুল বাঁ হাতে তার চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'চুলে তেল দিয়া দেন তো খালা। তেল দিলে এই রইদে চুল কেমন ঝকমক করব দেইখেন।'

তাবারন কোনো কথা বলল না। তবে ঘর থেকে তেল এনে পারুলের পেছনে বসে চুলে তেল দিতে লাগল। পারুল আয়নায় চেহারা দেখতে দেখতে বলল, 'আমার ধারণা আমার মায়রে খুন করছেন আপনে। এইটা আইজকা আমার মায়ের ঘরে বইস্যা বইসা আমার মনে হইছে খালা। আপনে চিন্তা কইরা বলবেন, আমার বুদ্ধি কেমন। আমার বুদ্ধিমতে, আপনে সেইদিন রাইতে মায়ের ভাতের মধ্যে বিষ জাতীয় কিছু মিশাই দিছিলেন। সহজ কাম। মায় ভালো হইলে আপনের নানান সমস্যা। আরো অনেকেরই সমস্যা। সে না থাকলে অনেক সুবিধা। আর কামটাও খুবই সহজ। সহজে কঠিন সমস্যার সমাধান। কথা ঠিক কিনা বলেন? আমার বুদ্ধি কেমন?'

বুকের ভেতর ধপ করে একটা বিশাল পাথর পড়ে যেন তাবারনের দম আটকে দিলো। সে হঠাৎ চিৎকার করে কান্না শুরু করল। তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বুক চাপড়াতে লাগল। পারুল অবশ্য তার জায়গা থেকে উঠল না। সে মনোযোগ দিয়ে আয়নায় তার চেহারা দেখতে লাগল। তাবারন দীর্ঘ সময় মাটিতে শুয়ে চিৎকার, চেচামেচি কান্নাকাটি করল। সে এই পুরোটা সময় আল্লাহর কাছে বিচার দিলো। তার নামে যারা এত বড় মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আল্লাহ যেন তাদের বিচার করেন। এমন আরো অনেক কিছু। তাবারন ভেবেছিল পারুল তাকে মাটি থেকে উঠাবে। কিন্তু পারুল তেমন কিছুই করল না দেখে শেষ অবধি সে নিজে নিজেই উঠে বসল। খানিক শান্ত হলো। তবে তখনও গুনগুনিয়ে কেঁদে যাচ্ছিল সে।

পারুল জিনিসপত্র গুছিয়ে পাটি থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'তাবারন খালা, সন্ধ্যা হইয়া গেছে, ভাত চড়ান। আর আপনের লগে মশকরা করছি। কোনডা মশকরা আর কোনডা আসল, তাও বোঝেন না? ওঠেন ওঠেন। ভাত চড়ান।'

তাবারন বড় বড় চোখ করে পারুলের দিকে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটা এমন কেন? সে আসলেই মশকরা করেছে? নাকি? তাবারন কিছুই বুঝতে পারছে না। সে রাজ্যের বিভ্রান্তি নিয়ে ধুলোমাটি ছেড়ে উঠল। তারপর রান্না চড়াতে গেল।

পারুলের কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে! এই অনুভূতির কোনো ব্যাখ্যা পারুলের কাছে নেই। সে কি করছে, কি বলছে, তাও যেন সে জানে না। তবে পারুলের কেন যেন মনে হচ্ছে, খুব শীঘ্রই একটা বড়োসড়ো সংবাদ তার জন্য অপেক্ষা করছে। সেই সংবাদটা হবে তার জন্য খুবই ভালো।

সংবাদটা এলো সন্ধ্যাবেলা। সংবাদ নিয়ে এলো লতা। রাজীব ফোন দিয়েছিল, সে পারুলকে না দেখে থাকতে পারছে না। আগামী পরশুর পরের দিন শুক্রবার সে আবার ঢাকা থেকে আসবে। তার আগের দুই দিন যেন সে লতার সাথে তার নানাবাড়ি গিয়ে থাকে। রাজীব সত্যি সত্যি এমন কথা বলেছে কিনা, পারুল জানে না, তবে লতা বলল, পারুলের কণ্ঠ শোনার তেষ্টায় নাকি রাজীবের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেই রাতেই। গভীর রাতে শুরু হলো তার ঘাট বমি। সকাল থেকে নড়াচড়ার শক্তিও অনেকটা কমে গেল। দুপুরে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আবারো আমোদি বেগমকে ডাকলেন। তার কথা বলার শক্তিও খুব একটা নেই। তারপরও মনের জোরেই তিনি আমোদি বেগমকে পাশে বসতে বললেন। আমোদি বেগম বসলেন তার সিথানের পাশে। তৈয়ব উদ্দিন ফ্যাসফ্যাসে মৃদু গলায় বললেন, 'আমি বুইঝ্যা শুইন্যা একখান বড় ভুল করছি আমোদি বেগম।'

আমোদি বেগম বললেন, 'কি ভুল?'

তৈয়র উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এই ভুলের নাম মনির। আমি আরো একজন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বানাই রাইখ্যা গেলাম। এইটা আমার অন্যায় হইছে। বড় অন্যায়। তারে থামানোর ক্ষমতা আমার আর নাই আমোদি বেগম।'

আমোদি বেগম বললেন, 'কি বলেন আপনে? সে তো সহজ সরল পোলা।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'সহজ-সরল বইল্যাই তারে আমি কাদামাটির লাহান মনের মতো কইরা বানাইতে পারছিলাম। সহজ-সরল না হইলে পারতাম না। কিন্তু এহন সে ফণা ধরা গোখরা সাপ। তারে সামলানোর মতো সাপুইড়্যা আর নাই।'

আমোদি বেগম বললেন, 'এইসব কি বলেন আপনে?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমি ঠিক বলতেছি আমোদি বেগম। তুমি তাড়াতাড়ি ফজুর সাথে যোগাযোগ করো। তারে বলো কাজগপত্রের ব্যবস্থা করতে। আমি তারে জমি লেইখ্যা ফেরত দিব। আরেকখান কথা, আমার জমিজমার কাগজপত্র যে কিছুই নাই, তা না। কাগজপত্র কম বেশি আছে। ওইটা মইধ্যের ঘরের সিঁড়ির নিচের সিন্দুকে। আমার মাথার বালিশের নিচে সিন্দুকের চাবি আছে। যাওনের সময় চাবি নিয়া যাইবা।'

আমোদি বেগম বললেন, 'আচ্ছা'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আরেকখান কথা, তোমরা সকলে ভাবতা আমি সাহসী মানুষ। ঘটনা ঠিক না। আমি বুদ্ধিমান মানুষ। বুদ্ধিমান মানুষ সাহসী হয়

না। সাহসী হয় বোকা মানুষ। বোকা মানুষ আগপাছ বিচার-বিবেচনা না কইরা লাফ দিয়া ঝাপাই পড়ে। ঝাপাইয়া পড়ইন্যা মানুষরে মানুষ পছন্দ করে। সাহসী মনে করে। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ নিজে ঝাপাইয়া পড়ে না। সে আগে কঠিন বিচার-বিবেচনা করে। হার জিত, লাভ-ক্ষতি ভাবে। তারপর বিপদ থাকলে অন্যরে দিয়া কাজ সারে। আমি সারাজীবন অন্যরে দিয়া কাজ সারছি। আমার সাহসী মানুষের ভান ধইর‍্যা থাকতাম। আমার সাহসের আসল ঘটনা আছিল এস্কান্দারের বাপ আলী হায়দার। আর তারপর এস্কান্দার।'

আমোদি বেগম বললেন, 'এত কথা কেন বলতেছেন? আপনের শরীলডা ভালো না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'এত কথা বলতেছি কারণ, আমি আব্দুল ফকিররে ভয় পাইতাম। খুব ভয়। এইজইন্যই তার কোনো ক্ষতি আমি করতে পারি নাই। বুদ্ধি দিয়া চেষ্টা করছিলাম, কাজ হয় নাই। বুদ্ধিমতে তার কোনো অলৌকিক ক্ষমতায় আমার বিশ্বাস করনের কথা না। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয়, এই ক্ষমতা তার আছে। তারে আমি গত কাইল একখান থাপ্পড় মারছি। সে কিছু বলে নাই। কিন্তু এই না বলনের মানে সে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নিব। সেই বিশেষ ব্যবস্থা কি সেইটা আমি জানি না।'

আমোদি বেগম বড় বড় চোখ করে বললেন, 'এইটা আপনে কি বলতেছেন?'

তৈয়র উদ্দিন খাঁ বললেন, 'যা বলতেছি, ঠিক বলতেছি আমোদি বেগম। আর একখান কথা, মনির বুদ্ধিমান না, বলদ। এইজইন্য তারেও আমি ভয় পাইতেছি। বলদ মানুষ যদি একবার বুইঝ্যা ফালায়, তার হাতে ক্ষমতা, তাইলে সে দুনিয়াতে জাহান্নাম নামাই আনব। আমার সবকিছু লইয়া ভয় লাগতেছে আমোদি বেগম।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে। তার চোখজোড়া কেমন মাছের চোখের মতো প্রাণহীন হয়ে উঠছে। তিনি হঠাৎ কাঁপা কাঁপা হাতে আমোদি বেগমের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'একখান কথা বলতে খুব মন চাইতেছে। কিন্তু শরমে বলতে পারতেছি না।'

আমোদি বেগম অবাক গলায় বললেন, 'কি কথা?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমারে সারাজীবন আমি কিছু দিতে পারি নাই। কিন্তু আইজ একখান জিনিস আমি তোমার ধারে চাইব। জিনিসখান তোমার আমারে দিতেই হইব। না করতে পারবা না।'

আমোদি বেগম দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন, 'কি জিনিস?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমার পরানডা জ্বলে বউ। আমার পরানডা কয়লার আগুনের লাহান জ্বলে। আমার চোউখ দুইখানও জ্বলে। পুইড়্যা আমার ভেতরটা ছাড়খার হইয়া গেছে। আমারে আমার কোহিনূররে একটু দেখতে দিবা

www.boighar.com

বউ? তারে খালি এক পলক দেখব বউ। তারপর চোউখ দুইখান বুজব। বউ, এই কথাখান তুমি রাখবা?'

আমোদি বেগমের ষাট বছরের বৃদ্ধ, সাড়বিহীন শরীরেও যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। সাড়া দিয়ে উঠল কি এক অবর্ণনীয় অনুভূতিতে। এই জনমে এই প্রথম তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তাকে বউ বলে ডেকেছেন। বউ! তার কী যে লজ্জা লাগছে। মনে হচ্ছে লজ্জায় মাটির ভেতর ঢুকে যান তিনি। কিন্তু সেই লজ্জা কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে অদ্ভুত এক ভালোলাগার আবেশে। তিনি তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হাতখানা আরো শক্ত করে ধরে বললেন, 'আমি নজুরে দিয়া কোহিনূররে খবর পাঠাইতেছি।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ভীত সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, 'সে যদি না আসে? সে জেদী। বড়ই জেদী। তারে আমি শেষবারের মতো অমল বাবুরে দেখতে যাইতে দেই নাই। এই কথা তো সে ভোলে নাই!'

আমোদি বেগম বললেন, 'সে আসব'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ চোখ বুজলেন। তার মুদিত চোখের দু'কোল গড়িয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় জল নামতে লাগল। আমোদি বেগম হাত বাড়িয়ে সেই জল মুছিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আমোদি বেগমের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মানুষের জীবন কোনো হিসাব বাকি রাহে না বউ। সারাজীবন আমি তোমার চৌক্ষের পানি দেখছি। আইজ তার হিসাব শুরু হইল। হিসাব নিতে ভুল কইরো না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কাঁদছেন। নিঃশব্দ কান্না। সেই কান্নার জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমোদি বেগম। তার কি মানুষটার কান্না দেখে একটুও মায়া হচ্ছে? না হচ্ছে না। হবার কথাও না। এই মানুষটার জন্য তার বুকের ভেতর বিন্দুমাত্র মায়া নেই, মমতা নেই, ভালোবাসা নেই। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, আমোদি বেগম আবিষ্কার করলেন তিনি কাঁদছেন। তার হাতে মুঠোয় ধরা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হাত। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কান্নার জল। তাহলে? জীবনের হিসাব সমান হলো কি করে? তার কান্নায়, তার দুঃখে, তার অসহ্য যন্ত্রণার জল দেখে তো কেউ কখনো কাঁদেনি। কেউ না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তো ননই। বরং তাকে কাঁদিয়ে তিনি আনন্দ পেয়েছেন। তাহলে তিনি কেন কাঁদছেন? যেই মানুষটা তার জীবনের সবচেয়ে দুঃসহতম অনুভূতির নাম, সবচেয়ে কষ্টকর স্মৃতির নাম, সেই মানুষটার জন্য তিনি কেন কাঁদছেন? এ কী হিসাব জীবনের? জীবনের এই হিসাব বড়ই বেহিসেবী। বড়ই অদ্ভুত। এই অদ্ভুত হিসেবের খাতায় আড়ালে-আবডালে রয়ে যায় অমিমাংসিত অসংখ্য গল্প, অসংখ্য অঙ্ক। সেইসব অমিমাংসিত গল্প আর অঙ্কের নামই বোধহয় মানবজনম।

আহা, মানবজনম, প্রবল ঘৃণার ভেতরও কি অপার মমতায়ই না সে বুকের ভেতর পুষে রাখে অস্পৃশ্য, রহস্যময় প্রগাঢ় ভালোবাসা। আহা!

প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় ফতেহপুর থেকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে নয়নকে। তাকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। ডাক্তার বলেছেন, তার শরীর সুস্থ হতে সময় লাগবে। এমনিতেই ভয়াবহ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল সে। তার উপর ওষুধ, পথ্য, চিকিৎসাবিহীন দীর্ঘ সময় পড়েছিল ফতেহপুরে। এর সাথে যোগ হয়েছে দীর্ঘদিনের নানান অনিয়ম। সবকিছু মিলিয়ে শরীরে বাসা বেঁধেছে নানান ব্যাধি। ফখরুল আলম অফিস থেকে দীর্ঘ ছুটি নিয়েছেন। তিনি সারাক্ষণ ছেলের পাশে বসে থাকেন। আর খানিক পরপর রুম থেকে বেরিয়ে যান। বেরিয়ে গিয়ে তিনি রুমালে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। ঘুমন্ত নয়নের মুখভর্তি দাড়ি। চোখ ঢুকে গেছে কোটরে। গাল ভেঙে গেছে। এই বয়সের সন্তানের এমন অবস্থা দেখে কোনো বাবারই স্থির থাকার কথা নয়। ফখরুল আলমও নেই। তিনি নয়নের পাশেই জায়নামাজ বিছিয়ে বসে নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে হাউমাউ করে কাঁদেন, 'ইয়া রাব্বুল আলামিন, ইয়া রহ্‌মানুর রহিম, ইয়া শাফি, ইয়া মাফি, তুমি আমার ছেলেকে সুস্থ করে দাও।'

নয়ন বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটায়। সেদিন কোহিনূর এলে নয়ন চুপচাপ মায়ের পাশে শুয়ে রইল। তখন মাগরিবের সময়। ফখরুল আলম জায়নামাজ বিছিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে দীর্ঘ মোনাজাত করলেন। মোনাজাতে তিনি প্রতিদিনের মতোই আল্লাহর কাছে করুণ গলায় নয়নের আরোগ্য কামনা করলেন। নয়ন হঠাৎ ফখরুল আলমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, আমার ছেলেকে সুস্থ করে দাও, এর পরিবর্তে বলো, আল্লাহ, তুমি নয়নকে সুস্থ করে দাও।'

ফখরুল আলম অবাক চোখে নয়নের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'কেন? আমার ছেলেকে সুস্থ করে দাও বললে কি সমস্যা?'

নয়ন বলল, 'আছে। সমস্যা আছে। বিশাল সমস্যা। তোমাকে যা বলছি, তাই করো।'

ফখরুল আলম আর কোনো কথা বললেন না। তিনি আবার মোনাজাত করলেন। মোনাজাতে কেঁদে কেটে আল্লাহর কাছে বললেন, 'ইয়া রাব্বুল আলামিন, ইয়া রহ্‌মানুর রহিম, ইয়া শাফি, ইয়া মাফি, তুমি নয়নকে সুস্থ করে দাও।'

কিন্তু মোনাজাত শেষ করেও ফখরুল আলমের কেমন অস্থির লাগতে লাগল। তার মনে হলো আমার ছেলেকে সুস্থ করে দাও বলার মধ্যে যেই তৃপ্তিটা আছে, সেই তৃপ্তি নয়নকে সুস্থ করে দাও বলার মধ্যেই নেই। সারাটাক্ষণ তার গলার মধ্যে কেমন একটা তেষ্টা তেষ্টা ভাব। মনে হচ্ছে গলাটা পানির অভাবে শুকিয়ে আছে। তিনি এই শীতের মধ্যেও খানিক পর পর ঢক্যঢক করে ফ্রিজের কনকনে ঠান্ডা পানি খেয়ে ফেলেন। কিন্তু তাতেও তার তেষ্টা ভাবটা যায় না। পরের ওয়াক্ত থেকে তিনি দুইবার মোনাজাত করা শুরু করলেন। একবার শব্দ করে কেঁদে। আরেকবার মনে মনে। মনে মনে করার সময় তিনি প্রণভরে বলতে লাগলেন, 'ইয়া রাব্বুল আলামিন, ইয়া রহ্‌মানুর রহিম, ইয়া শাফি, ইয়া মাফি, তুমি আমার ছেলেকে সুস্থ করে দাও।' মোনাজাত শেষ হতেই তার মনে হলো, তার তেষ্টা ভাবটা একটু একটু কমছে। কিন্তু পুরোপুরি কমছে না। তিনি লিফটে পাঁচতলা হাসপাতালের ছাদে চলে এলেন। সেখানে এসে অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। আর আল্লাহর কাছে মোনাজাত ধরে তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে একই দোয়া করলেন।

ফখরুল আলম আবিষ্কার করলেন তিনি যত জোরে চিৎকার করে কথাটা বলছেন। তত বেশি তার ভালো লাগছে। তিনি পাগলের মতো চিৎকার করে কথাটা বলতে লাগলেন। বারবার একই বলতে লাগলেন।

ফখরুল আলম কোহিনূরের কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি জানেন, কোহিনূর প্রায়ই আবোল-তাবোল বকে। নয়নকে নিয়ে কোহিনূর তাকে যা বলেছেন, তাও সেইসব আবোল-তাবোলেরই অংশ। তিনি কোহিনূরের কথা বিশ্বাস করেন না। একদম বিশ্বাস করেন না। তিনি যেন প্রবল চিৎকারে ওই নিঃসীম মহাশূন্যের অদৃশ্য মহা অস্তিত্বের কাছে তার দাবি পৌঁছে দিচ্ছেন। সেই দাবি সত্যাসত্য করার কোনো উপায় রয়েছে কিনা কে জানে!

তবে ফখরুল আলম এখন জানেন, এই মানবজন্ম কেবল রক্ত নয়। কেবল জন্মের পরিচয় নয়। বরং তার চেয়েও বেশি কিছু। সেই বেশি কিছুর নাম তেষ্টা। তার গলার ভেতর আটকে থাকা এই প্রবল তেষ্টা। সেই তেষ্টার নাম ভালোবাসা। এই ভালোবাসার তুল্য কিছু নেই। কিচ্ছু নাই।

ডিভোর্সটা হলো জানুয়ারির তেরো তারিখে। অনেকেই ভেবেছিল শেষ অবধি রেণু আর আসলাম সাহেবের ডিভোর্সটা বোধহয় আটকে যাবে। সে রকম নানান উপসর্গও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা আর হলো না। তবে আসলাম সাহেব আর আগের বাসায় ফিরেও এলেন না। হেমা বারকয়েক বাবার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু পারেনি। তার ফোন আবার বন্ধ। সে এখন পুরোপুরি মায়ের সাথেই থাকছে। নিয়মিত ক্লাস করছে। মাঝে-মধ্যে রাহাতের সাথে তার গানের স্টুডিওতে যায়। জায়গাটা তার ভালোই লাগে। তবে সবচেয়ে খারাপ লাগে বাসায় ফেরার পর। এই খারাপ লাগাটা কার জন্য হেমা জানে না। না বাবা-মার জন্য, না নয়নের জন্য, না রাহাতের জন্য, না তার নিজের জন্য? তাহলে?

অনেক ভেবে হেমার মনে হলো, এই খারাপ লাগাটা অভ্যস্ত একটা জীবনের জন্য। সে একটা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। একটা রুটিন মাফিক জীবন। সেই জীবনটা হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল। তার ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই সে যখন সারি সারি অট্টালিকা দেখে, তখন তার মন খারাপ হয়ে যায়। তার সেই বারান্দা, বারান্দার পাশে দাঁড়ানো সজনে গাছটার জন্য মন খারাপ হয়। তার সেই বিছানাটার জন্য মন খারাপ হয়। বাথরুমের লাল টুকটুকে বালতি আর মগটার জন্যও মন খারাপ হয়। সে এখানে এসে অমন লাল টুকটুকে বালতি আর মগই কিনেছে। কিন্তু তারপরও তার কেমন মায়া হয় সেই মগ আর বালতিটার জন্য? আচ্ছা, কেন? মায়া হয় কেন?

রোজ রোজ সে চোখের সামনে দেখত বলে? ছুঁয়ে দিত বলে? কিন্তু প্লাস্টিকের ওই বালতি, মগ, বিছানা, বারান্দাটার তো অনুভূতি নেই। গাছের নাকি অনুভূতি আছে, থাকলেও সে তো কখনোই টের পেত না। কিন্তু তারপরও সেই সকল কিছুর জন্য কেমন একটা মায়া, তীব্র মায়া। একটা শূন্যতাবোধ। মন খারাপ ভাব। কেন? কেবলই অভ্যাস হয়ে উঠেছিল বলে?

www.boighar.com

তাহলে মায়ের জন্য বাবার কি এখন মন খারাপ হয় না? কিংবা বাবার জন্য মায়ের? না হয় পরস্পরের প্রতি তাদের কোনো ভালোবাসা কখনোই ছিল না, কিন্তু ওই যে রোজকার চোখের সামনে থেকে জানান দেওয়া, আমি আছি। রোজকার উপস্থিতি ভালোবাসাহীন হলেও বলা, আমি আছি। বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকা ঘরের জড়, কঠিন দেয়ালখানাও যদি হুট করে নাই হয়ে যায়, ভেঙে ফেলা হয়, তখনও তো কেমন একটা মন খারাপ ভাব হয়, দুম করে একটা প্রবল শূন্যতা গ্রাস করে। অথচ একটা আস্ত মানুষ, তার চেনা মুখ, চেনা চলন, চেনা স্বর, তার কোথাও কি কখনো এই এতটুকু মায়াও লেগে থাকে না?

www.boighar.com

হেমা প্রবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হয়তো থাকে, কিন্তু সেই মায়াকে অগ্রাহ্য করতে মানুষ শিখে যায়। আচ্ছা, নয়নের কি তার জন্য কষ্ট হয়? নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু তার? হেমা ভেবে দেখেছে, নয়নের জন্য তার কষ্ট নেই। যা আছে তার নাম মায়া। তীব্র মায়া। নয়নকে তার কখনোই আর আট দশটা ছেলের মতো কঠিন, শক্ত-সমর্থ মানুষ মনে হয়নি। বরং সে যেন খানিকটা বেশিই নরম। একটা লতার মতো ব্যাপার। যে একা দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্ত। কিন্তু শক্ত কেউ একজন আলতো করে তাকে স্পর্শ করলে সে সেই স্পর্শ বুঝবার জন্য খানিকটা সময় নেয়। তারপর সেই স্পর্শ যদি তাকে নির্ভরতা দেয়, তবে সে তাকে জড়িয়ে ধরে। আর সকল মেয়েরা হয়তো শক্ত, কঠিন পুরুষকেই ভালোবাসে। বা পুরুষের মধ্যে ওই ভাবটা খোঁজে। কিন্তু হেমার কেন যেন এই নয়নকেই ভালো লাগত। আর সকল কিছুর চেয়ে বেশি। এই নরম, কোমল, বাচ্চাদের মতো সহজ করে হাসা নয়ন। কখনোই কোনো দাবি নেই। কিন্তু কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড টান সে রেখে দিত। কখনো খুব কাছে আসা হয় না, কিন্তু কোথায়, কীভাবে যেন একটা খুব গভীর করে কাছে থেকে যাওয়া। এই তো নয়ন। চোখের ভেতর রাজ্যের সহজতা। নিজে কিছুটা শক্ত বলেই হয়তো, নয়নের এই সারল্য, এই শিশু সুলভ আচরণ, এই কোমলতাটা হেমাকে টানত। কী যে একটা মায়া! সেই মায়ায় একজন প্রেমিক পুরুষের চেয়ে একজন শিশুই যেন ঢের বেশি টেনে নিয়েছিল তাকে!

নয়ন এখন কোথায়? নয়নের অসুস্থতার খবরটা হেমাকে দিলো নয়নের এক স্টুডেন্ট। তার সাথে টিএসসিতে হেমার দেখা। হেমাকে দেখেই সে বলল, 'নয়ন ভাইয়ের এখন কি খবর হেমাপু?'

হেমা ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বলল, 'হ্যাঁ। ভালো'।

ছেলেটা বলল, 'আমরা তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম'।

হেমা দুম করে বলে বসল 'কেন?'

ছেলেটা বলল, 'কেন? আপনি জানেন না? উনি কাউকে কিছু না জানিয়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে ভয়াবহ টাইফয়েড নিয়ে ফিরেছেন। সাথে আরো নানান সমস্যা। হাসপাতালে ভর্তি অবধি করতে হয়েছে!'

হেমা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। নয়নকে তার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। প্রচণ্ড ইচ্ছে। কিন্তু এই ইচ্ছেটাকে সে দমাতে চায়। প্রচণ্ড ইচ্ছে দমানো কঠিন কাজ। হেমা এখন থেকে জগতের সকল কঠিন কাজগুলোই করতে চায়। সে যেন জানে, তার সামনের পৃথিবীটা কঠিন সময়ের পৃথিবী। কঠিন সময়ে টিকে থাকতে হলে মানুষকে হতে হয় কঠিন। সেখানে সহজ, কোমল মানুষ টিকতে পারে না। এই কঠিন সময়ে মানুষকে কঠিন হতে হলে সবচেয়ে বেশি হতে হয় ভালোবাসাহীন। ভালোবাসাহীন মানুষের চেয়ে কঠিন কোনো মানুষ আর পৃথিবীতে নেই।

মানুষ ভাবে, ভালোবাসার মানুষটাকে জোর করে, বা অনুরোধ করে আটকে রাখা যায়। আদায় করা যায়, কিন্তু হেমার উল্টোটাই মনে হয়। কারণ যাই হোক, কেউ যদি চলে যেতে চায়, তবে তাকে যেতে দেয়াই উচিত। কিন্তু যাবার আগে তাকে জানিয়ে দেয়া উচিত, কী গভীর মমতায় তার জন্য বুকের ভেতর পুষে রাখা হয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা। যদি তারপরও সেই ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে সে চলে যেতে পারে। তবে তাকে শত কান্না, শত অনুরোধ, শত প্রার্থনায় ভেঙে পড়েও আর আটকে রাখা যায় না বা যাওয়া উচিত-ও নয়।

রাহাত এলো রাতে। তার নতুন অ্যালবামটা শেষ হয়েছে। সেই এই এতদিনেও হেমাকে অ্যালবামের নাম বলেনি। অ্যালবামের এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মোড়ক উন্মোচনও হয়নি। কিন্তু সে একটা কপি নিয়ে এসেছে হেমার জন্য। হেমা প্যাকেটটা খুলল। প্যাকেটের ওপরে লেখা কান্নার গান।

হেমা বলল, 'কান্নার গান কেন?'

রাহাত বলে, 'পৃথিবীর সব গানই তো কান্নার'।

হেমা বলল, 'সব? সব গান কান্নার?'

রাহাত বলল, 'হ্যাঁ।'

হেমা বলল, 'কীভাবে?'

রাহাত বলল, 'মানুষ গান কখন করে জানিস? যখন সে প্রবল আনন্দে থাকে, আর যখন সে প্রবল বিষাদে থাকে। প্রবল আনন্দের ভাষা কান্না। মানুষ প্রচণ্ড আনন্দে কেঁদে ফেলে। আবার প্রচণ্ড বিষাদেও কেঁদে ফেলে। এইজন্যই জগতের সকল গানই কান্নার। শুধু গানই না। সকল সৃষ্টিই। আর এই মুহূর্তেও

www.boighar.com

সৃষ্টিগুলো একদম হৃদয়ের গভীরের। তীব্রতম অনুভূতি ছাড়া তো কান্না হয় না। আমার এই গানগুলোও তেমন। তীব্রতম অনুভূতির।'

হেমা বলল, 'বাহ্'।

রাহাত বলল, 'আসলে কান্না না। জল। জগতের সকল কিছুই জলের। আর কান্না তো জলই'।

হেমা অবাক গলায় বলল, 'মানে?'

রাহাত বলল, 'দেখ, জল ছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রাণই বাঁচে না। কিচ্ছু না। আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছিস?'

হেমা বলল, 'কী?'

রাহাত বলল, 'জগতের সকল কিছু ধরতে হয় মুঠো করে। কিন্তু একমাত্র জল, যা মুঠো করে ধরা যায় না।'

হেমা বলল, 'তাতে কি?'

রাহাত বলল, 'জল ধরতে হয় দুই হাত এক করে আঁজলা পেতে।'

হেমা দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, 'হুঁ'।

রাহাত বলল, 'আর আঁজলার ভেতর কি থাকে বল তো?'

হেমা বলল, 'কি?'

রাহাত বলল, 'প্রার্থনা'।

হেমা বলল, 'কীভাবে?'

রাহাত বলল, 'কেন? আঁজলা পেতে দেখ, আঁজলার ভঙ্গিটাই তো প্রার্থনার ভঙ্গি। মোনাজাতের ভঙ্গি।'

হেমা ভীষণ অবাক হলো। বলল, 'তাই তো!'

রাহাত বলল, 'হ্যাঁ। ঠিক তাই। হয়তো নিমগ্ন প্রার্থনার জলেই থাকে সকল প্রাপ্তি।'

হেমা কথা বলল না। সে অবাক চোখে রাহাতের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অ্যালবাম বক্সটার পরের পাতায় গেল। সেখানে রাহাত লিখেছে, 'উৎসর্গ– হেমাকে। আমার নিমগ্ন প্রার্থনার জল'।

হেমা ঝট করে রাহাতের দিকে তাকাল। রাহাত হাসছে। কিন্তু হেমার কেমন কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু সে রাহাতের সামনে বসে কাঁদল না। কাঁদল রাহাত চলে যাবার পর। কিন্তু এই কান্না রাহাতের জন্য কিনা হেমা নিশ্চিত নয়। এমন হতে পারে, তার জন্য রাহাতের জন্য যে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে, রাহাতের সেই কষ্টটার জন্য তার এই কান্না। রাহাতের জন্য না। এ অনুভূতির বড় অদ্ভুত রহস্যময় টানাপড়েন। এর অর্থ হেমা কেন, কোনো মানুষই জানে না। হেমা

কাঁদতে কাঁদতেই ঝাপসা চোখে দেখল, রাহাতের অ্যালবাম বক্সটার শেষ পাতায় বড় বড় করে লেখা,

'আমি লিখেছিলাম ভুল পাতায়, কাগজ ওলটাতেই দেখি জলের শব্দ।
অক্ষর মিশে গেছে কান্নায়। শরীর জুড়ে অদ্ভুত খেয়াল!
মুছে যায় দাগ, অক্ষর, শব্দ বা আঁচড়।
কেউ কেউ বলে, জল মিশে যায় জলে।
অথচ সন্ধ্যার বিষণ্ন মন,
ছুঁয়ে দেখি আজ–
ফোঁটা ফোঁটা জলের ভেতর, লেখা আছে গোটাটা জীবন'!

www.boighar.com

রাজীবের সাথে পারুলের সেই শুক্রবার দেখা হলো। তারা আবারো সেই নদীর ধারে বসেছিল। পারুলকে দেখে রাজীব চমকে গেল। তার পরনে একখানা নীল শাড়ি। আর নাকে তার মায়ের নোলকখানা দুলছে। রাজীব মুগ্ধ চোখে নোলক পরা পারুলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে করুণ গলায় বলল, 'আপনার কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

পারুল বলল, 'হয় নাই, কিন্তু হইব'।

রাজীব শুকনো মুখে বলল, 'আমি শুনেছি মেয়েরা বিয়ের পরে নাকে নোলক পরে। কিন্তু আপনি তো দেখি বিয়ের আগেই পরে ফেলেছেন। আপনার বিয়ে কি ঠিক?'

পারুল বলল, 'জে ঠিক'।

রাজীব ঢোক গিলে বলল, 'বিয়ের তারিখ, পাত্র সবই ঠিক?'

পারুল বলল, 'তারিখ এহনও ঠিক হয় নাই। তয় পাত্র ঠিক'।

রাজীব ম্লান গলায় বলল, 'ও, আচ্ছা'।

পারুল রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তয়, একখান সমস্যাও আছে'।

রাজীব ঝট করে মুখ তুলে পারুলের মুখের দিকে তাকাল। তারপর রাজ্যের কৌতূহল গলায় ঢেলে বলল, 'কী সমস্যা?'

পারুল বলল, 'পাত্রীর লজ্জা শরম কম। পাত্রের লজ্জা শরম বেশি। হওনের কথা আছিল উল্টা। কিন্তু হইছে এইটা। এহন পাত্রীর তো লজ্জা শরম কম। এইজইন্য পাত্রী বিয়ার জইন্য দুই পায়ে খাড়া। কিন্তু পাত্রের ভাবসাব দেইখ্যা মনে হইতেছে না যে পাত্রীরে তার পছন্দ! সে মনে হয় বিয়ায় আতঙ্ক না'।

রাজীব পারুলের কথা বুঝতে পারছে না। সে বলল, 'সে আতঙ্ক না, এটা বলেছে?'

পারুল বলল, 'না বলে নাই। না বলনের অবশ্য কারণও আছে। সে এহনও জানেই না যে তার সাথে পাত্রীর বিয়া। না জানলে সে বলবো কেমনে? তবে সে বোকা। বুদ্ধিমান হইলে তার এতদিন বুইঝা ফেলনের কথা আছিল'।

রাজীব বলল, 'সবার বুদ্ধি তো সমান হয় না। আপনি বুঝিয়ে বলুন'।

পারুল বলল, 'এইটুক না বুঝলে কেমনে হইব? ঘর সংসার করতে হইব না? এত অবুঝ হইলে চলব?'

রাজীব বলল, 'আপনি বুঝিয়ে নিবেন। তাহলেই তো হলো!'

পারুল বলল, 'আমার ঠেকা! যার যার বুঝ, তার তার কাছে। সে না বুঝলে আমি কেন তারে বুঝাইতে যাব?'

রাজীব বলল, 'সম্পর্কে কারো কারো একটু বেশিই দায়িত্ব থাকে। একজন একদিকে একটু বেশি হলে, অন্যজন হয়তো অন্যদিক থেকে তা পুষিয়ে দেয়'।

পারুল বলল, 'অন্যজন কোন দিক দিয়া পোষাইয়া দিব? কি দিয়া?'

রাজীব খানিক কাছে সরে বসল পারুলের। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'ভালোবাসা দিয়ে'।

পারুল রাজীবের মুখের দিকে তাকাল। তারপর গভীর গলায় বলল, 'সত্য?'

রাজীব বলল, 'হুম। সত্য'। পারুলের এবার কেন যেন লজ্জা লাগছে। সে রাজীবের চোখ থেকে তার চোখ সরিয়ে নিলো। তাকিয়ে রইল নিজের পায়ের কাছে সোনালি রোদ পড়ে ঝলমল করা ঘাসে। নদীর মৃদু হাওয়ায় পারুলের নাকের নোলকখানা দুলছে। কি যে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাকে। রাজীব হঠাৎ তার কানের কাছে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে বলল, 'বোকাসোকা লাজুক পাত্রটা যদি খানিক সাহসী হতে চায়?'

পারুল লজ্জায় যেন লাল হয়ে গেল। সে কোনো কথা বলল না। তার মুখটা যেন আরো নত করে ফেলল সে। রাজীব হঠাৎ পারুলকে তুমি করে বলল। সে বলল 'আমার তোমাকে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে পারুল। অসম্ভব ইচ্ছে। আমি কি তোমাকে একটু ছুঁয়ে দিতে পারি?'

রাজীবের গলায় তুমি শুনে পারুল যেন জল হয়ে গেল। রাজীব পারুলের কানের কাছে ঠোঁট এনে বলল, 'দেই পারুল'।

পারুল কেমন ঘোর লাগা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'জানি না'।

রাজীব আলতো করে তার হাতখানা বাড়িয়ে পারুলের কোমড় জড়িয়ে ধরল। রাজীবের হাতের সেই স্পর্শে কি ছিল, কে জানে! পারুল যেন মোমের মতো গলে মিশে গেল রাজীবের শরীরে। রাজীব তাকে দু'হাতে শক্ত করে বেষ্টন করল। পারুলের ঘন তপ্ত ভারি নিঃশ্বাস বইছে। সেই নিঃশ্বাসের ছন্দে ছন্দে তার নাকের নোলকখানা কী অদ্ভুত সুন্দর করেই না দুলছে! রাজীব ধীরে তার ঠোঁটখানা নিয়ে গেল পারুলের কানের কাছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমায় তোমার নাকের নোলক করো। কাঁপতে দিও নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে'।

www.boighar.com

পারুলের মনে হচ্ছিল সে দম আটকে মারা যাবে। তার সারা শরীর জুড়ে কেমন এক ঘোর। কেমন অন্য এক স্পর্শের মাতম। সে চোখ বন্ধ করে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে বসে রইল রাজীবের পাশে। কিন্তু রাজীব তাকে পুরোপুরি শুষে নিলো না। অথচ পারুল তখন পুরোপুরি নিঃশেষ হবার উদগ্র বাসনায় বিলীন।

রাজীব চলে গেল বিকেলে। তারপরের শুক্রবার আবার আসলো রাজীব। লতার কলেজ বন্ধ থাকে বলে শুক্রবারটা সুবিধা। কিন্তু এবার এলো রাজীব একা। লতার সাথে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে আশিকের। এইজন্য আশিক রাগ করে আসেনি। কিন্তু রাজীব নিয়ম করেই আসতে থাকল। পারুল একটা বিষয় নিয়ে খুব বিরক্ত। শুক্রবার ছাড়া আর প্রতিটা দিন তার কাছে মনে হয় একেকটা বছর। কিন্তু শুক্রবারটা যুগের কাঁটায় এসে যেন সেকেন্ডের কাঁটায় চলে যায়। কি আশ্চর্য ব্যাপার!

রাজীব আগের চেয়ে অনেকটাই সপ্রতিভ হয়েছে। তবে এখনো তা নির্ভর করে পারুলের উপর। সে পারুলকে ভয় পায়। পারুল হাত বাড়ালেই সে কেবল হাতখানা ধরে। না বাড়ালে গুটিয়ে থাকে। তবে তারা আপনি থেকে তুমি হয়েছে। তারা কেউ কাউকে ভালোবাসি বলেনি। কিন্তু বলা হয়ে গেছে যেন তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি কিছু। সেদিন পারুল বলেছিল, 'আমি আর থাকতে পারব না একলা একলা।'

রাজীব বলেছিল, 'তাহলে?'

পারুল বলেছিল, 'তাহলে আবার কি? বিয়ার ব্যবস্থা করো। তোমার বাসায় কথা বলো। আমি আমার আব্বার লগে কথা বলি।'

রাজীব বলল, 'আমি তোমাকে না জানিয়ে মার সাথে কথা বলেও ফেলেছি।'

কথাটা শুনে পারুলের এত লজ্জা লাগছিল। সে আড়ষ্ট গলায় বলল, 'উনি কি বলছেন?'

রাজীব বলল, 'বাবার সাথে কথা বলবেন।'

পারুল বলল, 'আমি কি তাইলে আমার আব্বার সাথে কথা বলব?'

রাজীব বলল, 'এখুনি না। আগে আমি বাবা-মায়ের কাছ থেকে অনুমতিটা পাই।'

পারুল বলল, 'অনুমতি না পাইলে?'

রাজীব তার হাতখানা পারুলের হাতের উপর রাখল। তারপর আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। এইটুকু তো বোঝো? বোঝো না?'

কথাটুকু পারুলের কানে অপার্থিব সঙ্গিত হয়ে লেগে রইল। রাজীবের সেই এতটুকু হাতের স্পর্শ, এতটুকু কথার স্পর্শ, এতটুকু শব্দের অপার্থিব সঙ্গিত হয়ে কানে লেগে থাকা, আর কি চাই তার এই জনমে? আর কিচ্ছু চাই না। তারপরও পারুল অনেক কিছুই পায়। অনেক বেশি কিছু। রাজীব তার জন্য ঢাকা থেকে কত কিছু নিয়ে আসে! সেইসব জিনিস পারুল ব্যবহার করে না, খায় না। যদি শেষ হয়ে যায়! সে প্রতিদিন একটু একটু করে দেখে, হাত বাড়িয়ে ছোঁয়, আর ভাবে। এই তো জীবন। একটা হলুদ পাখির মতো। একটা রঙিন প্রজাপতির মতো, সোনালি রোদের মতো, শান্ত নদীর মতো। আহা।

পারুল সেদিন বাড়ি ফিরল আরো অন্য এক নতুন পৃথিবী উন্মোচনের আনন্দ নিয়ে। সে রাজীবকে লঞ্চের কেবিনে উঠিয়ে দিতে গেল। কেবিনটা চার দেয়ালের ছোট্ট একটা ঘর। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে খোলা। পারুলের বুকের ভেতরটা দুরুদুরু করে কাঁপছিল। একটা ভয়ে, আবার উত্তেজনায়ও। রাজীবকে তার ভয় নেই। কিন্তু তারপরও। রাজীব অবশ্য আগালোও না। কেবল পারুলকে দু'হাতে বুকের ভেতর জাপটে ধরে বসে রইল। লঞ্চের শেষ ভেঁপু বাজতেই পারুল উঠে দাঁড়াল। সে এই সময়টা রাজীবের চোখের দিকে তাকাতে পারে না। দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই রাজীব তার হাত ধরে টান দিলো। তারপর হঠাৎ পারুলের মুখখানা দু'হাতে চেপে ধরে সে তার ঠোঁট নামিয়ে আনল পারুলের ঠোঁটে। পারুলের তারপর আর কিছু মনে নেই। সে কেবল বিবশ হয়ে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইল। রাজীব কতক্ষণ এভাবে রেখেছিল পারুল জানে না। কিন্তু তার শরীর জুড়ে কী এক ঝিমঝিম ভাব। সেই রাত, পরদিন বাড়ি ফেরার পথের সারাটাক্ষণ সেই ঝিমঝিম ভাব লেগে রইল তার শরীরে। রাজীবের ঠোঁটের হঠাৎ অমন চুম্বক হয়ে তাকে শুষে নেওয়ার ওই সামান্য মুহূর্তটুকুই যেন পারুলকে জনিয়ে দিয়ে গেল, তার এই চেনা শরীরের ভেতরে রয়েছে অন্য এক শরীর। অন্য এক আস্বাদের অনাবিষ্কৃত জগৎ। এই
www.boighar.com
আস্বাদ তার কাছে বড় বেশি অচেনা। এ যেন এক অবাক নতুন পৃথিবী।

পারুল তার দিন দুই বাদে আব্দুল ফকিরের সাথে কথা বলল। আব্দুল ফকির কথা শুনে তেমন কিছুই বললেন না। চুপ করে রইলেন। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে পারুল খানিক চমকালো। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে বাবার সাথে তার যেন এক অঘোষিত দূরত্ব। এই দূরত্বের কারণ স্পষ্ট না। কিন্তু দূরত্ব স্পষ্ট। বহুদিন বাদে আব্দুল ফকিরের দিকে খেয়াল করে পারুল একটু অবাক হলো। তার চেহারার আগের সেই মোলায়েম ভাবটা যেন আর নেই। কোথায় যেন একটা প্রকট নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে।

www.boighar.com

সেই রাতে পারুল দেখল ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য। মাঝরাতে কিসের গোঙানিতে পারুলের ঘুম ভেঙে গেছে। গোঙানিটা চাপা কিন্তু স্পষ্ট। সে প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেও মুহূর্তেই তার মনে হলো কণ্ঠটা তার চেনা। এটা তাবারনের গলা। পারুল পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে এলো। উঠানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু বাহির বাড়ির ঘর থেকে কয়েক চিলতে মৃদু আলো এসে পড়েছে উঠানে। সে সন্তর্পণে সেই আলো পেরিয়ে উঠানের অন্য পাশে এলো। বাহিরবাড়ির এই ঘরে বহুকাল থেকে আব্দুল ফকির থাকেন। পাশের ঘরে থাকে জুলফিকার আর রতন। কিন্তু গতরাতে জুলফিকার আর রতনকে কই যেন পাঠিয়েছেন আব্দুল ফকির। ঘরের কাছাকাছি আসতেই তাবারনের গোঙানির শব্দ যেন আরো স্পষ্ট হলো। পারুল বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তাবারনের গোঙানির সাথে সাথে চাপা ফোঁস ফোঁস শব্দ। টিনের বেড়ার গায়ে উঠিয়ে ফেলা গজালের ছোট ছোট ফুটো। পারুল তার একটাতে চোখ রাখল। ভেতরে হারিকেনের মৃদু আলো। সেই আলোয় পারুল যা দেখল, তাতে তার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল। ভয়ে তার শিরদাড়া কেঁপে উঠল। তাবারন পুরো নগ্ন হয়ে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোমড় পেঁচিয়ে আছে একটা সাপ। আরেকটা সাপ পেঁচিয়ে আছে তার গলা। তীব্র আতঙ্কে তার চোখ যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আব্দুল ফকির বসে আছেন তাবারনের পায়ের কাছে। তার পরনে লুঙ্গি। কিন্তু শরীরের উপরের অংশ খালি। তিনি দু'হাতে তাবারনের উরুর মাংস খামচে ধরে বসে আছেন। পারুল আর মুহূর্তের জন্যও সেখানে দাঁড়াতে পারল না। সে তার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে কাঁপতে লাগল। ভয়ে, আতঙ্কে, ঘৃণায় তার শরীর গুলিয়ে বমি পাচ্ছিল। কিন্তু সে তেমন করেই স্থির বসে রইল সারারাত। ভোরের আলো ফুটতে সে ঘর থেকে বের হলো। আব্দুল ফকির তখন কেবল ফজরের নামাজ শেষ করে মসজিদ থেকে ফিরেছেন। তার চোখেমুখে ঝলমলে একটা ভাব। গতকালের সেই কাঠিন্যটা যেন আর নেই। পারুলকে দেখে তিনি মোলায়েম গলায় বললেন, 'কি হইছে মা? শরীল খারাপ? চেহারা দেইখ্যা মনে হইতেছে রাইতে ঘুম হয় নাই।'

পারুল কোনো কথা বলল না। আব্দুল ফকির বললেন, 'কোনো অসুবিধা হইলে আমারে বলবা মা।'

পারুল হঠাৎ বলল, 'আমার এই বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হইতেছে। আমার বিয়ার ব্যবস্থা করেন। অতি সত্বর ব্যবস্থা করেন। আমি আর এই গ্রামে থাকব না। আমি শহরে চইলা যাব। আপনে যোগাড়-যন্তর করেন। রাজীবের বিষয়ে আমি দেখতেছি।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'কিন্তু মা, ছেলেরে চিনি না, জানি না। সয় সংবাদ কিছু নেওয় হয় নাই। বংশ কি? বিষয়-আশয় কি? বাপ-মা কী করে...'

পারুল আব্দুল ফকিরকে কথা শেষ করতে দিলো না। সে হঠাৎ চাপা কিন্তু ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'আপনের কিছু দেহন লাগব না। যা দেহনের আমি দেখব। আপনের যা দেহনের আপনে তা দেহেন। কথা শেষ। একদম শেষ।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ধারণা, তার ডান হাতখানা ধীরে ধীরে অবশ হয়ে যাচ্ছে এবং এই অবশ হয়ে যাওয়ার কারণ আব্দুল ফকির। সেদিন দহলিজ ঘরে আব্দুল ফকিরকে থাপ্পড় মারার পর থেকেই যেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মনে মনে এমন কিছু ঘটারই অপেক্ষায় ছিলেন। আব্দুল ফকিরকে নিয়ে একটা প্রচণ্ড ভয় তার মনে সব সময়ই ছিল। তিনি তার দীর্ঘ জীবনে নানান কিছু করেছেন। কিন্তু আব্দুল ফকিরের ওপর থেকে এই ভয়টা তার কখনোই কাটেনি। তিনি অনেক চেষ্টা করেও এই ভয়টা কাটাতে পারেননি। চোখ বন্ধ করলে এখনো তিনি স্পষ্ট দেখতে পান, আব্দুল ফকিরকে চেপে ধরে তার মাথা কেটে নিয়েছে হায়দার আলী। কিন্তু সেই মাথা যখন বস্তা থেকে বের করা হলো, তা হয়ে গেল বজলু ব্যাপারীর মাথা। বিষয়টার নানান যুক্তি আছে, ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু তারপরও এখন পর্যন্ত ঘটনাটা মেনে নিতে পারেন না তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। এর পরের বারের ঘটনা আরো ভয়াবহ। সাবধানতা অবলম্বন করতে রাতের অন্ধকারে আব্দুল ফকিরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো শোলামুড়িয়ার বিশাল নদীতে। সেখানে তাকে খুন করে তার লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হবে নদীতে। তার হাত-পা বাঁধা। কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢাকা। মাঝরাতে তাকে নেয়া হলো নৌকার গলুইয়ে। হায়দার আলীর হাতে ধারালো বড় দা। সে দা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ শেষ মুহূর্তে তার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চান। এইজন্য তার মুখ খোলা হয়েছে।

আব্দুল ফকিরের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মনে হলো আব্দুল ফকিরের হাত খোলা। সে তার হাত পেছনে নিয়ে এমনভাবে বসে আছে যেন দেখলে মনে হবে তার হাত বাঁধা। কিন্তু আসলে তার হাত বাঁধা না। সে কোনোভাবে নৌকার ভেতরে বসে হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য এতে চিন্তার কোনো কারণ দেখেননি। তিনি চিন্তিত ছিলেন আব্দুল ফকিরের মুখ দেখে। তার মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। তিনি নির্বিকার

ভঙ্গিতে বসে আছেন। বরং কেমন একটা হাসির আভাও লেগে আছে মুখে। মুখমণ্ডলের কাপড়টা সরাতেই আব্দুল ফকির তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে সালাম দিয়ে বললেন, 'খাঁ সাব। আমার লাশখান গোর দিবেন কই?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'তোমার লাশের ভাগ্যে মাটি নাই ফইর। তোমার লাশ নদীতে ভাসব। লাশ পইচ্যা ভাইস্যা উঠব। কাউয়া, চিলে খাইব। পচব। যার শাস্তি যেমন।'

আব্দুল ফকির বলেছিলেন, 'এইটা কেমন কথা খাঁ সাব। আপনের সাথে তো আমার জমিজমা লইয়া ঝামেলা না যে আপনে আমারে মরনের পর তিন হাত মাটি দিবেন না। শুনছি, যাগো সাথে জমিজমা লইয়া ঝামেলা, তারা কবরের লইগ্যা মাটি পায় না।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কিছু বলতে যাবেন। এই মুহূর্তে দু'হাতে ভর দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে পানিতে লাফ দিলেন আব্দুল ফকির। সাথে সাথে দা চালিয়েছিল হায়দার আলী। কিন্তু দায়ের কোপ পড়েছিল আব্দুল ফকিরের পায়ে। বাঁ পায়ের প্রায় অর্ধেকটা কেটে রয়ে গিয়েছিল। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে সাথে সাথেই পানিতে ঝাপিয়ে পড়েছিল হায়দার আলীও। দীর্ঘ সময় তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো আব্দুল ফকিরকে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। সে যেন পানির সাথে মিশে গেল। কোনো সাড়া-শব্দ নেই, চিহ্ন নেই, ঢেউ নেই। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর তখনও বিশ্বাস হয়নি, ওই অন্ধকারে, ওই অত বড় কূল-কিনারাহীন নদীতে ওই অবস্থায় কারো পক্ষে বেঁচে ফিরে আসা সম্ভব! কিন্তু আব্দুল ফকির লাফিয়ে পানিতে পড়ার মুহূর্তে তিনি যেন আব্দুল ফকিরের চোখে কি দেখেছিলেন। কি দেখেছিলেন, তৈয়ব উদ্দির খাঁ জানেন না। কিন্তু তিনি বাড়ি ফেরেন তীব্র ভয় নিয়ে। বাড়ি ফিরে পড়েন ভয়াবহ জ্বরে। সেই জ্বর ছাড়ে মাসখানেক পরে। সুস্থ হয়ে তিনি শোনেন তার পাশের বাড়িতে ঢোল বাদ্যের আওয়াজ। তিনি আলী হায়দারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ঢোল বাজায় কেডা?'

আলী হায়দার বলেছিল, 'আব্দুল ফইর সাপের বিষ নামায়'।

সেই শেষ। আব্দুল ফকিরকে নিয়ে তারপর আর কোনো আগ্রহ দেখাননি তিনি। কিন্তু এই দিনকয় আগে সেই আব্দুল ফকিরকে দহলিজ ঘরে বসে যখন চড় মেরেছেন তিনি, সেদিন সেই মুহূর্তেই যেন মনে মনে এর পরিণতি মেনে নিয়েছেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ।

আমোদি বেগমকে ডেকে ঘটনা খুলে বললেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। আমোদি বেগম তাকে নানাভাবে বোঝালেন। তিনি বললেন যে তার হাত আসলে অবশ হয়ে যাচ্ছে না। এমনিতেই তিনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তার ওপর আব্দুল ফকিরের ঘটনা নিয়ে তার মধ্যে দীর্ঘদিনের ভয়। এছাড়া এত খারাপ শারীরিক অবস্থা তার আগে কখনো হয়নি। সবমিলিয়ে এটা তার মনের ভাবনা

www.boighar.com

যে আব্দুল ফকিরকে থাপ্পড় মারার কারণেই তিনি তার ডান হাত নড়াতে পারছেন না।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য বহু চেষ্টা করেও হাতখানা খুব একটা নাড়াতে পারলেন না। তবে চেষ্টায়ও তিনি ক্ষ্যান্ত দিলেন না। তার চেষ্টা চলতেই থাকল। এই মুহূর্তে মনির এলো। সে এসে বলল, 'দাদাজান, আপনের ধারে বাড়ির কিছু চাবি আছে। চাবিগুলান আর কেউর কাছে নাই। এহন চাবিগুলান তো দরকার।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'চাবি দিয়া কি করবি?'

মনির বলল, 'বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিসপত্র লাগে। বারবার তো আপনের কাছে আসন যায় না। আর দরকার তো। বোঝেন না?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বোঝেন না, তা না। তিনি বললেন, 'চাবিগুলান আর কয় দিন পর নে।'

মনির বলল, 'দাদাজান, আর কয়দিন পর নিলেও আমি নিবো। এহন নিলেও আমিই নিবো। দেরি হইলেই দেরি।'

মনিরের কথাবার্তা শুনে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর অবাক হবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি অবাক হলেন না। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'যহন দরকার পরব, তহন আমি নিজে তোরে ডাইক্যাই দিব।'

মনির বলল, 'দাদাজান, দরকার আপনে বোঝতে আছেন না। ঘরে বিছনায় শুইয়া দরকার বোঝন যায় না। চাবিগুলান না দিলে, সিন্দুক, বাক্স আর আলমারিগুলান ভাঙ্গা লাগব দাদাজান।'

মনির আর দাঁড়াল না। সে যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই চলে গেল। মনিরের আচরণে ভারি অবাক হয়েছেন আমোদি বেগম। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথা ভেবে তার মায়াই হচ্ছে। এই পাহাড়ের মতো মানুষটা ক্রমশই কেমন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছেন। তিনি তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখের দিকে তাকালেন। মনিরের গমনপথের দিকে তাকিয়ে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ মৃদু হাসলেন। তার হাসি দেখে আমোদি বেগম ভারি আশ্চর্য হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হাসতেছেন ক্যান? এইটা হাসনের মতো কোনো ঘটনা?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'একটা কথা চিন্তা কইর‍্যা হাসতেছি।'

আমোদি বেগম বললেন, 'কি কথা?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'জীবনের হিসাবের কথা। বড় পাক্কা হিসাব-নিকাশ।'

আমোদি বেগম বললেন, 'এইখানে হিসাব-নিকাশের কি দেখলেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমার বাজানের শেষদিকের কাজ কারবার আমার পছন্দ আছিল না। আমার খালি মনে হইত, এই কাজ যদি এমনে না

কইরা, অমনে করা হইত। অমনে না কইরা এমনে করা হইত। তাইলে আরো ভালো হইত। আমার তখন চিন্তা-ভাবনা সব বিষয় সম্পত্তির উপর। বাজানের শরীল খুব খারাপ। আমি ডাক্তার কবিরাজ আনি। মসজিদে মিলাদ দেই, দোয়া পড়াই। কিন্তু মনে মনে আল্লাহর ধারে বলি, আল্লাহ বুড়ারে যত তাড়াতাড়ি পারো, লইয়া যাও। এর জইন্য আমি মন মতো কাজ করতে পারতেছি না। আইজ মনিররে দেইখ্যা আমার সেই নিজের কথা মনে পড়ল। মনির পারলে এহন নিজ হাতে আমারে গলা টিপ্যা মাইরা ফালায়। তার মাথায় এহন খালি সয় সম্পত্তি। জীবনটা হইল একটা চোরপুলিশ খেলা বুঝলা? তুমি যত যাই করো, ধরা তোমারে খাইতেই হইব। আইজ বা কাইল।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ফজুরে বলছ কাগজপত্রের কিছু ব্যবস্থা করতে? আমি তো আর এই অবস্থায় জমি লেইখ্যা দিতে মাদারীপুর যাইতে পারব না। তারে বলো তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে। আমি চোউখ বোজলে কিন্তু শ্যাষ।'

আমোদি বেগম বললেন, 'সে ব্যবস্থায় আছে'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কোহিনূরের কোনো খবর পাইছ?'

আমোদি বেগম অনেকক্ষণ কোনো জবাব দিলেন না। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'সে আসব না'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যেন এই জবাবটা জানতেন। মনে মনে এমন কিছু শোনার প্রস্তুতিও ছিল। কিন্তু তারপরও বুকের কোথায় তীব্র ফলার মতো বিদ্ধ হলো কিছু। সেখানে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় রক্তক্ষরণ হতে থাকল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বাইরে অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। যেমন ছিলেন, তেমন চুপ করেই রইলেন। তার চারপাশে একটা চাপা কষ্ট ভেসে বেড়ানো নিঃশব্দে। এই নিঃশব্দতা বাকিটা দিন ভেসেই রইল। আরো গাঢ় হলো। গভীর হলো। তীব্র হলো। কিন্তু মিলিয়ে গেল না। নিঃশব্দতা ভাঙল পরদিন সন্ধ্যায়। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ছোট ছেলে দবির এসে উপস্থিত বাড়িতে। সাথে তার স্ত্রী এবং ছ'বছরের এক পুত্র সন্তান। তিনি এসে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ সরুচোখে তাকিয়ে বললেন, 'ঘটনা কি?'

দবির খাঁ বললেন, 'বাজান আপনেরে না জানাইয়া বিয়া কইরা ফালাইছিলাম। বরিশালের ঝালকাঠিতে গিয়া এই মাইয়ার মায়ায় পইরা গেছিলাম। সেই মায়া আর ছাড়াইতে পারি নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ছেলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই ছেলেকে এতটা নজর করে কখনো দেখেননি তিনি। অন্য সময় হলে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কি করতেন তা তিনি জানেন না। তবে দবির খাঁকে স্ত্রী সন্তানসহ দেখে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ভেতরে ভেতরে একটু যেন আনন্দিতই হলেন। যদিও পুত্রবধূর

www.boighar.com

চেহারা-ছবি দেখে তিনি খুশি হতে পারলেন না। বরং ভয়ানকভাবে আহতই হয়েছেন। নিজের ভেতরের সেই পুরনো জেদ, জাত্যাভিমান প্রবল আক্রোশে ফিরে আসতে চাইছিল। কিন্তু প্রবল চেষ্টায় তিনি তা প্রতিহত করলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বিয়ার কথা এতদিন বলস নাই ক্যান? তোর বিয়া নিয়া কি কারো কোনো আপত্তি ছিল? তুই বললেই তো বড় ঘর দেইখা জাঁকজমকভাবে বিয়া হইত। আর করছসই যহন, লুকাইয়া করলি কেন? জানাইয়াই করতি।'

দবির খাঁ বললেন, 'এইহানেই সমস্যা বাজান'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কি সমস্যা?'

দবির খাঁ বললেন, 'বংশ'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিজেকে বোঝালেন। তিনি তার এই ক'দিনের ভাবনা, বোঝাবুঝিকে যেন আবার নতুন করে নিজের ভেতর প্রথিত করলেন। খানিক সময় নিয়ে নিজের সাথে বোঝাপড়া করে, তিনি নরম গলায় বললেন, 'বংশ ছোট হইলেও সমস্যা নাই। তোর ছোট মায়ের বংশও তো ছোট বংশ। আমি তারে বিবাহ করি নাই? বংশটা আসল নারে, কর্মটাই আসল। এই জিনিস বুঝতে বড় দেরি হইছে আমার।'

দবির খাঁ বাবার কথা শুনে যারপরনাই অবাক হলেন। তিনি আহ্লাদিত গলায় বললেন, 'বাজান! বাজান!'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হেসে ছেলেকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, 'কোনো সমস্যা নাই বাজান। তুই এই বয়সেও শেষ পর্যন্ত বিয়া-শাদি করছস। সংসারী হইছস, এইতেই আমি খুশি। ছোট বংশ হোক সমস্যা নাই। তা মাইয়ার বাপ কি করে? বংশ কি?'

দবির খাঁ বললেন, 'বংশে মেথর। গু পরিষ্কার করে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ প্রথমে বিষয়টা বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'কি করে?'

দবির খাঁ আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। বললেন, 'সে ঝালকাঠি জেলা পরিষদে চাকরি করত। মেথরের চাকরি। সরকারি অফিস-আদালতে পায়খানা পরিষ্কার। মাঝে-মধ্যে ছুটা টাইমে খ্যাপও মারত। প্রাইভেট খ্যাপ। বালতি কান্ধে লইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরত। খ্যাপ পাইলে পায়খানা পরিষ্কার করত। সেই লোকের মাইয়া বিয়া করছি। কী করব বলেন? দেইখ্যা মায়া পইড়্যা গেল। সেই মায়া আর কাটাইতে পারলাম না। মাইয়ার বয়সও কম। আমার অর্ধেক। চেহারা ছবি ভালো না। মেথরের মাইয়া। বিয়া করব কেডা! মায়া পইড়্যা গেল বাজান। দুইন্যায় সব কিছু ছাড়া সহজ, মায়া ছাড়া সহজ না। আমার শ্বশুরের বয়সও বেশি না। আমার সমানই হইব। কিন্তু সে হঠাৎ মারা গেল। এতদিন তার ঘাড়ে

বইসা বইসা খাইছি। এহন কি করব? এইজইন্য চইলা আসছি। আপনে চাইলে আব্বা, আমি এই বাড়িতে থাকব না। আমারে দূরে কোনোখানে একটু জমি দেন, একখান ছনের ঘর তুইল্যা দেন। আমি সেইখানেই থাকব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আর কথা বললেন না। তার কেন যেন বমি পাচ্ছে। একবার মেথরদের বাথরুম পরিষ্কারের দৃশ্য তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দেখেছিলেন। পায়খানার স্লাবের ভেতর থেকে তারা দুইহাত ভর্তি করে মল উঠায়। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মাথা ঘোরাতে লাগল। বমি বমি ভাব হতে লাগল।

ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। চারদিক থেকে বাড়ির বাইরে মানুষ এসে জমা হতে লাগল। সকলেই এই বউ দেখতে চায়। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ছেলের বউ মেথরের ঘরের...! কারোরই যেন বিশ্বাস হয় না এই কথা! পরদিন সকাল নাগাদ দবির খাঁকে ঘরে আটকে তার স্ত্রী পুত্রকে বাড়ির বাইরে বের করে দেয়া হলো। সন্ধ্যা অবধি তারা সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটা মায়ের আঁচল ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মা, খিদা লাগছে'।

তার মা জবাব দিলো না। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। দবির খাঁর স্ত্রী জানে না, সে তার সন্তান নিয়ে কই যাবে! এই অচেনা-অজানা এলাকায় তার যাওয়ার কোনো জায়গা নাই।

রাতভর তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিজেকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। গত কিছুদিনের নানান চিন্তা-ভাবনা, বোঝাপড়া একত্র করে তিনি বিষয়টা মেনে নেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই কিছু মেনে নিতে পারলেন না তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। যতবার তিনি ভাবেন, ততবারই ঘেন্নায় তার সারা শরীর রি রি করে ওঠে। সেই রাতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন দবির খাঁর স্ত্রী তাকে ভাত বেড়ে দিচ্ছে। তিনি প্লেটে ভাত নিয়ে তরকারি নিলেন। তারপর আরাম করে ভাত মেখে মুখে দিলেন। রান্না খুবই ভালো হয়েছে। তিনি তৃপ্তি করে ভাত খেলেন। সাধারণত এত ভাত তৈয়ব উদ্দিন খাঁ খান না। তিনি আবারো ভাত চাইলেন। এবার ভাত মেখে মুখে দিতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন ভয়াবহ দুর্গন্ধ আসছে কোথাও থেকে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আচমকা তাকিয়ে দেখেন তিনি এতক্ষণ ভাত ভেবে যা আরাম করে খাচ্ছিলেন, তা আসলে ভাত না। মানুষের মল। তিনি ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলেন, তরকারির বাটিভর্তিও মানুষের নানারকম মল। ডালের বাটি ভর্তি পাতলা পায়খানা।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙেই তিনি হড়বড় করে বমি করলেন। সেই রাত তার কাটালো বমি করে। তিনি মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করতে পারলেন না। তার এই এতদিনকার চিন্তা-ভাবনা, কিছুই তাকে সামান্যতম প্রবোধও দিতে পারছে না। তিনি ভোরের আলো ফোঁটার আগেই

www.boighar.com

আমোদি বেগমকে ডাকলেন। বললেন, 'আমোদি বেগম, এই ঘটনা ঘটার আগে আল্লাহ আমারে উঠাই নিয়া গেল না কেন?'

আমোদি বেগম কথা বললেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আল্লাহ আমার মরনের আগে আমারে এই শাস্তি দেওনের কথা ভাবছিল? আমি এত বড় পাপ করছিলাম জীবনে!'

আমোদি বেগম বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। এই ঘটনা তিনিও মেনে নিতে পারছেন না। ভোরের আলো ফোঁটার সাথে সাথে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ঘরে চলে এলো মনির, খবির খাঁ, মনিরের মা। মনির বলল, 'দাদাজান, বাড়ির দরজায় এহনো দুইজন বইস্যা আছে। লোকজন দিয়া মাদারীপুর পাঠাই দিব? ওইখান থেইকা বরিশালের গাড়িতে তুইল্যা দিব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আগে দেখ আপোষে কিছু করন যায় কিনা? মাইয়ারে দবির বিয়া করছে। মামলা-মোকদ্দমা করলে সমস্যা। মান-সম্মানের প্রশ্ন। এক কাজ কর। আগে এইহানে লইয়ায়। দেহি কথা বইল্যা, পয়সাপাতি দিয়া কিছু করন যায়নি!'

সারারাত না খাওয়া, না ঘুমানো দবির খাঁর স্ত্রীর চেয়েও তার সন্তানের অবস্থা বেশি খারাপ। সে ঘরে ঢুকেই করুণ গলায় বলতে লাগল, 'দুইডা ভাত দ্যান, আল্লারস্তে দুইডা ভাত দেন।'

কিন্তু কেউ কোনো শব্দ করল না। সকলেই তাকিয়ে আছে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর দিকে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর শরীর যারপরনাই খারাপ। কিন্তু সেটি তিনি কাউকেই বুঝতে দিচ্ছেন না। দবির খাঁর পুত্র তার নাতি, কিন্তু সেই নাতির করুণ আর্তনাদ শুনেও তার বিন্দুমাত্র মায়া হচ্ছে না। বরং রাগ এবং ঘেন্নায় তার শরীর রি রি করছে। সম্ভবত ছেলেটির মা-ই শিখিয়ে দিয়েছিল, সে হঠাৎ দৌড়ে এসে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হাত ধরে কান্না শুরু করল, 'দাদাজান, খিদা, দাদাজান। খিদা। দুইডা ভাত দিতে কন, দাদাজান। নুন আর মরিচ হইলেই হইব দাদাজান। খিদা।'

দুটো ভাতের জন্য ছ'বছরের ছেলের এমন অসহায় করুণ কান্না দেখলে যে কারো মন গলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মন তাতে এতটুকু গললো না। বরং ছেলেটা তার হাত ধরতেই তৈয়ব উদ্দিন খাঁর আবার রাতের সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বহু কষ্টে যেন বমি চাপলেন। আচমকা পা ভাঁজ করে হাঁটুর ধাক্কায় তিনি ছেলেটাকে মেঝেতে ফেলে দিলেন। মনির এসে ছেলেটার সামনে দাঁড়াল। তারপর রক্তচক্ষু করে বলল, 'গলা চিপ দিয়া, ভাত খাওনের সাধ মিটাই দিব হারামজাদা! যা, পায়খানায় গিয়া গু খা।'

ছেলেটা এবার আর কাঁদল না। সে চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে মনিরের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন তার এইটুকু জীবনে, এর চেয়ে খারাপ

ঘটনা আর সে দেখেনি। সে আর একটুও কাঁদল না। উঠে গিয়ে মায়ের হাত ধরে টানতে লাগল। কিন্তু তার মা উঠল না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নানানভাবে দবির খাঁর স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। নানান ভয়ভীতি দেখালেন। মনিরকে দিয়ে হম্বিতম্বি অবধি করালেন। পয়সাপাতির প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। স্বামীকে ছাড়া সে এই বাড়ি থেকে কোথাও যাবে না। মেরে ফেললেও না।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ শেষ অবধি সিদ্ধান্ত দিলেন। সলিমুদ্দি দফাদারের পরিত্যক্ত বাড়ির পেছনে যে জঙ্গল মতো জায়গাটা রয়েছে, সেখানে একখানা ছনের ঘর তুলে দিতে বললেন। তবে দবির খাঁ সেই বাড়িতে যেতে পারবেন না। শুধু যে যেতেই পারবেন না, তাও না। স্ত্রীর সাথে কোনো সম্পর্কও তিনি রাখতে পারবেন না। সবচেয়ে ভালো হতো তালাকের ব্যবস্থা করতে পারলে। কিন্তু সেটিতে দবির খাঁকে কিছুতেই আতঙ্ক করানো গেল না।

সেই মুহূর্তেই দবির খাঁর স্ত্রী আর পুত্রকে খাঁ-বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হলো। দিনের মধ্যে ঘরামি ডেকে বাঁশ ছন দিয়ে কোনোমতে একখানা ঘরও তুলে দেয়া হলো। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য তারপর দিন কয় আর খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন না। খাওয়া-দাওয়া করতে বসলেই তার কেবল সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। তার চেয়েও বড় কথা, দবির খাঁর ছেলে তার হাতের যেখানে স্পর্শ করেছে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁর বারবার মনে হতে লাগল, সেই জায়গাটিতে বোধ হয় নোংরা লেগে আছে। তিনি সেদিন তিনবার গোসল করলেন। সাবান দিয়ে হাতের সেই জায়গাটা কম করে হলেও কুড়িবার ধুলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরপরই তার মনে হতে থাকল, তার শরীর জুড়ে বোধহয় ছড়িয়ে পড়ছে ভয়াবহ কোনো দুর্গন্ধ!

সংবাদটা শুনে পারুল হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। লতা দৌড়ে এসে পারুলকে জিজ্ঞেস করল, 'ও পারুল। পারুল। কি হইছে? ওই কি হইছে বল তো? রাজীব তোরে ফোনে খারাপ কিছু বলছে?'

পারুল ডানে-বায়ে মাথা নাড়াল। কিন্তু কান্নার দমকে সে মুখে কিছু বলতে পারছে না। লতা পারুলের কান থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে দেখল রাজীব এখনো লাইনে। সে ফোন কানে নিয়ে বলল, 'কি হইছে রাজীব ভাই? লতা এমনে কান্দে কেন?'

রাজীব হো হো হো করে হাসল। তারপর বলল, 'আব্বা-আম্মা বিয়ে মত দিয়েছেন। সে এই সংবাদ শুনে কাঁদছে। ফোনে পারুলের কিছু ছবি তুলেছিলাম। মাকে দেখিয়েছিলাম আগেই। আজ বাবার সাথে কথা হলো। বাবা কি একটা কাজে বাইরে যাচ্ছেন। ফিরতে পনেরো-কুড়ি দিন লেগে যেতে পারে। তারপরই আমরা সবাই আসব। পারুলের বাড়িতে গিয়ে মা-বাবা বিয়ের তারিখ ঠিক করে আসবেন।'

লতা আর কথা বলল না। সে ফোন কেটে দিয়ে পারুলকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো হাসতে লাগল। দুই বান্ধবী আনন্দে যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। তারা রুম জুড়ে বাচ্চাদের মতো হুটোপুটি করতে লাগল। দিন দুই আগে লতার কাছে রায়গঞ্জে এসেছে পারুল। তারপর আজ সন্ধ্যায় এই ঘটনা! আর এক মুহূর্তের জন্যও বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না পারুলের। কিন্তু পারুল পরদিন বাড়ি ফিরল। বাড়ি না ফিরে বলা উচিত সে যেন এক ভয়ঙ্কর গোরস্থানে ফিরে এসেছে। এখানে যেন আলো নেই, মানুষ নেই, প্রাণ নেই। কেবল ভয় আছে। মৃত্যু আছে। মৃত্যুর অশনিসংকেত আছে। পারুলের কী যে অসহ্য লাগছে এই বাড়িটা। এই গ্রামটা। এই আলো, হাওয়া, জল। সকলই যেন ভেতরে নোংরা জঘন্য এক চেহারা লুকিয়ে রেখে হেসে চলেছে। কিন্তু এখন সে সব কিছুই দেখতে পায়। বাইরের ঝকঝকে, মোলায়েম, মায়াবী মুখের ভেতরের

কদর্য চেহারা। লুকোনো মুখের এই দেখাটা বড় কষ্টের। বড় যন্ত্রণার। পারুলের খুব হাসফাস লাগে। সে আব্দুল ফকিরকে কথাটা বলল। আব্দুল ফকির বললেন, 'মারে, তোমারে ওই অতদূরে বিবাহ দিয়া আমি থাকব কেমনে?'

পারুল বলল, 'সব বাপ মা-ই মাইয়ার বিয়া দেয়। আপনেও দিবেন'।

আব্দুল ফকির বললেন, 'মা, বিয়া দেওয়া তো সমস্যা না। সমস্যা অতদূরে বিয়া দেওন। আর তুমি নাই, তোমার মাও নাই। আমি মানুষটা একলা কেমনে থাকব মা? তোমারে না দেইখ্যা আমি থাকতে পারব না গো মা।'

পারুল বলল, 'বিয়ার পর আমার মায় আর কোনোদিন তার বাপের বাড়ি যাইতে পারে নাই। তার বাপে তারে দেখতে পারে নাই। সেও তার বাপেরে দেখতে পারে নাই। এই কথা আপনের অজানা থাকনের কথা না।'

আব্দুল ফকির পারুলের কথায় থমকে গেলেন। তিনি আর কথা বললেন না। পারুল অপেক্ষা করতে লাগল পরের শুক্রবারের। আরো তিনদিন বাকি। তারপর রাজীবের সাথে তার দেখা হবে। আচ্ছা, সে কি একবার রাজীবকে তাদের বাড়ি নিয়ে আসবে? আসলে রাজীবকে সে কোথায় বসতে দিবে? বাইরের ঘরে? নাকি তার ঘরে? এইটুক ভাবতেই লজ্জায় পারুলের গাল লাল হয়ে উঠল। নাহ্, এখুনই রাজীবকে বাড়ি আনা ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং একসাথে বাবা মায়ের সাথেই সে আসবে! কিন্তু পরের শুক্রবার যখন রাজীবের সাথে দেখা হবে, সেদিন সে কি করবে? পারুলের কেন যেন মনে হচ্ছে, রাজীবের সামনে যেতে তার ভারি লজ্জা লাগবে!

দৃশ্যটা বেখাপ্পা কিন্তু সত্যি। আব্দুল ফকিরের ঘরে বসে আছে মনির। মনির বলল, 'ফইর সাব, আপনের লগে কোনোসময় কোনো বেয়াদবি করলে মাফ কইরা দিয়েন। দাদাজানের সাথে আপনের যা-ই কিছু থাকুক। সেইটা আপনাগো বিষয়। আমার লগে আপনের কোনো ঝামেলা আল্লাহর ইচ্ছা হইব না। আপনে আমার কোনো ক্ষতি কইরেন না ফইর সাব। আপনে কি জিনিস, সেইটা আমি জানি। কোনো ভুল টুল করলে মাফ কইরা দিয়েন ফইর সাব।'

আব্দুল ফকির কোনো কথা বললেন না। তিনি তার হাতখানা বাড়িয়ে মনিরের মাথায় রাখলেন। মনির বলল, 'দাদাজানের ডাইন হাতখান অবশ হইয়া গেছে কাকু।'

আব্দুল ফকির স্মিত হাসিতে বললেন, 'আল্লাহ তারে ভালো কইরা দিবেন'।

মনির বলল, 'এই ঘটনা কেন ঘটছে আপনে জানেন কাকু। দাদাজান সেইদিনই আমারে বলছিল, দহলিজ ঘরে কি হইছে!'

আব্দুল ফকির বললেন, 'মানুষমাত্রই দোষগুন থাহে মনির। আমারো দোষত্রুটি আছে। সে মুরুব্বী মানুষ। ভুল করছি, একটু শাসন কইরা দিছে।

www.boighar.com

এইটা সে করতে পারে না? তুমি ভাবতেছ, সেই জইন্য আমি তার হাতে সমস্যা করছি? না মনির। আল্লায় আমারে ওই ক্ষমতা দেয় নাই।'

মনির বলল, 'তাইলে ঘটনা কি হইল কাকু? দাদারও ধারণা, এই ঘটনা ঘটছে আপনের কারণে। একটু সত্যি কইরা বলেন তো কাকু!'

আব্দুল ফকির এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তিনি রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন। তার হাসিতে মনির পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেল। আব্দুল ফকির বললেন, 'তয় মনির, তোমার বিপদ কিন্তু সামনে'।

মনিরের বুকের ভেতর থেকে তার কলিজাটা যেন লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসার দশা হলো। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কি বলেন ফইর কাকু। আপনে থাকতে আমার বিপদ কেমনে আসব। আপনে আমারে রক্ষা করবেন কাকু।'

আব্দুল ফকির বললেন, 'শুনছি, তোমার ছোট চাচা দবির খাঁ বউ পোলাসহ ফেরত আসছে। ঘটনার কিছু বুঝতে পারছ?'

মনির বলল, 'কি ঘটনা?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সম্পত্তির ভাগিদার কিন্তু বাইর‍্যা গেল। এতদিন তার সবকিছুর মালিক আছিলা তুমি আর তোমার ভাই। এহন? কোন না কোন মেথরের ঘরে বিয়া করছে, সেই ঘরের পোলা হইব খাঁয়গো বংশের বাত্তি। মাইনষের কথায় জয়, মাইনষের কথায় লয়। কোন দিন না জানি, মাইনষে তার কারণেই খাঁ-বাড়ির মেথর বাড়ি বইলা ডাকন শুরু করে। তার হিসাব আছে? তার উপর ধরো আরো দুয়েকটা যদি বাচ্চা-কাচ্চা হয়, তাইলে কিন্তু ভাগিদার আরো বাড়ব।'

এতদিনে এই কথা একবারও চিন্তা করেনি মনির। সে আব্দুল ফকিরের কথা শুনে মোটামুটি হতবুদ্ধ হয়ে রইল।

আব্দুল ফকির বললেন, 'খাঁ সাব মুরুব্বি মানুষ, তার উপরে কথা বলন মানায় না। কিন্তু এইটা তিনি কি করলেন? ওই বউরে থাকতে দিলেন গ্রামে? তারপর আবার ঘর তুইল্যাও দিলেন? কি আশয়-বিষয় কিছুই জানি না। তয় খাঁ স্যাব যে তোমারে খুব একটা পছন্দ করতেন না, তা তো আগে থেইকাই জানি। কে জানে, কার মনে কি! নাইলে, যে খাঁ বংশ নিয়া এত ভাবনা-চিন্তা করত, সে এই বিয়া মাইন্যা নিলো? ভিতরে ভিতরে কি আছে, কে জানে! আমি তো আর ভিতরের লোক না। তয় ঘটনা যে কিছু আছে, তা তো শুনছিই। শুনছি ফজুর গয়নার কলসও নাকি খাঁ-বাড়িতে!'

মনিরের চোখ যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসলো। সে উত্তেজিত গলায় বলল, 'কি!'

আব্দুল ফকির বললেন, 'তোমার দাদাজানে আমারে নিজ মুখে বলছেন! যা-ই করো মনির, চোউখ কান খোলা রাইখা কইরো।'

মনির আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সেই মুহূর্তে সে ফতেহপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর শরীর যথেষ্ট খারাপ। তিনি শুয়ে আছেন তার ঘরে। তার সামনে বসে আছে ফজু আর তার ভাই নজু। তাদের কাছে জমিজমার নানা কাগজপত্র। দুইজন সাক্ষিও আছে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দুই দিক থেকে চল্লিশ বিঘা জমি লিখে দিচ্ছেন ফজু আর নজুকে। তাকে দলিল পড়ে শোনাচ্ছেন গেসুদ্দিন আমিন। ইউনিয়ন পরিষদের তহশিলদারও রয়েছেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ডান হাত পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি অকেজো হয়ে পড়েছে। তারপরও সেই হাতেই কোনোমতে টিপসইয়ের ব্যবস্থা করা হলো। টিপসই দেয়া শেষে আমোদি বেগম শাড়ির আঁচলে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হাতের কালি মুছে দিলেন। কলসির গয়নার বিষয়ে এখনও কিছু সিদ্ধান্ত হয়নি। অবশ্য সকলের সামনে সেটি আলোচনার বিষয়ও না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ চিন্তা করছেন, অন্যান্যদের বিদায় দিয়ে তিনি, ফজুরা দুই ভাই, আর আমোদি বেগম মিলে গয়নার বিষয়ে কথা বলবেন। এই গয়না একসাথে বিক্রি করা কিংবা ঘরে রাখা উভয়ই যথেষ্টই বিপজ্জনক কাজ। সুতরাং আর কি উপায় বের করা যায়, সেটি ভাবতে হবে। কিন্তু তাদের ভাবনা ভাবার সুযোগ হলো না। মনির ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল। তার সাথে সেই তাগড়া জোয়ান দুজন যুবক। তারা মনিরের সাথে ঘরে ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আজ তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে মনিরের বিস্তর বোঝাপড়া আছে! কিন্তু ঘরে ঢুকেই মনির থমকে গেল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সামনে ফজু আর নজুকে দলিল পর্চা হাতে বসে থাকতে দেখে মনিরের মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে গেল।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনিরের উন্মত্ত হয়ে ওঠা দেখলেন। বারকয়েক তার অসুস্থ ক্ষয়িষ্ণু কণ্ঠের ডাকে তিনি মনিরকে থামাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। মনির আর তার সাথের যুবক দুজন মিলে ফজু আর নজুকে ভয়ঙ্করভাবে পেটাল। তাদের যখন খাঁ-বাড়ি থেকে বের করা হলো, তখন দুজনেরই মৃতপ্রায় অবস্থা। তাদের সাথে থাকা সকল কাগজপত্র রেখে দেয়া হয়েছে। মনির অবশ্য এতেই ক্ষান্ত হলো না। সে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সামনে এসে চিৎকার করে বলল, 'সিন্দুক আলমারির চাবি চাইছিলাম, সেইগুলান কই? এক্ষণ সেই চাবি দিবেন। এক্ষণ।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এই প্রথম মনিরকে দেখে আতঙ্কিত বোধ করলেন। তার মনে হলো, তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে মনির না। একে তিনি আগে

www.boighar.com

কখনো দেখেননি। এমন কারো কথা তিনি কখনো চিন্তাও করেননি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ হঠাৎ তীব্র আতঙ্কবোধ করতে লাগলেন। তার মনে হলো তিনি এতদিন তার কোলের ভেতর দুধ কলা দিয়ে একটি ফণা লুকিয়ে রাখা গোখরা সাপ পুষেছিলেন। তিনি খুব করে চেয়েছিলেন, এই সাপটা একদিন ফণা তুলুক। সে ফণা তুলে ছোবল মারতে শুরু করুক অন্যদের। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। সেই সাপটা আজ ফণা তুলেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সাপটা ফণা তুলে আছে তারই দিকে। এখন কেবল ছোবল মারার অপেক্ষা!

লতার মন খারাপ। পারুল আর রাজীবের কত আগে থেকে তার সাথে আশিকের সম্পর্ক। অথচ পারুলের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার বিয়ের কোনো খবর নেই। এই নিয়ে আশিকের সাথে আজ তুমুল ঝগড়া হয়েছে তার। আশিক এবার এসেছে প্রায় মাস দেড়েক পরে। কী সব কাজে ব্যস্ত ছিল সে। কিন্তু আসার পর থেকেই লতার ঝগড়া। আশিক অবশ্য নানাভাবেই লতার অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাজ হয়নি। প্রতিবার এই সময়টা তারা লঞ্চের কেবিনে একান্ত সময় কাটায়। কিন্তু আজ অভিমানী লতা তার হাতটা অবধি ধরতে দেয়নি আশিককে। সে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আর কিচ্ছু হবে না। হাত ধরাও না। আশিক শেষমেষ বিয়ে নিয়ে গুরুতর আলোচনা করার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু লতা তাতে সাড়া দেয়নি। তার এক কথা, বিয়ে নিয়ে সরাসরি কথা বলতে হবে দুই পরিবারে। সে আর পরীক্ষা অবধি অপেক্ষা করতে পারবে না। এত পড়াশোনার দরকার নেই তার। সে বিয়ে করবে, রান্নাবান্না করবে। বাচ্চা-কাচ্চার মা হয়ে ঘর-সংসার সামলাবে। এতেই সে খুশি। আশিক দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও যখন লতাকে বোঝাতে পারল না, তখন সেও দূরে গিয়ে একা একা বসে রইল। সেই নদীর পারে। যেখানে বসতো পারুল আর রাজীব। কিন্তু আজ যেন ঠিকানা বদল হয়েছে। লতার আশিকের জন্য যে মায়া হচ্ছে না, তা না। বেচারা একা একা মন খারাপ করে বসে আছে। অথচ প্রতিবার তার বুকের ভেতর ঢুকে বেড়ালের বাচ্চার মতো ওম খোঁজে সে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করেছে, বিয়ের বিষয়ে কিছু চূড়ান্ত না হওয়া অবধি সে আর আশিকের কাছে যাবে না। লতা জানে আশিক তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। তাকে ছাড়া একমুহূর্তও সে থাকতে পারবে না। কিন্তু কেমন ছন্নছাড়া আর আলসে ধরনের ছেলে সে। কোনোকিছুতেই যেন গা নেই তার। লতা এবার এই আলসেমিটা ছাড়াবেই।

www.boighar.com

আশিকের কষ্ট হচ্ছে এটা লতা বোঝে। কিন্তু তারও কি কম কষ্ট হচ্ছে? কিন্তু এই কষ্টটা সে করতে চায়। তাদের ভালোর জন্যই করতে চায়। আশিককে একটা ধাক্কা দেয়া জরুরি। যখন মানুষ হাতের নাগালে সবকিছু পেয়ে যায়, তখন তার মূল্যটা সে বোঝে না। লতা চায়, আশিক এটা বুঝুক।

আশিক আর রাজীব চলে যেতে লতা আর পারুলের আবার রাতভর গল্প। লতার মন ভীষণ খারাপ হলেও একটা বিষয় নিয়ে সে খুব উত্তেজিত। পারুল আজ প্রথম প্রায় সারাটা দিন রাজীবের সাথে একা একা কেবিনে আটকে ছিল। তাদের মধ্যে কি হয়েছে, কে জানে! লতা চোখ নাচিয়ে বলল, 'দেখিস, আবার প্রথম বারেই প্যাট বাধাইয়া ফেলাইস না।'

পারুল প্রথমে লতার কথা বুঝতে পারল না। সে বলল, 'মানে? পেট বাধাইয়া ফেলাইবে মানে কি? প্যাট বাধাইব কেমনে?'

লতা পারুলের গাল টেনে ধরে বলল, 'এহ! আমার কচি খুকি। নাক টিপলে যেন দুধ বাইর হইব। সারাদিন কি করছ? সাধু সাইজো না আমার ধারে বুঝছ?'

পারুল যেন লতার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল। সে মুখ ঝামটা মেরে বলল, 'সবাইরে কি আশিক ভাই আর তুই পাইছস? সবাই তোগো মতো হইলে বাংলাদেশে আর মানুষজনে আটাইত না। পোলাপানে ভইরা যাইত।'

লতা বলল, 'হু। কত ধোয়া তুলসি পাতা, দেখা যাইব নে!'

পারুল বলল, 'ধোয়া তুলসি পাতা তো আর বলি নাই। শখ আহ্লাদ তো আমারো কিছু আছে না? তয় আফসোস, এমন এক ভ্যান্দা পোলারে জুটাই দিছস, ক কইলে কলিকাতা না বুইঝা, বোঝে কলম। কবে যে একটু কলিকাতা বুঝব!'

লতা বলল, 'খুব না!'

পারুল মুখ গম্ভীর করে বলল, 'কপাল বুঝছস। এই কপালে শখ আহ্লাদ বলতে কিছু নাই। আল্লায় কপালে একটা জামাই দিছে। তাও দেখি বোরকা পরইন্যা পুরুষ। মাইয়া মাইনষেরতন লজ্জা শরম বেশি।'

লতা বলল, 'হ। কেমন লজ্জা বোঝন যাইব। বিয়ার বছর না ঘুরতেই দেহন যাইব গণ্ডায় গণ্ডায় পোলাপান। পারলে বছরে দুইবার বিয়ানোর ব্যবস্থা করে!'

পারুল হাতের উল্টো পিঠে লতার মাথায় চাটি মেরে বলল, 'তোর মুখ যা হইছে না!'

লতা বলল, 'হা। এহন তো আমার মুখ খারাপই হইব। সুখের দিনে আর দুখের বন্ধুরে মনে থাহে না। এইটাই জগতের নিয়ম।'

এই কথায় পারুলের ভারি মন খারাপ হলো। সে লতাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বলল, 'তোর কি আশিক ভাইয়ের লগে ঝগড়া হইছে?'

লতা কোনো কথা বলল না। তবে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। আশিকের জন্য তার কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট। আশিককে সে অনেকবার ফোন করেছে। কিন্তু আশিক রাগ করে ফোন বন্ধ করে রেখেছে। লতার কাছে মনে হচ্ছে কেউ একজন তার বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। আশিকের গলা না শোনা অবধি এই পাথর তার বুকের উপর থেকে সরবে না। পরেরবার আশিক এলে সে সারাটাদিন আশিককে শক্ত করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে রাখবে। সারা রাত লতা ঘুমাল না। আশিক ফোন খুলল পরদিন দুপুরে। ফোন খুলতেই লতা ফোন করল। আশিক হ্যালো বলতেই লতা আর কিছু বলতে পারল না। তার মনে হলো সে বছরের পর বছর আশিকের গলা শুনতে পায়নি। সে ঝরঝর করে কেঁদে দিলো। আশিক কেবল ফিসফিস করে বলল, 'লতা, তুমি কি একটু চোখ বন্ধ করবে?'

লতা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'উমম'।

আশিক বলল, 'তুমি কি এবার একটু আমার কাছে আসবে?'

লতা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'উমমম'।

আশিক বলল, 'তুমি আমার কাছে আসো। আমার বুকের ভেতর। আমি তোমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখছি।'

লতা আবার কাঁদল। হাউমাউ করে কাঁদল। সেই কান্নার জলে তার বুকের উপর চেপে বসে থাকা শক্ত পাথরটা ক্রমশই গলে যেতে থাকল।

লতা প্রবল প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইল পরের সপ্তাহের জন্য। আশিককে দেখামাত্র সে চিৎকার করে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবে। তারপর পাগলের মতো চুমু খাবে তাকে। সে বাকি দু'দিন সারাটক্ষণ এই নিয়েই যেন ভাবল। কিন্তু লতার ভাগ্য খারাপ। পরের সপ্তায়ও আশিক আসতে পারল না। তার মায়ের বাইপাস সার্জারি হবে। গুরুতর অপারেশন। জীবন-মরণ সমস্যা। বন্ধুর মায়ের এমন গুরুতর অপারেশন রেখে আসতে পারল না রাজীবও। লতা সারারাত জায়নামাজে বসে মোনাজাতে কাঁদল। কাঁদল পারুলও। কিন্তু এই দুজনেরই মোনাজাতে একটা অদ্ভুত কথাই মনে হলো, তারা যতটা না আশিকের মায়ের সুস্থতার জন্য উদগ্রিব। তার চেয়েও বেশি উদগ্রিব তাদের মানুষ দুজনকে দেখার জন্য, কাছে পাওয়ার জন্য। আশিকের মা যত তাড়াতাড়ি সুস্থ হবেন, তত তাড়াতাড়িই তারা তাদের প্রিয়তম মানুষ দুজনকে কাছে পাবে! কিন্তু ভয়াবহ দুঃসংবাদটা এলো তিনদিন পর। আশিকের মা মারা গেছেন। লাশ নিয়ে যেতে হয়েছে আশিকের গ্রামের বাড়িতে। আশিক পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সে খায় না, ঘুমায় না। ফোন ধরে না। কারো সাথে কথা বলে না। এই ভয়াবহ

www.boighar.com

দুঃসময়ে আশিকের কাছে থাকতে যে কী ইচ্ছে করছে লতার। কিন্তু কীভাবে থাকবে সে! তার কেবল মনে হয়, সে কিচ্ছু পারে না। সে পারে শুধু একা একা কাঁদতে, আর আশিকের সাথে ঝগড়া করতে। এই ভেবে লতার কান্না আরো বাড়ে। কষ্ট আরো বাড়ে। তেষ্টা আরো বাড়ে। পরের সপ্তায় এলো রাজীব একা। লতার সাথে তার কথা বেশি হলো না। সেদিন লতার মামার বাসা ফাঁকা ছিল বলে রাজীব আর পারুল সারাদিন সে বাসায়ই থাকল। দিনভর দরজা আটকে তাদের বিয়ের নানান পরিকল্পনা হলো। রাজীবের বাবা আর সপ্তাখানেকের মধ্যেই দেশে ফিরবেন। তারা পারুলকে দেখতে গ্রামে আসলে পারুল কীভাবে কথা বলবে, কীভাবে তাদের সম্ভাষণ জানাবে, এমন কত কত বিষয়ে যে তারা কথা বলল তার হিসেব নেই।

রাজীব চলে গেলেও পারুলের ঘোর যেন কাটে না। তাকে রাজীব ছাড়া আর কিচ্ছু স্পর্শ করতে পারে না। লতা যে সারাটাক্ষণ মন খারাপ করে থাকে। কেঁদে কেটে যে সে তার চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে, তাও যেন পারুলকে স্পর্শ করে না। সে বুঁদ হয়ে আছে অন্য এক স্বপ্নের জগতে।

পরদিন দুপুরে বাড়ি ফিরল পারুল। তাবারনের জ্বর। সারাক্ষণ সে তার ঘর থেকে বের হলো না। পারুলও অবশ্য ডাকল না। এই বাড়ি ঘর, এই মানুষজন কোনো কিছুর প্রতিই তার আর কোনো মায়া নেই। সে এখান থেকে একবার যেতে পারলেই বাঁচে। কিন্তু প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় পারুলের। তার মনে হয় সে তাবারনের গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু আবারো সেই ঘৃণ্য, জঘন্য দৃশ্য দেখতে হবার আশঙ্কায় সে চুপ করে পড়ে থাকে। থাকুক আব্দুল ফকির তার ওই জঘন্য জীবন নিয়ে। পারুল আর এসব নিয়ে ভাবতে চায় না। সে দূরে চলে যাবে। বহুদূরে।

আবার গরম পড়তে শুরু করে দিয়েছে। মার্চ মাস চলেও এসেছে। সেদিন দুপুর বেলা খানিকটা তন্দ্রামতো এসেছিল পারুলের। এই সময়ে দরজায় কারো ধাক্কার শব্দে পারুলের ঘুম ভেঙে গেল। সে ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'কে?'

দরজার ওপাশ থেকে তাবারনের গলা শোনা গেল। সে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি তাবারন'।

পারুল দরজাটা খুলল। তাবারন দাঁড়িয়ে ছিল দরজায় হেলান দিয়ে। পারুল দরজা খুলতেই সে শেকড়কাটা গাছের মতো পারুলের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। তারপর ভয়ার্ত গলায় কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'পারুল গো, আমি পাপ করছি গো পারুল। ও পারুল, আমি পাপ করছি। আমি বুঝি নাই পারুল। ইবলিশ শয়তান আমার চৌক্ষে ঠুলি পরাই রাখছিল গো পারুল। আমি তোমার মায়ের খাওনে বিষ মিশাই দিছিলাম গো পারুল। ও পারুল,

এইটা আমি ইচ্ছা কইরা করিনাই গো পারুল। ও পারুল, তোমার বাপ, তোমার বাপ একটা জানোয়ার গো পারুল। সে একটা জানোয়ার। সেই আমারে বলছে, আমি যদি তোমার মায়ের খাওনে বিষ না মিশাই, তাইলে সে আমারে বাইর কইরা দিবো গো পারুল। ও পারুল। পারুল গো।'

তাবারন সুর করে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই সুর করে কথা বলছে সে। পারুল কিছু বলল না। সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। সে অনেক কিছুই সে আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বিশ্বাস করতে চায়নি। তার মনে হচ্ছিল, সে হয়তো কোথাও ভুল কিছু ভাবছে। তাবারন দুই হাতে পারুলের পা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদছে। পারুল হঠাৎ তাবারনের হাত ধরে তাকে দাঁড় করাল। তাবারনের গা অসম্ভব গরম। জ্বর এসেছে বোধ হয়। পারুল তাকে বিছানায় নিয়ে বসাল। তারপর বলল, 'কি হইছে বলেন?'

তাবারন শঙ্কিত চোখে এদিক-সেদিক তাকাল। তারপর বলল, 'সে মানুষ না। সে জানোয়ার। সে মানুষের চেহারার ইবলিশ শয়তান পারুল। আমার জীবনটা সে শ্যাষ করছে পারুল। আরো কত জনের জীবন যে সে শ্যাষ করছে। এই সব কথা তোমার মায় জানত। সে সব জানত। তুমি দেখবা পারুল? তুমি দেখবা?'

এই বলে তাবারন তার পরনের শাড়ি টেনে খুলে ফেলল। তাবারনের তল পেটে তখনও দগদগে ঘা। তার উরুতেও শুকনো ক্ষত। বুকে পোড়া দাগ ছাড়াও আরো কত কত ক্ষত যে রয়েছে!

পারুল আতঙ্কিত গলায় বলল, 'এইগুলান কি?'

তাবারন বলল, 'এইগুলান তোমার বাপে করছে পারুল। আমার কেউ নাই। ছোটবেলা থেইকা এই বাড়িতে আছিলাম। সে আমারে একদিন রাইতে জোর কইরা...'

তাবারন কথা শেষ করতে পারল না। কান্নায় তার গলা জড়িয়ে এলো। পারুল এক হাতে তাবারনের হাত চেপে ধরল। তাবারন বলল, 'তারপর থেইকা প্রত্যেকটা দিন। সুযোগ পাইলেই। আর পেট নষ্ট করনের লইগা এইটা সেইটা খাওয়াইত। কি কি যে খাওয়াইছে পারুল! একদিন তোমার মায়ও দেইখ্যা ফালাইলো। তারে তো আরো আগেই পাগল বানাই থুইছিল। সেইদিনের পর থেইক্যা তার উপরও শুরু হইল গজব। শরীলে ব্যথা দিয়া সে মজা পায় পারুল। সে মানুষ না, মানুষ না। আল্লাগো, কি যে তইজ্যাগুলান সে দিছে পারুল। এহন আর আমারে ভালো লাগে না। বান্দা নতুন মাগী লাগব। এইজইন্য আমারে খেদাইতে চায় পারুল। আমি কই যামু? আমার তো যাওনের কোনো জায়গা নাই গো মা...'

পারুলের সারা শরীর কাঁপছে। সে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'তারে এতদিনেও খুন করেন নাই কেন?'

তাবারন বলল, 'তার মইধ্যে কি জানি আছে পারুল। তারে ডর লাগে। কি আছে জানি না, তয় আছে। ডরে পরানডা কাঁপে পারুল।'

তাবারন সামান্য থেমে আবারো সতর্ক চোখে এদিক-সেদিক তাকাল। তারপর বলল, 'ক্যান তুমি শোনো নাই? ফতেহপুরের তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তারে খুন করতে নিছিল। একবার না, দুইবার। সেই দুইবারই কেমনে কেমনে বাঁইচা গেছিল! তারে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কেন খুন করতে আইছিল, এই কথা তো কেউ জানে না। জানত তোমার মায়। সে মাঝে-মধ্যে কী সব খাইয়া অচেতন হইয়া যায়, তহন নানান কথা কইয়া দেয়। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মাইয়া কোহিনূররেও সাপে কামড়াইছিল। সেই বিষ নামাইতে গিয়া সে কোহিনূররেও...। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এই কথা তো কাউর ধারে কইতে পারে নাই। অন্য উছিলায় তারে মারতে আইছিল। আর মাইয়ারে বিয়া দিয়া দ্যাশছাড়া করছিল... সেই কোহিনূরের পোলাই তো আইছিল আমাগো বাড়ি। কেন আইছিল কে জানে!'

পারুল ঝট করে তাবারনের মুখের দিকে তাকাল। আর সাথে সাথে নয়নের মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অনেকক্ষণ যেন নয়ন তার চোখের সামনে ভেসে রইল। একের পর এক ছবি। সেই প্রথম দিন দেখা হবার পর থেকে ভয়াবহ অসুস্থ অবস্থায় চলে যাওয়ার দিন অবধি। প্রত্যেকটা মুহূর্ত। হঠাৎ করেই কি এক তীব্র অপরাধবোধ পারুলকে জেঁকে ধরল। কী তীব্র লজ্জা, গ্লানি, কষ্ট, অপমান, বিষাদ, ক্রোধ, শূন্যতা, সকল কিছু মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেল। নয়নের সেই উন্মাতাল চোহারা, ক্লান্ত চোখ, ভেঙে পড়া গাল, কান্না মাখা কথা, তার কোথাও না কোথাও কি সেই তিক্ষ্ণ সত্যটাই ছিল? আসলেই কি সেটি সত্যি?

এই প্রথম পারুলের মনে হলো, না হয়েই পারে না। না হলে অমন করে সে কেন এখানে ছুটে আসবে! পারুলের হঠাৎ নয়নের জন্য এত মায়া হতে লাগল, এত মায়া! তার কান্না পেয়ে গেল। মনে হলো নয়নকে যদি আরেকবার সে পেত, তবে আদরে আদরে ভরিয়ে দিত। ওই নিষ্পাপ মুখ, কেমন শিশুর মতো সহজ, সরল হাসি। কিন্তু সেই মুখের প্রতিটি রেখা জুড়ে ক্লান্তি, কান্না, ক্রোধ। এই প্রথম, পারুল তার জীবনে একটা বিশেষ অনুভূতি টের পেল। সেই অনুভূতির নাম ভালোবাসা। তবে এই ভালোবাসা আর সকল ভালোবাসার মতো নয়। এই ভালোবাসা ভাইয়ের জন্য মমতায় আর্দ্র হয়ে নিজের অজান্তেই চোখের জলে গাল ভিজিয়ে ফেলা অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকা এক বোনের ভালোবাসা।

আসলাম সাহেব তার লালমাটিয়ার বাসায় এসেছেন। এসেছে হেমাও। দুজন দীর্ঘ সময় মুখোমুখি বসে আছে। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না। নীরবতা ভাঙল হেমার ফোনের রিংটোন। কিন্তু সে ফোনটা ধরল না। কেটে দিলো। আবার বাজল। আবার কেটে দিলো। আসলাম সাহেব বললেন, 'এখানে সমস্যা হলে বারান্দায় গিয়ে কথা বলে আয়।'

হেমা বলল, 'আমার এমন কোনো গোপন ফোন নেই বাবা, যা তোমার সামনে বসে ধরতে পারব না।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'না না। আমি তা মিন করিনি। সবারই কিছু প্রাইভেসি থাকে। থাকা উচিত।'

হেমা বলল ,'সে আমি জানি বাবা'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'নয়নের খবর কি?'

হেমা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কোনো খবর নেই বাবা'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'কেন, ঝগড়া হয়েছে?'

হেমা বলল, 'বাদ দাও না বাবা!'

আসলাম সাহেব বললেন, 'নয়নকে কিন্তু আমার বেশ পছন্দ'।

হেমা বলল, 'তুমি আমায় কেন আসতে বলেছ বাবা? সেটা বলো প্লিজ।'

আসলাম সাহেব খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'তোর মার সাথে থাকতে সমস্যা হচ্ছে না?'

হেমা বলল, 'আমার কোনো কিছুতেই সমস্যা হয় না বাবা'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'সমস্যা হয় না? না স্বীকার করিস না। মানিয়ে যাস?'

হেমা বলল, 'হয়তো মানিয়েই যাই। যদি মানিয়ে না নেয়া যায়, তবে ঠিকঠাক থাকা মুশকিল। এখানে টিকে থাকতে হলে মানিয়ে নিতেই হয়। কারো কম, কারো বেশি।'

www.boighar.com

আসলাম সাহেব বললেন, 'এইজন্যই বোধহয় তোর মা আর আমার সম্পর্কটা টিকল না। কিন্তু মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা তো আমি কম করিনি।'

হেমা বলল, 'এই টপিকটা থাকুক বাবা?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'সরি। তোর খুব কষ্ট হয় তাই না? বন্ধুরা এটা-সেটা বলে? তখন খুব খারাপ লাগে।'

হেমা বলল, 'আমাকে নিয়ে কে কি বলল, তা নিয়ে আমি ভাবি না বাবা।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'একটা সময় ভাবতাম তুই আমার মতো হয়েছিস। কিন্তু আজকাল আমার মনে হয়, না, তুই হয়েছিস তোর মার মতো।'

হেমা বলল, 'এটা কেন মনে হলো বাবা?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'এই যে সবকিছুই খুব নিয়ন্ত্রিত। একটা কন্ট্রোল থাকে নিজের উপর।'

হেমা হাসল। বলল, 'একটা কথা বলি বাবা?'

আসলাম সাহেব মাথা নাড়ালেন। হেমা বলল, 'ধরো প্রচণ্ড কষ্টে কারো চোখে পানি আসছে না। তার মানে কি সে কাঁদছে না? এমনও তো হতে পারে, যতটা কষ্টে মানুষ চোখে পানি এনে কাঁদে। তার কষ্ট তার চেয়েও বেশি। এইজন্য কান্নাটা হয়তো আর বের হতে পারে না। ধরো বরফের মতো। পানি জমে যেমন বরফ হয়ে যায়। হয়তো কষ্টটা এত বেশি যে কান্না জমে বরফের মতো হয়ে যায়। চোখ গলে আর বেরিয়ে আসতে পারে না।'

আসলাম সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথা বললেন না। হেমা বলল, 'তুমি বিয়ে করছ কবে বাবা?'

আসলাম সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'দেখি'।

হেমা বলল, 'বিয়ের কোনো প্রোগ্রাম হবে? মানে এই বয়সে এসে ঘটা করে তো কিছু হয় না। তা যেভাবেই করো, হবে তো?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'এগুলো নিয়ে কথা বলতে তোর খারাপ লাগছে না?'

হেমা সামান্য চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বাবা। লাগছে'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'তাহলে? বলছিস কেন?'

হেমা বলল, 'তোমাকে ইজি করার জন্য। আমার জন্য ডিসিশন নিতে তোমার যেন কোনো দ্বিধা না হয়। আমার কারণে কখনো যেন মনে না হয়, এত বড় একটা মেয়ে আছে, এটা করা কি ঠিক হবে? ওটা করা কি ঠিক হবে? এই জন্য বাবা। আমি চাই না, আমার কারণে কোনোভাবেই তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত, কোনো আনন্দে বাধাগ্রস্ত হোক। সো, আমি চাই বিষয়গুলো নিয়ে তুমি আমার সাথে সহজ থাকো।'

আসলাম সাহেব বললন, 'তোকে আমি এমন করে আগে কখনো দেখিনি। আজকাল তোকে যত দেখছি, আমার মধ্যে দুটি জিনিস ঘটছে। খুব অবাক লাগছে আর খুব অপরাধবোধ হচ্ছে।'

হেমা বলল, 'অপরাধবোধ কেন হচ্ছে বাবা?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'এই যে আমাদের ভালো থাকা নিয়ে, কমফোর্ট জোন নিয়ে তুই কত কনসার্ন। অথচ আমরা কেউ একবারও তোর কথা ভাবলাম না!'

হেমা বলল, 'আমি ভালো আছি বাবা। আর একটা কথা, তোমার বিয়েতে কিন্তু আমি আসব। সেজেগুঁজেই আসব। নতুন মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলব। শি ইজ প্রিটি।'

আসলাম সাহেব কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তোর মা কষ্ট পাবে না?'

হেমা বলল, 'তুমি বিয়ে করছ বলে? নাকি আমি তোমার বিয়েতে গিয়ে নাচব, গাইব, আনন্দ করব বলে?'

আসলাম সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তিনি চুপ করে রইলেন। হেমা বলল, 'বাবা, আমাকে ডেট জানিও। ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ কনফারেন্সে এটেন্ড করবার সুযোগ এসেছে। প্রথমে দিল্লি, তারপর কাঠমান্ডু। প্রায় সপ্তাহ দুয়েকের ট্যুর।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'গরম পড়ে যাচ্ছে তো।'

হেমা বলল, 'সমস্যা হবে না বাবা'।

তারপর দুজন চুপ। অনেকক্ষণ। হেমা হঠাৎ বলল, 'তুমি আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছ না, তাই না বাবা? আমাকে এমনি এমনি ডেকে এনেছ কেন বলো তো? আমি উঠি?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'আরেকটু বস।'

হেমা বসল। আসলাম সাহেব বললেন, 'আমি ভাবছি এই বাসাটায় আমি আর উঠব না। এটা এমন ফাঁকাই থাকবে।'

হেমা হেসে বলল, 'কেন মায়ের স্মৃতিতে মেমোরিয়াল বানাবে?'

আসলাম সাহেব বললেন, 'আমার ভালো লাগবে না। চোখের সামনে এতটা বছর একটা চেনা দৃশ্য। একেকটা চেনা দিন। সেখানে নতুন কোনো অচেনা দৃশ্য আমার ভালো লাগবে না।'

হেমা বলল, 'অচেনাই তো চেনা হয় বাবা'।

আসলাম সাহেব বললেন, 'কিন্তু আগের চেনাটা হারালে কষ্টও তো হয়।'

হেমা বলল, 'ওই কষ্টটাই মায়া বাবা। ওটা আছে বলেই তো মানুষ বাঁচে। না হলে দেখতে সব মানুষ কবে দলবল বেঁধে সুইসাইড করে ফেলেছে!'

www.boighar.com

আসলাম সাহেব বললেন, 'কিন্তু মায়াতে তো কষ্ট'।

হেমা বলল, 'মানুষ তো কষ্টটাই চায় বাবা। সে ভান করে সে আনন্দ চায়। কিন্তু আসলে সে চায় কষ্ট। কারণ সে জানে, তার কষ্ট তাকে আনন্দের উপলক্ষ দেবে। কাছের মানুষটা এসে হাত ধরবে। মন ভালো করবার চেষ্টা করবে। এক্সট্রা কেয়ার করবে। মানুষ এটা খুব চায় বাবা। কিন্তু যে মানুষ সব সময় আনন্দে থাকে সে এটা পায় না। মায়ার যে কষ্ট, তাও এর সাথেই থাকে। প্রিয় মানুষের মন খারাপ হলে, কষ্ট হলে যে মানুষটা এগিয়ে আসে, সে তো ওই মায়া থেকেই আসে।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তোর মায়ের কি আমার জন্য মায়া হয়?'

হেমা বলল, 'যে মায়া নিয়ে দ্বিধা থাকে, সংশয় থাকে, সে মায়া নিয়ে ভেবো না বাবা। ওইরকম মায়ার কথা ভাবলে যে কষ্ট, তা কাটাতে পারবে না। সব সময় কেবল অপূর্ণ মনে হবে। তার চেয়ে অপেক্ষায় না থেকে যেটুকু নগদ, আনডাউটেড পাচ্ছ, সেটুকু নিয়ে নাও।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তুই এত কিছু কি করে বুঝিস? এমন চমৎকার করে গুছিয়ে বলা কোথায় শিখলি?'

হেমা বলল, 'জীবন থেকে বাবা।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তোর জীবন কি আমার চেয়ে বড়?'

হেমা বলল, 'সময়ের বিবেচনায় জীবন বড় হয় না বাবা। বড় হয় বোধের বিবেচনায়। কে কতুটুকু বুঝল, অনুভব করল, কীভাবে করল তার উপর।'

আসলাম সাহেব বললেন, 'তুই কি জানিস, আমি যখন কোনো বিপদে পড়ি, আমার যখন মন খারাপ হয়, কোনো সমস্যা যায়, যখন মনে হয় কারো সাথে কথা বললে আমার মন ভালো হয়ে যাবে, সে আমার সমস্যাগুলোর সমাধান করে দিবে, তখন আমার একমাত্র যে মানুষটার কথা মনে হয়, সেই মানুষটা তুই? তোর ভেতর একটা মা মা ব্যাপার আছে। মনে হয় তোর কাছে এলেই শান্তি। একটা আশ্রয়, ছায়া।'

হেমা বলল, 'কেউ যদি এই শান্তি, ছায়া, আশ্রয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায় বাবা?' www.boighar.com

আসলাম সাহেব বললেন, 'তাহলে সে হয়তো এই ছায়াটাকে ঠিকভাবে বুঝতেই পারেনি। অথবা তার কষ্টটা হয়তো এতই বেশি যে এই ছায়ায় সে কষ্টটা সারাতে পারছে না। শান্তি পাচ্ছে না।'

হেমা হাসল, 'বলল, তাহলে কি লাভ হলো বাবা? তুমি যদি তোমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাকেই ছায়া দিতে না পারো, তাহলে পুরো পৃথিবীকে ছায়ায় ঢেকে কি লাভ?'

আসলাম সাহেব উঠে এসে হেমার পাশে দাঁড়ালেন। তারপর হেমার মাথায় আলতো করে হাত রেখে বললেন, 'প্রত্যেকটা মানুষের কিছু গোপন কষ্ট থাকে আমি জানিরে মা। সেগুলো জানতে চাওয়াও অন্যায়। কিন্তু তুই কি নিয়ে এমন কষ্ট পাচ্ছিস, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে রে মা!'

হেমা উঠে দাঁড়াল। তারপর বাবার হাতখানা ধরে ফিসফিস করে বলল, 'বাবা, যে মানুষ নিজের কষ্ট গোপন করতে পারে না, সে বড় দুর্বল মানুষ বাবা। আমি দুর্বল মানুষ হতে চাই না।'

হেমা আর কিছু বলল না। দাঁড়ালও না। আসলাম সাহেব কিছু বলতে গিয়েও আর বললেন না। ইচ্ছেটাকে দমালেন। কিছু কিছু সময় থাকে ইচ্ছের রাশ টানার। এই মুহূর্তটুকু তেমন।

হেমা সারাটাদিন এখানে-সেখানে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াল। বাসায় ফিরল সন্ধ্যার পর। রেণুর সাথে টুকটাক কথা হলো। কিন্তু ভালো লাগছিল না কিছুই। এই ভালো না লাগাটাকে পাত্তা দিতে চায় না হেমা। কিন্তু ভালো না লাগার অনুভূতিগুলো সব সময়ই ভালো লাগার অনুভূতিগুলোর চেয়ে শক্তিশালী। ভালো লাগার অনুভূতিকে যত সহজে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলা যায়, তত সহজে ভালো না লাগার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। হেমা ঘর অন্ধকার করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। এই সময় রাহাতের ফোন আসলো। ফোন ধরতেই রাহাত বলল, 'ঝটপট দুটা প্রশ্নের উত্তর দে তো!'

হেমার ভ্যালো লাগছিল না কথা বলতে। তারপরও বলল, 'হা বল'।

রাহাত বলল, 'যতটা সম্ভব চেষ্টা করার পরও ভালো থাকতে না পারলে কি করা উচিত?'

হেমা বলল, 'কি হয়েছে?'

রাহাত বলল, 'আমি ভালো নেই। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। অ্যান্ড দিস উজ টোটালি ইলজিক্যাল। মানে ধর বিষয়টা এমন না যে আমি তোকে চাই। বরং আমি তোকে চাই না। কিন্তু সব সময় একটা ভয়াবহ কষ্ট। অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে। কষ্ট পাওয়ার অভ্যাস। নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা ইতর শ্রেণির প্রাণী আমি।'

হেমা বলল, 'এই যে বললি না, আমাকে তুই চাস না। এই কথাটা সত্যি। এটা আমিও জানি। কিন্তু তোর এই কষ্ট পাওয়াটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ধর তোর সাথে আমার কোনো একটা সম্পর্ক হয়ে গেল, দেখবি এর চেয়ে খারাপ ঘটনা আর হতে পারে না। তখন মনে হবে এখনই ভালো ছিলাম। ইশ, যদি আবার এখানে ফিরে আসতে পারতাম! এটা অনেকটা অবসেশনের মতো।'

www.boighar.com

রাহাত বলল, 'আমি জানি। আমি টের পাই। নিজে নিজে ভাবি, ধর তোর সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল বা প্রেম। চিন্তা করলেই আমার কেমন অস্বস্তি হয়। মনে হয় আমাদের মধ্যে তখন খুব বিব্রতকর একটা সম্পর্ক হবে। কাছে গিয়ে দূরত্বটা বাড়বে।'

হেমা মৃদু হাসল। বলল, 'একদম ঠিক। ওভাবে কাছে গেলে দূরত্বটা বাড়বে। কিছু কিছু সম্পর্ক আলাদা রাহাত। সেটা আমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারি না। যেহেতু এই বয়সের একটা ছেলে আর মেয়ের সম্পর্কের ম্যাক্সিমাম ইনটেনসিটি ওই প্রেম অবধি। সেজন্য আমরা যখন কেউ কাউকে প্রচণ্ড রকম মিস করি, ফিল করি, কেয়ার করি, তখন খুব সহজেই ভেবেই নেই যে, উই আর ইন লাভ। এটা এত বেশি প্রচলিত এবং সাধারণ একটা ভাবনা যে এর বাইরে গিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারি না আমরা।'

রাহাত বলল, 'কিন্তু তোর কি এতদিন এমন মনে হয়েছে?'

হেমা বলল, 'না। মনে হয়নি। আমি তো আর সবার থেকে আলাদা নই। আমারো মনে হতো, আমি তোকে কষ্ট দিচ্ছি। একটা গিল্টি ফিলিংও কাজ করে। কিন্তু এইমাত্র তুই যখন বললি, তখন আমারও মনে হলো, আমরা যদি কখনো কাপল হই, বা ধর তুই আর আমি বিয়ে-টিয়ে করে ফেললাম। এই পর্যন্ত ভাবা সম্ভব। তারপর আর না। উই আর হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ! দ্যাট উইল বি দ্য মোস্ট টেরিবল থিং ক্যান হ্যাপেন। আমার এখন সত্যি মনে হচ্ছে, এখন যতটা কাছে আছি আমরা, তার চেয়ে হাজার হাজার গুন দূরে সরে যাব তখন।'

রাহাত সাথে সাথে কথা বলল না। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'অনুভূতিগুলো এমন অদ্ভুত কেন বল তো?'

হেমা বলল, 'অনুভূতি অদ্ভুত না। অনুভূতি হয়তো ঠিকই আছে। আমরা বুঝতে ভুল করি। হয়তো যার বন্ধু বা অন্য কিছু হবার কথা ছিল, কিন্তু তাকে প্রেমিক ভেবে ফেলি। যার প্রেমিক হবার কথা তাকে বন্ধু বা ভাইয়া ভেবে ফেলি। মানে হয় কি, ধর কারো প্রতি কোনো একটা ফিলিং গ্রো করল। আমরা সাথে সাথে তড়িঘড়ি করে তার একটা শেপ দিয়ে ফেলি। ভাবার সময় নেই না। অস্থির হয়ে যাই সেটাকে ডিফাইন করতে। আর একবার ডিফাইন করে ফেলার পর ওই ভাবনা থেকে আর বের হওয়া যায় না। একদম বিয়ে-টিয়ে করে ফেলার পর গিয়ে মনে হয়, আরে, ধুর! এটা কি করলাম!'

রাহাত বলল, 'এই যে এতক্ষণ এত কথা বললাম কেন জানিস?'

হেমা বলল, 'কেন?'

রাহাত বলল, 'আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জানি এতে অপরাধবোধে ভোগার কিছু নেই। কিন্তু তারপরও লাগছে। এইজন্য এসব বলে সিদ্ধান্তটাকে লেজিটিমাইট করার চেষ্টা।'

হেমা বলল, 'কি সিদ্ধান্ত?'

রাহাত বলল, 'আমি দেশের বাইরে চলে যাচ্ছি'।

হেমার চমকানোর কথা ছিল কিনা হেমা জানে না। তবে সে চমকালো না। সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কবে?'

রাহাত বলল, 'নেক্সট উইকেই'।

হেমা বলল, 'এত তাড়াতাড়ি?'

রাহাত বলল, 'হু। একটা ভালো স্টাডি অপরচুনিটি আছে কানাডায়। ছোট মামা থাকেন ওখানে। হুটহাট ডিসিশন। মাসখানেক ধরেই প্রসেস চলছিল। বাট আই ওয়াজ কনফিউজড।'

হেমা বলল, 'নাও ইটস ফাইনাল?'

রাহাত বলল, 'অলমোস্ট ফাইনাল'।

হেমা বলল, 'তুই কি বিয়ে-টিয়ে করে যাচ্ছিস?'

রাহাত চমকালো। বলল, 'তুই! মানে, এখনো তো বাসায় ছাড়া আর কেউ জানে না!'

হেমা বলল, 'না না। আমাকে কেউ কিছু বলেনি। আন্দাজ করলাম।'

রাহাত বলল, 'কীভাবে?'

হেমা বলল, 'এমন হয়। এসব সিচ্যুয়েশনে এমন হয়। করা সম্ভব, এমন অনেকগুলো সিদ্ধান্ত একসাথে নিয়ে নেয় মানুষ। একটা বড়োসড়ো চেঞ্জ নিয়ে আসার চেষ্টা। অনেকদিনের নিয়ম, অভ্যাসকে এলোমেলো করে দেয়ার চেষ্টা।'

রাহাত বলল, 'আমি কি ভুল করছি হেমা?'

হেমা বলল, 'অন্য কেউ হলে হয়তো বলতাম ভুল। কিন্তু তোর ক্ষেত্রে কেন যেন মনে হচ্ছে ঠিক।'

রাহাত বলল, 'কেন?'

হেমা বলল, 'তুই অনেকটা কেন্দ্রীভূত মানুষ। তোর সব সময় একটা কেন্দ্র দরকার। পৃথিবী উল্টে গেলেও তুই সহজে সেই কেন্দ্র থেকে সরবি না। আবার কোনোভাবে কেন্দ্রটা বদলাতে পারলে দেখবি, নতুন কেন্দ্রটাতেও তুই ঠিক আগের মতোই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বি। কনসান্ট্রেড হয়ে পড়বি। আমার মনে হয়, এটা তোর জন্য ভালো।'

রাহাত চুপ করে রইল। হেমাও। তারপর হেমার হঠাৎ মনে হলো, এই পরিস্থিতিতে তার চুপ করে থাকা ভালো দেখায় না। সে কথা বলল, 'মেয়েটাকে কি আমি চিনি?'

www.boighar.com

রাহাত বলল, 'হুম'।

হেমা বলল, 'কে?'

রাহাত বলল, 'গেজ কর?'

হেমা খানিক ভাবল। তারপর বলল, 'বোটানির সেই মেয়েটা? ওই যে কবিতা পড়ে ভালো? কি যেন নাম! ওহ, শিউলী?'

রাহাত বিস্মিত গলায় বলল, 'তুই কি বল তো! কেমনে পারিস?'

হেমা হাসল, 'তুই না আমাকে নিয়ে হেমার মনস্তত্ত্ব নামে বই লিখে ফেলবি বলেছিলি? এখন তো উল্টোটা হওয়া উচিত। তোকে নিয়ে আমি বই লিখে ফেলতে পারি।'

রাহাত এ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলল না। সে বলল অন্য প্রসঙ্গে, 'একটা কথা বলবি?'

হেমা বলল, 'হুম। বলব'।

রাহাত বলল, 'তুই কি করবি ভাবছিস? মানে নয়ন ভাই...'।

হেমা হাসল। বলল, 'আমি ভালো থাকব রাহাত। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু করে সবই ভালো থাকতে। কে কার সাথে থাকল, কীভাবে থাকল এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ ভালো থাকা। আমি ভালো আছি।'

কথা আর বেশি এগুলো না। রাহাত চলে গেল পরের শনিবার। অদ্ভুত ব্যাপার হলো রাহাত চলে যাবার পরের কয়েকটা দিন হেমার খুবই শূন্য লাগতে লাগল। মনে হতে লাগল এই শহরটা যে কী ভীষণ ফাঁকা। যেন কেউ নেই এখানে। হেমা শক্ত মনের মানুষ। সম্পর্ক, অনুভূতি নিয়ে তার ভাবনাগুলোও বেশ গোছানো। কিন্তু তারপরও রাহাত চলে যেতে তার ভীষণ একা লাগতে লাগল। মনে হতে লাগল, রাতদুপুরে মন খারাপ হলে কথা বলার আর কেউ রইল না। যখন ইচ্ছে তখন ফোন করার কেউ রইল না। আরো কতকিছুর যে কেউ একজন রইল না! রাহাতের উপস্থিতি তার জীবনে এত সরব ছিল যে, তার না থাকাটা তাই প্রবল হয়ে উঠল।

এই প্রথম হেমার মনে হলো, রোজকার অভ্যাসের মতো যে আছে, থাকে, তার সেই 'থাকা'টা উপলব্ধি করতে হলেও অনিবার্য হয়ে ওঠে হঠাৎ তার 'না থাকা'টা। কী অদ্ভুত!

সে রাতে হেমা রেণুর কাছে ঘুমাল। রেণু দিন দিন কেমন যেন আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হন না। কথা বলেন না। একই ফ্লাটের দুইটি ঘরে দু'জন প্রাণী। অথচ মনে হয় যেন যোজন যোজন দূরত্বে তাদের বসবাস। হেমা মাঝরাতে হঠাৎ রেণুকে ডাকল, 'মা'।

রেণু সাথে সাথে জবাব দিলেন, 'হু'।

হেমা বলল, 'কি ভাবছ বলো তো?'

রেণু বললেন, 'কিছু ভাবছি না তো!'

হেমা বলল, 'ভাবছ। এই মাঝরাতে কিছু না ভেবে কেউ একা একা চুপিচুপি শুয়ে জেগে থাকতে পারে না।'

রেণু কথা বললেন না। হেমা বলল, 'তোমার খুব একলা লাগে তাই না মা?'

রেণু বললেন, 'মানুষ তো একাই'।

হেমা বলল, 'না মা। মানুষ দুই ধরনের। এক ধরনের মানুষ হাজার মানুষের ভালোবাসা পেয়েও, সঙ্গ পেয়েও এক ধরনের কাল্পনিক একাকীত্বে ভোগে। নিজেকে একলা ভেবে ভেবে দুঃখ বিলাস করে। এটার ভেতরও এক ধরনের আনন্দ আছে। আরেক ধরনের মানুষ আছে সত্যি সত্যিই একা।'

রেণু কথা বললেন না। হেমা হঠাৎ গাঢ় গলায় বলল, 'আমার খুব একলা লাগে মা। খুব।'

হেমার গলায় যেন কি ছিল! এমন করে হেমাকে কখনো কথা বলতে দেখেননি রেণু। তিনি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে হেমার মাথাটা কাছে টানলেন। তারপর তার মাথার চুলে ধীরে বিলি কেটে দিতে লাগলেন। হেমা ফিসফিস করে বলল, 'আমার খুব কষ্ট হয় মা। আমি কাউকে বলি না। নিজেকেও না। আমি বলতে চাই না। কিন্তু আমার খুব কষ্ট হয়। আমার মনে হয় আমি সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটা বিশাল খোলা মাঠে একা দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখ যতদূরে যায়, শূন্য, ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। কোথাও না। আমার তখন খুব ভয় হয় মা।'

রেণু মেয়ের মাথাটা নিজের গালের সাথে চেপে ধরেন। কেউ আর কোনো কথা বলে না। অন্ধকারে কেটে যায় নৈঃশব্দ্যের অনন্ত প্রহর। কিংবা ভিজে যায়।

www.boighar.com

শেষরাতের দিকে খিঁচুনির মতো উঠেছিল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর। তারপর বুকের বাঁ দিকে প্রচণ্ড ব্যথা। তিনি দম নিতে পারছিলেন না। কাউকে ডাকতে পারছিলেন না। আমোদি বেগম কয়েকদিন থেকে তার সাথেই থাকছেন। কিন্তু আমোদি বেগমের নিজের শরীরটাও ভালো না। সারারাত জেগে জেগে ভোররাতের দিকে চোখের পাতাটা খানিক লেগে এসেছিল তার। আর সেইসময়ই এই ঘটনা। ভোরে ঘুম ভেঙে আমোদি বেগম দেখেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ঘুমাচ্ছেন। বার দুই ডাকলেন। কিন্তু সাড়া দিলেন না। ধীরে নিঃশ্বাস বইছে তার। উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন নিজের শরীরটাও প্রচণ্ড দুর্বল লাগছে। চোখে ঝাপসা দেখছেন। মাথা ঘোরাচ্ছে। তারপরও অনেক কষ্টে উঠে হাতমুখ ধুলেন আমোদি বেগম। কিন্তু ঘরে ঢোকার মুখে উঠানেই হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। সেই যে নিজের ঘরের বিছানায় গিয়ে পড়লেন, সারাদিন আর বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না। শুয়ে শুয়েই আমোদি বেগমের মনে হলো বাড়িটা বড় বেশি সুনসান। কোথাও কোনো লোকজন নেই। নিস্তেজ গলায় বারকয়েক একে ওকে ডাকলেনও। কিন্তু কেউ কোনো সাড়াশব্দ করল না। খানিকটা রোদ চড়তে ছোট ছেলে দবির খাঁকে চোখে পড়ল আমোদি বেগমের। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ির লোকজন সব কই?'

দবির খাঁ বললেন, 'ফরাজি গো বাড়িতে কারে নাকি জ্বীনে ধরছে। আব্দুল ফইর গেছে সেই জ্বিন ছাড়াইতে। সবাই জ্বিন ছাড়ানি দেখতে গেছে।'

আমোদি বেগম বললেন, 'এই জইন্য বাড়ি ঘর এমনে কবরস্থান বানাই রাইখা সবাইর যাইতে হইব?'

দবির খাঁ কোনো কথা বললেন না। আমোদি বেগম হঠাৎ বললেন, 'তোর বউরে একটু ডাইক্যা লইয়ায়। গিয়া বল আমি আসতে বলছি। তোর বাপের শরীল খুব খারাপ। কথা বলতেও পারে না। কিছু খায়ও নাই। তারে একটু

ন্যাওয়ান দিতে হইব। কাপড়-চোপড়গুলান বদলাইতে হইব। ঘরটাও পরিষ্কার করতে হইব। যা ডাইক্যা লইয়ায়।'

দবির খাঁ বললেন, 'কোনো অসুবিধা হইত না তো?'

আমোদি বেগম বললেন, 'না। হইত না। তুই যা'।

দবির খাঁ বললেন, 'আব্বায় যদি তার হাতের কিছু না নেয়?'

আমোদি বেগম বললেন, 'তার এহন সেই অবস্থা নাই। বিপদে পড়লে বাঘেও ঘাস খায়।'

বিপদে পড়লে বাঘ ঘাস খেলেও তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ছোট পুত্রবধুকে তার ঘরেই ঢুকতে দিলেন না। দবির খাঁ বললেন, 'আব্বা, আপনের দিকে এহন আর কারও কোনো খেয়াল নাই। এস্কান্দারও বাড়িতে নাই। তারে মনির জানি কই পাঠাইছে। আপনে যে বেয়ান হইতে কিছু খান নাই এই নিয়াও কারো কোনো মাথাব্যথা নাই। আপনের রাইত-বিরাইতে ঘরে পায়খানা-প্রসাব করছেন। গন্ধ ছোটতেছে। সে আইসা ঘরদোর পরিষ্কার কইরা, আপনেরে একটু নাওয়াই ধোয়াই দেউক আব্বা। সে ছোটলোকের মাইয়া। এইসবে তার কোনো সমস্যা নাই।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কথা বলতে পারছেন না। তার শরীর কাঁপছে। কিন্তু তার মধ্যেও তিনি যতটা সম্ভব হম্বিতম্বি করে উঠলেন। বললেন, 'ওই মাইয়া জানি আমার ঘরে ঢোকে না। ওরে খাঁ-বাড়ি ঢোকতে দিছে কেডা? অরে এক্ষণ খাঁ-বাড়িরতন বাইর কর। এক্ষণ।'

দবির উদ্দিন খাঁ আরো কি যেন বলতে গেলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ধমকে উঠে বললেন, 'ওই মাইয়া যদি আমার ঘরে ঢোকে, আর আমার শরীলে হাত দেয়, আমি অক্ষণ মরব। আমারে বিষ আইন্যা দে, আমি বিষ খাইয়া মরব। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এতো পইচ্যা গেছে যে তার ঘরে মেথর ঢুকব? মেথরের হাতের রান্ধন-বাড়ন খাইয়া তৈয়ব উদ্দিন খাঁর বাইচ্যা থাকন লাগব! তার আগে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিজে জীবন নিজে দিব।'

দবির খাঁ আর কথা বললেন না। কথা বললেন না তৈয়ব উদ্দিন খাঁও। রাগে তার সারা শরীর কাঁপছে। সেই সারাটাদিন তেমনই শুয়ে রইলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। কথা নেই, শব্দ নেই, যেন নিসাড় এক মৃত মানুষ। বিকেলের দিকে খানিকটা সুস্থ বোধ করলেন আমোদি বেগম। তিনি ঘরে ঢুকতেই তৈয়ব উদ্দিন খাঁ করুণ গলায় বললেন, 'আমারে একটু কিছু খাইতে দিবা বউ? প্যাটে বড় খিদা।'

আমোদি বেগম তাকে সামান্য কিছু খাবার দিলেন। খাবার দিতে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'মনির কি বলছে কিছু শুনছেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কি বলছে?'

www.boighar.com

আমোদি বেগম বললেন, 'আপনের এই ঘরখান খালি কইরা দিতে বলছে। আপনেরে নিয়া রাখতে বলছে উত্তরের ছোট্ট ঘরে। এই ঘরখান সবচাইতে বড়। সে নাকি বিয়া করব। এইজন্য ঘর এইখান সাজাইতে গোজাইতে হইব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কথাটা শুনলেন। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। আমোদি বেগম বললেন, 'আপনের জইন্য যহন তহন কামের মানুষগোও আইতে নাকি মানা কইরা দিছে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ এবারও কথা বললেন না। তবে সেদিনের মতো মৃদু হাসলেন। কিন্তু তার চোখে পানি। দৃষ্টি শূন্যে। তিনি হঠাৎ বললেন, 'সে ঠিকই করতেছে। এইটা পাওন আমার দরকার আছিল। তুমি বট গাছ লাগাইলে ছায়া পাইবা, আমগাছ লাগাইলে ফল পাইবা, খাজুর গাছ আর মান্দার গাছ লাগাইলে পাইবা কাঁটা। এইটাই নিয়ম। সাপ পুষলে চুমা পাইবা না, সাপে আদর কইরা চুমা দিলেও সেইটা হইয়া যায় ছোবল। আমি তারে বানাইছি, পুষছি। যেমন বানাইছি, তেমন ফল পাইতেছি।'

আমোদি বেগম বললেন, 'সে আমারে বলছে, আপনেরতন চাবিগুলান নিয়া দিতে। কলসির কথাও জিগাইছে।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'কলসি কই রাখছ?'

আমোদি বেগম কথা বললেন না। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন, 'আমারে এহনও অবিশ্বাস করো বউ?'

আমোদি বেগম বললেন, 'না। অবিশ্বাস করি না'।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বললেন , 'তাইলে?'

আমোদি বেগম বললেন, 'কিছু কথা আছে, অবিশ্বাসের লইগ্যা না, অন্য কারণে বলন যায় না। কিন্তু সেই কারণটা বললেও সমস্যা। সময় হইলে আমিই আপনেরে বলব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অতি কষ্টে হাসলেন। তারপর বললেন, 'আমার আর সময় হইব না বউ। সময় শ্যাষ।'

তিনি একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'শেষবার আরেকবার কোহিনূররে খবর পাঠাইবা বউ? একটা বার? আমি যদি মইর‌্যা যাই, তাও কি সে দেখতে আসব না?'

আমোদি বেগম বললেন, 'খবর পাঠাইলে নজরুলরে দিয়া পাঠাইতে হইব। সময় লাগব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হায় সময়। সময়'।

এই কথা ক'টিই তৈয়ব উদ্দিন খাঁর শেষ কথা। সেই রাতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর গুরুতর স্ট্রোক হলো। স্ট্রোকে তার শরীরের ডানপাশটা পুরোপুরি নির্জীব হয়ে গেল। তার মুখ বাঁকা হয়ে গেল বীভৎসভাবে। প্রায় পুরোপুরিই রহিত হয়ে

গেল তার বাক্‌শক্তি অনেক চেষ্টায় বিকৃত শব্দ বের হলেও তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল। এই নিয়ে অবশ্য বাড়ির কারো মধ্যেই তেমন কোনো হইচই দেখা গেল না। আমোদি বেগম বহুকষ্টে একবার এসে দেখে গেছেন। তার শরীরও সংকটাপন্ন। তিনি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতেই পারছেন না।

সেদিন সন্ধ্যায়ই তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে উত্তর দিকে ছোট ঘরখানায় স্থানান্তর করা হলো। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মস্তিষ্ক সচল। তিনি সকলই দেখতে পারছেন, বুঝতে পারছেন। কিন্তু কেবল কথা বলতে পারছেন না। তার সচল চেতনা যেন তাকে বারবার বলছে, 'মরে যাও তৈয়ব উদ্দিন খাঁ, মরে যাও। যতদ্রুত সম্ভব মরে যাও। তোমার সামনে ভয়াবহ সময়। এই ভয়াবহ সময় থেকে তোমাকে একমাত্র যে বাঁচাতে পারে, তার নাম মৃত্যু। মৃত্যু ছাড়া আর কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তুমি মরে যাও। এখন মৃত্যুর চেয়ে প্রিয় আর কিছু তোমার নেই।'

সমস্যা হচ্ছে তৈয়ব উদ্দিন খাঁ চাইলেও এখন মরতে পারবেন না। নিজেকে হনন করবার ক্ষমতাটুকুও তার নেই। তাকে বেঁচে থাকতে হবে স্বাভাবিক মৃত্যুর আগ অবধি। সেই মৃত্যু কতদূর কে জানে! সারাটা জীবন কত কত চাওয়ার পিছে পাগলের মতো হন্যে হয়ে ঘুরে ফেরা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর এখন একটা মাত্র চাওয়া। সেই চাওয়ার নাম মৃত্যু। তার জীবনের পরম প্রার্থিত চাওয়া। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হঠাৎ মনে হলো, এই জীবনে তিনি যত যা কিছু চেয়েছেন, যা কিছু পেয়েছেন, তার সকল কিছুর বিনিময়েও যদি সম্ভব হতো, তবে তিনি কেবল মৃত্যুই চাইতেন। এই জীবনে তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। কিচ্ছু না। এক জনমের সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম অলঙ্ঘনীয় সত্যের নাম মৃত্যু। অথচ সেই ভয়ঙ্কর সত্যিটি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রার্থিতও।

কারণ মৃত্যুবিহীন মানবজনম অর্থহীন।

মনিরকে চাবি বুঝিয়ে দিয়েছেন আমোদি বেগম। কিন্তু এখনো কলসির খোঁজ সে পায়নি। বারকয়েক এসে তৈয়ব উদ্দিনের সাথে কলসির খোঁজে কথা বলার চেষ্টা করেছে মনির। কিন্তু তৈয়ব উদ্দিন খাঁ চেষ্টা করেও কথা বলতে পারেননি। মনিরের প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। তার ধারণা, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বোবার ভান ধরে বসে আছেন। সে নানাভাবে কথা বলানোর চেষ্টা করেও পারেনি। সন্ধ্যাবেলা তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে দেখতে এলেন আব্দুল ফকির। আব্দুল ফকিরকে খবর দিয়ে এনেছে মনির। তার ধারণা তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কাছ থেকে যদি কেউ এই খবর বের করতে পারে, তবে তিনি একমাত্র আব্দুল ফকির।

বাড়ির সকলেই মনিরের ভয়ে তটস্থ। এমনকি তার বাবা খবির খাঁও আজকাল মনিরের সামনে কথা বলতে ভয় পান। তরপরও আব্দুল ফকিরকে

www.boighar.com

বাড়িতে দেখে তিনি মনিরের কাছে ঘটনা জানতে চাইলেন। মনির অবশ্য খবির খাঁকে খুব একটা গুরুত্ব দিলো না। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল যে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর চিকিৎসা করতেই এসেছেন আব্দুল ফকির। সন্ধ্যার পরে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ঘরে ঢুকলেন আব্দুল ফকির। তিনি ঢুকলেন একা। ঢুকেই ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিলেন। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মাথার কাছে একটা হারিকেন জ্বলছে। আব্দুল ফকির গিয়ে হারিকেনের আলো খানিক বাড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম খাঁ সাব। ভালো আছেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ফ্যালফ্যাল করে আব্দুল ফকিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। আব্দুল ফকির বললেন, 'খাঁ সাব। শরীল কেমন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আব্দুল ফকিরের দিকে তাকিয়ে বার কয় কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার মুখ থেকে কেবল অর্থহীন শব্দছাড়া আর কিছুই বের হলো না। আব্দুল ফকির মমতামাখা গলায় বললেন, 'কথা কইতে কষ্ট হইতেছে খাঁ সাব? আহারে, এই বয়সে আইসা আল্লাহপাক এই বুড়া মানুষটারে এত কষ্ট দিতেছেন?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ একদৃষ্টিতে আব্দুল ফকিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আব্দুল ফকির তার একটা হাত রাখলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মাথায়। তারপর খুব আদুরে ভঙ্গিতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'খাঁ সাব। আপনে ওই দিন আমার এক গালে থাপ্পড় মারছিলেন। এক গালে থাপ্পড় মারা অলক্ষণ। আপনে জানেন, আমার মেয়ে-ছেলে নিয়া কারবার। এই ঘটনায় একবার থাপ্পড় মারাটা বিরাট অলক্ষণ। আপনে কি আমার আরেক গালে আরেক খান থাপ্পড় মারবেন?'

এই প্রথম তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ভয় পেলেন। তীব্র ভয়। তার চোখে-মুখে সেই ভয় ফুটে উঠল। আব্দুল ফকির বললেন, 'ডর লাগতেছে খাঁ সাব? ডর লাগতেছে কেন? আপনের এহন আর ডরের কি আছে? যহন ডর পাইলে কামে লাগত, তহন তো ডর পাইলেন না। তহন তো খুব সাহস দেহাইলেন। আব্দুল ফইররে আপনে চেনেন নাই খাঁ সাব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বারকয়েক ঝাটকা মেরে তার মাথা থেকে আব্দুল ফকিরের হাত সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। আব্দুল ফকির বললেন, 'আপনে আমারে আরেকখান থাপ্পড় মারবেন খাঁ সাব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর ডান হাতখানা ধরে নিজের গালের সাথে ঘসতে লাগলেন আব্দুল ফকির। তার চোখ যেন সাপের চোখের মতো ঠান্ডা। গলার স্বর ক্রমশই সাপের মতো হিশহিশে হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'আর গয়নার কলসিখান কই খাঁ সাব? এইটা তো আপনেরে বলতেই হইব। এইটা না বইলা আপনেরে তো আব্দুল ফইর মরতেও দিব না খাঁ সাব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ক্রমাগত মুখে নানান ধরনের বিকৃত শব্দ করতে লাগলেন। তিনি আব্দুল ফকিরের হাতের নাগাল থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না। তার মুখ একদিকে বাঁকা হয়ে গেছে। মুখের কোল গড়িয়ে লালা ঝড়ছে। আব্দুল ফকির বললেন, 'মুখখান এমনে ব্যাকা হইয়া গ্যাছে খাঁ সাব? চিন্তা নিয়েন না। আব্দুল ফইর থাকতে চিন্তা কইরেন না। খাড়ান ঠিক কইরা দিতেছি।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখের বাঁকা হয়ে যাওয়া অংশে আব্দুল ফকির হঠাৎ সপাটে থাপ্পড় বসালেন। পরপর দুইবার। তারপর বললেন, 'এইবার কথা বলেন খাঁ সাব। এইবার কথা বলেন।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁর চোখের কোল গড়িয়ে পানি পড়ছে। তার মুখের কোল গড়িয়ে লালা ঝড়ছে। আব্দুল ফকির তার পকেট থেকে লোহার খুব ছোট্ট একখানা পেরেক বের করলেন। তারপর বললেন, 'কলসির কথাটা কন না খাঁ সাব। না হইলে ইশারায় জানান। জানান না খাঁ সাব? কলসি কই?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ স্থির শুয়ে রইলেন। নিথর, নিস্পলক। আব্দুল ফকির বললেন, 'আপনে কথা বলতে পারবেন খাঁ সাব। একটু চেষ্টা করলেই আপনে কথা বলতে পারবেন। কলসের কথাটা জানন খুব দরকার খাঁ সাব। মনির খাঁ-বাড়িতে কলস খুঁইজ্যা ফাতাফাতা কইরা ফালাইছে। কিন্তু কোথাও নাই। একটু ইশারায় হইলেও বলেন খাঁ সাব?'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যেমন ছিলেন, তেমনই তাকিয়ে রইলেন। আব্দুল ফকির হঠাৎ বললেন 'জিব্বায় সাড় পান না খাঁ সাব? জিব্বায় বোধ নাই? লড়ে চড়ে না? খাড়ান, সব ঠিক হইয়া যাইব, ব্যবস্থা নিতেছি।'

হারিকেনের চিমনি তুলে দিয়ে পেরেকের আগার দিকটা কিছুক্ষণ আগুনে পুড়লেন আব্দুল ফকির। তারপর সেই গরম পেরেকখানা চেপে ধরলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁর জিভে। অসহ্য যন্ত্রণায় তৈয়ব উদ্দিন খাঁ চিৎকার করে উঠলেন। তার মুখ থেকে জান্তব স্বর বেরিয়ে এলো। সেই স্বর শুনে ছুটে এলেন খবির খাঁ, দবির খাঁ, মনির, মনিরের সাথের দুজন যুবকসহ আরো অনেকেই। আব্দুল ফকির গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, 'পেরেশানির কিছু নাই। এই পেরেক পুইড়া, দোয়া পইড়া ফুঁ দিয়া জিব্বায় ছ্যাঁক দিলাম। আইজ একবার দিলাম। দেখলাম অনেকটাই সাড় আইছে জিব্বায়। আর কয়েকদিন রেগুলার দিতে পারলেই আল্লাহর ইচ্ছা অল্পবিস্তর হইলেও জবান ফিরা আইব।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার পুত্রদের দিকে তাকিয়ে বীভৎস শব্দে আর্তনাদ করতে লাগলেন। একটা ছোট্ট অবোধ শিশুর মতো ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে অনুনয় করতে লাগলেন। কিন্তু তার সেই আর্তনাদে কেউই সাড়া দিলো না। আব্দুল ফকির

www.boighar.com

উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আবারো হাত বোলালেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মাথায়, মুখে, গলায়। তারপর খানিক ঝুঁকে তার কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, 'আল্লাহর উপর ভরসা রাহেন খাঁ সাব। আমি আর কি? সামান্য উছিলা মাত্র। সব ঠিক হইয়া যাইব খাঁ সাব।'

আব্দুল ফকির খাঁ-বাড়ি থেকে বের হলেন গভীর রাতে। তার সাথে জুলফিকারও এসেছে। তবে জুলফিকারকে তিনি কী এক কাজে পাঠিয়েছেন ফজু ব্যাপারীর বাড়ি। খাঁ-বাড়ি থেকে বের হবার আগে মনির তাকে রাতের খাবার খাওয়ালো। বহুদিন হয় মনির তার মাছ ধরার নেশার কথা বলতে গেলে ভুলেই গেছে। নানান ব্যস্ততায় আর আগের মতো সময় হয় না তার। আজ যেন আবার সেই মাছ ধরার কথা মনে পড়েছে মনিরের। সুযোগ বুঝে আব্দুল ফকিরের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত নানান বুদ্ধি পরামর্শও নিলো সে। খাঁ-বাড়ি থেকে বের হয়ে আব্দুল ফকির পায়ে হেঁটে যাবেন নদীর ঘাটে। সেখানে নৌকা রাখা আছে।
www.boighar.com
শীতকাল প্রায় শেষ হয়ে এলেও এখনও খালে-বিলে পানি বাড়তে শুরু করেনি। জুলফিকার কি ফজুর বাড়ি থেকে নদীর ঘাটে চলে গেছে? আব্দুল ফকির কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলেন। তারপর নদীর ঘাটের দিকেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার গায়ে একখানা চাদর। কিন্তু মিনিট দশেক হাঁটতেই গরম লাগতে লাগল। সলিমুদ্দি দফাদারের পরিত্যক্ত বাড়ির কাছাকাছি এসে গা থেকে চাদরখানা খুলে ফেললেন আব্দুল ফকির। অন্ধকারে খানিক দাঁড়িয়ে চাদরটা ভাঁজ করে গলার দু'পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে আবার যেই হাঁটার জন্য পা ফেলেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঠিক সামনেই ভূতের মতো উদয় হলো একটি ছায়ামূর্তি। আব্দুল ফকির কিছু বলার আগেই ছায়ামূর্তিটি তার চাদরের দু'পাশের দু'প্রান্ত ধরে তাকে হ্যাচকা টানে শুইয়ে ফেলল মাটিতে। তারপর চাদর ধরে টেনে নিয়ে গেল রাস্তার পাশে সলিমুদ্দি দফাদারের ভেতর বাড়ির বাড়ির উঠানে। আব্দুল ফকিরের গলায় প্রায় ফাঁস আটকে রয়েছে চাদরখানা। চোখে যেন সর্ষে ফুল দেখছেন তিনি। ছায়ামূর্তিটি আব্দুল ফকিরকে ভেতর বাড়ির জংলা উঠানে নিয়ে ফেললেন। চাদরটা একটু শিথিল হতেই আব্দুল ফকির বুক ভরে দম নিলেন। তারপর বললেন, 'কেডা আপনে? কেডা?'

আব্দুল ফকির আরো কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। তার আগেই সশব্দে, সপাটে এক থাপ্পড় পড়ল তার গালে। তিনি ছোটখাট হালকা পাতলা মানুষ। থাপ্পড় খেয়ে ছিটকে পড়লেন বাঁ পাশে। ছায়ামূর্তিটি এবার আব্দুল ফকিরকে চিৎ করে মাটিতে শোয়ালো। তারপর তার বুকের উপর চেপে বসে চাদরের অনেকটা অংশ ঢুকিয়ে দিলো আব্দুল ফকিরের মুখে। আব্দুল ফকির হাত-পা ছুড়ে নানান কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। ছায়ামূর্তিটি এবার এক হাতে আব্দুল ফকিরের মাথা ঠেসে ধরল মাটিতে।

আরেক হাতে আব্দুল ফকিরের থুঁতনির দাঁড়ি থেকে একগোছা দাঁড়ি মুঠো করে ধরে হ্যাচকা টানে তুলে ফেলল। তার শরীরে যেন অসুরের শক্তি। আব্দুল ফকির সর্বশক্তিতে চিৎকার করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। ছায়ামূর্তিটি অন্ধকারেই হাতে উঠে আসা মুঠোভর্তি দাড়িগুলো দেখল। তারপর আবার একগোছা দাড়ি ধরে টান মারল। আবারো উঠে এলো একগোছা দাড়ি। দাড়ির উঠে আসা ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে। ছায়ামূর্তিটি এরপর আব্দুল ফকিরকে টেনে উঠে দাঁড় করাল। তারপর বলল, 'ডরায়েন না ফইর সাব। আমি জ্বিন ভূত কিছু না। আমি এস্কান্দার। আমি নিজেই জ্বিন ভূত খুব ডর পাই। দেখলাম আপনে হাচাই জ্বিন ভূতের কারবার করেননি। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম। এইজইন্য পরীক্ষা কইরা দেখলাম, ঘটনা হাচানি? আর দাদাজান শ্যাষ কয়দিনে আমারে কয়টা মাডার করনের সুযোগ দিছিল। হাতটা এইজইন্য খালি নিশপিশ করতেছে। তয় ভাবতেছি এহনই আর মাডার করব না। মাডার করব আরো পরে। মাডার করনের আগে এমনে টাইন্যা টাইন্যা আপনের শরীলের সব লোম পরিষ্কার করব ফইর সাব। আমি বলদ মানুষ। বুদ্ধিসুদ্ধি কম। আমার কথায় বেয়াদবি নিয়েন না। দাদাজানের কষ্ট আমি দেখতে পারি না ফইর সাব। খালি কান্দন আহে ফইর সাব। খালি কান্দন আহে।'

এস্কান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। সে আব্দুল ফকিরকে ছেড়ে দিয়েছে। আব্দুল ফকির ধীর পায়ে খানিক পিছিয়ে ঘুরে রাস্তার দিকে হাঁটা দিলেন। তারপর আর পেছন ফিরে তাকালেন না। রাস্তা অবধি স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই হেঁটে গেলেন আব্দুল ফকির। তার মুখের নিচের দিকটা ভয়ানকভাবে ছিলে দগদগে ঘা হয়ে আছে। আব্দুল ফকির ভেবে পাচ্ছেন না, কাল সকালে তিনি লোকজনকে মুখ দেখাবেন কি করে! এই মুহূর্তে তিনি শুনলেন, এস্কান্দার তাকে ডাকছে। সে ডাকতে ডাকতে বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। আব্দুল ফকির আর কোনো দিকে তাকালেন না। তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন নদীর ঘাটের দিকে।

এস্কান্দার অন্ধকারে তাকিয়ে আছে। তার চোখজোড়া যেন ভাটার আগুনের মতো জ্বলছে। গত কিছুদিন থেকেই খুনের নেশা চেপেছে তার। খুন করার জন্য সারাক্ষণ হাত-পা নিশপিশ করতে থাকে। এই এখনো করছে। এস্কান্দারের ধারণা খুন একটা নেশার মতো, একবার করলে বারবার করতে ইচ্ছে হয়। খুন করার সময় মানুষের চোখে যে ভয় ফুটে ওঠে, তা দেখতেও তার ভারি ভালো লাগে। এই মুহূর্তে এস্কান্দারের শরীরটা যেন খুন করার নেশায় আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে। একটা প্রবল আক্রোশে তার মাথা ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। নৃশংস খুনের তেষ্টায় এস্কান্দারের শরীরের প্রতিটি স্নায়ু যেন সরব হয়ে

www.boighar.com

উঠছে। সে দৌড়ে রাস্তায় উঠে এলো। রাগে, ক্রোধে, জিঘাংসায় টগবগ করে ফুটতে থাকা এস্কান্দার হঠাৎ আবিষ্কার করল তার চোখ বেয়ে অঝরে নেমে যাচ্ছে অশ্রুধারা। কী অদ্ভুত! সে কাঁদছে কেন? তৈয়ব উদ্দিন খাঁর জন্য? এস্কান্দার তার চোখের সামনে থেকে একমুহূর্তের জন্যও তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখখানা সরাতে পারছে না। এই মানুষটাকে সে তার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তার এমন অসহায় মুখ আর সহ্য করতে পারছে না সে। এস্কান্দারের কেবল খুন করতে ইচ্ছে করছে, খুন। সেই রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে চোখের কোলে একই সাথে জিঘাংসার আগুন আর ভালোবাসা কান্না নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এস্কান্দার। এই নিকষ কালো অন্ধকার যেন সাক্ষী! সে যেন জানে, কী অদ্ভুত এই মানব মন, কারো জন্য খুনের ক্রোধে কেঁপে ওঠা বুকের ভেতর ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার কারো জন্য যত্ন করে পুষে রাখে প্রবল মমতায় মাখামাখি অঝর কান্না।

বিষয়টা বুঝতে সময় লেগেছে লতার। তবে ঘটনাটা এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না। বিশ্বাস হচ্ছে না পারুলেরও। এবং পারুল বিশ্বাস করছেও না। তার বিশ্বাস তারা ভুল বুঝছে। লতারও অবশ্য প্রথম প্রথম তাই-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু শেষ প্রায় কুড়ি দিন ধরে আশিকের ফোন বন্ধ। সে ভেবেছিল আশিকের কোনো সমস্যা হয়েছে। তার মা মারা গিয়েছে, মানসিক অবস্থা ভালো না। নানান সমস্যা থাকতে পারে। এ কারণেই হয়তো তার ফোন বন্ধ। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে, লতার ভয় তত বেড়েছে। সেই সাথে মনে পড়ছে মায়ের বলা কথাগুলো। মা তাকে প্রায়ই বলতেন মোবাইল ফোনে এই ধরনের সম্পর্ক বিপজ্জনক। চেনা নেই জানা নেই, হুট করে প্রেম হয়ে গেল, আর মেয়েগুলোও বোকার মতো সবকিছু সঁপে দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে ফেলল। তারপর একদিন দেখা গেল ছেলে উধাও। তার ফোন বন্ধ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা যদি ঠিকানা বা নাম ধাম কিছু দিয়েও থাকে, তবে সেসবও হয় মিথ্যা। লতার কাছে আশিকের বাসার ঠিকানা নেই। একটা বন্ধুর ফোন নম্বর ছিল। সেই ফোন নম্বরও বন্ধ। লতা তারপরও আশায় ছিল। এই বুঝি আশিক তাকে ফোন করবে। সেই আগেরবারের মতো ফোন করে মাফ চাইবে। তারপর দেখা গেল এমন কারণে সে ফোন বন্ধ করে রেখেছিল যে, তা শুনে উল্টো মায়াই লাগবে লতার!

কিন্তু আশিক আর ফোন দিলো না। শুধু যে ফোনই দিলো না, তা-ই না। তার ফোন আর খুললই না। লতার খুব ছটফট লাগতে লাগল। সে রাজীবকেও বারকয়েক ফোন দিলো। কিন্তু রাজীব তখন ধরল না। রাজীব ফোন ধরল তারও কয়েকদিন পর। তার বাবা-মাকে নিয়ে পারুলকে দেখতে আসার কথা। রাজীব ফোন ধরতেই লতা প্রায় কেঁদেই ফেলল। সে হাউমাউ করে আশিকের খোঁজ জানতে চাইল। রাজীব অবশ্য লতাকে আশ্বস্ত করল। সে বলল আশিক আবার গ্রামে গেছে। হয়তো নেটওয়ার্ক সমস্যা, বা অন্য কোনো কারণে ফোন অফ।

www.boighar.com

রাজীবের কথায় লতা যে পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়েছিল, তা নয়। তবে একটা আশা তো ছিল।

সেই আশাটাও নিভে গেল তার দিন কয় বাদে। যেদিন বাবা-মাকে নিয়ে পারুলকে দেখতে আসার কথা রাজীবের, তার ঠিক আগের দিন। লতার সাথে যেন ফোনে সব সময় যোগাযোগ রাখতে পারে, এই জন্যই লতা থেকে গিয়েছিল রায়গঞ্জেই। পরদিন ভোরে রাজীবরা যখন লঞ্চ থেকে নামবে, তখন তাদের নিয়ে পারুলদের বাড়ি যাবে লতা। কিন্তু তার আগের দিন দুপুর থেকে হঠাৎ ফোন অফ রাজীবের। প্রথমবার ফোন বন্ধ পেতেই লতার বুকের ভেতরটা কেউ যেন খামচে ধরল। তার মনে হলো তীব্র আতঙ্কের একটা বরফ শীতল চিনচিনে স্রোত নেমে যাচ্ছিল তার গলা বেয়ে বুকের ভেতর। সারা শরীর কেমন অবশ হয়ে আসছিল। তারপর সারাটাক্ষণ ফোন হাতে নিয়ে বসে রইল লতা। আর মিনিটে মিনিটে ফোন দিতে লাগল। কিন্তু রাজীবের বন্ধ ফোন আর খুললই না। লতার কেমন অস্থিরতা শুরু হলো। সে কি করবে এখন? সে কি পারুলদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে? কিন্তু সেখানে গেলে ফোনের নেটওয়ার্ক থাকবে না। এর মধ্যে যদি রাজীব আবার ফোন দেয়! ওদিকে আবার পারুলের বাড়িতে একটা হুলস্থুল লেগে গেছে। এখনই গিয়ে কিছু একটা পরিকল্পনা না করলে বাড়ি ভরা মানুষের মাঝে একটা ভয়ানক বেইজ্জতি হয়ে যাবে! লতার দিশেহারা লাগতে লাগল। সে কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছিল না। পারুলের সাথে কথা বলা দরকার। এক্ষুণি কথা বলা দরকার। সে জানে না কেন, তার বুকের ভেতর একটা স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ কু ডাক ডাকছে! আগেভাগে পারুলকে একটা কিছু না বলে সে থাকতে পারছে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, রাত। লতার সত্যি সত্যি পাগল হবার দশা। সে কাঁদছে। ফোন করছে। একবার বাড়ির বাইরে যাচ্ছে, একবার ভেতরে। কিন্তু তার অস্থিরতা তাতে এতটুকুও কমল না। আর কখনো এমন অস্থিরতায় সে ভুগেছে কিনা, লতা জানে না। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই লতা বাড়ি থেকে বের হলো। তখনো ঢাকার লঞ্চ এসে ঘাটে ভেড়েনি। সে গিয়ে লঞ্চঘাট দাঁড়িয়ে রইল। লঞ্চ আসলো তারও কিছুক্ষণ পর। কিন্তু রাজীব এলো না। একের পর এক প্যাসেঞ্জার নেমে গেল লঞ্চ থেকে। ফাঁকা হয়ে গেল পন্টুন। কিন্তু কোথাও রাজীব নেই। লতা লঞ্চে উঠে দিশেহারার মতো একটা একটা করে কেবিনে গেল। লঞ্চের কেবিন বয়দের কাছে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু নেই!

লতার পারুলদের বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। পারুলদের উঠানের পাশে খোলা চুলা। সেখানে গাঁয়ের বৌ ঝিয়েরা মিলে তখনও নানান আয়োজন করছেন। কত রকমের খাবার! গ্রামের পিঠে, পায়েস, টক, মিষ্টি, ঝাল। কত কি! তারা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই লতা পাগলের মতো ছুটে

পারুলের ঘরে ঢুকল। সেখানে কয়েকটা মেয়ে মিলে পারুলকে সাজাচ্ছে। লতাকে দেখে সকলের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল, 'আইয়া পড়ছে? বাইরের ঘরে বইতে দিছেন?'

লতা কি বলবে? সে তাকিয়ে আছে পারুলের দিকে। পারুলের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে হয়ে আছে। পারুল প্রবল কৌতূহল নিয়ে লতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎই যেন লতার মুখের ভাষা পড়তে পারল সে। পারুল ঝট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রবল আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মতো রুদ্ধশ্বাস গলায় বলল, 'কি হইছে লতা?'

লতা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর খুব ধীরে, যতটা সম্ভব নিজেকে শান্ত করে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'বাসা থেইক্যা লঞ্চে আসনের পথে গাড়ি একসিডেন্ট করছে। রাজীবের বাপ মাথায় আঘাত পাইছে। তারে নিয়া হাসপাতালে ভর্তি করান লাগছে। আমারে তহন জানাইতে পারে নাই। ফোন টৌন বন্ধ হইয়া গেছিল। জানাইছে রাইতে।'

ঘরের প্রতিটি মানুষ মুহূর্তেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণের হইচই, আনন্দ-উল্লাস নিমেষেই বিষাদের গভীর মেঘ হয়ে নেমে এলো ঘরে। তারপরের সময়টুকু যেন মৃত বাড়ির শোকের। একে একে সবাই এসে পারুলকে শান্তনা দিয়ে চলে গেল। পারুল বসে আছে চুপচাপ। তার পরনে মায়ের সেই লাল শাড়িটা। সবাই তাকে নিষেধ করলেও সে নোলকটাও পড়েছিল। রাজীব তাকে পইপই করে বলে দিয়েছিল তার বাবা-মাকে সে গ্রামের সহজতা দিয়ে মুগ্ধ করে দিতে চায়। ঘটনা আব্দুল ফকিরকেও জানানো হলো। আব্দুল ফকির বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। তাকে দেখতে লাগছে অদ্ভুত। তিনি তার সব দাঁড়ি চেঁছে ফেলেছেন। কিন্তু থুতনির দগদগে ঘা এখনো শুকায়নি। একসিডেন্টের ঘটনা শুনে আব্দুল ফকির যে মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন, এমন না। তিনি বরং খুশিই হয়েছেন। পারুলকে তিনি তার চোখের আড়াল করতে চান না। ওই অতদূরে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তিনি তাকে না দেখে কীভাবে থাকবেন, এই নিয়ে তার মধ্যে একটা তীব্র মনোঃকষ্ট কাজ করছিল। কিন্তু এই বিয়ের জন্য পারুল যেভাবে উদগ্রিব হয়ে আছে, তাতে তার কথা কেন, কারো কোনো কথাই তার সামনে টিকত না। সেখানে এমন একটা ঘটনা ঘটায় আব্দুল ফকিরের চেয়ে খুশি আর কেউ হয়নি। আব্দুল ফকির একটা জিনিস আবিষ্কার করে খুব অবাক হন, তিনি মনে মনে যা চান না, বেশিরভাগ সময়ই কেমন কেমন করে যেন সেই ঘটনাগুলো শেষ অবধি ঘটে না। আবার যা চান, সেই ঘটনাগুলোও বেশিরভাগ সময়ই কেমন কেমন করে যেন ঘটে যায়! এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! আব্দুল ফকির নিজেই নিজের এমন ক্ষমতায় মাঝে-মধ্যে অবাক হয়ে যান। সেখানে অন্যদের ভড়কে যাওয়া তো স্বাভাবিক।

www.boighar.com

মেয়েকে শান্তনা দিতে আব্দুল ফকির এসেছিলেনও। কিন্তু পারুল স্পষ্ট গলায় বলে দিয়েছে, এখন সে কারো সাথেই কোনো কথা বলতে চায় না। সে দরজা বন্ধ করে লতাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল।

অনেকক্ষণের নীরবতা ভেঙে লতা ডাকল, 'পারুল!'

পারুল সেই ডাকে সাড়া দিলো না। তবে হঠাৎ ঝর্নার জলের মতো ভেঙে পড়ল। লতা তাকে আরো বার দুয়েক ডাকল, কিন্তু পারুল সাড়া দিলো না। অনেকটা সময় সে কাঁদল। তারপর শাড়ির আঁচলে নিজের চোখ মুখ মুছে পারুল বলল, 'তুই না বলছিলি, আমার কপালডা ভালো পারুল?'

লতা শক্ত করে পারুলের কাঁধ ধরে রইল। পারুল বলল, 'আল্লায় আমার লগে কেন এমন করে লতা? আমি তো কোনো পাপ করি নাই। করলে আমার বাপ করছে। আল্লায় আমারে শাস্তি দেয় কেন লতা?'

লতা এবারো জবাব দিলো না। সে এখনো বুঝতে পারছে না, আসল ঘটনা সে পারুলকে কীভাবে বলবে! পারুল বলল, 'রাজীবের কোনো ক্ষতি হয় নাই তো লতা? আল্লাহর কিরা, তুই আমারে মিথ্যা কথা বলবি না। ভালো-মন্দ যাই হোক, আমারে সত্য কথা বলবি। যাই হোক, সত্য কথাখানই আমারে ক। আমি আর মিথ্যা জিনিস নিতে পারতেছি না লতা।'

কি বলবে লতা? সে পারুলের মাথাটা তার কাঁধে চেপে ধরে রাখল। পারুল বলল, 'রাজীবের যদি বড় কোনো দুর্ঘটনাও হইয়া থাহে, আমারে বল লতা। আমারে সত্য কথাটা বল।'

লতা কি করবে সে ভেবে পাচ্ছে না। পারুলকে তার এখুনি বলে দেয়া উচিত সত্যিটা। এখুনি। না হলে প্রতি মুহূর্তে তার ভেতর রাজীবকে নিয়ে নতুন নতুন অনুভূতির সৃষ্টি হবে। ভাবনা সৃষ্টি হবে। তার নিজের কষ্ট কি পারুলের চেয়ে এতটুকুও কম? নাকি বেশিই? সে এই এতটা দিনেও আশিককে চিনতে পারেনি? মুহূর্তের জন্যও না? কীভাবে? লতার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় এটা কোনো ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। ঘুম ভেঙে গেলেই দেখবে সব আবার আগের মতো। কিন্তু পারুলের জন্যও কি সে দায়ী নয়? তার জন্যই পারুলের সাথে রাজীবের এই সম্পর্ক। দিনের পর দিন সেই সম্পর্কে আলো, হাওয়া, জল দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে, সতেজ রেখেছে, বিস্তৃত, গভীর করেছে সে! কিন্তু লতা তো জানে, সে মুহূর্তের জন্যও পারুলের কোনো ক্ষতি চায়নি। বরং ভালো চেয়েছে। লতার নিজেকে কেমন অসহায়, নিঃস্ব, দায়গ্রস্ত এক মানুষ মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই জগৎ সংসারে তার চেয়ে বিপন্ন, বিধ্বস্ত, ভাগ্যাহত আর কেউ নেই। পারুল তো অন্তত কাঁদতে পারছে, কিন্তু সে তো কাঁদতেও পারছে না।

দীর্ঘ সময় বয়ে গেল। নৈঃশব্দ্যের দীর্ঘ সময়। কিন্তু সময় জানে, এই নৈঃশব্দ্যের ভেতর কষ্টের ছুড়ির তীক্ষ্ণ ফলায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লেখা হয়েছে কত কত শব্দ, কত কত কথা, কত কত কান্না!

লতা সেই নৈঃশব্দ্য ভেঙে পারুলের হাত ধরে বলল, 'পারুল। একটা কথা। খুবই জরুরি।'

পারুল ঝট করে মাথা তুলে তাকাল। তারপর বলল, 'রাজীবের কিছু হইছে? খারাপ কিছু?'

সে তার কথা শেষ করতে পারল না। ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নার দমকে তার শরীর কাঁপছে। সেই কান্না জড়ানো গলায়ই বলল, 'আমারে একটু ঢাকা লইয়া যাবি লতা? আমি অর মুখখান একবার খালি দেখব। একটা বার। ওই একটাবার দেইখ্যাই আমি সারাটা জীবন কাটাই দিতে পারব লতা। ও লতা! লতারে...'।

লতা চুপ করে রইল। পারুলকে এই কথা বলার সাহস সে করে উঠতে পারছে না। কিন্তু তাকে বলতেই হবে। সে হঠাৎ দুম করে বলে বসল, 'রাজীবের গাড়ির কিছু হয় নাই পারুল। আমি যেইটা সন্দেহ করছিলাম সেইটাই। কাইল দুপুরেরতন তার ফোন বন্ধ। আমরা একটা ফাঁদে পড়ছিলাম পারুল। বড় ফাঁদ।'

পারুল কান্না থামিয়ে স্থির চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'এইগুলান সব মিথ্যা আছিল? তোর মা যা বলছিল, আশিক ভাইরে লইয়া প্রথম প্রথম আমি যা সন্দেহ করতাম, সেইটাই সত্য?'

এবার লতা কাঁদল। সে ঝুঁকে পারুলের ভাঁজ করা হাঁটুর উপর মাথা রাখল। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, 'দুইন্যাটা এত খারাপ কেন পারুল? মানুষ এত খারাপ কেন? কেন মানুষ এত খারাপ?'

পারুল কিন্তু আর ভেঙে পড়ল না। সে স্থির শান্ত গলায় বলল, 'আমি জানি না লতা। আমি বিশ্বাসও করি না। রাজীব! রাজীব এমন না লতা। আমি তারে দেখছি। তার চোউখ দেখছি। ওই চোখের ভিতর এইগুলান নাই লতা। তুই যেইটা বলছস, ওইরকম কোনো একটা ঝামেলা হইছে লতা। কোনো একটা ঝামেলা হইছেই হইছে। আমি জানি রাজীব আসবই। রাজীব না আইসা পারব না। সে আমারে ছাড়া থাকতে পারব না লতা। আমার আল্লায় জানে আর আমি জানি, সে কেমন মানুষ। ও আল্লাহ! আমি বিশ্বাস হারাই নাই। আমি বিশ্বাস হারাই নাই লতা। আমি বিশ্বাস হারাব না। আল্লাগো, আমি জানি সব ঠিক হইয়া যাইব। সব ঠিক হইয়া যাইব গো আল্লাহ। ও আল্লাহ!'

পারুল আর লতা, সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের রাতখানা যেন কাটিয়ে দিলো মৃতপ্রায় দুজন মানুষের মতো। পরদিন ভোরেও তাদের ঘরের দরজা খুলল না।

www.boighar.com

তাবারন ডাকল, আব্দুল ফকির ডাকলেন। শেষ অবধি তারা উঠল। কিন্তু শেকড় কাঁটা গাছের মতো নেতিয়ে রইল তারা। কেউ কারো সাথে কোনো কথাও বলল না। দুপুরের দিকে লতা তাদের বাড়িতে গেল। সে ফিরল সন্ধ্যার খানিক পর। তখনো পারুলের ঘরের দরজা বন্ধ। লতার আর ইচ্ছে করছিল না পারুলকে ডাকতে। সে চুপচাপ গিয়ে বসে রইল পুকুর ঘাটে। অনেকটা সময়। চারপাশটা বড় বেশি সুনসান। সেই সুনসান স্তব্ধতায় লতার চোখের সামনে একটার পর একটা ছবি ভেসে আসতে লাগল আশিকের। কত কত স্মৃতি, কত কত অনুভূতি, ব্যাকুলতা, মন কেমন করা মুহূর্ত, কথা, গভীর অন্তরঙ্গতা, শরীরী স্পর্শ, আরও কত কত কিছু! অথচ তার সবই মিছে ছিল? কেবল সত্যি ছিল, ওই শরীরী স্পর্শটুকুই? কেবল ওই স্পর্শটুকুর জন্যই আর সব মিছেমিছি খেলা? আর সব? এই সব কিছু?

লতার বিশ্বাস হতে চায় না। মনের কোথায় যেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটু আশা থেকে যায়। বিশ্বাস থেকে যায়। কিন্তু সে এও জানে, এই সম্পর্কে আরো কত বড় বড় ফাঁক যে রয়ে গিয়েছিল, তা সে মুহূর্তের জন্যও টের পায়নি। তখন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে ছিল সে। না হলে এই এত বড় বড় ফাঁকগুলো কি করে তার চোখের আড়ালে থেকে গেল? ভালোবাসলে আসলেই মানুষ অন্ধ হয়ে যায়? বোকা হয়ে যায়? কতবার সে আশিককে বলেছে তার ঠিকানা দিতে, তার মা-বাবা, বা নিদেনপক্ষে ভাই বা বোনের কারো ফোন নম্বর দিতে। যদি কখনো কোনো কারণে তাকে না পায়? তখন কি হবে? প্রতিবারই নানান ছল ছুঁতোয় এড়িয়ে গেছে আশিক।

একটা মানুষের জীবনে কতটা তীব্র কষ্টের অনুভূতি থাকতে পারে? কতটা শূন্য লাগতে পারে একটা মানুষের? লতার মনে হয় না, এই মুহূর্তে তার যে অনুভূতি হচ্ছে, তার চেয়ে তীব্র কোনো কষ্ট এ জগতে কারো আছে! এর চেয়ে গভীর কোনো শূন্যতা আর কারো থাকতে পারে!

এভাবে কতক্ষণ একা বসেছিল লতা জানে না। কিন্তু হঠাৎই তার আশেপাশে অনভিপ্রেত কিছু একটার অস্তিত্ব যেন তার অবচেতন মনকে সতর্ক করে তুলল। মুখ তুলে তাকাতেই চমকে গেল লতা! খানিক ভয়ও। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এসেছে। সেই অন্ধকারে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আব্দুল ফকির। লতা খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যদিও অন্ধকার, তারপরও মেয়েলি সংবেদনশীলতা থেকেই হয়তো সে চট করে তার গায়ের ওড়নাটা ঠিক করে ফেলল। তারপর বলল, 'চাচা, আপনে এইহানে?'

আব্দুল ফকির নরম গলায় বললেন, 'মা, তুমি এইহানে একলা একলা কি করো? রাইত হইছে অনেক। সেই সইন্ধ্যা থেইক্যা দেহি তুমি এইহানেই বইস্যা রইছো?'

লতা বলল, 'না চাচা। তেমন কিছু না। পারুলের দেখলাম মন অনেক খারাপ। এইজন্য অরে আর ডাকলাম না। ও কি আমারে খোঁজতেছে চাচা?'

আব্দুল ফকির কেমন যেন একটা অন্যরকম গলায় বললেন, 'তুমি যে আইছ, এইটাই তো কেউ জানে না লতা।'

লতার হঠাৎ কেমন যেন খুব অস্বস্তি লাগতে লাগল। সে বলল, 'আন্ধারও অনেক হইয়া আসছে চাচা। দেহি একটু সইরা জায়গা দেন। পারুল আমার উপর মনে মনে রাগই হইব।'

আব্দুল ফকির সামান্য সরে জায়গা দিয়ে বললেন, 'আবার গরমটা কি পড়ছে দেখছ? এই একটু গরম পড়লেই সাপ-খোপ সব হাওয়া খাইতে খোলা জায়গায় বাইর হইয়া আসে। সাবধানে যাইতে হইব। আর আমাগো এই অঞ্চলের মতো সাপ আর কোনো অঞ্চলে আছে শোনছ? দেহি দেহি, হাতখান দেও। আমি ধইরা নিয়া যাই। আন্ধারে কোন দিকে না কোন দিকে পাও দিবা, সাথে সাথে কামড়। দেও দেও।'

লতা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আব্দুল ফকির তার হাতখানা ধরে তাকে টেনে উঠালেন। লতা জানে না কেন, তার ভারি অস্বস্তি এবং ভয় হতে লাগল। সে বলল, 'আমি যাইতে পারব চাচা'।

আব্দুল ফকির বললেন, 'না না। তুমি যাইতে পারলেই তো আমি যাইতে দিব না মা। বড়গো কথা শোনতে হয়।'

কথা শেষ করতে না করতেই আব্দুল ফকির হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন লতা এতক্ষণ যেখানে বসেছিল, সেখানে। আর সেই সাথে লতাকে একটানে বসিয়ে ফেললেন তার কোলে। তারপর পেছন দিক থেকে দুইহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন লতাকে। তার মুখ তখন লতার চুলের ভেতর। লতার সবগুলো ইন্দ্রিয় মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে উঠল। মুহূর্তের ঘটনা, কিন্তু তার আর বুঝতে বাকি রইল না কিছুই। সে বার দুই ঝটকা মেরে তার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। প্রবল আতঙ্কে লতা কাঁপছে। আব্দুল ফকির বললেন, 'অস্থির হইতেছ কেন লতা? আসো, একটু গপসপ করি'।

লতা হঠাৎ তীব্র ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল, 'আপনে আমারে যাইতে দিবেন। না চিক্কুর দিয়া পারুলরে ডাকব?'

আব্দুল ফকির বললেন, 'ডাকলে তোমারই ক্ষতি। এই এত রাইতে তুমি আমার লগে এইহানে কি করো? এইটা মানুষ জানাজানি হওন কি ভালো হইব লতা?'

লতা আর একটা কথাও বলল না। সে চিৎকার করে পারুলকে ডাকল। একবার, দুইবার, তিনবার। তিনবারের বার ভেতর বাড়ি থেকে পারুল সাড়া দিলো। আব্দুল ফকির সাথে সাথে লতাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

www.boighar.com

বললেন, 'এই যে দেখো, তুমি আমারে ভুল বুঝলা। আমি তাল সামলাইতে না পাইরা পইড়া গেলাম ঘাটের উপরে। সাথে তোমারে নিয়া পড়লাম। আমি বুড়া মানুষ...'।

লতা আর আব্দুল ফকিরের বাকি কথা শুনল না। সে দৌড়ে ছুটে গেল বাড়ির দিকে। পারুল ততক্ষণে অনেকটাই সামনে এগিয়ে এসেছে। সে বলল, 'কি হইছে লতা? তুই এত রাইতে ওই দিকে কি করতেছিলি?'

লতা তখনো নিজেকে সামলে নিতে পারেনি। তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তীব্র আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে সে। পারুল আবারো বলল, 'কি হইছে?'

লতা বলল, 'না, কিছু হয় নাই। পুকুর ঘাটে একলা একলা বইসা আছিলাম। আচুক্কা চাইয়া দেহি আন্ধার। ভয় পাইয়া গেছিলাম।'

লতা কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল, 'আমি বাড়ি যাব পারুল। আমার ভালো লাগতেছে না।'

পারুল খুবই অবাক হলো লতার কথায়। কিন্তু সেও কেন যেন আর জোর করল না। সেই অত রাতে তাবারন আর পারুল মিলে লতাকে দিয়ে আসলো তাদের বাড়িতে। সারারাত দুই চোখের পাতা আর এক করতে পারল না লতা। এই ঘটনা সে কার কাছে বলবে? কীভাবে বলবে? কী ভয়ানক লজ্জার কথা! এই কথা সে না পারুলকে বলতে পারবে, না তার মা-বাবাকে বলতে পারবে। ঘেন্নায়, ভয়ে, অপমানে পারুলের নিজেকেই নিজের অশুচি লাগতে লাগল। তার হঠাৎ মনে হতে লাগল, এই আব্দুল ফকির মানুষটার চোখের দৃষ্টি যে খারাপ তা সে বহু আগে থেকেই বুঝতে পারছিল, কিন্তু কখনোই সেভাবে গ্রাহ্য করেনি। আসলে এই এত বয়স্ক একটা মানুষ। তার ওপর তার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবীর বাবা, তার ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি। লতার সেই রাতে আরো একটা ঘটনা মনে পড়ল। যেদিন প্রথমবার আশিকের ফোন বন্ধ ছিল। প্রচণ্ড মন খারাপ নিয়ে সে আর পারুল ঘুরতে গিয়েছিল নদীর ঘাটে, আর তখন আব্দুল ফকির এসেছিলেন নৌকা নিয়ে। সেই নৌকায় উঠতে যাবার সময় তাকে ধরে নৌকায় উঠিয়েছিলেন আব্দুল ফকির। আর তখনও তার স্পর্শে লতা কুঁকড়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে এই ভেবে লতা প্রবোধ দিয়েছিল যে সে ভুল বুঝেছে!

সে রাতে ঘুমাতে পারেনি পারুলও। তার পরের রাতও না। তার পরের রাতও না। নির্ঘুম পারুলের চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। তার খাওয়া, ঘুম, গোসল সকলই যেন উধাও হয়ে গেছে। জগতের কোনো কিছুর প্রতিই কোনো আগ্রহ নেই তার। সারাক্ষণ কেমন আনমনা হয়ে ঘরের দাওয়ায় বা তার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। কারো সাথে কথা বলে না। কিন্তু পারুল জানে, রাজীব আসবে। আসবেই। সে না এসে পারে না। এই বিশ্বাস তার আছে।

পারুল রাজীবের অপেক্ষায় থাকবে। রাজীব যেন কোনোদিন ফিরে এসে বলতে না পারে, পারুল, আমার প্রতি এই তোমার বিশ্বাস? তুমি জানতে না, আমি ফিরে আসব? তাহলে? একটু অপেক্ষা করতে পারলে না আমার জন্য?

এই কথা বলার সুযোগ রাজীবকে দিবে না পারুল। সে বরং রাজীবকে বলবে, 'আমি জানতাম তুমি আসবে। এই বিশ্বাস আমার আছে। আর তোমার একটা উপহার তো আমার কাছে রয়ে গেছে, সেটা তোমাকে না দিয়েই আমি চলে যাব? কখনোই না।'

রাজীব তখন কি করবে?

পারুল একা একা কত কিছু যে ভাবে! রাজীবের সাথে কথা বলে। প্রশ্ন করে, উত্তর পায়। গল্প করে। কত কত পরিকল্পনা করে। কিন্তু একটা কথা সে রাজীবকে একবারও বলে না। তার খুব অভিমান হয়, রাজীব কেন সেই কথাটা তাকে একবারও জিজ্ঞেস করে না? একবারও না! সে তো রাজীবকে বলবে বলেই এই কথাটা এখনো কাউকেই বলেনি। কাউকেই না। রাজীব তাকে জিজ্ঞেস না করলে সে এই কথাটা বলবে না। কোনোদিন না। পারুল একা একা ঘরের দরজা বন্ধ করে কত কত কথা বলে। মাঝে-মধ্যে কথা বলার সময় সে তার জামাটা পেটের উপর থেকে তুলে দেয়। তারপর পেটের উপর হাত রেখে ফিসফিস করে কথা বলে, 'তুই যে আমার প্যাটে আইসা পড়ছস, এইটা কিন্তু আমি চাই নাই, এইজইন্য তুই আমারে ভুল বুঝিস না। আমার তো ডর করতে আছিল। তারপরও কেমনে কেমনে হইয়া গেল। কিন্তু তোর বাপ তো তোর কোনো খোঁজ নিতেছে না। এহন? এহন কি করব আমি বল? আমি কিছু করতে পারব না। আমার কি একলা ঠ্যাকা? আমার একলা ঠ্যাকা না। তোর বাপ আসলে তার বলবো, আমি প্যাটে নিয়া আর কষ্ট করতে পারব না। এহন তুমি কয়দিন কষ্ট করো। নেও, প্যাটে নেও। তহন দেখব সে কি করে? হা হা হা!'

পারুল তার পেটের ভেতর বেড়ে ওঠা এক মানবভ্রুণের সাথে কথা বলতে থাকে। কথা বলতে থাকে আরো একটি মানবজন্মের সাথে। যেই জন্মের মানবজন্ম ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই।

www.boighar.com

www.boighar.com

রেণু বললেন, 'ছাতাটা নিয়ে যা, যা রোদ'।

হেমা বলল, 'প্লিজ মা। ডোন্ট বি মাই মাদার'।

রেণু বললেন, 'এটা কি ধরনের কথা? ডোন্ট বি মাই মাদার মানে কি? আই অ্যাম অলরেডি ইওর মাদার।'

হেমা বলল, 'ইটস অলরাইট। ইউ আর জেনেটিকালি মাই মাদার। বাট তুমি কখনো মা ছিলে না। অপরিচিত মহিলার মতো ছিলে। এখন মা হবার চেষ্টা করছ।'

রেণু বললেন, 'একটা ছাতা নিয়ে যেতে বলার সাথে এতকিছু বলার মানে কি?'

হেমা বলল, 'কোনো মানে নেই মা। আমার ছাতা নিয়ে হাঁটতে ভাল্লাগে না। পাহাড়ে যাচ্ছি, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোরার জন্য?'

রেণু বললেন, 'ওকে যাস না'।

হেমার ট্যুর যে আজ বা কালই, তা না। এখনো দিন পনেরো বাকি। কিন্তু রেণু প্রতিদিনই বিভিন্ন কথার ছলে এটা-সেটা দিয়ে যাচ্ছেন। সেদিন দিয়ে গেলেন একটা সানস্ক্রিন। বললেন, 'পাহাড়ে যাবি, অনেক রোদ। এটা মুখে, হাত পায়ে একটু মেখে নিস।'

হেমা কথা বলেনি। সে চুপচাপ ক্রিমটা রেখে দিয়েছে ব্যাগে। তারপর দিন দুটো চমৎকার ওয়াটার বটল কিনে নিয়ে এসেছেন রেণু। সাথে এক বক্স স্যালাইন। বললেন, 'অনেক ডিহাইড্রেশন হবে,এগুলো সাথে রাখিস।'

হেমা মৃদু হেসেছে। কিছু বলেনি। রোজই এমন টুকটাক চলতেই থাকে। আজ ছাতা। হেমা বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি মা?'

রেণু বললেন, 'বল'।

হেমা বলল, 'তোমার কি খুব একা লাগছে আজকাল?

রেণু বললেন, 'কেন? একা লাগবে কেন?'

হেমা বলল, 'এই যে আমার এত যত্ন করছ!'

রেণু বললেন, 'আগে কখনো করতাম না?'

হেমা বলল, 'করতে না, তা না। কিন্তু এত তো করতেই না। তোমার কি মনে হচ্ছে, আমাকে আদর ঘুষ দিয়ে বাবার কাছ থেকে আটকে রাখবে? লাভ নেই মা। বাবা নতুন বিয়ে করছে। মেয়েটাকে আমি দেখেছি। বাবার জন্য খুব কেয়ার। রিকশায় বসা দুজনের সে কি হাসাহাসি! বাবা সম্ভবত আইসক্রিম খেয়ে গালে মাখিয়ে ফেলেছিল, মেয়েটাকে দেখলাম কী যত্ন করেই না শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে!'

রেণু কথা বললেন না। তিনি হাতের কি কাজ করছিলেন। সেটি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হেমা বলল, 'শোনো মা। বাবার সাথে আমার কথা হয়েছে। বাবার বিয়েটা এ মাসেই হতো। কিন্তু আমি বলেছি, আমি ছাড়া যেন বিয়েটা না হয়। আমি সাজগোজ করে বিয়েতে যেতে চাই। কি পরে যাব বলো তো মা? শাড়ি? না সালোয়ার কামিজ?'

রেণু যেন হেমার কথা শুনতেই পাননি। তিনি টুক করে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। হেমা আড়চোখে তাকিয়ে মায়ের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। আজ আবার মাঝরাতে নিজের ঘর ছেড়ে মার ঘরে গেল হেমা। রেণু তখনও জেগে। হেমা বলল, 'মা আমাকে বিয়ে দেবে না?'

রেণু হাসলেন। বললেন, 'এত রাতে বিয়ের কথা কেন?'

হেমা বলল, 'আমার মাথায় একটা প্রশ্ন এলো মা। আচ্ছা মানুষ বিয়ে করে কেন বলো তো?'

রেণু বললেন, 'শুধু শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করছিস। উত্তর না নিয়ে যে তুই আসিসনি, সে তো আমি জানিই।'

হেমা বলল, 'আমি উত্তর নিয়ে আসলে সেটি তো আমার উত্তর। তোমার উত্তর কি সেটি বলো।'

রেণু বললেন, 'এর কোনো স্পেসিফিক উত্তর নেই। একেকজনের কাছে একেকরকম। সবাই একই কারণে বিয়ে করে না।'

হেমা বলল, 'একটা কারণ আছে মা। সবার এক।'

রেণু বললেন, 'কি?'

হেমা বলল, 'নিরাপত্তার জন্য। এই নিরাপত্তা নানানরকম হতে পারে। খাবার-দাবারের নিরাপত্তা থেকে আইডেনিটিটির নিরাপত্তা। সঙ্গীর নিরাপত্তা। ধরো, আমাদের দেশে তো একটা বয়সের পরই মেয়েদের কেন বিয়ে দেয়া হচ্ছে না, জামাই নেই কেন? কার জামাই কি করে, এই ধরনের নানান প্রশ্ন। তারপর ধরো বয়স হয়ে যাওয়ার পরও কোনো মেয়ে বিয়ে করল না, বা হচ্ছে না, সাথে সাথেই সেই মেয়েটা এক ধরনের আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে পড়ে যাবে।

www.boighar.com

অনিরাপদ হয়ে যাবে। মানে তার একটা বিয়ে দরকার পরিচিতির জন্য যে শি হ্যাজ আ হাজবেন্ড। রাইট? তবে একটা বিষয় কি জানো, সবচেয়ে ইম্পর্টান্ট সম্ভবত নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য। মানুষের বয়স যত বাড়ে, মানুষ তত নিঃসঙ্গ হতে থাকে। তার গণ্ডি তত ছোট হতে থাকে। এই সময়টা তার বন্ধু থাকে না। তখন তার বন্ধু হয়ে যায়, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, এইসব। সে জানে, এরা যত দূরেই যাক, বা ভুলেই যাক, কোনো না কোনোভাবে তারা বাঁধা। সেটা হচ্ছে সম্পর্কের বন্ধন। সেটা উহ্য হলেও আছে। আর বুড়ো হতে থাকা মানুষগুলো তাদের নিঃসঙ্গতায় এই সম্পর্কের সঙ্গ খোঁজে।'

রেণু বললেন, 'এই মাঝরাতে কী সব আবোল-তাবোল লেকচার শুরু করে দিলি।'

হেমা বলল, 'কথাগুলো কেন বললাম জানো মা?'

রেণু বলল, 'কেন?'

হেমা বলল, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তুমি এই ইনসিকিউরিটিতে ভুগছ। তুমি মন খারাপ বা রাগ করো না। তোমাকে কিছুদিন থেকে আমি খুব বুঝতে চাইছি। কেন বুঝতে চাইছি জানো? আমার নিজেকে বোঝার জন্য। তুমিও একটা বিশেষ অবস্থা পার করছ। আমিও। দুটো ভিন্ন হলেও, কোথাও একটা শক্ত মিল আছে। চাইলে মেলানোও যায়। এইজন্যই আমি তোমাকে বুঝতে চাইছলাম মা।'

রেণু বললেন, 'তারপর কি বুঝলি?'

হেমা বলল, তুমি এই এতদিনে এসে এখন নিঃসঙ্গতার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ছ। তুমি নিজেই হয়তো বুঝতে পারোনি। কিন্তু হচ্ছ। ধরো, এতদিন বাবা, আমি, তুমি আমরা একসাথে থাকতাম। আমাদের মধ্যে তেমন কথাবার্তাও হতো না। কিন্তু তারপরও তোমার মনে হতো উই আর আ ফ্যামিলি। উই আর ইন আ রিলেশনশিপ এবং এটা শেষদিন পর্যন্ত এমনই থাকবে। মানে সেটাকে আলাদা করে কখনো খেয়াল করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু সম্পর্কটা যখন ভেঙে গেল তখন কিন্তু একটা ইনসিকিউরিটি তৈরি হলো। যেমন ধরো, তোমার কি খুব করে মনে হচ্ছে না, আমি চলে গেলে তুমি খুব একা হয়ে যাবে? তোমার খুব নিঃসঙ্গ লাগবে। খারাপ লাগবে।'

রেণু জবাব দিলেন না। হেমাই বলল, 'এই যে আমি এতদিনের দীর্ঘ ট্যুরে যাব, তোমার কি একা একা লাগবে না বাসায়? তারপর ধরো আমি এসে যদি বাবার বাসায় উঠে যাই?'

রেণু এবারও কোনো জবাব দিলো না। হেমা বলল, 'মা, তুমি যে আমায় এত এত কেয়ার করছ, এই যে ধরো, আমার ট্যুরে যাওয়া নিয়েও। এটা নিয়ে আমার মধ্যে আলাদা কোনো অনুভূতি হচ্ছে না জানো? আমার কেবল মনে হচ্ছে, আমার মা তো কখনো এমন ছিল না। সে তো আগে কখনো

কোনোদিনও এমন কিছু করেনি। খেয়ালও রাখেনি কখনো। সে সব সময় তার নিজের পৃথিবী নিয়ে ব্যস্ত ছিল। নিজের কষ্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সে কখনোই তার চারপাশের আর কারো কষ্টটা দেখার চেষ্টা করেনি। একটা মানুষের কাছে যখন তার নিজের কষ্টটাই সবচেয়ে বেশি বড় হয়ে ওঠে, তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে স্বার্থপরতা প্রবল মা। এইজন্য তোমার হঠাৎ আমাকে এমন যত্ন করা, ভালোবাসা, এটা আমার কাছে এক ধরনের স্বার্থপর আচরণ মনে হয়েছে। কথাটা তোমাকে না বললেও পারতাম। কিন্তু আমার মনে হলো, তোমার জানা দরকার আমি কি ভাবছি। ধরো এই যে এতটা বছর কেবল নিজের কষ্টটা নিয়েই ভাবলে, একবার বাবার কথাও তো ভাবতে পারতে, একবার আমার কথাও তো ভাবতে পারতে? আমাদের সবার কথা?'

হেমা সামান্য থামল। তারপর বলল, 'আমি খুব একা মা। আমার কোনো বন্ধু নেই। নিজের একজন মানুষ ছিল, সেও নেই। বাবা-মা নেই। আমি ভেবেছিলাম, একা একা দিব্যি একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়। আমি খুব শক্ত হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার এখনই খুব ভয় লাগছে মা। আমি একা, নিঃসঙ্গ, আমার মন খারাপ হলে শক্ত করে আমার ধরবার জন্য কেউ নেই। আমার আহ্লাদ করতে ইচ্ছে করলে, সেই আহ্লাদ দেখে কেউ বলবে না, কি ন্যাকামিই না পারে মেয়েটা! বরং সে সেটা দেখে মুগ্ধ হবে। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করলে কেউ কাঁধ পেতে দিবে। কেউ নেই, অসহায় লাগলে জড়িয়ে ধরে বলবে, আমি আছি, আমরা আছি। অভিমান করলে নানান কিছু সেই অভিমান ভাঙাবে। আমার এমন কেউ নেই মা। এটা ভেবে আমার কেন যেন খুব ভয় হচ্ছে, অসহায় লাগছে।'

রেণু হাত বাড়িয়ে হেমাকে কাছে টানলেন। কিন্তু হেমা এলো না। সে যেমন শুয়ে ছিল, তেমনই শুয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, 'একটা বাচ্চাদের মতো আবদার করি মা?' রেণু বললেন, 'কি?'

হেমা বলল, 'আমার মন কেমন করছে। কেমন অস্থির লাগছে। আমি শক্ত হতে গিয়ে বোধহয় আরো দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। রোজ রাতে অনেক আজেবাজে স্বপ্ন দেখি। আমি দুর্বল হতে চাই না মা। এই ট্যুরটা নিয়েও যে কি বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব স্বপ্ন দেখছি, চিন্তাও করতে পারবে না। মনে হচ্ছে, ট্যুরটাতে না যাই। কিন্তু আমি যাব মা। দুর্বল মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে বেশি। আমি দুঃস্বপ্নও দেখতে চাই না। আমি এই ভয়টা জয় করতে চাই।'

রেণু বললেন, 'আমারও মন কেমন করছে, তুই যাস না।'

হেমা হাসল। বলল, 'তোমার মন কেমন করছে অন্য কারণে মা। তোমার সাবকনশাস মাইন্ড বলছে, আমি চলে গেলে এই বাসায় তোমার খুব একা লাগবে। তার চেয়ে আমাকে কোনোভাবে রেখে দিতে পারলে ভালো।'

www.boighar.com

রেণু কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। হেমা চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'মা, আমি যদি তোমাদের দুজনের সাথে একদিন বাইরে কোথাও রাতের খাবার খেতে চাই, তোমরা কি যাবে?'

হেমা প্রশ্নটা শেষ করে রেণুর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু রেণু কোনো কথা বললেন না। সেই সারা রাতেও না। পরদিনও না। হেমাও আর মাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। বাবা-মাকে সে কখনোই তার ইচ্ছেয় বা তার জন্য জোর করে এক করতে চায়নি। এখনো চায় না। বরং মনটা হঠাৎ ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ায়ই এই পাগলামিটা সে করল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে খুবই বাচ্চাদের মতো অপরিপক্ব একটা কাজ করেছে। কাজটা করা তার ঠিক হয়নি। সে আসলাম সাহেবকেও জানিয়েছিল। তিনি বলেছেন, তার কী কী সব কাজ পড়ে গেছে এই পুরো মাসটা। শেষ অবধি অবশ্য রেণু আর আসলাম সাহেব দুজনই রাজি হলেন। হেমা যাবে শনিবার। তারা সময় দিলেন শুক্রবার সন্ধ্যা ছটায়। সেদিন মহিলা পরিষদে পরপর দুটো প্রোগ্রাম আছে রেণুর। আসলাম সাহেবেরও অফিসের ইমার্জেন্সি কিছু মিটিং আছে। কিন্তু তারপরও তারা হেমাকে সময় দিলেন।

এই প্রথম বাবা-মায়ের কাছে নিজেকে আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো হেমার। সে পাঁচটা থেকে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে রইল। হেমার মধ্যে কেমন যেন একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার চলে এসেছে। সে রেস্টুরেন্ট থেকে উঠে গিয়ে কিছু রঙিন কাগজ কিনে নিয়ে আসলো। তারপর সেগুলো ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করে তাতে রেণু আর আসলাম সাহেবের নানান বৈশিষ্ট্য লিখল। দোষ-গুন, ভালো-মন্দ সবই। আজ বাবা-মা এলে, একজনের সম্পর্কে লেখা কাগজ আরেকজনকে পড়তে দিবে সে। ভাবতেই কেমন ছটফট লাগছিল হেমার। এমন ছেলেমানুষি টাইপের বিষয়গুলো তার সাথে যায় না। কিন্তু আজ যেন খুব বাচ্চা হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে হেমার। আদুরে আহ্লাদি বাচ্চা। হয়তো বাবা-মাকে একসাথে এই তার শেষ পাওয়া। কে জানে, হতে পারে এ কারণেই তার অবচেতন মন তাকে এই সময়টুকু শিশুর মতো করে কাটাতেই প্রলুব্ধ করছে! ঘড়ির কাঁটা যেন আর নড়ছে না। হেমার অস্থির লাগতে লাগল। কিন্তু ছটা পেরিয়ে সাড়ে ছ'টা হলো, কেউই এলেন না। সাড়ে ছটা থেকে সাতটা। কেউ নেই।

হেমা মাকে ফোন দিলো। রেণু ধরলেন না। বাবাকে ফোন দিতেই ফোন কেটে দিলেন আসলাম সাহেব। সাড়ে সাতটায় রেণু মেসেজ পাঠালেন, 'আমার একটু দেরি হবে। মন্ত্রী এসেছেন বলে প্রোগ্রামটায় আটকে গেছি। তবে ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব।'

হেমা বসে রইল রাত দশটা অবধি। একা একা। একা একাই তো? নাকি তার সঙ্গে কেউ ছিল? হয়তো ঘড়ির কাঁটা, সময় আর রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা।

হয়তো তার সঙ্গে ছিল অভিমান আর চাপা কান্নাও। কিন্তু সে তো অভিমানী হতে চায় না। বরং সব সময় সদা সতর্কতায় সকল অভিমান আলগোছে সরিয়ে রেখেছে দূরে। কিন্তু আজ যেন পারল না সে।

আসলাম সাহেবের ফোন বন্ধই ছিল বাকিটা সময়। হেমা বাসায় ফিরল রাত সাড়ে দশটা। রেণু ফিরলেন বারোটায়। রেণু নানানভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন। হেমা অবশ্য কিছুই হয়নি, এমনভাবেই হাসি হাসিমুখেই কথা বলল রেণুর সাথে। তবে রাতে তার ঘুম হলো না। সারারাত বুকের ভেতর কেমন একটা চিনচিনে ব্যথা! শেষ রাতের দিকে গিয়ে হেমার বাঁধ ভাঙল। নয়নের সাথে এত কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল হেমার! এত ইচ্ছে হচ্ছিল! কিন্তু সে তো নয়নকে ডাকবে না। সে চুপি চুপি অপেক্ষায় থেকে যাবে। প্রয়োজনে অনন্ত অপেক্ষায়। কিন্তু সে নিজ থেকে কখনোই তাকে ডাকবে না। হেমা সারাটা রাত অন্ধকারে মাথা ডুবিয়ে বসে রইল। তার শেষরাতের দিকে কি যে হলো হেমার! সে যেন নিজের অজান্তেই নয়নকে ফোন দিয়ে ফেলল। কিন্তু স্ক্রিনে ফোন ডায়াল হতে দেখেই হেমার আবার মনে হলো, না, সে তো নয়নকে আর কখনোই ফোন দিবে না, তাহলে? সে যত শক্ত হতে চাচ্ছিল, তার চেয়ে তো আরো বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে! হেমা তড়িঘড়ি করে ফোন কাটতে গিয়ে দেখল নয়নের নাম্বার বন্ধ। ঠিক সেই মুহূর্তে হেমার মনে হলো, জগতের কোনো ভালোবাসাময় অনুভূতিই তার জন্য নয়। সে তারপরও জোর করে সেগুলোকে কেবল তাড়া করতে চেয়েছে। এই চেষ্টাটা সে আর করবে না। কখনো না।

পরদিন বারোটায় ফ্লাইট হেমাদের। ঢাকা থেকে প্রথমে দিল্লি। সেখানে সপ্তাখানেক থেকে তারপর নেপাল। কিন্তু হেমা বাসা থেকে বের হয়ে গেল খুব ভোরেই। রেণু তার সাথে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হেমা কী সব কারণ দেখিয়ে একাই বের হয়ে গেল। প্রচণ্ড গরম পড়া শুরু হয়েছিল। আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামবে কিনা, কে জানে! হেমার হঠাৎ খুব বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে হচ্ছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হেমার মনে পড়ল কাঠমান্ডু থেকে ফেরার সময় তাদের দু'দিনের জন্য চেরাপুঞ্জি যাবার কথা। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃষ্টিপ্রবণ শহরের একটা চেরাপুঞ্জি। হেমা যেন চোখ বন্ধ করেই দেখতে পেল গভীর সবুজ এক সুউচ্চ পাহাড়ের কাঠের তৈরি কোনো বাংলোর খোলা বারান্দায় বসে আছে সে। তার সামনের দিগন্ত মিশে গেছে প্রবল বৃষ্টিতে। সে একা, একাকী এক মানুষ, প্রবল নিঃসঙ্গতা বুকে চেপে বৃষ্টি দেখছে। তার মনে হচ্ছে, এই বৃষ্টি এমন করেই ঝরে যাচ্ছে তার নিঃসঙ্গ বুকের ভেতরও। এই বৃষ্টি যেন আর কখনো থামবে না।

এই বৃষ্টি যেন এক অন্তহীন কান্নার গল্প।

www.boighar.com

আমোদি বেগম মারা গেলেন ভোর রাতে।

তার মৃত্যু নিয়ে খাঁ-বাড়ির কারোই যে আলাদা কোনো বিশেষ অনুভূতি রয়েছে, তা নয়। তারপরও সকলেই যেন চমকে গেল। এই চমকে যাওয়ার অবশ্য কারণও রয়েছে। সকলেই মনে মনে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল। দিন পনেরো ধরে তার অবস্থা শোচনীয়। তিনি বিছানায় পায়খানা-প্রসাব করেন। প্রথম প্রথম একজন কাজের লোক এসে বারকয়েক তা পরিষ্কারও করেছিল। কিন্তু দিন দুই চার যেতেই সেই আসা কমতে লাগল। তারপর বন্ধই হয়ে গেল। তার ঘরে কেউই ঢুকতে পারছে না। ভয়াবহ দুর্গন্ধে পেট গুলিয়ে বমি আসে।

এস্কান্দারকে বেশিরভাগ সময়ই থাকতে হয় উত্তরের বিলে। সেখানে নতুন পরিকল্পনা করছে মনির। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বলশালী লোক দরকার। মাঝখানে একদিন এসে তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে দেখে গেছে সে। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদেছে এস্কান্দার। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নির্বিকার তাকিয়ে থেকেছেন। তিনি যেন সর্বংসহা এক মানুষ। মানুষ ইচ্ছে করে সর্বংসহা হয় না, হয় বাধ্য হয়ে। অসহায় হয়ে। এককালের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী তৈয়ব উদ্দিন খাঁর চেয়ে অসহায় আর কে আছে! তৈয়ব উদ্দিন খাঁ অবশ্য কাঁদেন না, মনে মনে হাসেন আর তাকিয়ে থাকেন। নিজেকে আজকাল গাছের মতো মনে হয় তৈয়ব উদ্দিন খাঁর। গাছ স্থির দাঁড়িয়ে নির্বিকার সকলই দেখে যায় শুধু। কেউ এসে মজার ছলে তার ডাল ভেঙে নিয়ে যায়। কেউ এসে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যায়। ঝড় এসে শেকড়সহ উপড়ে ফেলে। হয়তো ওই উপড়ে যাওয়াতেই বৃক্ষের আনন্দ। সকল অনুভূতি বুকে পুষে জড়, অথর্ব হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে কষ্টকর আর কী হতে পারে! তিনি এখন কেবল ওই একটা ঝড়ের অপেক্ষায়ই আছেন। শেকড়সহ উপড়ে যাবার অপেক্ষায়।

আজকাল তাকে নিয়ম করে খাবারও দেয়া হয় না। মনির বলে দিয়েছে, তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে সারাদিনে খাবার দেয়া হবে একবার। যাতে তার পায়খানা প্রসাব কম হয়। বারবার এই জিনিস পরিষ্কার করবে কে! তার কারণে খাঁ-বাড়িতে ঢোকা যায় না। দুর্গন্ধে সারা বাড়ি ছেয়ে আছে। কোনো ভদ্র মানুষ আর এই বাড়িতে ঢুকতে পারে না। তা তৈয়ব উদ্দিনও চেষ্টা করেন না খেতে। তার নিজেরও খুব ভয়। এই বুঝি কলকল করে সকল বাধ ছুটে গেল। লুঙ্গির ভেতর ঘিনঘিনে আধা তরল চিটচিটে অনুভূতিটা শরীরের কিছু অংশে তিনি টের পান। গা গুলিয়ে আসত প্রথম প্রথম। কিন্তু ওই যে সর্বংসহা। আজকাল তিনি সর্বংসহা হয়ে গেছেন। এই কদিনে একবারও তাকে আমোদি বেগম দেখতে আসেননি ভেবে ভেতরে ভেতরে ভারি অবাক হয়েছিলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। তবে কষ্ট পাননি। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আর কোনো কিছুতেই কষ্ট পাবেন না তিনি। কষ্টের, লজ্জার, অপমানের কিছু ঘটলেই তিনি মৃত্যুর কথা চিন্তা করবেন। আহা, মৃত্যু, আরাধ্যতম মুক্তির মৃত্যু। এই তো এলো বলে! হয়তো আজ সন্ধ্যায়, না হয় রাতে, না হয় মাঝরাতে বা শেষ রাতে। ভোরে বা দুপুরে। এই তো মৃত্যু এলো বলে। মৃত্যুর কথা ভাবলেই তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মন ভালো হয়ে যায়। আনন্দে ঝলমল করে ওঠে চোখের দৃষ্টি। আহা, মৃত্যু, আহা!

কিন্তু আমোদি বেগমের মৃত্যুর কথা শুনে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। আমোদি বেগমকে তার খুব ঈর্ষা হয়ে গেল। সারাটা জীবন তিনি ভেবেছেন, তিনি আমোদি বেগমকে ঠকিয়েছেন, তাকে বঞ্চিত করেছেন। আর নিজে জিতেছেন। কিন্তু এই শেষ জীবনে এসে তিনি দেখলেন, আসলে প্রতিটি জায়গায় হেরেছেন তিনি নিজে। জিতেছেন আমোদি বেগম। এই মৃত্যুর ক্ষেত্রেও! কী অদ্ভুত। মৃত্যুর মতো এমন পরম প্রার্থিত বিষয়টাও আমোদি বেগম তার আগেই নিজের করে নিলেন। এই জীবনে নিজেকে এত দুর্ভাগা আর কখনোই লাগেনি তৈয়ব উদ্দিন খাঁর। মৃত্যুর মতো এমন পরম প্রার্থিত আর কিছুই যেন নেই এই মানবজন্মে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মনে হতে থাকে, মৃত্যুবিহীন এই মানবজনম কী ভয়ঙ্কর রকমেরই না বীভৎস!

আমোদি বেগমের মৃত্যুর খবর কোহিনূরকে জানানো নিয়েও কারো কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। দিনেদিনেই তার দাফন হয়ে গেল। মনিরের বিয়ের তোড়জোড় চলছে। কন্যার বাড়ি মাদারীপুর শহরে। তার বাবার টিন, রড, লোহা, সিমেন্টের বিশাল ব্যবসা রয়েছে। তারা পাত্র, পাত্রের বাড়ি ঘর দেখতে আসবে। বিয়ের ঘটকালি করছেন আব্দুল ফকির। এই নিয়ে বাড়িতে একটা সাজ সাজ রব। খাঁ-বাড়ি যেন ওলটপালট করে সাজানো হচ্ছে। আগের দিন সকাল বেলা হঠাৎ মনির এসে তার ছোটচাচা দবির খাঁকে ডেকে বলল, 'কাকা, একখান কথা।'

www.boighar.com

দবির খাঁ বললেন, 'কি কথা?'

মনির বলল, 'কত বড় বিরাট বংশের লোক তারা জানেন? আমাগো আছে জমিজমা। তাগো আছে নগদ পয়সা। আইজকাইল জমিজমা কিচ্ছু না। আসল হইলো ব্যবসা-বাণিজ্য। নগদ টাকা-পয়সা। এহন সেই বংশের মানুষ আইব বাড়ি ঘর দেখতে। এই সময় যদি দাদাজান এই অবস্থায় এইহানে থাহে, তাইলে একটা বেইজ্জতি না? তার উপর কি গন্ধটাই না ছোটে কাকা। আপনেই কন?'

দবির খাঁ কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। মনির বলল, 'এক কাম করেন কাকা। দাদাজানরে আপনের ওই নতুন বাড়িতে লইয়া যান। দাদাজান তো হুকুম দিছিল, আপনে ওই বাড়িতে যাইতে পারবেন না। আমি বলতেছি, আপনে ওই বাড়িতে যান। বিয়া করছেন আপনে, তাতে কার কি! আপনে যান কাকা। আর দাদাজানরে একটু নিয়া যাওনের ব্যবস্থা করেন। এই দুইটামাত্র দিন। তারপর আবার লইয়া আসব।'

দবির খাঁ কোনো কথা বললেন না। যে কারণেই হোক, তিনি বরং তার স্ত্রী পুত্রের কাছে যেতে পেরে খুশি। তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে সেই রাতেই রাতের অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া হলো দবির খাঁর স্ত্রী আর পুত্রকে রাখা ছোট্ট ছনের ঘরখানাতে। মনির বলেছিল দিন দুই বাদে সে তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে নিয়ে আসবে। কিন্তু তিনদিন পেরুলেও সেই নিয়ে আসা আর হলো না। দবির খাঁর বউ ভয়েও কখনো সামনে আসে না তৈয়ব উদ্দিন খাঁর। যা করার করেন দবির খাঁ নিজেই।

সেদিন রাতে হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। সেই বৃষ্টি আর থামল না। ছনের ঘরের চালা ছুটে প্রথমে টুপটুপ করে, তারপর ছলছল করে বৃষ্টি ঝরতে লাগল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা টের পাচ্ছিলেন তার বুকের উপর। খুব সরে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু পারছিলেন না। কাউকে যে ডাকবেন, সে উপায়ও নেই। অন্ধকারেই অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। বৃষ্টির ফোঁটা ক্রমশই অনাবিল ধারার মতো ঝরে যেত থাকল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর বুকে। তার শক্ত বিছানায়। পিঠের তলায়। প্রচণ্ড ঠান্ডায় যেন জমে যেতে থাকল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজ পড়া জীর্ণ শরীর। তিনি অসহায় শূন্য চোখে নির্বিকার তাকিয়ে রইলেন নিকষ অন্ধকারে। আহারে, জীবন! আহারে!

সেই অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ার মতো এগিয়ে এলো কে যেন! তারপর চুপি চুপি ফিস ফিস করে বার কয় তাকে শব্দ করে ডাকল। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ স্পষ্ট শুনতে পেলেন, দবিরের স্ত্রী। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ দেখলেন, আবছা অন্ধকারে সে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর তার পাশে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সে। বারকয়েক চোখের কাছে, নাকের কাছে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল

তিনি জেগে আছেন কিনা! নাকি বেঁচে আছেন কিনা? তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিশ্চিত না। তবে তিনি এটি নিশ্চিত, কোনো উদ্দেশ্য আছে মেয়েটার। তাকে অপমানের শোধ নিতে এসেছে সে? জগতে অপমানের কথা কেউ ভোলে না। সে ছোট হোক আর বড়! সুযোগ পেলে তার শোধ নিতেও ছাড়ে না মানুষ। কী অনাচারই না মেয়েটার প্রতি করেছিলেন তিনি! কি ভয়াবহ অপমান, শাস্তি। তার ছেলেটা চোখের সামনে দুটো ভাতের জন্য কেঁদেছিল অবধি। অথচ তিনি...'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ আর এসব ভাবতে চান না। কিছুই না। তিনি জীবন জুড়ে যা কিছু করেছেন, এ সকল যদি তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকে, তবে তিনি তা মেনে নিচ্ছেন। অবশ্য মেনে না নিয়েই বা তার উপায় কি! হয়তো এইজন্য অন্তত মানসিকভাবে হলেও তিনি প্রস্তুত। যে কোনোকিছুর জন্যই প্রস্তুত।

এই এতরাতে দবির খাঁর বউ কি করবে? এই সুযোগে আব্দুল ফকিরের মতো সেও কি তাকে চড় থাপ্পড় মারবে? কিন্তু দবির খাঁর স্ত্রীর হাত দু'খানা নিজের গলার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। মেয়েটা কি তাহলে তাকে গলা টিপে মারবে? তৈয়ব উদ্দিন খাঁ খানিক অবাক হলেও মনে মনে খুশিই হলেন। এই মৃত্যুটাই তো তার কাছে প্রার্থিত ছিল! তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। দবির খাঁর স্ত্রীর হাত এসে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর বুকের উপরের দিকটায় ঠেকল। তারপর হাত দু'খানা চলে গেল তার গলার কাছে। দু'হাতে গলার দু'পাশে ধরে খানিক চাপ বাড়াল হাতখানা। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে ফেললেন। আহা, মৃত্যু! অবশেষে সেই প্রার্থিত মৃত্যু। তিনি চোখ বন্ধ করে অপেক্ষায় রইলেন সেই ভয়ঙ্করতম কিন্তু একইসাথে প্রার্থিততম মৃত্যু যন্ত্রণারও। কিন্তু মেয়েটা তার গলা চেপে ধরল না। তার হাত সরে গেল তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মাথার কাছে। সে তার দু'হাতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মাথা ছুঁয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ ফ্যাসফ্যাসে গলায় ডাকল, 'ও শিমুলের বাপ। শিমুলের বাপ। পইড়্যা পইড়্যা ঘুমাইতে আছেন। আর এইদিকে দেইখ্যা যান, মানুষটা বিষ্টিতে ভিজ্যা জবজইব্যা হইয়া গেছে। ও শিমুলের বাপ।'

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ তার নাতির নামটাও জানতেন না। নাতির নাম তাহলে শিমুল! কিন্তু মেয়েটা এ কী করছে! খানিক বাদে দবির খাঁ উঠে আসলেন। তারপর রাতের বাকি সময়টুকুতে তৈয়ব উদ্দিন খাঁকে সরিয়ে তাদের বিছানায় নিয়ে যাওয়া হলো। তার গা মুছে দিয়ে তাকে শুকনো কাপড় পরানো হলো। হারিকেনের আলোয় ভাপ দেয়া কাপড়ে তার বুকে উত্তাপ দেয়া হলো। তিনি মরার মতো চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। তার ভয় হতে লাগল, পাছে তিনি চোখ মেলে চাইলে ভয়ে মেয়েটা উঠে চলে যায়! এই হাতের স্পর্শ, এই মমতার স্পর্শ দূরে চলে যায়। তৈয়ব উদ্দিন মৃত মানুষের মতো পড়ে রইলেন। দবির খাঁ

স্ত্রী হঠাৎ বললেন, 'বাজানরে একটু গরম সাগু খাওয়াইতে পারলে ভালো হইতো! দেহেন না একটু সাগুর ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা!'

দবির খাঁ বললেন, 'এই রাইতে এহন সাগু পাব কই?'

দবির খাঁর স্ত্রী বললেন, 'বেয়ান হইলে একটু দেইখেন'।

দবির খাঁ বলল, 'দেখব নে। আর একখান কথা, তুমি কিন্তু যহন-তহন তারে বাজান বইল না।'

দবির খাঁর স্ত্রী বলল, 'যহন-তহন তো ডাকি না। এহন তার চেতন নাই দেইখ্যা ডাকছি!'

দবির খাঁ বললেন, 'মনে থাহে জানি। সে জানি না শোনে।'

দবির খাঁর স্ত্রী বলল, 'না, তারে শোনাইয়া বলব না। আমি তো তার ধারেই আহি না।'

দবির খাঁ বললেন, 'আবার যে এইসব খাওয়াইবা, যদি প্যাট ছাইড়্যা আবার বিছনা নষ্ট করে।'

দবির খাঁর স্ত্রী বলল, 'মাখলে মাখবো। বুড়া মানুষ। সে তো এহন এইরমই করব। এইটা নিয়া এত চিন্তার কি আছে! আল্লায় এহন পর্যন্ত আমার হাত তো রাখছে। যতবার মাখব, ততবার পরিষ্কার করব।'

দবির খাঁ বললেন, 'হ। মেথরের মাইয়া তো। এইগুলানে ঘিন কিয়ের?'

দবির খাঁর স্ত্রী বললেন, 'মেথরের মাইয়া হইছি বইলা এইগুলান কোনো দিন হাত দিয়া ধরি নাই। আমার বাজান কোনোদিন আমাগো দিয়া এই কাম করানির কথা ভাবেও নাই। জীবনে প্রথম কোনদিন এই প্রসাব-পায়খানা ছানছি, হাত দিয়া ধরছি জানেন? যেইদিন মা হইছি, সেইদিন। আমার শিমুলের হাগা-মুতা। তা দুইন্যার কোন মানুষটা এইগুলান করে নাই? এমন কেউ আছে? নাই। এমন কেউ নাই। তায় এত ঘিন কিয়ের। এই বুড়া মানুষটা আর আমার সেই দুইদিন বয়সের শিমুল, কোনো ফারাক তো আমি দেহি না শিমুলের বাপ। আপনে দেহেন?'

দবির খাঁ কোনো কথা বললেন না। হারিকেনের আলো মুখে পড়ছে বলেই কিনা কে জানে, দবির খাঁর স্ত্রী তার শাড়ির আঁচলখানা দিয়ে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখটা ঢেকে দিলেন। সেই আঁচলখানা বিছিয়ে আছে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মুখে, চোখে, চিবুকে, গলায়, কপালে, নাকে। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হঠাৎ মনে হতে লাগল, এই আঁচলখানা তিনি চেনেন। এই আঁচলখানা তিনি বছরের পর বছর ধরে চেনেন। কিন্তু বহুবছর এই আঁচলখানা যেন হারিয়েছিল তার স্মৃতি থেকে, তার অনুভূতি থেকে। তিনি এই আঁচলের কথা ভুলে ডুবে ছিলেন জগতের আর সকল কথায়, আর সকল চিন্তায়, অনুভূতিতে। তিনি হঠাৎ ফোসফোস করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। তার সেই নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিতে লাগলেন

সুবাস। সেই শ্বাসের সাথে টেনে নিতে লাগলেন ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণ এই জগতের না। এই ঘ্রাণ অন্য কোনো জগতের। এই সুবাস জুড়ে মায়া। সেই মায়া জুড়ে মা। মা, মাগো, ও মা। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কথা বলতে পারলেন না। কিন্তু তার বুকের ভেতর তড়পাতে লাগল কত কত বছর আগে মরে যাওয়া তার মা। মায়ের আঁচল। আঁচলের ঘ্রাণ। ঘ্রাণভর্তি মমতা। সেই মমতা জুড়ে মা। ও মা। মা। মাগো। তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কাঁদতে লাগলেন। তার গাল ভেসে যাচ্ছে জলে। সেই জলের ভেতর জীবন।

তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কাঁদছেন। সেই সাথে কিছুটা বিরক্তও হচ্ছেন। মেয়েটা তাকে আর বাজান বলে ডাকছে না কেন? কেন ডাকছে না? কেন?

www.boighar.com

কোহিনূর যেদিন তার মায়ের মৃত্যুর পুরনো সংবাদটি পেল, সেইদিন সারা বাংলাদেশের মানুষ পেল একটি তরতাজা সংবাদ। মাদারীপুরের হোসনাবাদ গ্রামের আব্দুল ফকির নামের প্রখ্যাত এক সাপুড়ে খুন হয়েছেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো তিনি খুন হয়েছেন নিজের মেয়ের হাতে। তার মেয়ে তাকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। হত্যার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, মেয়ের বান্ধবীকে সাপের বিষ নামানোর কথা বলে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন আব্দুল ফকির।

সংবাদটি মোটামুটি আলোচনা তুলে ফেলল দেশব্যাপী। কিছু কিছু সংবাদপত্রে লিড নিউজ হয়েছে সংবাদটি। তবে বেশিরভাগ সংবাদপত্রেই বক্স আকারে সেকেন্ড লিড নিউজ করেছে এটি। সাথে আব্দুল ফকিরের নানান কুকীর্তির খবরও ছাপা হয়েছে। মেয়ের ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবি ছাপা হয়েছে আব্দুল ফকিরের লাশেরও। তবে তার লাশের ছবি এতটাই বীভৎস যে সেটিকে পুরোপুরি ছাপা সম্ভব হয়নি। বাবার লাশ কুপিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে তার মেয়ে।

আমোদি বেগমের মৃত্যুর খবর শুনে নয়ন আর কোহিনূর ফতেহপুর ফিরছিল। তারা ফিরছিল বাসে। প্রথমে ফরিদপুর হয়ে মাদারীপুরের মোস্তফাপুর এসে নামবে তারা। সেখান থেকে নানান ঝামেলা করে পৌঁছাতে হবে ফতেহপুর। কোহিনূর কত কত বছর পর ফতেহপুর ফিরছেন। কিন্তু সেটি নিয়ে তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বাসযাত্রার পুরোটা সময় তিনি বসে রইলেন নির্বিকার, নিশ্চুপ। আরিচা ফেরি ঘাটে এসে সেদিনের সংবাদপত্রটা কিনল নয়ন। পত্রিকার ভাঁজ খুলে প্রথম পাতায় চোখ রাখতেই পুরো পাথরের মতো জমে গেল সে। পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় করে পারুলের ছবি, তার পাশে আব্দুল ফকিরের লাশের ঝাপসা ছবি। নয়ন এক নিঃশ্বাসে সংবাদটা পড়ল। তারপর ছুটে এলো বাসে। কিছুক্ষণ মায়ের পাশে বসে রইল সে।

তারপর আস্তে করে মায়ের হাতে পত্রিকাটা দিলো। কোহিনূর রাজ্যের অনাগ্রহ নিয়ে পত্রিকাটা দেখলেন। সংবাদটাও পড়লেন। তারপর পত্রিকাটা ফেরত দিয়ে দিলেন নয়নকে। কোনো কথা বললেন না। কোনো কৌতূহল দেখালেন না।

নয়ন ভারি অবাক হলো কোহিনূরের আচরণে। তারা মোস্তফাপুর এসে নামল দুপুরবেলা। এখান থেকেই ফতেহপুরের কষ্টকর যাত্রা। কিন্তু নয়নকে চমকে দিয়ে কোহিনূর বললেন, তিনি যাবেন মাদারীপুর শহরে। নয়ন কারণ জিজ্ঞেস করলেও তিনি কোনো জবাব দিলো না। তারা মাদারীপুর শহরে পৌঁছালো তারও ঘণ্টাখানেক পর। কোহিনূর মাদারীপুর কোর্টে গিয়ে তার অমল স্যারের বন্ধু সুবিমল উকিলকে খুঁজলেন। কোহিনূর জানেন এই এতবছর পরেও সুবিমল উকিলকে খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে মাদারীপুর শহরে তার পরিচিত আর কেউ নেই। সুবিমল উকিলের সূত্রে যদি পরিচিত কাউকে পেয়ে যান তিনি! কোহিনূরের ভাগ্য ভালো, সুবিমল উকিলের ছেলে অঘোর এখন মাদারীপুর কোর্টের নামকরা উকিল। তিনি কোহিনূরকে চিনলেন। অপ্রত্যাশিত রকমের আদর-আপ্যায়নও করলেন।

সেই রাতে কোহিনূর থেকে গেলেন তার বাসাতেই। সেখানে তারা থাকলেন আরো দু'দিন। যে করেই হোক পারুলের সাথে একবার দেখা করতে চান কোহিনূর। পারুল এখন আছে মাদারীপুর জেল হাজতে। তার সাথে কোহিনূর দেখা করতে চানই চান। সুবিমল উকিলের ছেলে শেষ অবধি পারুলের সাথে কোহিনূরের দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারলেন। পারুল জেলখানার গরাদের ভেতর দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কোহিনূরের দিকে। দেখা করার সময় অতি সামান্য। এর মধ্যেই কথাবার্তা যা বলার বলে ফেলতে হবে। কোহিনূর বললেন, 'আমারে তুমি চেনো? আমার নাম কোহিনূর'।

পারুল বলল, 'আপনেরে কহনো দেহি নাই। তয় আপনের নাম শুনছি'।

কোহিনূর বললেন, 'আর কিছু শোনো নাই?'

পারুল সাথে সাথে কথার জবাব দিলো না। মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। কোহিনূর এক হাতে নয়নকে টেনে কাছে নিয়ে এলো। তারপর বলল, 'এরে চেনো নাই?'

পারুল এবার ধীরে মাথা তুলল। তার দৃষ্টি অভিব্যক্তিহীন। সে বলল, 'আমি জানি'।

কোহিনূর বললেন, 'সারাজীবন এই একটা ইচ্ছা আমি নিজের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখছিলাম পারুল। আমি পারি নাই। আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি যদি তারে তোমার মতো ওই দাওখান দিয়া কোপাইতে পারতাম পারুল!'

কোহিনূরের হাত, মুখ, মুখের প্রতিটি শিরা-উপশিরা অবধি টানটান হয়ে আছে। কোহিনূর বললেন, 'আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে, নিজের মেয়ে যখন

www.boighar.com

তার প্রথম কোপটা দিলো, তখন তার কেমন লাগছে? নিজের সন্তান। তখন সে কি বলছে? সে কেমনে তাকাইছে? সে কি করছে? আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে পারুল। খুব।'

পারুল কোনো কথা বলল না। সে চুপচাপ তাকিয়ে আছে কোহিনূরের মুখের দিকে। কোহিনূর বললেন, 'আল্লাহ তারে সবচেয়ে বড় শাস্তিটাই দিছে। এর চেয়ে বড় আর কি শাস্তি সে পেত? এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছু তার জন্য ছিল না। আমি একটু তোমার পায় হাত দিয়া সালাম করতে চাই পারুল।'

পারুল যেমন ছিল, তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। জেলখানার গরাদের এপার থেকে পারুলকে ছুঁয়ে দেয়া সম্ভব না। কিন্তু কোহিনূর তারপরও হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর নিচে পায়ের দিকের লোহার গরাদ হাতে ছুঁয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমি জানি না, তোমার সাজা কি হবে। কিন্তু আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব তোমার মামলা চালাতে।'

পারুল কোনো কথা বলল না। কোহিনূরদের দেখা করার সময় শেষ হয়ে এসেছে। বার দুয়েক তাদের এসে তাড়া দিয়ে গেছে কারা পুলিশ। কোহিনূর বললেন, 'তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?'

পারুল খানিক সময় নিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, 'না'।

কোহিনূর আর কিছু বললেন না। তিনি নয়নকে নিয়ে ঘুরে বের হয়ে যাবেন, এই মুহূর্তে পারুল ডাকল, 'ভাইজান'।

প্রথমে কোহিনূর আর নয়ন কেউই যেন ঠিকভাবে বুঝতে পারল না, পারুল কাকে ডাকল। কিছুটা সময় লাগলেও নয়ন পেছন ফিরে পারুলের দিকে তাকাল। পারুল বলল, 'ভাইজান, আমারে আপনে মাফ কইরা দিছেন তো?'

নয়ন কি বলবে? পারুল হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর বলল, 'ভাইজান, এই দুনিয়ায় আপনে ছাড়া আমার আর কেউ নাই। আপনের হাতে আমি একটা জিনিস দিয়া যাব ভাইজান। আমার ফাঁসি হইলেও এই জিনিসটারে আপনে দেইখ্যা রাখবেন।'

নয়ন অবাক চোখে পারুলের দিকে তাকিয়ে রইল। পারুল বলল, 'আইজ না। আপনে আরেকদিন আমারে দেখতে আইবেন। সেইদিন আমি আপনারে বলব ভাইজান।'

পারুল কাঁদছে। নয়নের খুব ইচ্ছে হচ্ছে পারুলকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু সেটা সম্ভব না। কে জানে, সেই কারণেই কিনা, নয়ন লোহার শিকগুলো দুহাতে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

এক ভয়াবহ শূন্যতা বুকে চেপে ফতেহপুরে পৌছাল নয়ন আর কোহিনূর। মাঝখানে বার দুই বৃষ্টিতেও ভিজল তারা। ফতেহপুর নদীর ঘাটে যখন তারা

পৌঁছাল তখনও গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে নয়ন তার ব্যাগ থেকে দিন তিনেক আগে কেনা পত্রিকাখানা বের করে মায়ের মাথা মুড়িয়ে দিলো। বাড়ি অবধি পৌঁছাতে পৌঁছাতে পত্রিকাখানা ভিজে চুপসে গেছে। ভিজে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে কতকত অক্ষর, সংবাদ। পারুলের ছবি, আব্দুল ফকিরের ছবি। আর কত কি!

সেই সাথে মুছে গেছে আরো একটি সংবাদ। যেই সংবাদটি এই কদিনে কারোই চোখে পড়েনি। নয়নেরও না। ভারতের চেরাপুঞ্জিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীবাহী একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছে। তাতে মারা গেছেন এক ছাত্রীসহ তিনজন। আহত হয়েছেন প্রায় সকলেই। নয়ন যদি জানত যে হেমাও তখন চেরাপুঞ্জি এবং সংবাদটা যদি সে দেখতে পেত, তাহলে হয়তো পারুলের খবরটার মতোই প্রবল আগ্রহ নিয়েই সংবাদটা পড়ত সে। হয়তো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখত সেখানে লেখা আছে হেমার নামও। দেখে কি করত নয়ন? হেমাকে কি তার এই কয়েকদিনে মুহূর্তের জন্যও মনে পড়েছে? বা ওই ছোট্ট খবরের শিরোনাম দেখলে কি হেমার কথা তার মনে পড়ত? তারপর যদি সে সংবাদটা পড়ত, তাহলে কি করত?

কি করত সেটা জানা গেল না। কারণ অক্ষর মিশে গেছে জলে। কে জানে সেই জল কেবলই বৃষ্টির কিনা! নাকি সেখানে রয়ে গেছে ফোঁটা ফোঁটা কান্নার জলও। সেই কান্নার জল হয়তো অভিমান। সেই অভিমান চেরাপুঞ্জির কোনো এক সুউচ্চ পাহাড়ের কোনো এক কাঠের বারান্দায় বসে থাকা কোনো এক নিঃসঙ্গ মেয়ের বুকের সকল দুঃখ বয়ে এনে ঝরে পড়ছিল বৃষ্টির জল হয়ে। সেই জল হয়তো চায়নি এই অক্ষর নয়ন পড়ুক। সেই জল হয়তো চেয়েছে অক্ষরে নয়, এই ফোঁটা ফোঁটা জলের ভেতর লেখা থাকুক মানবজনম!

www.boighar.com

www.boighar.com

কোহিনূর খাঁ-বাড়িতে আসার দু'দিন হয়ে গেল। এই দুদিনে তার সাথে কারোই কোনো কথাবার্তা তেমন হয়নি। সে এসে উঠেছে তার আগের সেই ঘরেই। ঘরখানা সে যেমন রেখে গিয়েছিল, চেষ্টা করা হয়েছে তেমনই রাখতে। হয়তো তৈয়ব উদ্দিন খাঁ ভেবেছিলেন, কোনো একদিন কোহিনূর ফতেহপুর আসবেন। আর এসে তিনি যেন তার রেখে যাওয়া ঘরখানা তেমনই পান। তা ঘরখানা তেমনই আছে, কোহিনূর ঘর দেখে চমকেও গিয়েছেন। কুড়ি-পঁচিশ বছর তো কম সময় নয়! যদিও ঘরের এখানে-সেখানে কিছু কাজও করতে হয়েছে, তারপরও ঘরখানা দেখে কোহিনূর হকচকিয়েই গেলেন। যদিও বাড়ির আর কোনো কিছুই আর আগের মতো নেই। প্রথম দুইদিন কোহিনূর বাড়ি থেকে বের হলেন না। খাঁ-বাড়িতে যে একটা বড় ধরনের ওলটপালট ঘটে গেছে, তা কোহিনূর স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন। সকলের মধ্যেই একটা থমথমে ভাব। দবির খাঁর ঘটনাও কোহিনূর শুনেছেন। শুনেছেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁর কথাও। কিন্তু কোনোকিছু নিয়েই কোনো আগ্রহ দেখাননি তিনি। জন্মের পর মনিরকে বছর দশেক আগে একবার দেখেছিলেন কোহিনূর। কী এক কাজে তার বাসায় গিয়েছিল সে। সেই তাদের প্রথম আর শেষ দেখা। সেই মনিরকে নিয়ে যে খাঁ-বাড়িতে একটা গা ছমছমে ব্যাপার। তা কোহিনূর স্পষ্ট টের পেয়েছেন। টের পেলেন সেদিন বিকেলে গ্রাম দেখতে বের হয়েও। পুরো গ্রামটাই পাল্টে গেছে। কিন্তু কীভাবে পাল্টে গেছে তা কোহিনূর জানেন না।

তিনি হাঁটতে গিয়ে হুটহাট অনেক বাড়িতেই ঢুকে পড়লেন। কিন্তু তাকে বলতে গেলে কেউ সেভাবে চিনল না। আরো অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, যারা তাকে চিনল তাদের প্রায় কেউ তার সাথে আগ্রহ নিয়ে কথা বলল না। তবে তাতে যে কোহিনূরের মন খারাপ হয়েছে তা নয়। বরং প্রবল ভালো লাগা নিয়েই তিনি গ্রাম ঘুরে দেখলেন। এই ঘুরে দেখায় একটা অদ্ভুত আনন্দও রয়েছে। তিনি কিছু একটা দেখলেই চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে আজ

থেকে বহুবছর আগের কোনো একটি দিনের কথা মনে করার চেষ্টা করছেন। যেই দিন তিনি এখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন এবং অবাক ব্যাপার হচ্ছে তিনি টুপ করে সেই দিনের ছবি একদম স্পষ্ট করেই মনে করতে পারছেন। তারপর আবার চোখ মেলে তিনি মিলিয়ে নিচ্ছেন এই মুহূর্তে তার সামনের ছবিটির সাথে। খেলাটি খেলে কোহিনূর আনন্দ পাচ্ছেন। প্রবল আনন্দ। বহু বহু দিন পর কোহিনূর যেন নির্জলা আনন্দময় সময় কাটালেন।

কোহিনূরের সাথে আছে এস্কান্দার আর তার বড় ভাই খবির খাঁ। হাঁটা পথে নানান কথা হলো তাদের। কিন্তু একবারও বাবার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন না কোহিনূর। তিনি বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন ফজু ব্যাপারীর বাড়ি। কোহিনূর বাড়িতে ঢোকামাত্রই একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল সেই বাড়িতে। ফজু তাকে বসতে দিলো উঠানের মাঝখানে। তাকে ঘিরে চারপাশে বসল ব্যাপারী বাড়ির সকল গৃহস্তরা। তারা সকলেই উৎসুক হয়ে আছে কোহিনূরের কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য। কোহিনূর জানেন তারা কি শুনতে চায়। তার এই আসার অপেক্ষায়ই হয়তো অসংখ্য দিন রাত গুনে কাটিয়েছে তারা। ফজুর ভাই নজু তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। কোহিনূর তার সাধ্যমত চেষ্টাও করেছিলেন তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার। কিন্তু বছরের পর বছর তার বাবা তৈয়ব উদ্দিন খাঁ যে অন্যায় তাদের উপর করেছেন, তার কতটুকুরই বা ক্ষতিপূরণ তিনি দিতে পেরেছেন? অথচ, কোহিনূরের সব সময়ই মনে হয়েছে, ব্যাপারীদের এই ভয়াবহ অবস্থার পেছনে কোনো না কোনোভাবে দায় রয়েছে তারই। তার কারণেই খুন হয়েছেন বজলু ব্যাপারী। তারপর একের পর এক তাদের জমি দখল করেছেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁ। অনেককে ভিটেমাটি ছাড়া করেছেন। আর আজ সেই তিনিই যেন তাদের কাছে আশার শেষ এক চিলতে আলো।

কোহিনূর চুপ করে বসে সকলের মুখের অব্যক্ত ভাষা বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'মামলা-মোকদ্দমার কী অবস্থা?'

নজরুল বলল, 'আপনে তো জানেনই সব। মামলা-মোকদ্দমা আর সম্ভব না। যা আছিল সব তো হারাইলাম। আপনের বুদ্ধিমতো আপনের মায়ের ধারেই রাখতে দিছিলাম। কিন্তু সেই জিনিসও গেল, আপনের মায়ও মরল। আব্দুল ফইরও নাই। আমাগো এহন তুমি ছাড়া আর কোনো আশা নাই। চাইয়া দেহো, তোমার সামনের মানুষগুলানের মুখের দিক। সবাই এই এত বছর তোমার আশায়ই অপেক্ষা করছে।'

ফজু ব্যাপারী বলল, 'এতদিন ভাবতাম তৈয়ব উদ্দিন খাঁ কবে মরব। তারপর হয়তো আমাগো একটু আছান হইব। কিন্তু সে নিজেই তো আমাগো উপর আছান হইছিল। বলছিল কিছু জমিন লেইখ্যা দিব। দেওনের ব্যবস্থাও

করছিল। সেইটা দেইখ্যা মনির তো পারলে তহনই আমাগো জানে খুন কইরা ফালায়। এহন আমাগো অবস্থা হইছে বাঘের মুখেরতন ছুইট্টা সিংহের মুখে পড়ছি। মনির তো আর মানুষ নাই কোহিনূর, সে তো আস্তা দজ্জাল হইয়া গেছে। সে এহন কি করছে জানো?'

কোহিনূর কথা বললেন না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন ফজুর দিকে। ফজু বলল, 'তোমার বাপের জবান বন্ধ হইয়া যাওনের কয়েকদিন পর এক রাইতে সে লোকজন নিয়া আইছিল। আইসা বইলা গেছে কলসির খোঁজ যদি তারে আমরা না দেই, তাইলে সে ভিটা মাটি ছাড়া করব সবাইরে। এই গ্রামেই থাকতে দিব না। ঘরে ঘরে আগুন লাগাই দিব। কিন্তু সেই জিনিস এহন আমরা কই পাব? তোমার মায় নাই, সে সেই জিনিস কি করছে, তা তো আমরাও জানি না।'

কোহিনূর সাথে সাথে জবাব দিলেন না। খানিক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের যত জমি জোর করে ভোগদখল হয়েছে, তার সব আপনারা ফেরত পাবেন। আমি চেষ্টা করব এই এতবছরের ক্ষতিপূরণ দিতেও। এই জিনিস ফিরাই না দিয়ে আমি যাব না।'

কোহিনূরের এইটুক কথাই যেন শুকনো মুখগুলোতে প্রাণের সঞ্চার করল। যদিও সকলেরই ভয় মনিরকে নিয়ে। সেই শঙ্কার কথা অনেকে বললও। কিন্তু কোহিনূর সে বিষয়ে কোনো কথা বললেন না। তিনি বাড়ি ফিরে এলেন সন্ধ্যার আগে আগে। তারপর একা একা গিয়ে আমোদি বেগমের কবরের সামনে দীর্ঘ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো কান্নাকাটি না, কোনো কথা না। একদম নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ, নিথর এক মানুষ। কে জানে তার এই নিথর নীরবতা জুড়েই হয়তো অবিরাম বয়ে যাচ্ছিল গভীরতম প্রার্থনা।

রাতে কোহিনূরের ঘরে আসল মনির। তার চেহারায় চাপা এক বুনো হিংস্রতা। তাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বহু চেষ্টা করেও সেই হিংস্রতা সে লুকিয়ে রাখতে পারছে না। যতটা সম্ভব নরম গলায়ই সে কোহিনূরের সাথে এটা সেটা নানান কথা বলার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎই বলল, 'ফুপু, আপনে নাকি ফজু ব্যাপারীর বাড়ি গেছিলেন?'

কোহিনূর রোদে শুকাতে দেয়া কাপড় ভাঁজ করছিলেন। তিনি সেই কাপড় ভাঁজ করতে করতেই বললেন, 'হুম'।

মনির বলল, 'আপনে তাগো কি বইলা আসছেন?'

কোহিনূর বললেন, 'কত কিছুই তো বলেছি। তুই কোনটা শুনতে চাস?'

মনির বলল, 'জমিজমা ফিরাই দেওনের বিষয়ে'।

কোহিনূর বললেন, 'জমিজমার বিষয়ে শুনে তুই কি করবি?'

মনির খানিক উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমি কি করব মানে? আমি না করলে কে করব?'

কোহিনূর বললেন, 'তোর বয়স কত?'

মনির বলল, 'কেন? বয়স দিয়া কি করবেন আপনে?'

কোহিনূর কাপড় ভাঁজ করা রেখে সোজা দৃষ্টিতে মনিরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তুই কি মেয়ে-ছেলে নাকি? বয়স বলতে সমস্যা কী? ছেলেরা তো বয়স লুকায় না, বয়স লুকায় মেয়েরা। তুই মেয়ে মানুষের মতো বয়স লুকাচ্ছিস কেন?'

মনির এবার রীতিমতো ক্ষেপে গেল। সে উঁচু গলায় বলল, 'আপনে কিন্তু বেশি বেশি করতেছেন ফুপু। আমি যেইটা বলছি, আপনে সেইটার জবাব দেন।'

কোহিনূর বললেন, 'আমি বেয়াদব ছেলে পছন্দ করি না মনির। তুই আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হ। ভদ্রভাবে কথা বলতে পারার আগে আমার চোখের সামনে আসবি না। যা।'

মনির হতভম্ভ হয়ে গেল। গত কিছুদিনে সে এতটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল যে তার সাথে এইভাবে কেউ কথা বলতে পারে এটা তার কল্পনায়ও ছিল না। সে বলল, 'ফুপু, আপনে কিন্তু বেশি...'

কোহিনূর হঠাৎ ধমকে উঠলেন, 'চুপ। থাপড়ায়ে আমি তোর দাঁত ফেলে দেব। বেয়াদব জানি কোথাকার। বড়দের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় সেটাও তোকে তোর বাবা-মা শেখায় নাই? যা, এক্ষণ গিয়ে তোর আব্বাকে ডেকে নিয়ে আয়। খাঁ-বাড়ির ছেলেপেলেদের কি বেয়াদব বানানো হচ্ছে নাকি। যা। আমার চোখের সামনে থেকে যা।'

মনির কি করবে ভেবে পেল না। সে অনেক কথাই বলার চেষ্টা করছে, ভাবছে। কিন্তু কোনো কথাই সে গুছিয়ে আনতে পারছে না। কোহিনূর গলা চড়িয়ে এস্কান্দারকে ডাকলেন। তারপর বললেন, 'উকিল বাবুরে যে খবর দিতে বলছিলাম, খবর দিছ এস্কান্দার?'

এস্কান্দার বলল, 'জ্বে ফুপুজান। খবর পাঠানো হইছে। সে কাইল বেয়ান বেয়ান চইলা আসব।'

মনির বলল, 'কিয়ের উকিল? উকিল কেন?'

কোহিনূর ঠান্ডা গলায় বললেন, 'এস্কান্দার, এই বেয়াদবটাকে আমার চোখের সামনে থেকে সরাও। এক্ষুণি সরাও।'

মনির স্তব্ধ হয়ে গেছে কোহিনূরের আচরণে। কোহিনূরের প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে তার নিজেকে মনে হচ্ছে একটা ভাঁড়। তবে সে ভয়ও পেয়ে গেছে। এস্কান্দারের ভাবগতিক সুবিধার মনে হচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে সে যে-কোনো

www.boighar.com

সময় তার শরীরে হাতও তুলে ফেলতে পারে। ফণা তুলেও ছোবল না মারতে পারা সাপের মতো ফোঁসফোঁস করতে করতে বের হয়ে গেল মনির।

পরদিন ভোরে সুবিমল উকিলের ছেলে অঘোর উকিল আসলেন ফতেহপুর। তিনি খাঁ-বাড়ির কাছারি ঘরে কোহিনূরের সাথে বসেছেন। তার সাথে বসেছেন খবির খাঁ ও দবির খাঁও। খাঁয়েদের জমিজমার সকল কাগজপত্র মনিরের কাছে। কাগজপত্রের জন্য সেই সাতসকালে মনিরের কাছে পাঠানো হয়েছে এস্কান্দারকে। কিন্তু মনির আসছে না। সে আসলো আরো খানিক পর। এসেই হম্বিতম্বি শুরু করল। তাকে ছাড়া খাঁ-বাড়ির জমিজমার হিসেব নিয়ে বসার ফল ভালো হবে না, সে এসবের শেষ দেখে ছাড়বে। রক্ত বইয়ে দেবে খাঁ-বাড়ির উঠানে। এমন নানান কথা। খবির খাঁ ছেলেকে থামাতে গেলেন। কিন্তু কোহিনূর তাকে হাত ধরে বসালেন। তারপর মনিরকে নরম গলায় বললেন তাদের সাথে বসতে।

তা মনির বসলও। তবে তখনো সে সাপের মতোই ফোঁসফোঁস করছিল। কোহিনূর শান্ত ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তোকে আমি কিছু কথা বলব। মন দিয়ে শুনবি। এই মন দিয়ে শোনাটা দুইভাবে হতে পারে। এক, তুই আপোষে ইচ্ছা করে শুনবি। দুই, তোকে শুনতে বাধ্য করা হবে। এখন বল কোনটা করবি?'

মনির আবারো উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার সাথের ছেলে দুটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ছুটে এলো ঘরে। কোহিনূর এস্কান্দারকে ডেকে বললেন, 'এদের বাইরে নিয়ে যাও এস্কান্দার। প্রথমে বল এক ঘন্টার মধ্যে এরা যেন ফতেহপুর ছেড়ে চলে যায়। না হলে এদের কোমড়ের ঠিক উপরে দুটা দুটা চারটা গুলি করবি।'

মনির চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে দেখল এস্কান্দারের হাতে একটা বন্দুক। সে বন্দুক দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। ছেলে দুটি মনিরকে অসহায় অবস্থায় রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কোহিনূর বললেন, 'এবার চুপচাপ বসে পড়। আমি না বলতে বলা পর্যন্ত একটা কথাও বলবি না। মনে থাকবে?'

মনির তাও শুনল না। সে লম্ফঝম্ফ চিৎকার চেঁচামেচি করতেই থাকল। কোহিনূর আবারো এস্কান্দারকে ডাকলেন। মনির অবশ্য তাতেও দমল না। বরং তার চিৎকার-চেঁচামেচি আরো বাড়ল। এস্কান্দারকে কোহিনূর ইশারায় কি বললেন কে জানে, সে আচমকা বিরাশি শিক্কার একটা থাপ্পড় বসাল মনিরের গালে। মনির ছিটকে পড়ল ঘরের দেয়ালে। তার মাথা বনবন করে ঘুরছে। সে চোখে অন্ধকার দেখছে। কোহিনূর ইশারায় এস্কান্দারকে বললেন মনিরকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিতে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কোহিনূর বললেন, 'খাঁ-বাড়ির সব সম্পত্তির আইনগত মালিকানা কার? তৈয়ব উদ্দিন খাঁর। সে এখনো জীবিত আছে। ফলে এখনো এই সকল সম্পত্তির মালিক সে। সে যদি

মারা যায় তবে তার এই সম্পত্তির মালিকানা হবে তিনজনের। বড় ভাই, ছোট ভাই আর আমি। আমি মেয়ে হিসেবে যা পাব, তারা ছেলে হিসেবে পাবে তার দ্বিগুন। এটা হলো মুসলিম সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন। তোর বাপ খবির খাঁ যদি মারা যায়, তারপর তার সম্পত্তির দুটা সমান ভাগ হবে। এক ভাগ পাবে তোর বড় ভাই। আরেক ভাগ তুই। এখন তুই আমাকে বল, কেউ কি এখনও মারা গেছে? তৈয়ব উদ্দিন খাঁ বা খবির খাঁ? যায় নাই। তাহলে তুই এই খাঁ-বাড়ির সম্পদ নিয়ে এত হম্বিতম্বি করতেছিস কেন? মাথায় যদি বুদ্ধি না থাকে, তাইলে গায়ে শক্তি দিয়ে কাজ হয় না। আর গায়ে শক্তি না থাকলেও, মাথায় বুদ্ধি থাকলেই দুনিয়া জয় করা যায়। তোর মাথায় তো এক আনা বুদ্ধিও নাই। খালি আছে গোয়ার্তুমি আর শক্তি। আর মানুষরে ভয় দেখিয়ে সব ঠান্ডা করার গাধামি। এইখানে বড়রা মিলে খাঁ-বাড়ির দীর্ঘদিনের কিছু হিসেব-নিকেশ নিয়ে বসছে। তুই বাচ্চা মানুষ। এইগুলার মধ্যে তোর থাকার দরকার নেই। তবে তোর একটা কাজ আছে, লোকজন নিয়ে গিয়ে ছোট ভাইর বউকে, আর বাবাকে ওই বাড়ি থেকে আনার ব্যবস্থা কর। আমি এখান থেকে বের হয়ে যেন দেখি, তাদের এনে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। যা।'

মনির আর একটা কথাও বলল না। সে যেন এই এতদিনে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। কিন্তু এস্কান্দারের বিরাশি শিক্কার থাপ্পড় আর কোহিনূরের এই কয়েক মুহূর্তের বয়ান যেন তার সেই ঘোর কাটিয়ে দিয়েছে। সে যেন আবার তার সেই আগের চিরাচরিত মনিরকে তার ভেতরে টের পাচ্ছে।

প্রায় দুপুর অবধি জমিজমার হিসেব-নিকেশ চলল। আরো কিছু কাগজপত্র দরকার ছিল। সেসবের ঝামেলা মেটাতে কোহিনূরকে প্রায় মাসখানেক থাকতে হলো ফতেহপুর। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর টিপসই নিয়ে জমিজমার ভাগ বাটোয়ারাও হয়ে গেল ঠিকঠাকভাবে। নিজের ভাগের জমিজমায় কোহিনূর কম পেলেন না। তিনি তার পুরোটাই দিয়ে দিলেন ব্যাপারীদের। ফতেহপুর ছেড়ে যাবার আগের রাতে কোহিনূর দেখা করলেন তৈয়ব উদ্দিন খাঁর সাথে। পিতা-কন্যা একে অপরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন দীর্ঘ সময়। কারো কোনো কথা নেই, শব্দ নেই। নীরব নৈঃশব্দ্যের অন্তহীন সময়। কোহিনূর এক সময় তার দু'হাতের ভেতর বাবার হাত দু'খানা মুঠো করে ধরল। ধরে বসে রইল। কোহিনূরের হাতের ভেতর কাঁপছে তৈয়ব উদ্দিন খাঁর হাত। কোহিনূরের হাত জোড়াও কি থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে! কে জানে, হয়তো এই দু'জোড়া হাত গভীরতম স্পর্শে তাদের অজস্র দিনের জমানো অজস্র অব্যক্ত কথা বলে যেতে লাগল পরস্পর।

পরদিন বিকেলে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন কোহিনূর। লঞ্চ ধরতে রায়গঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার ঠিক আগমুহূর্তে দবির খাঁর স্ত্রী চুপি চুপি

কোহিনূরকে আলাদা ডেকে নিলো। যদিও কোহিনূরের বড় ভাইয়ের স্ত্রী হবার সুবাদে কোহিনূরকে তার তুমি করেই বলার কথা। কিন্তু সে তাকে আপনি করেই বলে। দবির খাঁর স্ত্রী কোহিনূরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'আপা, আপনের সাথে একখান গোপন জরুরি কথা আছে।

কোহিনূর বললেন, 'আপনের গোপন জরুরি কথাখান মনে হয় আমি জানি। মায় কি মরনের আগে গয়নার কলসিটা আপনার কাছে দিয়ে গিয়েছিল? ওই বাড়িতে?'

দবির খাঁর স্ত্রী ভারি অবাক হলো। সে বলল, 'জ্বে। উনি বলছিলেন আমারে গোপন কইরা রাখতে। কেউ তো আর চিন্তাও করব না যে ওইটা আমার বাড়িতে! কিন্তু উনি তো আর জানতেন না যে অমনে মইরা যাইবেন। এহন আমি পড়ছি বিপদে, ওই কলসি আমি কি করব! কার কাছে দিব!'

কোহিনূর ভেতরে ভেতরে খুব অবাক হয়েছে। চমকে গিয়েছে ভীষণ। কিন্তু সে তা প্রকাশ করল না। সে বলল, 'কলসিটা এহন কই আছে?'

দবির খাঁর স্ত্রী বলল, 'ওই বাড়িতে মাটির চুলা বানানির আগে চুলার নিচে গর্ত কইরা সেইহানে রাখছি। এহন ওই জিনিস কি করব আপা?'

কোহিনূর বললেন, 'এক কাজ করেন, ফজুকে ডেকে দিয়ে দেন। ওকে বলেন, ও চাইলে মাদারীপুর শহরে গিয়ে অঘোর উকিলের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কোনো কর্মকর্তার কাছে জমা দিয়ে দিতে পারে।'

দবির খাঁ স্ত্রী বলল, 'আইচ্ছা আপা। আমি আইজকাই বলব।'

কোহিনূর বিদায় নিয়ে চলে গিয়েও কি মনে করে আবার ফিরে এলো। তারপর দবির খাঁর স্ত্রীকে হঠাৎ দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। মেয়েটা তাকে চমকে দিয়েছে। ভীষণ চমকে দিয়েছে!

পারুলের কি ফাঁসি হবে?

পারুল তার স্বল্পজ্ঞানে যা বোঝে, তাতে সে জানে খুন করলে ফাঁসিই হয়। তবে খুনি যে খুন করেছে তা প্রমাণে আদালতে দুই পক্ষের উকিলদের নানান যুক্তি তর্ক, তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। কিন্তু পারুল এসবের কিছুই চায় না। তাছাড়া এসবের দরকার আছে বলেও তার মনে হয় না। পারুল যে খুন করেছে, সেটা অনেকটা প্রকাশ্যেই এবং তা সে স্বীকারও করেছে। যে রাতে লতাকে সাপে কাটল, সে রাতে পারুল বাড়িই ছিল। তাকে খবর দিলো রতন। খবরটা পেয়েই পারুলের বুকের ভেতর ধক করে উঠল। সেদিন রাতে তাদের বাড়ি থেকে লতা যে হঠাৎ চলে গেল, তারপর সে আর আসেনি। বিষয়টি নিয়ে পারুলের মনটা কেমন খচখচ করছিল। কিন্তু নিজে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল বলেই এই নিয়ে লতাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি পারুল। তারপর এই গতকালই লতাদের বাড়িতে গিয়েছিল পারুল। এ কথা সে কথার পর পারুল সেদিনের ঘটনা জানতে চাইল। লতা অবশ্য সাথে সাথেই বলল না। দীর্ঘ সময় সে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ পারুলকে ধরে কেঁদে ফেলল লতা। ঘটনা শুনে পারুল স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। তার মনে হচ্ছিল সামনে পেলে সে এই মুহূর্তে আব্দুল ফকিরকে খুন করে ফেলতে পারে। পারুল কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না যে একটা মানুষ কতটা জঘন্য, কতটা বিকৃত মস্তিষ্কের হলে নিজের মেয়ের বান্ধবীর সাথে এমনটা করতে পারে! সেই থেকে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল পারুল।

লতার সাপে কাঁটার খবর শুনে প্রথমেই তাই তার মাথায় ঢুকে গেল আব্দুল ফকিরের কথা। নিশ্চিত করেই আব্দুল ফকিরই যাবেন লতার বিষ নামাতে। এরপরের ঘটনা পারুল আর ভাবতে পারছিল না। ভেতর ভেতর যে রাগটা এই এতদিনে নানান ঘটনায় একটু একটু করে জমছিল, সেদিন এসে তা যেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি হয়ে টগবগ করে ফুটতে লাগল। সে এক কাপড়ে ছুটে গেল লতাদের বাড়িতে।

www.boighar.com

লতাকে সাপে কাঁটার ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। সে রান্নাঘরে কুপির আলোয় রান্না করছিল। চুলার একপাশে শুকনো খড়ি স্তুপ করে রাখা। লতা খানিকটা আনমনা হয়েই ছিল। না চাইলেও তার মাথায় সারাক্ষণ আশিকের স্মৃতিই ভাসে! চুলায় খড়ি ঠেলে দিতে দিতে সে খেয়াল করল খড়ি শেষ। সে বা দিকে হাত বাড়িয়ে স্তুপ করে রাখা খড়ি থেকে একটা খড়ি টেনে বের করল। খড়িটা টেনে বের করার সময়ই সে টের পেয়েছে কিছু একটা প্রচণ্ড তীক্ষ্ণতায় তার হাত ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু সে তখনও তাকিয়ে ছিল চুলার দিকেই। আনমনা লতা আরেকখানা খড়ি টেনে বের করতে গিয়েই হঠাৎ কি ভেবে তাকাল! আর ঠিক তখনই সে সাপটাকে দেখতে পেল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, সাপটা দ্বিতীয়বারের মতো ছোবল মারল তার হাতে। ঘটনা বুঝতে সামান্য সময় লাগল লতার। সাপটা তখনও ফণা তুলে ফুসছিল। ভয়াবহ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল লতা। লতার মা বাড়িতে নেই। তিনি গিয়েছেন রায়গঞ্জে। চিৎকার শুনে দৌড়ে ছুটে এসেছেন তার বাবা। তিনি এসে দেখলেন লতা সাপ সাপ বলে চিৎকার করছে। এবং সাপটা তখন রান্না ঘরের বেড়ার নিচ দিয়ে হিশহিশ শব্দ তুলে বের হয়ে যাচ্ছিল। ঘটনা আব্দুল ফকির অবধি পৌঁছাতে সময় লাগল না। তিনি ছুটে এলেন চোখের পলকে।

তারপরের ঘটনাগুলো আরো অনেক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। লতাকে কালসাপ কেটেছে বলে বিষ নামানোর জন্য ঢোল-বাদ্য নিয়ে উঠানে বিশাল আয়োজন শুরু হলো। লতার মাথা তখনও ঝিমঝিম করছিল। সে চোখে ঝাপসা দেখছিল। মনে হচ্ছিল তার বাঁ-হাতখানার ওজন অনেক বেড়ে গেছে। প্রচণ্ড ভারি হাতখানা সে যেন তুলতে পারছিল না। কিন্তু লতার মস্তিষ্কের আরেকটি অংশ তখন ভাবছিল অন্য কথা। আব্দুল ফকির তার বিষ নামাতে এসেছে, এবং তাকে উঠানের পাশে দুই দিন দুই রাত থাকতে হবে শোনামাত্রই লতার চোখে ভেসে উঠেছিল সেই রাতের অন্ধকারে পারুলদের পুকুর ঘাটের ঘটনা। আর সাথে সাথেই তার কেন যেন মনে হলো, এ সকলই আব্দুল ফকিরের সাজানো কোনো ঘটনা নয়তো? আব্দুল ফকির সম্পর্কে নানান সময় নানান কথাবার্তা তার কানেও এসেছে। এমনটাও ফিসফাস শোনা যায় যে আব্দুল ফকির তার পোষা বিষদাঁতহীন সাপও নাকি অনেকের বাড়ি ঘরে ছেড়ে দিয়ে আসেন। কিন্তু পারুলের বাবা বলেই সে সকল কথায় এতদিন কখনোই কান দেয়নি লতা।

তাছাড়া চোখের সামনে অমন ভয়ালদর্শন সাপ কামড়ালে তা নিয়ে সন্দেহ করার দুঃসাহসই বা কে দেখায়! প্রচণ্ড আতঙ্কে লতার যেমন মূর্ছা যাওয়ার মতো অনুভূতি হচ্ছিল, একইসাথে তার মনে হচ্ছিল সাপটি আব্দুল ফকিরের অমন কোনো পোষা নির্বিষ সাপ নয়তো! হয়তো সেই রাতের শোধ নিতেই তিনি অন্ধকারে ওই মুহূর্তেই সাপটা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তাদের রান্না ঘরে!

লতার হাতে শক্ত করে বাঁধ দেয়া হয়েছে। তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে পারুল। লতা হঠাৎ পারুলের দু'হাত খামচে ধরে কেঁদে ফেলল। পারুল অবশ্য কিছুই বলল না। কিন্তু সেই সারাটা রাত সে জেগে রইল উঠানে। ঘটনা ঘটল দ্বিতীয় দিন শেষ রাতে। হোগলা পাতায় ঘেরাও দেয়া ঘরখানা ধূপের ধোঁয়ায় ভরে গেল। সেই ধোঁয়ার সাথে বিকট গন্ধও ভেসে আসছিল। পারুল যেন লতার গোঙানিও টের পাচ্ছিল। বাড়ির আর সকলেই তখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ঘুমে ঢুলুঢুলু। পারুল জানে না কেন, সে দৌড়ে রান্না ঘর থেকে খেজুর গাছ কাঁটার লম্বা দা খানা নিয়ে এসে ঢুকে পড়ল ঘরে। লতার মুখে একখানা গামছা ঢোকানো। তার হাত দু'খানা বাঁধা। তার ঊর্ধাঙ্গে কাপড় থাকলেও নিম্নাঙ্গের কাপড় অর্ধেকটা নামানো। পাশেই একটা ডালা খোলা বাক্স। সেই বাক্সের ভেতর থেকে ফণা তুলে আছে একটা সাপ। পারুল যেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ সময়ে তার মাথায় খুন চেপে গেল। তারপরের ঘটনা পারুল নিজেও বলতে পারবে না। সে যখন রক্তমাখা দা-খানা নিয়ে ঘর থেকে বের হলো ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে। শরীর থেকে মাথাটা আলাদা হবার আগ অবধি পারুল মুহূর্তের জন্যও থামেনি। সে যখন পেছন থেকে আব্দুল ফকিরের ঘাড়ে প্রথম কোপটা বসাল, আব্দুল ফকির তখন হতবুদ্ধ অবস্থায় পেছন ফিরে তাকিয়েছিলেন। তার চোখভর্তি তখন আতঙ্কের চেয়েও বেশি অবিশ্বাস। তিনি একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, 'মাগো...'। পারুল পরের কোপটা বসিয়েছিল তার মুখে। ওই মুখে সে আর কোনোদিন মা ডাকটা শুনতে চায়নি।

দুপুর নাগাদ লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল লতাদের বাড়ি। পুলিশ, সাংবাদিকে ভরে গিয়েছিল উঠান। এই পুরোটা সময় পারুল রক্তমাখা শরীরে বসেছিল। পারুলই যে আব্দুল ফকিরের খুনি, তা হাজার হাজার মানুষ দেখেছে, সাংবাদিকরা দেখেছেন। ফলে আলাদা করে প্রমাণের কিছু নেই। পারুল অবশ্য তার ফাঁসি নিয়ে ভীতও নয়। তবে সে একটা আশা নিয়ে অপেক্ষায় আছে, রাজীব কি তাকে একবারের জন্যও দেখতে আসবে না? সে জানে, এই সংবাদ দেশের সব মানুষ জানে। নিশ্চয়ই রাজীবও জানে। সে কি আসবে না পারুলকে দেখতে? পারুলের দৃঢ় বিশ্বাস রাজীব তাকে দেখতে আসবে, আসবেই। আজ, অথবা কাল, অথবা পরশু। সে আসবেই। এই অপেক্ষায়ই পারুলের দিন কাটে।

এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। মহিলা বিষয়ক বেসরকারি একটি আইনি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পারুলের মামলাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত করার জন্য উচ্চ আদালতে রিট করল। এই বিষয়ে তারা উচ্চ আদালতের বিশেষ দৃষ্টি কামনা করছে। তাদের মতে এই খুনের পেছনের ঘটনাগুলো যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা উচিত। শুধু তাই-ই নয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আব্দুল

www.boighar.com

ফকির সম্পর্কে নানান অনুসন্ধানী চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন একের পর এক প্রকাশ হতে লাগল। বিষয়টি নিয়ে সকল মহলেই একটা আলাদা কৌতূহল তৈরি হলো। বেসরকারি সংস্থাটির মতে পারুলের মানসিক সুস্থতা এবং এর পেছনে ঘটা নানান ঘটনার সঠিক তদন্তে মামলাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত করা জরুরি। সংস্থাটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত মামলাটি ঢাকায় স্থানান্তরের জন্য রুল জারি করল। ২০১৫ সালের ১৯ নভেম্বর পারুলকে প্রিজন ভ্যানে ঢাকায় নিয়ে আসা হলো।

পারুল শেষ অবধি ঢাকায় এলো। তার আজন্ম স্বপ্নের শহর ঢাকা। ঢাকা শহরে তখন নিয়ন আলো জ্বলছে। লাল-নীল রঙের আলোয় ঝলমল করছে সুউচ্চ শপিংমল। রিকশায় টুংটাং শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে প্রেমিক প্রেমিকারা। ঠিক সেই মুহূর্তে পারুলের স্বপ্ন সত্যি হলো। প্রিয়তম ঢাকা, স্বপ্নের ঢাকা, আজন্মের আরাধ্যতম শহর ঢাকায় শেষ অবধি পারুল এলো। কিন্তু প্রিজন ভ্যানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সুউচ্চ জানালা দিয়ে সেই ঢাকা দেখার সুযোগ পারুলের হলো না।

পারুলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের তরফ থেকে মামলা দায়ের করা হলো। যদিও চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ড এবং তার এই মামলা নিয়ে নানা মুখে নানান কথা ছড়াতে লাগল। পত্রিকা-টেলিভিশন বেশ কিছুদিন এই নিয়েই সরব হয়ে রইল। কিন্তু একদম চুপ হয়ে রইল যে, তার নাম পারুল। সে এই নিয়ে কোথাও কিছু বলল না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেয় না। নিজ থেকেও কোনো কথা বলে না। আইনি সহায়তা প্রদানকারী বিভিন্ন সংগঠন পারুলকে আইনি সহায়তা দিতে চাইলে পারুল তা নিয়েও কোনো আগ্রহ দেখাল না। সে এই মামলা লড়তে চায় না। তবে তার কিছু বিশেষ কথা রয়েছে। সেই এই কথা বলতে চায় নয়নকে। নয়নের সাথে পারুলের দেখার ব্যবস্থাও করা হলো। পারুলের সাথে দেখা করতে এসে প্রথমদিনই পারুলের মুখ থেকে নয়ন যে সত্যটি আবিষ্কার করল, তার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। তবে নিজেকে সামলে নিয়ে নয়ন শেষ শেষ অবধি পারুলকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আইনি সহায়তা নিতে রাজি করিয়ে ফেলল। আইনি সহায়তা দিলো নারী বিষয়ক আইনি সহায়তা প্রদানকারী সেই প্রতিষ্ঠানটিই। এই নিয়ে শেষ ক'টা মাস দিশেহারা হয়ে রইল নয়ন। তবে সেই দিশেহারা সময়েও পারুলের মুখ থেকে শোনা কথাটিকে মুহূর্তের জন্যও মাথা থেকে তাড়াতে পারল না নয়ন। পারুল অন্তঃসত্ত্বা! পারুল নয়নের কাছে কিছু লুকায়নি। রাজীবের সাথে পরিচয় থেকে শুরু করে পুরো ঘটনাই সে খুলে বলেছে নয়নকে।

ঘটনা শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল নয়ন। বাসায় ফিরে সেদিন আর কোনো কাজে মন বসাতে পারেনি সে। হাজারটা উদ্ভট চিন্তা গিজগিজ করতে থাকল মাথায়। রাতে ঘুমাতে গিয়ে অন্ধকার ঘরে নয়নের কেন যেন মনে হতে লাগল, এই জগৎ আসলেই একটা চক্রের মতো। সেই চক্র ঘুরে ফিরে আবার একই জায়গায় ফিরে আসে। মাঝখানে শুধুই সময়ের ব্যবধান। সময় ছাড়া আর সকলই এক ও অভিন্ন। সময় চলে গেলেও এই জগতের গল্পরা কোথাও চলে

www.boighar.com

যায় না। তারা থেকে যায়। সকল গল্পরা কোনো না কোনোভাবে একইরকম থেকে যায়। সেই তো ঘুরে ফিরে আনন্দ আর দুঃখের গল্প। ভালোবাসা আর ঘৃণার গল্প। পাপ আর পূণ্যের গল্প। ঠকানো এবং ঠকে যাওয়ার গল্প। গল্পের উপস্থাপন আর চরিত্ররা কেবল সময়ভেদে বদলায়। গল্প বদলায় না।

এই যে পারুল, এই যে নয়ন, হেমা, রেণু, নুরুন্নাহার, লতা, আসলাম সাহেব, এই যে কোহিনূর, তৈয়ব উদ্দিন খাঁ, আব্দুল ফকির, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া রাজীব কিংবা পারুলের গর্ভে বেড়ে ওঠা এক মানবভ্রুণ, এরা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র, কিন্তু এদের জীবনের গল্পে এরা যেন কেউ না কেউ, কোনো না কোনোভাবে অন্য কারো প্রতিচ্ছবি।

নয়নের মনে হয়, পারুলের গর্ভের ওই মানব ভ্রুণের সাথে সে যেমন তার মিল খুঁজে পায়, তেমনি মিল খুঁজে পায় খবির খাঁ কিংবা দবির খাঁর সাথেও। তৈয়ব উদ্দিন খাঁর মতো একজন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী পিতার সন্তান হয়েও সারাজীবন যেন তারা হয়েছিলেন নয়নের মতোই পিতৃপরিচয়হীনই। নিজের রক্তের হওয়া সত্ত্বেও তৈয়ব উদ্দিন খাঁ নিজেই যেন কখনোই তাদের তার নিজে সন্তান বলে স্বীকার করে নেননি। কোহিনূর, রেণু, নুরুন্নাহারের জীবনের গল্পগুলোও কোথাও না কোথাও গিয়ে এক। বরং এই সকল গল্পে আলাদা করেই আলো ছড়ান যেই মানুষটা, তিনিই রয়ে যান সবচেয়ে আড়ালে। ফখরুল আলমের দিকে তাকালে নয়নের ভারী অবাক লাগে। কী গভীর, কী নিঃশব্দ, কী নিঃসংশয়!

সময় যে জীবনের চক্রে বয়ে চলে মানুষের গল্প, তাতে কি পাপ-পুণ্যের হিসেব হয়? কর্ম কি ফল হয়ে ফিরে আসে পার্থিব জীবনেই? নয়ন জানে না, যদি তাই হয়, তবে কি আব্দুল ফকিরের কর্ম ফিরে এলো পারুলের জীবনের গল্পে? কিন্তু তা কেন হবে? এ ভারি অন্যায়! নয়ন হিসেব মেলাতে পারে না। কোহিনূর, হেমা, লতা কিংবা নুরুন্নাহারের জীবনের গল্পে ফিরে এসেছে কার গল্প? আমরা কি তবে জীবন জুড়েই তবে পুরনো খেরোখাতার হিসেব মেটাই? পরিচয়ের হিসেব? কর্মের হিসেব? নাকি সবই বিভ্রম? সবই শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় এক অর্থহীন যাত্রা? www.boighar.com

এ বড় অদ্ভুত হিসেব-নিকেশ। এ মেলাতে যাওয়া বড় কষ্টের। তবে নয়নের শেষ অবধি মনে হয়, জীবনের গল্পগুলো জুড়ে কেবলই আত্মপরিচয়ের সংকট। সেই পরিচয় সংকট কারো জন্মের, কারো বংশের, কারো 'নিজ' বা 'অন্যে'র, কারো ধর্মের, কারো কষ্ট বা আনন্দের, কারো প্রাপ্তি বা হারানোর। কারো ঘৃণা কিংবা ভালোবাসার। কেবলই পরিচয় সংকট। এ জীবন যেন কেবলই পরিচয় সঙ্কটে দিশেহারা মানুষের পরিচয় খুঁজে বেড়াবার গল্প।

মাঝখানে কেবল সময়ের ব্যবধানে এই গল্পগুলোই ঘুরে ফিরে চলতে থাকে। সেই একই গল্প। অবিরাম অনন্তকাল। কিন্তু সেই সকল গল্পই সকলের জানা থাকে না। একেকজন কেবল তার নিজের জীবনের গল্পগুলোই জানে। বাদবাকি মানুষের কষ্টের, অপ্রাপ্তির, সঙ্কটের গল্পগুলো তার কাছে রয়ে যায় অজানা। আর এই বাদবাকি গল্পগুলো অজানা রয়ে যায় বলেই, জগতের সকল মানুষই তার নিজেকেই ভাবে সবচেয়ে দুঃখী, সবচেয়ে বড় পরিচয় সঙ্কটে ভোগা, ভাগ্যাহত মানুষ। অথচ সে জানে না, তার ঠিক পাশের মানুষটিই কি অনন্ত দুঃখগাঁথা বুকে বয়ে বেড়ায়।

এমন করেই জগতের কত কত গল্প যে রয়ে যায় আড়ালে-আবডালে! সেই সকল গল্পগুলো কেবল থেকে যায় সেই একজন কিংবা দু'জন মানুষের বুকের ভেতর সঙ্গোপনে।

পারুল জেলখানার নিয়ম-কানুন জানত না বলেই তার ভয় ছিল, তার সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখবার আগেই তার ফাঁসি হয়ে যাবে না তো! নয়ন অবশ্য তাকে আশ্বস্ত করেছে, এমন কিছুই হবে না। পারুল খুব করে কেঁদেছে নয়নের সামনে। কতবার যে সে ক্ষমা চেয়েছে! হাতজোড় করে অনুনয় বিনয় করেছে। নয়ন মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। কী যে অসহায় লাগে তার!

নয়নের মাঝে-মধ্যে মনে হয়, এই খুনটা তো পারুলের না, তার নিজের করার কথা ছিল। কিন্তু খুনটা করল পারুল। পারুল যেন তার হয়েই খুনটা করে দিলো। তাহলে পারুল কেন ফাঁসিতে ঝুলবে? ফাঁসিতে ঝোলার কথা তো তার। এই একই কথা মনে হয় কোহিনূরেরও। এই খুনটা হয়তো করার কথা ছিল তারও। কিংবা কে জানে, হয়তো আরো অসংখ্য মানুষের! কিন্তু সেই অসংখ্য মানুষের হয়ে খুন করে পারুল একা কেন শাস্তি ভোগ করবে!

কোহিনূর দিনরাত এখানে-সেখানে ছুটলেন। ছুটল নয়নও। দিনের পর দিন। এর মধ্যে পারুল আইন সহায়তাকারী সংস্থাটিকেও জানাল তার গর্ভে সন্তান থাকার কথা। সন্তানের পিতার পরিচয়ে সে রাজীবের বিষয়ে কিছু জানাল না। পারুল চায় না রাজীবকে জোর করে কেউ খুঁজে বের করুক। তার দৃঢ় বিশ্বাস রাজীব একদিন সত্যি সত্যিই ফিরে আসবে। রাজীব নিশ্চয়ই এখন জানে, পারুল কোথায় আছে? কারণ পারুলকে নিয়ে দিনের পর দিন গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। পারুলের ধারণা, তার ফাঁসির আগ মুহূর্তে হলেও রাজীব ফিরে আসবে। একবারের জন্য হলেও সে আসবে। সে পারুলের সাথে দেখা করবেই।

পারুল অবশ্য তাদের জানিয়েছে, সন্তানের বাবা মধ্যপ্রাচ্যে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ। এই অবস্থায় তার সন্তানের সকল দায়িত্ব সে দিয়ে যেতে চায় নয়নকে। পারুল এবং নয়ন, তাদের দুজনেরই ধারণা ছিল, বিষয়টি নিয়ে

www.boighar.com

নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো আইনি ঝামেলা পোহাতে হবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। বরং সংস্থাটি পারুলের ইচ্ছেকেই প্রাধান্য দিলো এবং বিষয়টি তারা যথাযথ নিয়মানুসারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও জানাল। কর্তৃপক্ষ জানাল বাবা যেহেতু নিখোঁজ, মা চাইলে নির্ভরযোগ্য যে কারো কাছেই তার সন্তানের দায়িত্ব দিতে পারেন।

রেণু রোজ হেমাকে ডাকেন। প্রথমে নিঃশব্দে। তারপর ফিসফিস করে। তারপর সশব্দে। তিনি হেমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকেন, 'হেমা, মাগো। ও মা। মারে'।

হেমা অবশ্য মায়ের ডাকের জবাব দেয় না। সে কেবল ঘুমায়। একটানা নিসাড় ঘুম। এই ঘুম সে গত চারমাস ধরে ঘুমাচ্ছে। ডাক্তারী পরিভাষায় এই ঘুমকে বলে কোমা। এই ঘুমের মধ্যে মানুষের কোনোরকম অনুভূতি থাকে না। শরীরে প্রাণ থাকলেও তার মস্তিষ্ক হয়ে যায় অচেতন। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, কোমায় চলে যাওয়া মানুষের মস্তিষ্ক আবার চেতনা ফিরে পেতেও পারে। চেরাপুঞ্জির ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় হেমার মৃত্যু হয়নি, তবে যা হয়েছে তা মৃত্যুর চেয়ে কম কিছু নয়। ভারত থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে তিন মাস পর। কিন্তু আসলেই কি হেমাকে নিয়ে আসা হয়েছে? নাকি নিয়ে আসা হয়েছে অন্য কাউকে?

ডাক্তারদের মতে, এই অবস্থা থেকে হেমার ফিরে আসার সম্ভাবনা যে একদমই নেই, তা নয়। তবে তা অনেকক্ষেত্রেই নির্ভর করছে দৈবের উপর। তাছাড়া তার শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াও স্বাভাবিক রয়েছে। যদিও ডাক্তাররা বলেছেন, কোমা হলো এমন একটি শারীরিক অবস্থা যার উপরের মেডিকেল সায়েন্সের পুরোপুরি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে তাদের পক্ষে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলাও সম্ভব নয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস বলে, বছরের পর বছর কোমায় থেকে অনেক রোগী শেষ অবধি পুরোপুরি মৃত্যুবরণ যেমন করেছেন, তেমনি কেউ কেউ আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বেঁচেও উঠেছেন। তবে এই অনির্দিষ্ট সময়ের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিতে পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রাণঘাতী ইনজেকশনের মাধ্যমে কোমায় থাকা রোগীর পুরোপুরি মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য রোগীর আত্মীয়-স্বজনের পূর্ণ অনুমতি থাকতে হয়। আসলাম সাহেব হেমাকে

www.boighar.com

নিয়ে আসলেন দেশে। দুর্ঘটনার খবর শুনে তিনি আর রেণু ছুটে গিয়েছিলেন ভারতে। দেশে ফিরে আসলাম সাহেব দুম করে তার বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন। তিনি জানেন, তার এই মুহূর্তে টাকা দরকার। অনেক টাকা।

আসলাম সাহেব শান্ত, ধীর স্থির। তিনি কারো সাথে এই নিয়ে খুব একটা কথাবার্তা বলেন না। রেণুর মতো পাগলপ্রায় আচরণও তিনি করেন না। তিনি সারাক্ষণ একদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রেণু মাঝে-মধ্যে যখন পাগলামীর সীমা ছাড়িয়ে যান, তখন আসলাম সাহেবকে খানিক সচল হয়ে উঠতে দেখা যায়। তখন তিনি শক্ত হাতে রেণুকে বুকের সাথে চেপে ধরে হেমার বিছানার পাশে বসে থাকেন। রেণু একনাগাড়ে কাঁদতে থাকেন। অঝোরে, অক্লান্ত, বিরামহীন সেই কান্না নিঃশব্দ।

দৃশ্যটি অদ্ভুত! ডিভোর্স হয়ে যাওয়া এক দম্পতি তাদের মৃতপ্রায় অচেতন সন্তানের পাশে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকেন। পঁচিশ বছরের সুদীর্ঘ দূরত্ব, সুদীর্ঘ সময় সকলই যেন ঘুঁচে গেল এক মুহূর্তেই। সেইসব সময়ের অজস্র চেষ্টার গল্প, অজস্র বিনিদ্র রাত্রির অপেক্ষার গল্প, ঘৃণা, ভালোবাসা, আকুলতার সকল গল্প ব্যর্থ করে দিয়ে তারা যখন কাগজ-কলমে সই করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, তখন এই একটিমাত্র অপেক্ষা, এই একটিমাত্র ব্যাকুলতা তাদের কাছে নিয়ে এলো। কিংবা মাতৃত্ব আর পিতৃত্বের ব্যাখ্যাতিত এক অনুভূতি যেন সব ছাড়িয়ে হয়ে উঠল একমাত্র সত্য।

গত পঁচিশ বছরের আর সকল কিছু অর্থহীন হয়ে গিয়ে তাদের সামনের এই একটিমাত্র মানবজন্মই শেষ অবধি হয়ে উঠল সবচেয়ে বেশি অর্থময়। হেমার এই মৃতপ্রায়, অচেতন, নির্জীব মানবজন্মটিই কেমন করে বাঁচিয়ে তুলল পঁচিশ বছর ধরে মৃত, অচেতন, নির্জীব হয়ে পচে গলে শেষ হয়ে যাওয়া একটি সম্পর্ককে।

কী অদ্ভুত এই হিসেবের গল্প, কী রহস্যময় এই জীবন, কত কত মৃত্যুর মধ্যেও লেখা থাকে কত কত পুনরুজ্জীবনের গল্প।

আসলাম সাহেবের মাঝে-মধ্যে মনে হয়, হেমা সব টের পাচ্ছে। সে সব বুঝতে পারছে। তিনি বারকয়েক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেসও করেছেন। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন, হেমা কিছু শুনতে পায় না। কিছু বুঝতে পারে না। হেমার ফিরে আসার বিষয়েও তারা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না। কিন্তু আসলাম সাহেব ডাক্তাদের এই কথা বিশ্বাস করেন না। তার ধারণা হেমা সুস্থ হয়ে উঠবে। নিশ্চিত করেই সুস্থ হয়ে উঠবে। তিনি রোজ সংবাদপত্র, ইন্টারনেট খুঁজে খুঁজে কোমা থেকে ফিরে আসা মানুষদের খবর বের করেন। সেদিন জিজাস আপারিচো নামের এক স্প্যানিশ কিশোরের খবর বের করলেন। ছেলেটি ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কোমায় চলে গিয়েছিল।

ডাক্তাররাও বলে দিয়েছিলেন, এই কিশোর আর কখনো এই কোমা থেকে ফিরবে না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে এগারো বছর পর সে সেই কোমা থেকে ফিরে এসেছে এবং এখন সুস্থ মানুষের মতই জীবনযাপন করছে।

শুধু তাই-ই না, দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরও কোমা থেকে জেগে উঠেছে, এমন ঘটনাও রয়েছে। একটা দুটা না, আসলাম সাহেব এমন অসংখ্য সংবাদ খুঁজে বের করেছেন। তিনি যে শুধু এই সংবাদগুলো খুঁজে বের করেছেন তাও না। তিনি এগুলো প্রিন্ট করে যত্ন করে একটা ফাইলে রেখে দিয়েছেন। কেউ আসলেই তিনি সেই ফাইল খুলে একটা একটা করে সংবাদ দেখান। তারপর পড়ে পড়ে শোনান। তারপর বলেন, 'আমার হেমা ভালো হয়ে যাবে। আমার হেমা ভালো হয়ে যাবে। একদম সুস্থ হেমা।'

এইসময় আনন্দে তার মুখ ঝলমল করে ওঠে। চোখ চকচক করে ওঠে। অভ্যাগতরা আসলাম সাহেবের মুখের দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকেন। আসলাম সাহেবের হাসি-হাসি মুখ হঠাৎ মলিন হয়ে যায়। তিনি খানিক স্তিমিত গলায় বলেন, 'কী? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো? আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন, এই দেখুন, এইখানে কি লেখা আছে, দেখুন।'

সকলেই আসলাম সাহেবের হাতের প্রিন্ট করা কাগজের দিকে তাকান। কিন্তু ওই তাকানো অবধিই। তাদের চোখের দৃষ্টিতে কোনো আগ্রহ থাকে না। আসলাম সাহেব আবারো উচ্চঃস্বরে পড়তে থাকেন। কিন্তু তার সেই পড়া কেউ শোনে বলে মনে হয় না।

ডাক্তাররা বলেছেন, আসলাম সাহেব চাইলে হেমাকে বাসায়ও নিয়ে যেতে পারেন। হাসপাতালের কেবিনে রেখে রেখে গুচ্ছের টাকা খরচ করার কোনো মানে নেই। এখানে হেমার আলাদা কোনো চিকিৎসারও দরকার নেই। সে এক গভীর ঘুমে। এই ঘুমের মধ্যে তাকে সময়মতো নল দিয়ে খাওয়াতে হয়, আর বিশেষ ব্যবস্থায় বাথরুম করাতে হয়। এইটুকুই যা ঝক্কি। বাদবাকি সময়টা সে পড়ে থাকে মৃতের মতো। কিংবা গভীর ঘুমে ডুবে থাকা মানুষের মতো। এখন শুধু অপেক্ষার সময়। হয়তো কোনো একদিন সে তার এই অচেতন অবস্থা থেকে জেগে উঠতেও পারে! তবে সে সম্ভাবনা নিয়ে জোর দিয়ে কিছু বলতে পারেন না ডাক্তাররা। এমন অবস্থা থেকে ফিরে আসার ঘটনা খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু আসলাম সাহেব ডাক্তারদের কথা শোনেননি। তিনি হেমাকে রেখে দিয়েছেন হাসপাতালের কেবিনেই। তার দৃঢ়বিশ্বাস, হেমা ফিরে আসবে, আসবেই।

রেণু যখন তখন কাঁদেন। এই সময়ে আসলাম সাহেব রেণুকে নানান কথা বলে শান্ত্বনা দেন। তবে সবচেয়ে বেশি যেটি করেন, তা হলো তিনি তখন খুব আগ্রহ নিয়ে রেণুকে পত্রিকার সংবাদগুলো পড়ে শোনান। রেণু কাঁদতে কাঁদতে

সেই সংবাদ শোনেন। শুনতে শুনতে তার মনে হয়, হয়তো কাল সকালেই হেমা সুস্থ হয়ে উঠবে। সে ঘুম থেকে উঠে বলবে, 'মা বাইরে নিশ্চয়ই আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছে। আমি এখনই বাসায় যাব। আমাকে কড়া করে এক কাপ কফি বানিয়ে দিবে। আমি বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখব। বৃষ্টি দেখতে দেখতে কফি খাবো। আচ্ছা মা, সজনে গাছটার পাতাগুলো কি বৃষ্টি পড়লে এখনো আগের মতো সবুজ হয়?'

রেণু এই সময়ে মনে মনে হেমার সাথে কথা বলেন। কথা বলতে গিয়ে তিনি নানান মিথ্যে কথাও হেমাকে বলেন। হেমাকে তিনি এখনও একবারও বলেননি যে তার বাবা তার চিকিৎসার খরচ চালাতে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন। এই কথা তিনি হেমাকে বলবেনও না। রেণু মনে মনে ঠিক করে রেখছেন, হেমা সুস্থ হয়ে উঠলেই তারা তাদের আগের ফ্ল্যাটটাই নতুন বাড়ির মালিকের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে নিবেন। হেমাকে তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে দিবেন না যে এই বাড়িটা আর তাদের নেই।

নয়ন যেদিন হেমাকে দেখতে এলো, সেদিন সত্যি সত্যিই তুমুল বৃষ্টি। সে সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই এলো। নয়ন দাঁড়িয়ে ছিল ভেজা কাপড়ে। আসলাম সাহেব অনেকক্ষণ নয়নের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এতদিনে এলে?'

নয়ন আসলাম সাহেবের কথার কোনো জবাব দিলো না। সে ঘোরগ্রস্তের মতো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ নিবদ্ধ হয়ে আছে ঘরের ভেতর হেমার ঘুমন্ত মুখের ওপর।

আসলাম সাহেব বললেন, 'আগে কাপড়টা পাল্টে নাও'।

নয়ন এই কথায়ও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। সে দরজার কাছটাতে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। একটা কথাও কাউকে জিজ্ঞেস করল না। নয়ন এলো পরদিনও। সেদিনও সে তেমনই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কারো সাথে কোনো কথা বলল না। না সেই দিন, না তার পরদিন। না তারপরের দিন। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে না নয়ন। কিন্তু সে রোজ আসতে লাগল। খুব ভোর বেলা এসে সে বাইরের বারান্দায় একটা বেঞ্চি আছে, সেই বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে থাকে। আর রাত হলে যায়। আসলাম সাহেব তাকে কত কিছু জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু সে কোনো কথারই জবাব দেয় না। বসে থাকতে থাকতে তার একটা ঘোরের মতো হয়। সে সেই ঘোরের ভেতর রেণুর মতই হেমার সাথে কথা বলে। হেমা তাকে বলে, 'তুমি কেন এসেছ?

নয়ন বলে, 'তুমি যে আসতে বললে!'

হেমা বলে, 'কই? না তো!'

নয়ন বলে, 'হ্যাঁ'।

হেমা বলে, 'কবে?'

নয়ন বলে, 'মনে করে দেখো'।

হেমা খানিক চুপ করে ভাবে। তারপর বলে, 'কই? আমার তো মনে পড়ছে না!'

নয়ন বলে, 'কেন, তুমি যে বলেছিলে, তুমি আমার অপেক্ষায় থাকবে!'

হেমা এবার চুপ করে যায়। নয়ন বলে, 'আমি এসেছি, এবার ওঠো'।

হেমা কথা বলে না। নয়ন বলে, 'কই? ওঠো'।

হেমা বলে, 'আমি তো উঠতে পারি না নয়ন! আমার কি যে ইচ্ছে করে উঠতে! কিন্তু আমি উঠতে পারি না'।

নয়ন বলে, 'একটু চেষ্টা করে দেখো। তুমি ঠিক উঠতে পারবে'।

নয়ন দেখে, হেমা উঠতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তার হাত-পা, চোখের পাতা, মাথা সকলই যেন অদৃশ্য এক দড়িতে বাঁধা। এই বাঁধন ছেড়ে সে উঠতে পারছে না। কিন্তু সে সব শুনতে পাচ্ছে। সে সব বুঝতে পারছে। এই সময়টায় হেমার জন্য নয়নের খুব কষ্ট হয়। তার মনে হয় সে গিয়ে যদি ওই অদৃশ্য বাঁধনটাকে খুলে দিয়ে আসতে পারত! কিন্তু সে হেমার কাছে যায় না। সে দূর থেকে উঁকি দিয়ে খানিক দেখে। তারপর আবার বাইরের এই বেঞ্চিতে এসে বসে থাকে। তারপর মনে মনে হেমার সাথে কথা বলে।

হেমা তাকে মাঝে-মধ্যে বলে, 'তুমি সারাক্ষণ এখানে বসে থাকো কেন নয়ন?'

নয়ন বলে, 'তোমার জন্য'

হেমা বলে, 'আগে তাহলে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে কেন?'

নয়ন বলে, 'তোমার কাছে আসার জন্য'।

হেমা বলে, 'কাছে আসার জন্য ফিরিয়ে দিতে হয়?'

নয়ন বলল, 'হ্যাঁ হয়। কাছে আসার জন্য দূরে যেতে হয়'।

হেমা বলল, 'কতটা দূরে?'

নয়ন বলে, 'যতটা দূরে গেলে কাছে আসা যায়। দূরে না গেলে কাছে আসা যায় কি করে?'

হেমা বলে, 'কিন্তু সব দূরত্ব থেকে তো কাছে আসা যায় না নয়ন। কিছু কিছু দূরত্ব আছে, যেখানে গেলে সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না'।

এই কথায় নয়ন থমকে যায়। সে বলে, 'তুমি অতটা দূরে যেও না প্লিজ'।

হেমা বলে, 'আমি যেতে চাই না তো! আমার খুব কষ্ট হয়। বাবা-মার জন্য কষ্ট হয়। তোমার জন্য কষ্ট হয়'।

নয়ন বলে, 'তাহলে ফিরে এসো তুমি'।

www.boighar.com

হেমা বলে, 'পারছি না তো! আমি চেষ্টা করছি, খুব চেষ্টা করছি নয়ন। খুব।'

নয়ন বলে, 'চেষ্টাটা কখনো ছেড়ো না। কখনো না'।

হেমা বলে, 'আমি ছাড়ব না। কিন্তু যদি অনেক অনেক সময় লেগে যায়? অনেক অনেক বছর? যদি তখন আমি বৃদ্ধ হয়ে যাই?'

নয়ন বলে, 'আমি অপেক্ষায় থাকব'।

হেমা বলে, 'সত্যি সত্যি থাকবে তো?'

নয়ন বলে, 'হ্যাঁ। থাকব'।

হেমা বলে, 'কিন্তু আমার মতো হয় যদি? আমি বলেছিলাম আমি তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকব। কিন্তু দেখো, তুমি তো সেই এলে, কিন্তু আমিই তো নেই। আবার আমি এসে যদি দেখি তুমি নেই?'

নয়ন এই সময়টায় ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে। সে ফিসফিস করে বলে, 'আমি থাকব হেমা। সারাজীবন থাকব। তুমি শুধু এসো। একবার এসো। প্লিজ, এসো। একবার'।

করিডোরে হেঁটে যাওয়া নার্স, ডাক্তার, রোগী আরো কত কত মানুষ নয়নের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়! একটা মানুষ এমন অদ্ভুতভাবে একা বসে বসে রোজ রোজ কাঁদে! কিন্তু কারো সাথে সে কথা বলে না। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। ওই এক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বসে থাকে। আর কখনো কখনো বিড়বিড় করে কি সব বলে! তারপর কাঁদে।

নয়নের মনে হয়, একদিন ঠিক ঠিক হেমা জেগে উঠবে। কিংবা জেগে উঠবে সে নিজে। তার কেন যেন মনে হয়, হেমার ওই অমন করে ঘুমিয়ে থাকা, তার এই এমন করে হেমার জেগে ওঠার অপেক্ষায় রোজ বসে থাকা। কিংবা পারুলের ওই জেলের ভেতর বন্দি হয়ে রাজীবের অপেক্ষায় থাকা। কিংবা তার বাবা ফখরুল আলম জীবনভর তার মা কোহিনূরকে সত্যি সত্যি নিজের করে পাবার জন্য যে অপেক্ষা করেছেন সেই অপেক্ষা, এর কোনো কিছুই আসলে বাস্তবে ঘটা কোনো ঘটনা নয়। এর সকলই যেন একটা ঘোর, একটা দুঃস্বপ্ন। হয় এই দুঃস্বপ্ন সে নিজে দেখছে। না হয় পারুল দেখছে, না হয় হেমা দেখছে। না হয় দেখছে অন্য কেউ। একজনের স্বপ্নে বাদ বাকি আর সকলেই কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছে। কেউ একজন এই ঘুম থেকে জেগে উঠলেই তারা আর সকলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

নয়ন খুব ভাবে। সারাটাক্ষণ ভাবে। মানবজনমটিই তো এমন, তাই নয় কি? এমন একেকটা স্বপ্নের মতোই তো। হতে পারে না? এই যে সে, এই যে চারপাশের পৃথিবী, এই যে এত এত মানুষ, সম্পর্ক, মায়া, অনুভূতি এর সকলই

কি আসলে একেকটা স্বপ্ন হতে পারে না? এই জগতে ঘুম ভেঙে গেলে যেমন স্বপ্ন ভেঙে যায়, স্বপ্নের সব চরিত্ররা মিলিয়ে যায়। কে জানে, কোনো একদিন হয়তো সে দেখবে, তার ঘুম ভেঙে গেছে, আর সেই ঘুম ভেঙে সে হয়তো দেখবে এই মানবজনমের এই এত এত ঘটনা, এত এত গল্প এর পুরোটাই ছিল আসলে একটা স্বপ্ন। হতে পারে না এমন? এমনও তো হতে পারে, মৃত্যু মানেই এই মানবজন্মের ঘুম ভেঙে অন্য কোনো জন্মে জেগে ওঠা। যেমন এই জন্মে মানুষ যখন স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠে তখন তার স্বপ্নে দেখা মানুষগুলোর কি হয়? কোথায় যায় তারা? নাকি তারাও মানুষের মতো, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মুহূর্তে তাদেরও মৃত্যু ঘটে সেই স্বপ্নের জগতে?

আচ্ছা এই মানবজনম যদি সত্যি সত্যিই স্বপ্ন হয়, তখন কি এই মানবজন্মের এই এত এত মানুষ, এত এত সম্পর্ক, অনুভূতি, এদের জন্য তার খারাপ লাগবে? নিশ্চয়ই লাগবে। স্বপ্ন শেষ হয়ে গেলেও তো তার রেশ থেকে যায়। মৃত্যু কি তবে এই মানবজন্মের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে অন্য কোনো জন্মে জেগে ওঠা? সেখানে কি তাহলে রয়ে গেছে অন্য কোনো জনম? সেই জনমের নাম কি?

নয়ন জানে না। সে কেবল জানে, স্বপ্ন হলে হোক, তারপরও তার এই মানবজন্মের একটামাত্র প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার নাম হেমা।

হেমার সাথে গত কিছুদিন নয়ন কথা বলতে পারে না। চেষ্টা করলেও পারে না। হেমা আর জবাব দেয় না। নয়ন চেষ্টা করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। তার মস্তিষ্ক যেন একই সাথে দুজন মানুষের ভূমিকা পালন করতে করতে ক্লান্ত। নয়ন অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, তার মস্তিষ্কে থাকা হেমার প্রতি তার অভিমান হচ্ছে। কী অদ্ভুত, হেমা বলতে তো কিছু নেই, যে ছিল, তা তার মস্তিষ্কেরই একটি বিশেষ কল্পনা। কিন্তু সেই কল্পনাটিকে গত কয়েকদিন থেকে সে সজীব করতে পারছে না। আর পারছে না বলেই তার এই অদ্ভুত অভিমান।

সেদিন হঠাৎ করেই আবার সেই হেমা যেন কথা বলে উঠল। সে বলল, 'কত দিন হলো এভাবে অপেক্ষা করছ?'

নয়ন বলল, 'জানি না তো!'

হেমা বলল, 'কেন? জানতে হবে তো! আমায় এর শোধ করতে দেবে না?'

নয়ন বলল, 'অপেক্ষার কোনো শোধ হয় হেমা?'

হেমা বলল, 'হয় না?'

নয়ন বলল, 'না'।

হেমা বলল, 'তাহলে?'

নয়ন বলল, 'তাহলে কি?'

www.boighar.com

হেমা বলল, 'আমি তোমার এই অপেক্ষার মুহূর্তের অসহ্য কষ্টগুলো মুছে দেবো কীভাবে?'

নয়ন হাসল। তারপর একা একাই ফিসফিস করে বলল, 'ভালোবেসে'।

হেমা যেন খানিক চমকালো। তারপর বলল, 'আর আমি যদি কখনোই ফিরে আসতে না পারি?'

নয়ন বলল, 'পারবে'।

হেমা বলল, 'কীভাবে?'

নয়ন বলল, 'এই যে এখন যেভাবে ফিরে এসেছ'।

হেমা বলল, 'এই আমি তো সত্যি সত্যি ফিরে আসিনি নয়ন। এই আমি তো তোমার কল্পনা'।www.boighar.com

নয়ন বলল, 'কে জানে, কোনটি সত্যি, আর কোনটি কল্পনা?'

হেমা বলল, 'এ কেমন কথা?'

নয়ন বলল, 'এটিই কথা হেমা। আমরা কেউ জানি না, কোনটি সত্যি আর কোনটি কল্পনা। আমরা যখন স্বপ্নের ভেতর মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে দৌড়াই তখন তো আমরা জানি না যে আমরা স্বপ্ন দেখছি। তখন মনে হয়, ওটাই সত্যি। কী প্রাণপণ সেই দৌড়। তাই না? কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে দেখি ওটি ছিল স্বপ্ন। তাই না? কে জানে, হয়তো ঘুম ভাঙা আমি মানুষটাও অন্য কারো স্বপ্ন। অন্য কারো কল্পনা। হতে পারে না?'

হেমা চুপ করে রইল। নয়ন বলল, 'তুমি ভয় পেয়ো না, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। রক্তমাংসের মানুষের অস্তিত্বে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে তো, কিংবা কল্পনার মানুষের অস্তিত্বের সাথে বসবাসের অভ্যেস নেই তো, হয়তো এইজন্যই সত্যিকারের তুমি বলে যাকে ভাবি, সেই মানুষটাকেই আমার বেশি দরকার। খুব বেশি দরকার।'

হেমা বলল, 'তোমার আমাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে না?'

নয়ন বলল, 'খুব'।

হেমা বলল, 'তাহলে? তাহলে তুমি তো এই আমাকে ছুঁয়ে দেখতে পারবে না!'

নয়ন বলল, 'এটাও অভ্যেস। আমরা হয়তো এই ছোঁয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি হেমা। এই তোমাকে হয়তো অন্য কোনোভাবে ছোঁয়া যায়। যা আর সকল ছোঁয়ার ছেয়ে গভীর। আর সকল ছোঁয়ার চেয়েও আনন্দের।'

হেমা এবার আর কথা বলল না। চুপ করে রইল। নয়নও।

ফখরুল আলম বসে আছেন বাড়ির ছাদে। পাশের মাঠে ক্রিকেট খেলছে ছেলেপুলেরা। লাল টেপ পেচানো একটা টেনিস বল হঠাৎ ছুটে এলো তার দিকে। তিনি ডানে সরবেন না বামে সরবেন ভাবতে ভাবতেই বলটা তার চশমায় ঠুকে গেল। চশমার বাঁ চোখের ডাটটা ভেঙে চোখের পাশে খানিক কেটেও গেল। ফখরুল আলম অবশ্য খেয়াল করলেন না। নিচ থেকে ছেলেপুলেগুলো চেঁচামেচি করছে। তিনি চশমা ছাড়া তেমন একটা চোখে দেখেন না। তাছাড়া বলটা তার কপালে লেগে ছাদের কোথায় গিয়ে যে পড়েছে, তাও তিনি ঠিকঠাক ঠাহর করে উঠতে পারছেন না। তিনি উঠে বলটা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু নিচ থেকে চেঁচামেচি বাড়তেই লাগল। খানিক সময় লাগলেও বলটা খুঁজে পেয়ে তিনি ছুঁড়ে মারলেন নিচে। কিন্তু সামনের ইলেকট্রিকের তারে লেগে বলটা গিয়ে পড়ল ময়লার ড্রেনে। এতক্ষণ নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে ছোকড়াগুলো এবার যেন খেঁদিয়ে উঠল, 'কানা নাকি আপনে? চোখে দ্যাখেন না?'

কথাটা শুনে ফখরুল আলমের কেমন মন খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ হবার মতোই ঘটনা। কিন্তু এমন তো তার সাথে রোজই ঘটে। কই তখন তো তার মন খারাপ হয় না! বরং সরি টরি বলে ঝামেলা এড়িয়ে তিনি চলে আসেন। তাহলে আজ? আজ কেন এমন হচ্ছে?

ফখরুল আলমের চেহারা বা আচরণটাই যেন একটু কেমন! হয়তো এজন্যই রোজ বাসে-পথে, অফিসে এমন দুয়েকটা কথা তাকে শুনতেই হয়। শুনতে শুনতে এসবে তার অভ্যাসই হয়ে গেছে। কিন্তু আজ তাহলে এমন মন খারাপ হয়ে গেল কেন? ফখরুল আলম অনেকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। আজকের সন্ধ্যাটাও যেন কেমন একটা মন খারাপ করে দেয়া সন্ধ্যা।

ফখরুল আলমের সামনে দিয়ে কতগুলো পাখি উড়ে গেল সার বেঁধে। সামনের ইলেক্ট্রিকের তারের উপর বসে ডানা ঝাপটালো একটা কাক। কোথাও

www.boighar.com

আলাদা কিছু নেই। অথচ তারপরও ফখরুল আলমের কি যে মন খারাপ হয়ে যেতে লাগল! তার কেমন একা একা লাগতে লাগল। সারাজীবন তো তিনি একাই। কিন্তু এমন আলাদা করে কখনো তো একা মনে হয়নি!

ফখরুল আলম হঠাৎই কারণটা ধরতে পারলেন। কারণটা হচ্ছে ওই লাল টেনিস বলটা। টেনিস বলটা দেখে তার নয়নের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে। নয়ন একবার বল মেরে তার চশমার ডাট ভেঙে দিয়েছিল। আজ টেনিস বলটা আর ছেলেগুলোকে দেখে তার সেই ছোট্ট নয়নের কথাই মনে হচ্ছিল। হয়তো সে কারণেই এত মন খারাপ হয়ে গেছে! অন্ধকার নেমে আসতে আরও খানিক সময় লাগবে। একটা ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। কিন্তু সেই হাওয়া জুড়েও যেন তীব্র মন খারাপের ছোঁয়া।

ফখরুল আলমের মনে হলো, তার কাঁধে যেন সেই ঠান্ডা হাওয়া জমাট বেঁধে আটকে আছে। তিনি ডান হাত বাড়িয়ে কাঁধের জমাট অনুভূতির স্পর্শটুকু ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। হাত বাড়াতেই চমকে গেলেন তিনি। ঘাড় ঘুরে পেছনে তাকাতেই দেখলেন কোহিনূর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'কোনো দরকার?'

কোহিনূর বললেন, 'হ্যাঁ'

তিনি বললেন, 'কি? বুয়া আসেনি?'

কোহিনূর বললেন, 'না, এসেছে'।

তিনি বললেন, 'তাহলে? বাজার নেই?'

কোহিনূর বললেন, 'না, আছে'।

তিনি বললেন, 'ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?'

কোহিনূর বললেন, 'না'।

তিনি বললেন, 'নয়নের কোনো সমস্যা?'

কোহিনূর বললেন, 'না'।

তিনি বললেন, 'তাহলে?'

কোহিনূর কথা বললেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তার মুখখানা যেন ভার। চোখ জোড়া যেন ফুলে আছে। ফখরুল আলম বললেন, 'কার কি হয়েছে?'

কোহিনূর বললেন, 'আমার হয়েছে'।

ফখরুল আলম ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি আতঙ্কিত গলায় বললেন, 'কি হয়েছে?'

কোহিনূর হঠাৎ কিশোরী মেয়ের মতো সলজ্জ কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে আমার খুব জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।'

ফখরুল আলম হতভম্ব হয়ে গেলেন। তার ধারণা তিনি ভুল কিছু শুনছেন। তিনি থতমত গলায় আবারো জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ইচ্ছে করছে?'

কোহিনূর বললেন, 'আপনাকে আমার খুব জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেন জানি লজ্জাও হচ্ছে। আপনি কি আমাকে একটু জড়িয়ে ধরবেন?'

ফখরুল আলম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন! কি হয়েছে কোহিনূরের? মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো! তিনি কোহিনূরকে ভয় পান। যথেষ্টই ভয় পান। কোহিনূরের মেজাজমর্জি বুঝে চলার চেষ্টা করেন। পারতপক্ষে তার সামনে যান না। কোহিনূরও অবশ্য তাকে নিয়ে কখনো কোনো আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু এখন তিনি কি করবেন? সন্ধ্যাবেলা আশেপাশের বাড়ির ছাদেও লোকজন রয়েছে। কোহিনূরকে এই অবস্থায় তাকে সত্যিসত্যি জড়িয়ে ধরতে বলেছেন? ফখরুল আলমের ধারণা তিনি কোহিনূরের কথা বুঝতে পারেননি। কোহিনূর বলেছেন একটা, তিনি বুঝেছেন আরেকটা।

তিনি বললেন, 'তুমি রাগ করো না কোহিনূর। আমি না তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

কোহিনূর ফখরুল আলমের বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন। তারপর প্রগাঢ় আবেশমাখা গলায় বললেন, 'আপনি কি একটু আমাকে জড়াই ধরবেন? শক্ত করে?'

ফখরুল আলম বিব্রত ভঙ্গিতে এদিক-সেদিক তাকালেন। তারপর দ্বিধাজড়িত গলায় বললেন, 'আশেপাশের ছাদে লোকজন। তারা সব দেখছে কোহিনূর।'

কোহিনূর বললেন, 'আমি আপনার বিয়ে করা বউ না? তারা দেখলে কি সমস্যা?'

ফখরুল আলম বললেন, 'তোমার কিছু হয়েছে কোহিনূর? কোনো সমস্যা?'

কোহিনূর বললেন, 'হ্যাঁ। হয়েছে'।

ফখরুল আলম বললেন, 'কি হয়েছে?'

কোহিনূর হঠাৎ ফখরুল আলমকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তারপর তার বুকের সাথে মুখ ঘষতে ঘষতে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ফখরুল আলম কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে কোহিনূরকে শক্ত করে বেষ্টন করলেন। বললেন, 'কি হয়েছে কোহিনূর? শরীর খারাপ লাগছে? অসুস্থ লাগছে?'

কোহিনূর জবাব দিলেন না। তিনি কাঁদতেই লাগলেন। চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। সেই অন্ধকারে ফখরুল আলমের বুকের ভেতর মিশে গিয়ে কোহিনূর ফিসফিস করে বললেন, 'আপনে কি জানেন, এই দুনিয়ায় সবচেয়ে হতভাগী মানুষটা আমি!'

www.boighar.com

ফখরুল আলম কথা বললেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোহিনূর ফিসফিস করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কেন এই দুনিয়ার সবচেয়ে হতভাগী মানুষটা আমি জানেন?'

ফখরুল আলম তাও জবাব দিলেন না। তিনি আসলে জানেন না। এই জগতের কতটুকুই বা তিনি জানেন?

কোহিনূর বললেন, 'কারণ, এই দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো মানুষটা আমার। কিন্তু কোনোদিন তারে আমি আমার ভাবতে পারি নাই। কোনো দিন না। আমি কত বড় হতভাগী আপনি বুঝছেন?'

ফখরুল আলম আসলে বোঝেননি। এত ভারি ভারি কথা তিনি বোঝেন না। তিনি সহজ মানুষ, সহজ কথা বোঝেন। কোহিনূর বললেন, 'বাকি জীবনটা আমি আর আপনারে পর ভাবতে চাই না। আমি আপনারে আমার নিজের চেয়েও আপন ভাবতে চাই। আপনি দিবেন? আপনি আমারে আপনারে একটুখানি দিবেন?'

ফখরুল আলম বুঝতে পারছেন না তিনি তাকে কীভাবে কোহিনূরকে দিবেন? কোহিনূর এসব কি আবোল-তাবোল বকছে! তিনি এও বুঝতে পারছেন না, কোহিনূরের এসব আবোল-তাবোল শুনে তার কান্না পাচ্ছে কেন! তার গাল বেয়ে পানি নামছে! ফখরুল আলম কোহিনূরকে ছেড়ে দিয়ে হন্যে হয়ে এ পকেট থেকে ও পকেট রুমাল খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু রুমাল কোথাও পেলেন না। কী লজ্জার কথা। তিনি এই ছাদে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। কেউ দেখলে কি বলবে? আচ্ছা, তিনি কি কোহিনূরের শাড়ির আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছবেন? কোহিনূর কিছু বলবে না তো?

ফখরুল আলম সাহস করে কোহিনূরের শাড়ির আঁচলের দিকে হাত বাড়ালেন।

হেমাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো নয় মাস পর। তার অবস্থার অবশ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, হাসপাতালে রেখে আলাদা কোনো চিকিৎসার সুযোগ নেই। তার চেয়ে হেমার পরিচর্যার জন্য একজন নার্স রেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসাটাই ভালো। আসলাম সাহেবও শেষ অবধি ভেবে দেখলেন, সে-ই ভালো। রেণুর কথামতো আগের ফ্ল্যাটটিই তারা ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু হেমাকে বাসায় নিয়ে আসাতে ধকল পোহাতে হলো আরো অনেক। এতদিন কোনো বিপদে-আপদে দেখা না পাওয়া আত্মীয়-স্বজনরা হঠাৎ হই হই করে তেড়ে আসলেন। তাদের প্রধান আপত্তি, স্বামী-স্ত্রী না হয়েও এভাবে এক ছাদের নিচে তো বসবাস করতে পারেন না রেণু আর আসলাম সাহেব! বিষয়টি অবশ্য রেণু বা আসলাম সাহেব, কারো মাথাতেই ছিল না। শেষ অবধি নিয়ম-কানুন মেনে নতুন করে আবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারতে হয়েছে তাদের।

নয়নকে অবশ্য বহুদিন আর কোথাও দেখা গেল না। আসলাম সাহেব কয়েকবার নয়নের খোঁজ করার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু পাননি। নয়নের দেখা মিলল দীর্ঘ আড়াই বছর পর। সে দাঁড়িয়ে আছে একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে। ল্যাম্পপোস্টটার মাথার উপরে ডালপালা ছড়ানো একটা সবুজ সজনে গাছ। সজনে গাছের সবুজ পাতার গা ঘেঁষে একটা খোলা বারান্দা। বারান্দার ওপাশের দেয়ালে একটা দরজা। সেই দরজার ওপাশে যে ঘরখানা রয়েছে, সেখানে একখানা খাট। সেই খাটে তখনও ঠিক দুইবছর আগে যেভাবে শুয়েছিল, ঠিক একইভাবে শুয়ে আছে হেমা। একটা জড় খাট, কিংবা একটা চেয়ার, টেবিল, কিংবা একখানা ছবির ফ্রেমের মতো। জড়, অসাড়। এই বাড়ির আর কোনো কিছুই বদলায়নি। সারাদিনের কাজ শেষে রোজ রাতে, এই ঘরখানা হয়ে ওঠে অদ্ভুত এক জগৎ। রেণু ফিসফিস করে হেমার সাথে কথা বলেন। ডাকেন, 'মা, মারে। ও মা। মা, মাগো।'

www.boighar.com

সেই ডাক হেমা শুনতে পায় কিনা বোঝা যায় না। তবে আসলাম সাহেব শুনতে পান। তিনি আলতো করে রেণুর কাঁধে হাত রাখেন। রেণু সেই হাত সরিয়ে দেন না। তিনি হাত তুলে তার কাঁধের উপর রাখা আসলাম সাহেবের হাতখানা ধরেন। তারপর ফিসফিস করে বলেন, 'আল্লাহ কি সত্যি সত্যি জীবনের বিনিময়ে জীবন ফিরিয়ে দেন?'

আসলাম সাহেব রেণুর প্রশ্নের জবাব দেন না। তিনি শক্ত করে রেণুর হাত চেপে ধরেন। রেণু বলেন, 'সম্রাট বাবরের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহপাক তার সন্তান হুমায়ূনের জীবন ফিরিয়ে দেননি?'

আসলাম সাহেব কী জবাব দিবেন? রেণু বললেন, 'আমি আমার জীবনের বিনিময়ে আমার মেয়ের জীবন ফিরে পেতে চাই।'

আসলাম সাহেব ডাকলেন, 'রেণু!'

রেণু বললেন, 'আমাকে কি করতে হবে তুমি বলো'।

আসলাম সাহেব এবার কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি জানি না, রেণু। আমি জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।'

তিনি দু'হাতে রেণুকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। এই কান্নার গল্পরা চলতেই থাকে। রোজ রাতের গভীর অন্ধকারে এই কান্নার জলে লেখা হতে থাকে জগতের তীব্রতম কষ্টের গল্প। সেই গল্প এই চিরবঞ্চিত, চির দুঃখী দুজন বাবা-মা ছাড়া জগতের আর কেউ জানে না। কেউ না। নাকি জানে? হয়তো জানে। জানে রাতের এই গভীর কালো অন্ধকার আর দুর্ভেদ্য দেয়াল। কিন্তু সেই অন্ধকার আর দুর্ভেদ্য দেয়ালের কি সাধ্য আছে এই গল্প বোঝার?

নয়নের সাথে আড়াই তিন বছর বয়সের ছোট্ট ফুটফুটে এক মেয়ে এসেও মাঝে-মধ্যে ওই সজনে গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটার নাম অপেক্ষা। অপেক্ষার নাম রেখেছে তার মামা নয়ন। তার মা পারুলেরও অবশ্য নামটা ভীষণ পছন্দের। পারুলের মামলার রায় হয়েছে। শেষ অবধি তার ফাঁসি হয়নি। তার সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন।

বয়সের তুলনায় অপেক্ষা খানিক বেশিই চুপচাপ। খানিক গম্ভীরও। সে কিছু কথাও বলতে পারে। তবে তা কেবল তার মর্জি হলেই। না হলে নয়। সে নয়নকে মাঝে-মধ্যে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে জিজ্ঞেস করে, 'আমরা এখানে কি করি?'

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'অপেক্ষা'।

অপেক্ষা তার মধ্যাঙ্গুলি উঁচু করে নিজের দিকে ইশারা করে নিজেকে দেখিয়ে বলে, 'আমি?'

নয়ন বলে, 'হুঁ'।

অপেক্ষা নয়নের কথা বুঝতে পারে না। তবে সে মুখ ফুটে আর কিছু বলেও না। সেও নয়নের মতো চুপচাপ তাকিয়ে থাকে তার মাথার উপরের বারান্দাটার দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। ঘুম পেয়ে যায়। সে ঘুমিয়েও পড়ে। ঘুমন্ত অপেক্ষাকে বুকে চেপে নয়ন সারা শহর ঘুরে বেড়ায়। তার একটুও কষ্ট হয় না। সে একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে, আজকাল অপেক্ষাকে ছাড়া হাঁটতে তার কষ্ট হয়। মনে হয় তার শরীরের একটা কোনো অংশ বোধহয় তার সাথে নেই। নিজেকে কেমন অপরিহার্য কোনো অঙ্গহীন মানুষ মনে হয় তার।

মাঝে-মধ্যে অপেক্ষাকে নিয়ে পারুলের সাথে দেখাও করতে যায় সে। কিন্তু পারুলের প্রতি অপেক্ষার আগ্রহ তেমন নেই। সে নয়নের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকায়। নয়ন পারুলকে হাতের ইশারায় দেখিয়ে বলে, 'মা। মা'।

অপেক্ষা পারুলের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকে। তারপর নয়নের দিকে মুখ ফিরিয়ে নয়নের শরীরের সাথে মিশে যেতে যেতে আহ্লাদি গলায় বলে, 'মামা?'

নয়ন মা দুটোকে ভেঙে আলাদা করে দিয়ে বলে, 'মা...। এইটা তোমার মা'।

অপেক্ষা আবার একইভাবে পারুলের দিকে তাকায়। তারপর আবার একইভাবে নয়নের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার শরীরের সাথে মিশে গিয়ে আহ্লাদি গলায় বলে, 'মামা'।

পারুল অবশ্য এতে মন খারাপ করে না। সে বরং মুগ্ধ চোখে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। আচ্ছা, আজ থেকে কুড়ি বছর পর, এই মেয়েটা কত বড় হবে? সে যখন যাবজ্জীবনের সাজা শেষ করে জেল থেকে বের হবে, তখন কি তার মেয়ে তাকে চিনবে? নাকি এমন করেই মুখ ফিরিয়ে নেবে? পারুলের ধারণা, নেবে না। জগতে মায়ের কষ্ট সবচেয়ে বোঝে মেয়েরা। তার মেয়েও নিশ্চয়ই তার কষ্ট বুঝবে। কিন্তু রাজীব? রাজীব কি সত্যি সত্যিই কখনো আসবে না? না আসলে না আসুক। এই যে তার মেয়ে, এই এক অপেক্ষা আছে। সে আবার আসবে। তাকে এক চোখ দেখার অপেক্ষা নিয়েই পারুলের সপ্তাহ কেটে যায়। মাস কেটে যায়। বছর কেটে যায়। তবে পারুলের বিশ্বাস, রাজীব একদিন না একদিন আসবেই। সে সবাইকে চমকে দিয়েই চলে আসবে। পারুলের আজকাল খুব অস্থির লাগে। সে শুনেছে, জেলখানার বছরের হিসেব বারো মাসে হয় না, হয় নয় মাসে। আর যাবজ্জীবন সাজাও সেই অর্থে যাবজ্জীবন নয়। নানান হিসেব-নিকেশ শেষে তা বছর কুড়িতে এসে ঠেকে। ইশ কুড়িটি বছর যদি এক ফুঁয়ে চলে যেত তার!

কিন্তু যায় না। সময় কারো অপেক্ষায় যেমন থাকে না। তেমনি কারো অপেক্ষায় সে চলেও যায় না। সে যায় তার নিজের মতো।

www.boighar.com

সেদিন রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল নয়ন। একটা বিশাল নদী। নদীর ধারে বিশাল বটগাছ। বটগাছের শেকড় ছড়িয়ে গিয়ে নদীর জল ছুঁয়েছে। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। সেই ঢেউয়ের ভেতর একখানা ছোট্ট নাও। নাওয়ের ডগায় বসে আছে অপেক্ষা। অপেক্ষাকে দেখতে লাগছে অনেক বড়। সে তাকিয়ে আছে জলের ভেতর। নয়নকে দেখে অপেক্ষা অবিকল তার মায়ের কণ্ঠে বলল, 'মামা, একটা মেয়ে না নৌকা থেকে লাফিয়ে পানিতে পড়ে গেছে।'

নয়ন বলল, 'নৌকা থেকে লাফিয়ে কে পানিতে পড়বে?'

অপেক্ষা ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আমি তো জানি না মামা'।

www.boighar.com

নয়ন বলল, 'না জেনে কথা বলবে না। এই নৌকায় তো আর কেউ ছিল না যে পানিতে লাফিয়ে পড়বে।'

অপেক্ষা বলল, 'ছিল মামা। তুমি দেখতে পাওনি।'

নয়ন বলল, 'কে ছিল?'

অপেক্ষা বলল, 'একটা মেয়ে মামা। সে নৌকার মেঝেতে শুয়ে লুকিয়ে ছিল। তোমাকে আসতে দেখেই সে লাফিয়ে পড়েছে পানিতে। তুমি তাকে বাঁচাও মামা।'

নয়ন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে অপেক্ষাকে বলল, 'আমি কি করে তাকে বাঁচাব?'

অপেক্ষা বলল, 'তুমি পানিতে নামো মামা। নেমে তাকে পানি থেকে তোলো।'

নয়ন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে খানিক হতবুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পানিতে নামল। কিন্তু পানিতে নেমেও নয়ন মেয়েটিকে কোথাও খুঁজে পেল না। কোথাও না। সে পানির নিচে ডুবে গিয়ে অবধি মেয়েটাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না। কোথায় মেয়েটি?

এই মুহূর্তে নয়নের মনে হলো মেয়েটি পানিতে ভেসে উঠেছে। সে চিৎকার করে নয়নকে ডাকছে। নয়নের উচিত এখনই পানির উপরে ভেসে উঠে মেয়েটিকে তুলে ধরে তাকে নৌকায় বা তীরে উঠিয়ে নেয়া। কিন্তু নয়ন তা পারল না। এই এতক্ষণ পর নয়ন তার পানির নিচে ডুবে যাওয়ার কারণ খুঁজে পেল। তার হঠাৎ মনে হলো, সে তো আসলে সাঁতারই জানে না। সে সাঁতার না জেনেই অপেক্ষার কথা শুনে দুম করে পানিতে নেমে গিয়েছিল। এখন? এখন সে কি করবে? নয়ন আবিষ্কার করল তার দম ফুরিয়ে এসেছে। শরীর অসাড় হয়ে আসছে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করল নিঃশ্বাস নিতে। কিন্তু পারল না। গল গল করে নাক আর মুখ দিয়ে পানি ঢুকে গেল। তার অসহ্য কষ্ট হতে লাগল। বুকের ভেতরটা হাঁসফাঁস করতে লাগল একটু বাতাসের জন্য। একটু তাজা হাওয়ার জন্য। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য। কিন্তু নয়ন পারল না। সে ক্রমশই

নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকল। মৃত্যু! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু তাকে গ্রাস করে নেবে। নয়ন চিৎকার করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তার হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। নয়ন চোখ বন্ধ করে ফেলল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখল, মাছের মতো সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে কেটে একটা মেয়ে তার কাছে চলে এলো। তারপর আলতো হাতে তার হাত ছুঁয়ে দিলো। তারপর কি অদ্ভুত মিষ্টি করেই না হাসল! নয়ন সেই মুহূর্তে মেয়েটাকে চিনতে পারল, হেমা! হেমা বলল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে নয়ন?'

নয়ন বলল, 'হু'।

হেমা বলল, 'আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে নয়ন'।

নয়ন বলল, 'কিন্তু তুমি তো হাসছ!'

হেমা বলল, 'আমি তো এমনই নয়ন'।

নয়ন বলল, 'কেমন?'

হেমা বলল, 'এই যে সারাটাজীবন বুকের ভেতর কষ্ট পুষেও হেসে যাওয়া মানুষ।'

নয়ন বলল, 'তোমার এত কষ্ট কেন?'

হেমা বলল, 'মানুষ বলে'।

নয়ন বলল, 'মানুষ হলেই বুকের ভেতর কষ্ট পুষে রেখে হাসতে হয়?'

হেমা বলল, 'হ্যাঁ হয়। জগতে আর কোনো প্রাণী তার রাগ, কষ্ট, ক্রোধ লুকিয়ে হাসতে পারে না। একমাত্র মানুষই পারে। নিজের ভেতরের অনুভূতি লুকিয়ে অন্যরকম অভিনয় করে বাঁচতে।'

নয়ন বলে, 'কিন্তু আমি যে পারি না?'

হেমা বলে, 'তুমিও পারো'।

নয়ন বলে, 'কই? তোমার জন্য এই যে আমার এত কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমি তো কখনোই সেগুলো লুকিয়ে রাখতে পারি না।'

হেমা বলে, 'জগতের সব মানুষ তো এক হয় না নয়ন।'

নয়ন বলল, 'কিন্তু আমি তোমার মতো হতে চাই। তোমার মতো।'

হেম বলল, 'আমি চাই না তুমি আমার মতো হও নয়ন। আমার মতো হওয়া অনেক কষ্টের।'

নয়ন বলল, 'কষ্ট হলো হোক। তারপরও আমি তোমার মতো হতে চাই। শান্ত, স্থির, গভীর।'

হেমা আবারো মিষ্টি করে হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে আলতো করে নয়নের গাল ছুঁয়ে দিলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নয়নের মনে হলো তার শরীর জুড়ে অদ্ভুত এক আবেশ ছড়িয়ে যাচ্ছে। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। ঘুম, ঘুম, ঘুম। নয়ন তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

www.boighar.com

নয়নের ঘুম ভাঙল পরদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেলে। হেমার সুস্থ হয়ে ওঠার খবরটা সে পেল তারও দু'দিন বাদে। চার বছর এক মাস তেরো দিন পর হেমা কোমা থেকে উঠল। তাকে নিবিড় পরিচর্যায় রাখা হয়েছে হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে থাকতে তার আর ভালো লাগছে না। তার খুব বাসায় যেতে ইচ্ছে করে। তারপর তার সেই একলার বারান্দাটায় চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে। সজনে গাছগুলো কি পাতা ছেড়েছে? ঝুম বৃষ্টিতে সেই পাতাগুলো এখন নিশ্চয়ই গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে। হেমার বুকের ভেতরটা কেমন তড়পায়। এত ভেবেও নিজেকে কেন সে অনুভূতিহীন করতে পারে না? মানুষ এমন কেন? একটা পাতার জন্য, একটা ফুলের জন্য, এক ফোঁটা শিশিরের জন্য, একটা কল্পনার নদী, খানিক মেঘ, একটা পাহাড়, খানিক বৃষ্টি, খানিক স্মৃতি, খানিক স্পর্শ কিংবা ভুলে যাওয়া একটা গোটা মানুষের জন্যও কেন তার মন কেমন করে!

মানুষ হয়ে জন্মানোর এই এক কষ্ট! সকলই কেমন বুকের ভেতর ডুবে ডুবে লুকিয়ে থাকে। তারপর সুযোগ পেলেই ভেসে ভেসে ওঠে। তারপর বানের জলের মতো সকল কিছু ভাসিয়ে দেয়।

নয়নের সাথে হেমার দেখা হলো তারও কিছুদিন পর। নয়নকে দেখে হেমা হাসল। অবিকল স্বপ্নে দেখা সেই হাসির মতো। তাদের মধ্যে কথাবার্তা হলো খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। নয়ন বলল, 'তুমি কি এখনো আমার ওপর রাগ করে আছ?'

হেমা বলল, 'হু। রাগ করে আছি।'

নয়ন বলল, 'এখনো?'

হেমা বলল, 'হু'।

নয়ন বলল, 'আমি রাগ ভাঙাতে কি করব?'

হেমা বলল, 'কোনো এক নিকষ কালো বৃষ্টির দিনে আমার বারান্দাটার নিচে ভ্যানভর্তি করে কদমফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

নয়ন বলল, 'আর কিছু?'

হেমা বলল, 'হু'।

নয়ন বলল, 'আর কি?'

হেমা বলল, 'আমাকে একটা পুকুর কিনে দিবে। পুকুরের চারধার জুড়ে থাকবে অজস্র হিজল আর কদমফুলের গাছ। আমি সেই হিজল আর কদম ফুলের গাছের তলায় বসে থাকব। কোনো এক হিজল ফুলের দিনে পুকুর ভর্তি ভেসে থাকা হিজল ফুলের ভেতর পা ডুবিয়ে বসে আমি তোমাকে ডাকব। তারপর বলব, চলো বিয়ে করি ফেলি।'

নয়ন বলল, 'এত সব আমি কই প্যাব? আর পেলেও, অতদিন পর্যন্ত আমি দেরি করতে পারব না। আগে বিয়ে করি ফেলি? তারপর না হয় খুঁজে দিব।'

হেমা বলল, 'কিন্তু তুমি যদি তখন তোমার কথা না রাখো?'

নয়ন বলল, 'রাখব'।

হেমা বলল, 'কি করে বুঝব?'

নয়ন বলল, 'বুঝবে'।

হেমা হাসল। নয়নও।

তারপর কোনো এক তুমুল বৃষ্টির অন্ধকার দুপুরে হেমা হঠাৎ বারান্দায় নিচে তাকিয়ে চমকে গেল। নয়ন দাঁড়িয়ে আছে নিচে। তার পাশে একটা ভ্যান। ভ্যানভর্তি অসংখ্য কদম ফুল। কদমফুলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট ফুটফুটে এক মেয়ে। সে তাকিয়ে আছে হেমার দিকে। হেমার চোখে চোখ পড়তেই সে হাত ইশারা করে হেমাকে ডাকল। একবার, দুইবার, তিনবার। হেমা হঠাৎ পাগলের মতো ঘরে ঢুকল। তারপর তার সেই গাঢ় নীল শাড়িটা সে ঝটপট পরে ফেলল। তারপর পাগলের মতো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। হেমা তার হাত ধরে ভ্যানের মাঝখানটায় উঠে বসল।

তুমুল বৃষ্টিতে অদ্ভুত সুন্দর এক দৃশ্য! নীল শাড়ি পরা অদ্ভুত সুন্দরী এক তরুণী বসে আছে খোলা ভ্যানে। তার পাশে বসে আছে ফুটফুটে পরীর মতো এক শিশু। তাদের চারপাশ ছেয়ে আছে অজস্র শুভ্র হলুদাভ কদমফুলে। এক অদ্ভুত তরুণ ঘোরগ্রস্তের মতো সেই ভ্যান চালিয়ে নিচ্ছে। সে মাঝে-মধ্যেই মাথা ঘুরিয়ে পেছন ফিরে চাইছে। পেছনে তাকাতেই তার চোখ পড়ে যাচ্ছে তরুণীর চোখে। তরুণী মিষ্টি করে হেসে বলছে, 'ভেজা শাড়ির মেয়েদের দিকে অমন করে তাকাতে নেই জানো না?'

তরুণ লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তার খুব ইচ্ছে করছে তরুণীর পাশে গিয়ে বসতে। তার হাতখানা হাতের ভেতর মুঠোবন্দি করে এই তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে যেতে। কিন্তু সাহস করে এই কথা সে তরুণীকে বলতে পারছে না। এত সাহস তার নেই। সে কী তরুণীকে ভয় পায়? হয়তো পায়। আর পায় বলেই সে ডাকাত হতে পারে না, সে হয় চোর। সে চোরের মতো চুরি করে বারবার তরুণীর দিকে তাকাচ্ছে। তার আশা, তরুণী যদি হঠাৎ করেই তাকে ডাকে। ডেকে যদি বলে, 'এসো'।

নয়ন হেমার সেই ডাকের অপেক্ষায় আছে। সে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষায় আছে হেমার ছোট্ট সেই ডাকটির। তারা শহর ছাড়িয়ে চলে এসেছে খানিক নির্জন জায়গায়। এখানে চারধারে খোলা মাঠ। বিস্তৃত আকাশ। আকাশ জুড়ে

www.boighar.com

মেঘ। মেঘ জুড়ে বৃষ্টি। চরাচর ভাসিয়ে নেয়া বৃষ্টি। নয়নের হঠাৎ মনে হলো, হেমা তাকে ডাকছে। নয়ন ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হেমা মিষ্টি করে হেসে নয়নের দিকে হাত বাড়ি তাকে ডাকল, 'এসো'।

নয়নের হঠাৎ মনে হলো তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। তার যে কেমন লাগতে লাগল! মনে হলো বুকের ভেতর হাজারটা প্রজাপতি ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। ফুরফুরে হাওয়ারা আলতো করে ছুঁয়ে যাচ্ছে বুকের গহীন। সে রাস্তার পাশে ভ্যানখানা থামাল। তারপর নেমে এলো ভ্যান থেকে। তার সামনে তখনও হাত বাড়িয়ে বসে আছে বৃষ্টিভেজা নীল শাড়ির এক অপরূপ রূপবতী তরুণী। এই তরুণীর নাম হেমা। সে হেমার দিকে এগুতে লাগল। প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। সেই ঝাপসা হয়ে আসা দৃষ্টির বৃষ্টিতে নয়ন হেমার হাত ছুঁয়ে দিলো। হেমা শক্ত করে নয়নের হাতখানা ধরে ফেলল। নয়নের আচমকা মনে হলো, এই দৃশ্য সত্যি তো? সত্যিই হেমা তার পাশে বসে আছে তো? সত্যিই কি সে শক্ত করে তার হাত ধরে এই তুমুল বৃষ্টির বিকেলে তার পাশে বসে রয়েছে? এই এত এত কষ্ট, এত এত দুঃসহ দিন রাত্রির অবর্ণনীয় অপেক্ষার কি সত্যি সত্যিই অবসান ঘটেছে? নাকি এর সকলই স্বপ্ন? নাকি এর সকলই মিথ্যে কল্পনা? নাকি আরো একবার এই সকল কিছুই তার মস্তিষ্কের কষ্ট কল্পিত কোনো সৃষ্টি? নাকি সকলই বিভ্রম? www.boighar.com

বিভ্রম? নয়ন জানে না। জানে না কেউই।

কে জানে, হয়তো এই বিভ্রম আর অপেক্ষার নামই মানবজনম!

সাদাত হোসাইন

স্নাতকোত্তর, নৃবিজ্ঞান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
বুকের ভেতর অফুরন্ত গল্পের বসতি। সেইসব গল্পই বলে যেতে চান লেখায়, চলচ্চিত্রে, ছবিতে। *আরশিনগর* আর *অন্দরমহল* নামের দীর্ঘ কলেবরের দুটি উপন্যাস দিয়ে চমকে দিয়েছেন বাঙালি পাঠককে। বিস্তৃত পরিসরে গল্প বলতে ভালোবাসেন। তারই ধারাবাহিকতায় লিখেছেন সুদীর্ঘ উপন্যাস *মানবজনম*। গল্প বলছেন চলচ্চিত্রেও। তুমুল আলোচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *বোধ* দিয়ে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু। সম্প্রতি *দ্য শুজ* চলচ্চিত্রের জন্য জিতেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬-এর সেরা চলচ্চিত্রকারের পুরস্কার। এছাড়া লেখালেখি, আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্রের জন্য জিতেছেন 'জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড'।

জন্ম মাদারীপুর জেলার, কালকিনি থানার কয়ারিয়া গ্রামে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট এক নদী। সেই নদীর বুকে বয়ে যাওয়া স্রোতের মতনই বুকের ভেতর অজস্র গল্পের স্রোত বয়ে বেড়ানো মানুষটি জীবন জুড়েই গল্প বলতে চান। তার মতে, জীবন জুড়ে যেমন গল্প থাকে, তেমনি গল্প জুড়েও থাকে অসংখ্য জীবন। কী অদ্ভুত, নশ্বর জীবনের সেই সব গল্পরাই কেবল হয়ে থাকে অবিনশ্বর।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত।

www.boighar.com
প্রচ্ছদ ■ খন্দকার সোহেল
www.boighar.com
লেখকের ছবি ■ [illegible]